এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের
নির্বাচিত রচনা

সম্পাদনা

ফয়েজ আলম

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ আর তাঁর চিন্তাভাবনা বাংলাদেশে এরই মধ্যে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসার জন্ম দিয়েছে। প্রাক্তন উপনিবেশের মানুষ হিসাবে আমরা উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী সাঈদের মধ্যে খুঁজে পাই সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মুক্তির প্রণোদনা। সাঈদের জন্ম ১৯৩৫ সালে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে এক এপিসকোপ্যালিয়ান খ্রিস্টান পরিবারে। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর উদ্বাস্তুর নিয়তি মেনে কিশোর বয়সে পরিবারের সাথে মিশরে পাড়ি জমান। কিছুকাল কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ওখানে মাউন্ট হারমান স্কুল, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠ শেষে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ওখানেই আজীবন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য পড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যান্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরের দায়িত্ব পালন করেন।

ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাঈদ। ১৯৭৭ সালে প্রবাসী ফিলিস্তিন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রায় ১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তিসংক্রান্ত মতবিরোধে পদত্যাগ করেন তিনি। এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের পিতা সাঈদ প্রায় এক যুগ ধরে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খ্রি. আমেরিকার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই মহান মানুষটি।

সমকালে আধুনিক মনোভাবের ধীর কিন্তু নিশ্চিত বিলুপ্তি এবং নতুন চিন্তাভঙ্গির বিচিত্র উৎসারণে যে প্রশ্নময়তা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চিত অনুসন্ধান শুরু হয় সাঈদ তার মধ্যে কিছুটা ভিন্ন পথে যাত্রা শুরু করেন: সংস্কৃতি—সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, আধিপত্য, ক্ষমতা এবং অনুন্নত বিশ্বের মানুষের মনোজগতে তার প্রভাব ও পরিণতি হয়ে ওঠে তাঁর পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের বিষয়।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের

নির্বাচিত রচনা

সম্পাদনা

ফয়েজ আলম

সংবেদ

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের নির্বাচিত রচনা

© প্রকাশক

সংবেদ প্রকাশনা ১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রকাশক
পারভেজ হোসেন
সংবেদ, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনা সহযোগী
মোজাম্মেল হক

প্রচ্ছদ
পীযুষ দস্তিদার

কম্পোজ
কালজয়ী কম্পিউটার্স
৫ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
সংবেদ প্রিন্টিং পাবলিকেশন, ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

মূল্য : চারশত আশি টাকা

ISBN: 984-300-000202-0

একমাত্র পরিবেশক
মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭, ৭১১৯৪৬৩

ভারতে পরিবেশক
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, বি-৯, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

SELECTION FROM EDWARD W. SAID ed. Fayaz Alam. Published on February 2008. Published by : Mozammel Haque. Sangbed. 85/1. Fakirerpool. Dhaka-1000. Cover Design by Pijush Dastidar & Neeru. Price : Tk. 480.00

আমার দুই শিক্ষক

ড. আনিসুজ্জামান

আবুল কাসেম ফজলুল হক

এবং

আবুল হাসনাত

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

অরিয়েন্টালিজম

ভূমিকা ৩০
প্রাচ্যকে জানা ৫৬
কাল্পনিক ভূগোল ও তার প্রতিনিধিত্ব : প্রাচ্যের প্রাচ্যায়ন ৭৫
সর্বশেষ পর্যায় ৯৭

কাভারিং ইসলাম

ভূমিকা ১২৫
ইসলাম ও পশ্চিম ১৪৪
জ্ঞান ও তাফসীর ১৬৮

রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল

বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্ব ১৭৯
ক্ষমতার প্রতি সত্যভাষণ ১৯১

কালচার এন্ড ইমপেরিয়ালিজম

ভূমিকা ২০৫
প্রতিরোধ সংস্কৃতির মর্মকথা ২২৩

অন্যান্য রচনা

নির্বাসনে ভাবনাচিন্তা ২৩৭
প্রতিবাদী আমেরিকা ২৫১
উপনিবেশিত'র পরিবেশন নৃবিজ্ঞানের আলাপচারীগণ ২৬২
সার্ত্রের সঙ্গে আমার বিরোধ ২৮৬

গোলকায়নের সংকট ২৯৫
সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য যুদ্ধ ৩০৬
মার্কিন মুলুকে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য ৩০৯
বেঁচে থাকার পর কী ঘটবে? ৩১৪
প্রভাববিস্তারী জীবনবীক্ষা ৩১৮
স্মৃতিকথা লেখার বিষয়ে ৩২০
ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতা (১৯৬৮-১৯৬৯) ৩৩০

সাক্ষাতকার

এডওয়ার্ড সাঈদের সাথে মোস্তফা বেওয়ামির কথোপকথন ৩৪১

ফিলিস্তিনিদের পরিচয় সন্ধানে
এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে সালমান রুশদীর বাক-বিনিময় ৩৬৫

এখন আমেরিকা-বিরোধিতা ও সন্ত্রাসবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮০

পরিশিষ্ট

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৪

সম্পাদকীয়

বাংলাভাষী লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সমঝদার পাঠকদের কাছে এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদের চিন্তাধারা এখন সুপরিচিত। উপনিবেশী আর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্বের তলে তলে সক্রিয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বর্ণচোরা চেহারা ও কলাকৌশল উন্মোচিত করে দুনিয়া জুড়ে যে আলোড়ন তুলেছেন তিনি তার অভিঘাত বাংলাদেশে এসেও লেগেছে। উপনিবেশ উত্তর বাংলাদেশে সাঈদ আর তার লেখালেখির ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঈদের বইপত্র পড়ানো হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও সাঈদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এইসব দিক মাথায় রেখে বর্তমান সংকলনটির পরিকল্পনা নেয়া হয়। সাঈদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে বাছাই করে লেখা নেয়া হয়েছে। এরপরও বলব হয়তো এমন বই বা লেখা বাদ পড়ে গেছে যা অন্য কারো বিচারে জরুরি মনে হতে পারে।

ভূমিকাতে বলেছিলাম, প্রকাশক কথাশিল্পী পারভেজ হোসেনের নিরলস শ্রম ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হতো না। যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, এই সুযোগে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। কালজয়ী কম্পিউটারের ফারুক খান এবং বানান সংশোধক ফরিদুল আলমকেও ধন্যবাদ।

ফয়েজ আলম
ঢাকা, ১লা ফাল্গুন, ১৪১৪

ভূমিকা

এডওয়ার্ড সাঈদের পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি কিভাবে আমাদের আলোকিত করে? কিভাবে পাঠ করব তাকে—কোন ঐতিহ্যের আশ্রয়ে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে? এমন কিছু জিজ্ঞাসা সামনে এনে আমাদের জ্ঞানচর্চায় সাঈদের প্রাসঙ্গিকতা বুঝে নেয়া দরকার। তার লেখাজোখার একটা বড় অংশ ব্যয় হয়েছে উপনিবেশিত'র (Colonized) ওপর উপনিবেশক (Colonizer) পশ্চিমের নানামুখি আগ্রাসন, আধিপত্য, শোষণের ধরন চিহ্নিত করার কাজে; তার কায়দা-কানুন ও পরিণতি বিশ্লেষণ করার তাগিদে। বলে নেয়া ভালো সাঈদের চিন্তায় আধিপত্যের এই ধারা কেবল ঔপনিবেশিক কালে সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমানের এই মুহূর্তটি পর্যন্ত প্রসারিত, হয়তো-বা অন্য কোনো নামে ও কৌশলে। *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* (১৯৭৯), *কাভারিং ইসলাম* (১৯৮১) অথবা *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* (১৯৯৩) পড়লে বোঝা যায় পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত উপনিবেশী মনোভাবের সাথে ভিয়েতনামে মার্কিন দখলাভিযান, ফিলিস্তিনে ইসরাইলী আগ্রাসনে পশ্চিমের সমর্থন কিংবা ইরাকে মার্কিন সামরিক আক্রমণের মতো রক্তক্ষয়ী ঘটনার সম্পর্ক কত গভীর।

আমাদের বিদ্যায়তনিক সমালোচনা রীতিতে বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ব এখনো বলশালী মানদণ্ড; অথচ সাঈদ বলেন বিশুদ্ধ জ্ঞান বলে কোনো জ্ঞান নেই, ব্যক্তির উৎপাদিত/চর্চিত জ্ঞান তার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপার্শ্বের চাপ ও ছাপে রাঙানো। কাজেই কথা আসে যে, এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাঈদের পর্যবেক্ষণ, মনোভাব ও বক্তব্য কতটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ?

এ বিষয়ে সাঈদের নিজস্ব মতামত আছে। টেক্সটকে তার কালের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার যে পদ্ধতি পশ্চিমে (সেইসূত্রে আমাদের এখানেও) শক্তিশালী তা প্রত্যাখ্যান করেন সাঈদ এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাস ও বাস্তবতার ঐতিহাসিক পরম্পরার ভিত্তিতে লেখা বিচারের প্রস্তাব করেন। *জোসেফ কনরাড এন্ড দি ফিকশন অব অটোবায়োগ্রাফি, দি ওয়ার্ল্ড দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক, কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* প্রভৃতি গ্রন্থে তার সাহিত্য-চিন্তার বিস্ময়কর অভিনবত্ব আমাদের মোহিত করে। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় ও দায়-দায়িত্ব নিয়ে লেখা *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল* (১৯৯৬) অতি সাম্প্রতিক প্রসঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ। সাঈদের এই বহুমুখি বিচরণকে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত এবং কিভাবে তা আমাদের বোধ সমৃদ্ধ করতে পারে তা গুরুত্বের সাথে ভাববার বিষয়।

টেক্সট পাঠ করা নিয়ে আজকাল অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, বিশেষত দেরিদার বিনির্মাণের সূত্রে। এখানে দেরিদার যতটা চর্চা হয়েছে তা সম্বল করে যারা টেক্সটকে স্বেচ্ছাচারী অর্থ সৃষ্টির জায়গা মনে করেন তারা আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে এক রকম দোষ দেখতে পারেন; তাদের মনে হতে পারে যে আমি সাঈদ পাঠের মুক্ত সম্ভাবনার

ওপর আগাম লাগাম দেয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু বাস্তবে আমি তা করছি না। আমি যা করছি তা হল পাঠককে তার যথাযথ প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের জরুরি কাজটার কথা মনে করিয়ে দেয়া এবং আমার সাঈদ পাঠের অভিজ্ঞতা তাদের বোধের কাছে হাজির করে সহায়তা করা।

আঠারো, উনিশ ও বিশ শতকে প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে পশ্চিমের কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য, বিভিন্ন জাতি/জনগোষ্ঠী/অঞ্চলের ওপর তাদের উপনিবেশী শাসনভার এবং সেইসূত্রে স্থানীয়দেরকে নিকৃষ্ট 'আন' (Other) হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা শুরু থেকেই আলোড়িত করেছিল সাঈদকে। এক সময় তার মুল পর্যবেক্ষণের বিষয় ওঠে উপনিবেশী আগ্রাসন ও তার পরিণতি। প্রাচ্যের মানুষ সাঈদ এ কাজে নিজের উপনিবেশী (Colonial) অভিজ্ঞতা ও অবস্থানকে গ্রহণ করেন প্রেক্ষণবিন্দু হিসেবে। সাঈদের নিজের ভাষ্যে এ সূত্রটি মনে করিয়ে দিলে সহজে বোঝা যাবে তিনি কেন পশ্চিমের জ্ঞানকাণ্ডে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থানকেই বিষয় হিসেবে বেছে নেন। *অরিয়েন্টালিজম*-এর ভূমিকায় তিনি লিখেন :

এ রচনায় আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বেশিরভাগটাই এসেছে দুটো বৃটিশ উপনিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু হিসাবে "অরিয়েন্টাল" হয়ে ওঠার সচেতনতা থেকে। ঐ দুই উপনিবেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে আমার সকল পড়াশোনা পশ্চিমা ধাঁচের। এ সত্ত্বেও কম বয়সের ঐ সুগভীর সচেতনতা অক্ষয় রয়ে গেছে। আমার এ অধ্যয়ন অনেক দিক থেকে প্রাচ্য বিষয়রূপী 'আমার' ওপর সেই সংস্কৃতির চিহ্নসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস, যে সংস্কৃতির আধিপত্য সকল প্রাচ্যবাসীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ কারণে আমার বেলায় মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ইসলামী প্রাচ্য (১৯৯৫, ২৫)।

প্রাচ্যে পশ্চিমের উপনিবেশী অবস্থান এবং উপনিবেশিত'র সামগ্রিক পরিস্থিতি পাঠ করার প্রক্রিয়ায় আমরা দেখি উপনিবেশী আগ্রাসনের সাথে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ও জ্ঞানচর্চার নিবিড় সম্পর্ক। বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক প্রণোদনা ও জ্ঞানচর্চা পশ্চিমাদের মনে প্রাচ্যকে নিকৃষ্টরূপে দেখায়, প্রাচ্যকে কব্জা করতে ও বশ করতে প্ররোচনা যোগায়। পশ্চিমের এই জ্ঞানভাষ্যকেই সাঈদ বলেছেন 'প্রাচ্যতত্ত্ব' ('অরিয়েন্টালিজম)—জ্ঞান ও ক্ষমতার শয়তানী জোটের সবচেয়ে বড় নমুনা, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের করুণতম এক কালপর্বের পেছনের অন্যতম কারণ। এটি সাঈদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *অরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮)-এর সারকথা।

ষোল বছর পরে লেখা *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* (১৯৯৩) এ ভাবনার একরকম প্রসার বললে ভুল হয় না; এখানে কেবল প্রাচ্য নয়, পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশগুলোও আলোচনার আওতাভুক্ত। এ বইয়ে তার দেখার বিষয় সংস্কৃতি—সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা উপন্যাস। পশ্চিমের সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গিতেই যে সুপ্ত ছিল সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা তা বোঝা যায় তাদের নামকরা উপন্যাসিকদের রচনাগুলো যথাযথভাবে পড়লে। এইসব উপন্যাস সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠায় এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখায় সহায়তা করেছে। *অরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) এবং *কালচার ও ইম্পেরিয়ালিজম* (১৯৯৩)—এই দুইটা বই সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ; সেইসঙ্গে *কাভারিং ইসলাম*—পশ্চিমের প্রচারমাধ্যমের একটা অংশের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা-উন্মোচক রচনা হিসেবে। আর আছে *রিপ্রেজেন্টেশন অব*

ইন্টেলেকচুয়াল (১৯৯৬): শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ছায়ার সর্বগ্রাসী বিস্তারের যুগে একজন বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ-অলক্ষণ কী, কী তার কর্মপ্রক্রিয়া, দায়ভার—এই সব প্রসঙ্গের এক অনবদ্য বিশ্লেষণ। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ নিয়ে রচিত প্রথমোক্ত দুটো গ্রন্থের বক্তব্য কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে উত্তর-উপনিবেশবাদ (Post-colonialism) বা উত্তর উপনিবেশী অধ্যয়ন (Post-colonial Studies)—পশ্চিমের আধিপত্যবাদী জ্ঞানচর্চায় এখন শক্তিশালী এক পাল্টা জ্ঞানভাষ্য (Counter Discourse)। আমি মনে করি প্রাক্তন-উপনিবেশের মানুষ হিসেবে এডওয়ার্ড সাঈদকে আমাদের পাঠ করা প্রয়োজন এই ধারায়—উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বোধ নিয়ে, উপনিবেশিত-র পটভূমি, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই সাথে আর সব উপনিবেশের মানুষদের প্রতি মানবিক সহমর্মিতা নিয়ে। এবং মনে রাখা উচিত চিন্তার ক্ষেত্রে সাঈদের দিনদিন বিস্তারে *অরিয়েন্টালিজম* ভিত্তি-বিন্দুর মতো। এই বইয়ে উপস্থাপিত তাত্ত্বিক কাঠামো ও পর্যবেক্ষণ সাঈদকে ঠেলে দিয়েছে অন্যান্য সম্পর্কিত পরিসরের দিকে, যেটা আমরা দেখি *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম, দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন, কাভারিং ইসলাম* প্রভৃতি গ্রন্থে।

২.

১৯৭৮ সালে *অরিয়েন্টালিজম* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ত্রিশটির মতো ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই একটি মাত্র গ্রন্থের জন্যও সাঈদ অমর হয়ে থাকতেন। এখন পর্যন্ত এ গ্রন্থটি মানববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার গভীরতর প্রভাব অব্যাহত রেখেছে। এ গ্রন্থে সাঈদের বিশ্লেষণের বিষয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর রাজনৈতিক, সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থিক আধিপত্যের পেছনে সক্রিয় সাংস্কৃতিক প্ররোচনা ও তার প্রকাশ্য চেহারা; প্রাচ্যের ঐ অঞ্চলের ওপর পশ্চিমের কর্তৃত্ব, কর্তৃত্বের আরোপণ, তার উপায় ও ধরনের ইতিহাস।

ঐ কর্তৃত্বের বা আধিপত্যের পেছনে কার্যকর সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য সাঈদ ব্যবহার করেন অরিয়েন্টালিজম বা 'প্রাচ্যতত্ত্ব' পরিভাষাটি। পশ্চিমে প্রাচ্যতত্ত্ব একটা জ্ঞানশাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের বিষয়; জীববিজ্ঞান, নৃ-তত্ত্ব বা ইতিহাস যেমন এক একটি জ্ঞানশাখা। ওখানকার পণ্ডিতদের মতে প্রাচ্যতত্ত্ব হল প্রাচ্য বা তার বিশেষায়িত কোনো অংশ সম্পর্কিত জ্ঞান ও জ্ঞানচর্চা।

পশ্চিমের দেয়া এই সংজ্ঞা থেকে মনে হবে, এটি বুঝি নিরীহ পণ্ডিতি বিষয়; তা খানিকট সত্যিও: পণ্ডিতি বিষয়, তবে নিরীহ বা নির্দোষ নয় কোনোমতেই। সাঈদ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিখ্যাত রচনাগুলো ঘেঁটে দেখান ওগুলোয় প্রাচ্য বরাবরাই নিকৃষ্ট, অযোগ্য, অসভ্য হিসেবে চিত্রিত হয়েছে; তার বিপরীতে পশ্চিম সকল সময় উৎকৃষ্ট, সভ্য, যোগ্য ও সক্ষম। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতার বোধ প্রাচ্যতত্ত্বের সৃষ্টি। এ বোধ এক পর্যায়ে পশ্চিমের রাজনীতিবিদ, পর্যটক, সৈনিক, ব্যবসায়ী, লেখক-শিল্পীদের প্ররোচিত করেছে প্রাচ্যকে কব্জা করতে। এই জ্ঞানের পরম্পরা একটি নির্দিষ্ট মনোভাব থেকে সৃষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। এই জ্ঞান নিরীহ বা নির্দোষ হয় কী করে? উপনিবেশ গড়ার বহু পূর্ব হতেই পশ্চিমের অনেক পণ্ডিত প্রাচ্যতত্ত্বের পরিসরে প্রাচ্যের

ইতিহাস, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, বিশ্বাস সম্পর্কে অজস্র কাল্পনিক ধারণা সৃষ্টি করেছে, প্রচার করেছে, প্রজন্মক্রমে নিজেরা তা বিশ্বাসও করেছে। সে কল্পনা ও ধারণার মূলে আছে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচ্যের নিকৃষ্টতার বোধ।

প্রাচ্যের প্রতি পশ্চিমের মনোভঙ্গির যে বিকাশ সাইদ চিহ্নিত করেন তার মূলে আছে পশ্চিমের পণ্ডিতদের 'আনতা' (Otherness) সম্পর্কিত ধারণা। মানুষের আত্ম-পরিচয় নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় 'আন'-এর ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দূর বা অজানা কিছুকে জানার চেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে সেই অজানা তার কাছে দেখা দেয় এমন কিছু হিসেবে যা 'নিজ' নয় এবং যা নিজের থেকে অন্যরকম। এই প্রক্রিয়ায় তা হয়ে ওঠে 'আন' (Other)। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হলে সেই আন-কে হতে হবে 'নিকৃষ্ট'। পশ্চিম তার পার্শ্ববর্তী প্রাচ্যকে এভাবেই 'আন' হিসেবে নির্মাণ করে এবং তাকে নিকৃষ্ট ধরে নিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিজ মনোভঙ্গিতে, ক্রমে জ্ঞানচর্চায়, সংস্কৃতিতে (সাঈদ ১৯৯৫; ৫৪, ৩৩২)। এই 'আন' প্রাচ্য বাস্তব প্রাচ্য নয়—এ হল পশ্চিমের জ্ঞানকাণ্ডের বিশেষ একটি শাখায় নির্মিত 'প্রাচ্য'। সাঈদ মনে করেন 'আনতা'র নিকৃষ্টতার বোধ পশ্চিমের মানুষদেরকে প্ররোচিত করেছে আনকে পরাস্ত করতে, দখল ও শাসন করতে—'আন'-এর এলাকায় অর্থাৎ প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে তা বজায় রাখতে। এস্কিলাস থেকে শুরু করে কিসিঞ্জারের রচনাতেও এই মনোভাবের চিহ্ন বিদ্যমান।

অতঃপর সাঈদ প্রাচ্যতত্ত্ব নামের ছদ্মবেশী জ্ঞানশাখাটিকে এর চরিত্রের সাথে মিলিয়ে সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে: প্রাচ্যতত্ত্ব হল প্রাচ্য এবং (প্রায়শ) পাশ্চাত্যের মধ্যে ধরে নেয়া তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভাবনারীতি (১৯৯৫, ২)। কাজেই, যে-ই প্রাচ্য সম্পর্কে জানতে আসে সে-ই প্রাচ্যতত্ত্বের প্রভাবে বাধ্য হয়ে প্রথমেই ধরে নেয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে, এবং প্রাচ্য নিকৃষ্ট ও পশ্চিম উৎকৃষ্ট। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখার যাবতীয় সাংস্কৃতিক সক্রিয়তার পেছনে এই মানসিক অবস্থা অনেকখানি দায়ী। এরই অংশ হিসেবে উপনিবেশকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করা হয় উপনিবেশকের লেখায়। এখনো পশ্চিমের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক উৎপাদন ও ভোগের ধরন— যেমন, টিভি অনুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা, সস্তা উপন্যাস, সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন এবং সাহিত্যের একটা বিশাল ধারায় এ জাতীয় মনোভাব সগর্বে বহাল।

সাঈদের অসামান্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখি পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে পশ্চিম হয়ে ওঠে কেন্দ্র, আর বাকি পৃথিবী প্রান্ত। কেন্দ্র থেকে একটি যন্ত্র-সদৃশ উপনিবেশী শাসন-পদ্ধতি ছড়ানো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। সাঈদ উপনিবেশী প্রশাসক ক্রোমারের মনোভঙ্গিতে চিহ্নিত করেন পশ্চিমের এই আগ্রাসী বিন্যাস, যা আসলে সকল প্রাচ্যতাত্ত্বিকের মনোভাবেই সক্রিয় :

"পশ্চিমে ক্ষমতার একটি কেন্দ্র এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত একটি বিরাট সর্বগ্রাসী যন্ত্র কল্পনা করেন ক্রোমার। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে অক্ষুন্ন থাকে, যন্ত্রটির নিয়ন্ত্রণও থাকে তার হাতে। প্রাচ্যে যন্ত্রটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যন্ত্রটিতে যা সরববরাহ করে তা মানববস্তু, বস্তুগত সম্পদ, জ্ঞান—যা আপনার আছে—যন্ত্রটির দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে আরো ক্ষমতায় (২০০৫; ৮২)।"

পাশ্চাত্যের মানুষেরা উপনিবেশিত প্রাচ্যে এসে বাস্তবতার নিরিখে তাদের প্রথাগত ধারণার সংশোধন না করে বরং তাকেই জোরদার ও পুনরুৎপাদন করে। এই দূরত্ব আর ঘোচেনি। এভাবে প্রাচ্যকে হেয়করণ, দমন ও শাসন করার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও মনোভাবই হল প্রাচ্যতত্ত্ব। পশ্চিমা জ্ঞানজগতে 'প্রাচ্যতত্ত্ব' নামের এই জ্ঞানভাষ্যের পরিশোধিত বক্তব্য হল :

(পৃথিবীতে)... *পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে। সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে, অবশ্যই, দ্বিতীয়োক্তদেরকে: যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দিবে, তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো না কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে।* (২০০৫, ৩৬)।

প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং প্রাচ্যের মানুষেদেরকে নিজস্ব শাসনে পরিচালিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে। যেহেতু প্রাচ্য বিনষ্ট, অসভ্য, তাই প্রাচ্যজনকে কথা বলতে দেয়া যায় না। কারণ সে নিজেকেও ভালো করে চিনে না, তাকে যতটা চিনে পশ্চিমের লোকেরা। তাই প্রাচ্যের পক্ষে কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ: প্রাচ্য পরিণত হয় নিকৃষ্ট, নির্বাক, নিষ্ক্রিয় উপনিবেশে। আঠারো শতকের শেষ থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের সক্রিয় যাত্রা শুরু হয়। এখনো তা অব্যাহত রয়েছে— তার যাবতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি সমেত— ভিন্নরূপে, নব্য-সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে।

অরিয়েন্টালিজম এমন এক রচনা যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক চিন্তার প্রেক্ষিত ও অভিমুখ চিরতরে পাল্টে দিয়েছে, অন্যদিকে, তার স্রষ্টাকে পরিণত করেছে কিংবদন্তীতুল্য মানুষে। পশ্চিমের আধিপত্যবাদী জ্ঞান ও সংস্কৃতি যখন সারা পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন *অরিয়েন্টালিজম* এক ধীরগতির বিস্ফোরণ যা আক্রান্ত করেছে সেই আধিপত্যের মূল প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শক্তি প্রাচ্যের ওপর সামরিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রাচ্যের মানুষের মন, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক স্বভাবের উপরও আধিপত্য করেছে, নিজেদের ইচ্ছেমতো রূপান্তরিত, বিকৃত ও পরিবর্তন করেছে তাদের মনোজগত ও বাইরের ইমেজকে তা জানার জন্য *অরিয়েন্টালিজম*-এর বিকল্প নেই। সাঈদের দৃঢ় যুক্তিসহ বক্তব্য, তীক্ষ্ণ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, ক্ষমতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ককে যথাযথভাবে সনাক্তকরণের কারণে *অরিয়েন্টালিজম* এখন আধিপত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনায় অনিবার্য আদর্শ। কিন্তু আমাদের জন্য *অরিয়েন্টালিজম*-এর গুরুত্ব আরো এক দিক থেকে, উত্তর-উপনিবেশবাদ নামে চলমান পাল্টা-জ্ঞানভাষ্যের উৎস-গ্রন্থ হিসেবেও। পরে এ নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করব।

৩.

সাঈদের অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও খানিকটা খোঁজ নেয়া দরকার। বিশ শতকে আধিপত্যের রাজনীতির সর্বগ্রাসী ছায়ায় আড়ষ্ট পৃথিবীতে বহুদিক-গামী বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন সাঈদ। একাধারে সাহিত্য-সমালোচনা, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব, সঙ্গীত, রাজনীতি— এ সমস্ত বিষয়েই লিখেছেন। কুড়িটিরও বেশি প্রকাশিত গ্রন্থে অভিব্যক্ত

তার ভাবনায় ক্ষমতা ও আধিপত্যের নানা দিকের প্রতিভাস মিলে। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এ ক'টিকে: *জোসেফ কনরাড এন্ড দি ফিকশান অব অটোবায়োগ্রাফি; বিগিনিংস : ইনটেনশন এন্ড মেথডস; অরিয়েন্টালিজম; দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন; কাভারিং ইসলাম; দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক; আফটার দি লাস্ট স্কাই; কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম; রিপ্রেজেন্টেশন্স অব দি ইন্টেলেকচুয়াল; আউট অব প্লেস*।

প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার কার্যকারিতা এবং টেক্সট-এর পরিপ্রেক্ষিত-বিষয়ক প্রশ্নে সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ রচনা *দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক*। ইউরোপে একদিকে লুকাচ-প্রভাবিত মার্ক্সীয় সাহিত্য আদর্শ, অন্যদিকে এলিয়টের মতামত থেকে উদ্ভূত সাহিত্যচিন্তার ধারা প্রবল। এলিয়ট-প্রভাবিত সাহিত্যাদর্শে ঐতিহ্যিক সূত্র ও নাগরিক অভিজ্ঞতার স্থান যদিও আছে, রাজনীতি সেখান থেকে নির্বাসিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলিয়ট-স্কুলের জোর স্বাভাবিক কারণেই বেশি। সাঈদ এই ধারার মধ্যে বেড়ে-ওঠে সূচনা করেন ভিন্ন স্বর ও চিন্তনভঙ্গির। সাঈদের মতে টেক্সট বা রচনা গণ-সংশ্লিষ্ট একটি জিনিস। রচনাকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতির ছাপ ধারণ করেও প্রচারের পর তা পাঠ, পাঠের অর্থ ও প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়; রচনার মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতের রাজনীতিও ছাপ ফেলে থাকে। তিনি পশ্চিমের উন্নাসিক টেকচুয়াল সমালোচনারীতির বিরোধিতা করে বলেন এ হল টেক্সট-এর ভেতরের রাজনীতি, আধিপত্য ও দমননীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবকে আলোচনার বাইরে রাখার একটি কৌশল। টেক্সটকে পাঠ করতে হবে মানবজীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করে। গ্রন্থটিতে সুইফট্ ও কনরাডের উপর তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা লেখকদ্বয়ের সৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে নতুন ধরনের আলোকপাত করেছে। *দি ওয়ার্ল্ড, দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক* প্রচলিত সাহিত্য সমালোচনার রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, টেক্সট-এর সাথে মানবজীবনের অবিচ্ছিন্ন বাস্তবতার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়তা করে এবং প্রস্তাব করে সমালোচনার অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ একটি ধরন।

দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন আমাদের সময়ের সবচেয়ে তীব্র, রক্তক্ষয়ী আন্তর্জাতিক সংঘাতের রাজনীতির উপর আলোকপাত। ফিলিস্তিনীদের মানবেতর অবস্থা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে ইহুদিবাদের বিকাশ ও পশ্চিমের উপনিবেশী প্রবণতার পটভূমিতে। সাঈদ মনে করেন জায়ানিজম ও উপনিবেশবাদ/নয়া সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক গভীর; ফিলিস্তিনীদের দুর্দশার কারণও তাই। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশচ্যুত, রাষ্ট্রচ্যুত ফিলিস্তনীদের দুর্দশার জীবন্ত চিত্র এ গ্রন্থটি। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী আজ ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। তাদের দেশ নেই, ভোট নেই, নাগরিক অধিকার নেই। সাঈদ প্রশ্ন রাখেন এইসব ফিলিস্তিনীদের দায় নেবে কে?

আফটার দি লাস্ট স্কাই সাঈদের তীব্র রাজনৈতিক সচেতন রচনা। মূলভাবগত অর্থে এটি *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইনেরই* বিস্তৃতি। একদিকে ফিলিস্তিন পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনুপম বিশ্লেষণ, অন্যদিকে, ফিলিস্তিনের ওপর ফটোগ্রাফার জ্যাঁ মোর-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছবি মিলে *আফটার দি লাস্ট স্কাই*-কে দিয়েছে সমকালের দালিলিক স্পর্শ। এখানে সাঈদ খুঁজে দেখেছেন সমকালে একজন ফিলিস্তিনী হওয়ার

অর্থ কী, একজন ফিলিস্তিনী হিসাবে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তাকে ? সাঈদ বলেন যে, পশ্চিমে এমন একটি দিনও পার হয় না যেদিন ফিলিস্তিনীরা প্রধান প্রধান সংবাদে অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কিন্তু প্রচারমাধ্যম তাদের যে ইমেজ সৃষ্টি করেছে, সাঈদ দেখান, তা খুনী-সন্ত্রাসী-অপহরণকারী অথবা সর্বহারা শরণার্থীর। ফিলিস্তিনীরা আজ পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের ঐ কৃত্রিম, ঘৃণ্য রাজনৈতিক ইমেজের বন্দি।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে ফিলিস্তিনীরা কিভাবে তাদের দেশ হারিয়েছে, ঘরবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে সেই মর্মান্তিক বিবরণ তুলে ধরেন সাঈদ। এবং সাম্প্রতিক ঘটনার আলোকে দেখান ফিলিস্তিনীরা প্রবাসী ও উদ্বাস্তু ইমেজ প্রত্যাখ্যান করে এখন নতুন আত্ম-পরিচয়ে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেছে: সে পরিচয় প্রতিরোধের, আত্মত্যাগের, দৃঢ় চৈতন্যের সংগ্রামী এক জাতির যারা ভবিষ্যৎ এক উজ্জ্বল সময়ের স্বপ্ন দেখছে।

কাভারিং ইসলাম-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে। *অরিয়েন্টালিজম* লিখে সাঈদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবী বৃত্তে ধ্বস নামিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রু। *কাভারিং ইসলাম*-এ তিনি পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমের বড় একটা অংশের সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্প্রদায়িক রূপটি উন্মোচন করেন। এর ফলে তিনি আর কখনো প্রচারমাধ্যমের সুনজরে আসতে পারেননি।

কাভারিং ইসলাম-এ সাঈদ প্রতিদিনের সংবাদ পরিবেশন, ফিচার, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ঘেঁটে দেখান পশ্চিমের প্রচারমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদেরকে খুনী, সন্ত্রাসী, অপহরণকারী হিসাবে চিত্রিত করে আসছে। অথচ বাস্তবে কেবল সংখ্যালঘু একদল মুসলিমই সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত, তাদের অধিকাংশই প্রথম দিকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রত্যক্ষ মার্কিন সহায়তায় সন্ত্রাসী গ্রুপ গড়ে তুলেছিল। আবার প্রতিটি মুসলিম দেশেই যে চরমপন্থী মুসলিম সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশাল উদারনৈতিক গোষ্ঠী তৎপর সে কথা উল্লেখও করা হয় না।

ফিলিস্তিনী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অথবা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখে আত্মরক্ষার জন্য ইরানের যুদ্ধকৌশলকে ব্যাখ্যা করা হয় সন্ত্রাসী তৎপরতা বলে, কিন্তু আগ্রাসনের নিন্দা করা হয় না। এ হল প্রচারমাধ্যমের ভাষ্য সৃষ্টির রাজনীতি, প্রাচ্যতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ। প্রাচ্যতত্ত্ব মুসলমানদের সম্পর্কে যে নমুনা তৈরি করেছে তা-ই চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর। একদল সন্ত্রাসী মুসলমানের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলা হচ্ছে ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী। সাঈদ আমাদেরকে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের এই তৎপরতা ও তার ভাষ্যের রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। এক অর্থে *কাভারিং ইসলাম* প্রচারমাধ্যম-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ।

আউট অব প্লেস (১৯৯৯) সাঈদের আত্মজীবনী; লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় বসে লেখা বই। এটি চমৎকার আত্মজীবনী; তেমনি নিছক সাহিত্য হিসেবে— একজন মানুষের বেড়ে-ওঠার ইতিহাস হিসেবেও গ্রন্থটি পড়তে পারি আমরা। সমকালীন রাজনীতির শিকার হয়ে কিভাবে নিজ বাড়ি-বাসভূমি, সমাজ, পরিপার্শ্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে পথ চলার মধ্যেই সাঈদের ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ তার একটা হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে এ বইয়ে। নির্বাসিত মানুষের গোপন, একান্ত বেদনার কথা সাঈদ অন্যত্রও বলেছেন; *আউট অব প্লেসে*

তার প্রকাশ মর্মস্পর্শী। সাঈদ সচরাচর সংযমী, এ সত্ত্বেও এ বইয়ে আমরা এমন এক মানুষের অন্তর্গত বেদনার স্পর্শ পাই যিনি ঘরহীনতার মধ্যে নিজস্ব ঘরের স্বপ্ন নিয়ে আজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন— সে ঘর কেবল সাদামাটা ঘর নয়, আপন পরিপার্শ্ব ও অস্তিত্বেও সহজ পদচারণার পরিসর সমেত একটা ভৌগোলিক ও মানসিক বাসভূমি।

৪.

কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম (১৯৯৩)এ ডওয়ার্ড সাঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি কাজের একটি। এ গ্রন্থে সাঈদের চিন্তা প্রথা ও চর্চার সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমের সংস্কৃতির এমন এক দিক উন্মোচিত করে যার সাথে সম্পর্ক আধিপত্য, দমন ও ক্ষমতার রাজনীতির। ইউরোপীয় এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক পেছনেও আধিপত্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

সাঈদ পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের বীজ সনাক্ত করার জন্য বেছে নেন সংস্কৃতির একটি ক্ষেত্র— উপন্যাস সাহিত্য। জেন অস্টিন থেকে সালমান রুশদি, ইয়েটস থেকে শুরু করে সমকালীন লেখকেরাও তার অনুপঙ্খ বিশ্লেষণের আওতায় আসে। *অরিয়েন্টালিজমে* পর্যবেক্ষণ সীমিত ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম*-এ তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে দেন পৃথিবীর অন্যান্য প্রাক্তন-উপনিবেশে, যেখানে উপনিবেশিক শক্তি কখনো-না-কখনো তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালিয়েছিল। এর মধ্যে আছে আফ্রিকা, পাক-ভারত উপমহাদেশ, দূরপ্রাচ্যের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যারেবীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ। এসব দেশে বসে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে সাম্রাজ্যের গর্বিত নাগরিক, সে কালের লেখকগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন সাঈদের আলোচনার লক্ষ্য সেই সব রচনা।

ঐ সব সাহিত্যিক রচনায় দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : প্রথমত— ওগুলোয় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীকে দেখা হয়েছে মানসিকতার একক কিছু ছাঁচে। যেমন ঐ সব লেখায় পাওয়া যায় 'ভারতীয় মন', 'ক্যারেবীয় নারীচরিত্র', বা 'আফ্রিকান স্বভাব', 'জ্যামাইকান আচরণ' ইত্যাদি শব্দ ও ধারণা। এর অর্থ হল ঐ লেখকের নিকট সকল ভারতীয়'র মন একই রকম, সকল ক্যারেবীয় নারীর চরিত্র এক, আফ্রিকান মানবগোষ্ঠী বুঝি বা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে স্বভাবের একটি মাত্র আদর্শ নিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল— ঐ সব লেখকের প্রত্যেকের রচনায় সাম্রাজ্য বিস্তার, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। নমুনা হিসাবে জোসেফ কনরাডের *হার্ট অব ডার্কনেস*-এর কথা ধরা যায়। কাহিনীটির কেন্দ্রে আছে পশ্চিমের 'সভ্যতা'র ছোঁয়াবিহীন আফ্রিকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল। বক্তা মার্লো যদিও মুখে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করে কিন্তু তার মনোভাব ঘুরে ফিরে যুক্তির জাল বুনে আফ্রিকার স্বায়ত্ত-শাসনের বিরুদ্ধেই। সাঈদ তাই মন্তব্য করেন, *"কনরাড আমাদের দেখাতে চান (শাদা মানুষ) কুর্দজের লুটের অভিযান, নদীপথে মার্লোর ভ্রমণ এবং গোটা কাহিনীটিই কিভাবে এই একটি মাত্র মূলভাব সমর্থন করে যে: ইউরোপীয়রা দক্ষ হাতে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে (আফ্রিকায়) তা অব্যাহতও রাখবে"* (১৯৯৩, ২৫)।

সাঈদ আরো কয়েক যুগ পেছনে গিয়ে চার্লস ডিকেন্সের *দুম্বে এণ্ড সঙ্গ (১৮৪৮)* থেকেও

উদাহরণ দেন। ঐ গ্রন্থে দেখা যায় দুষে তার নবজাত সন্তানের জন্য কামনা করছে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যক আধিপত্য, যা আসলে ঔপনিবেশিক আধিপত্যেরই একটি রূপ (১৯৯৩, ১৩)। একইভাবে সাঈদ ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিত করেন জর্জ এলিয়ট, রুডইয়ার্ড কিপলিং, জেন অস্টিন, আলবেয়ার ক্যামুসহ অনেকের রচনায়।

চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত *কালচার এণ্ড ইম্পেরিয়ালিজম*-এর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে বিরোধ ও প্রতিরোধাত্মক সংস্কৃতির উত্থান। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কোনো-না-কোনো রূপকল্পে প্রতিরোধ সূচিত হয়েছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিপরীতে প্রতিরোধাত্মক সাহিত্যের উত্থান উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনালগ্নে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সকল উপনিবেশই স্বাধীনতা লাভ করে। ক্রমে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠার প্রয়াস দেখা দেয় সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃ-তত্ত্বসহ মানব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। সূচনাপর্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর লেখকদের মধ্যেও বিপরীত সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে বিকশিত হয় প্রতিরোধের তীব্র ভাষা। এ গ্রন্থে প্রতিরোধাত্মক সংস্কৃতি বিষয়ে সাঈদের বিশ্লেষণ উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের জন্য গুরুত্ববহ।

সংস্কৃতি বিশুদ্ধ কোনো সৃষ্টি নয়, বরং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা দ্বারা রঞ্জিত। সেই রাজনীতির লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং সাম্রাজ্য সৃষ্টি। এই বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের অর্থাৎ প্রাক্তন-উপনিবেশের মানুষদের প্রয়োজন ছিল *অরিয়েন্টালিজম* ও *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম*-এর মতো গ্রন্থের। প্রতিরোধের সংস্কৃতির কৌশলগুলো বোঝার জন্য, লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য বই দুটি অবশ্যপাঠ্য।

বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের দায়-দায়িত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে সদা-সচেতন ছিলেন সাঈদ। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় এবং কর্তব্য সম্পর্কে তার নিজের লেখা *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল (১৯৯৪)* গ্রন্থ থেকেও মানবতাবাদী সাঈদকে আমরা চিনে নিতে পারি। সারা পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ যখন তথ্যব্যবসায় জড়িত অথবা সংশ্লিষ্ট তখন বুদ্ধিজীবী পরিভাষাটি কি অর্থ বহন করে ? কারা বুদ্ধিজীবী ? কি তার চারিত্র্য ? কি তার দায়িত্ব ? এ-সব প্রশ্নের জবাব সন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে সাঈদ বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে প্রচলিত মতামত তুলে ধরেন। ইতালীয় বামপন্থী এন্টনিও গ্রামসির মতে বুদ্ধিজীবী দুই রকমের। এক— জৈব (Organic) বুদ্ধিজীবী: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ঋণ-পরামর্শক, যাদের কাজ হল ক্ষমতামুখী প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের পক্ষে বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজস্ব স্বার্থ অর্জন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। দুই— ঐতিহ্যবাদী (Traditional) বুদ্ধিজীবী: যেমন শিক্ষক, ধর্মযাজক, আমলা। এ ধরনের বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যবাদী পন্থায় আদর্শের প্রচার করে বলে সমাজ পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। ফরাসি জুলিয়ান বেন্ডার মতে বুদ্ধিজীবীদেরকে সমাজের সংখ্যালঘু, মহৎ-হৃদয় মানুষ বলে মনে করা হয়, যার দায়িত্ব মানবতার কল্যাণে কাজ করা। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় প্রসঙ্গে সাঈদ প্রথাগত বক্তব্য এবং বামপন্থী চিন্তাধারার মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেও জুলিয়ান বেন্ডার মতের প্রতিই একটু বেশি ঝুঁকে পড়েন। সাঈদের মতে বুদ্ধিজীবীর মেধা, সততা, দায়িত্ববোধ তাকে অন্য সকল মানুষদের থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। বুদ্ধিজীবী তাই নিঃসঙ্গ মানুষ, যিনি

সেইসব ব্যক্তি বা ঘটনার কথা তুলে ধরবেন যেগুলো ক্ষমতার বিন্যাসের মধ্যে নিয়ত হারিয়ে যায়। বুদ্ধিজীবী তা করবেন

"এই বৈশ্বিক নীতি মেনে যে সকল মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তি ও জাতিসমূহের নিকট থেকে (স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের ব্যাপারে) গ্রহণযোগ্য মানের আচরণ আশা করেন ও তা পাওয়ার অধিকার রাখেন। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই মানদণ্ড ভঙ্গ করলে বুদ্ধিজীবীকে তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে হবে এবং সাহসের সাথে লড়াই করতে হবে (১৯৯৬, ১১-১২)।

উত্তরাধুনিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে লিওতার্দের প্রসঙ্গ তুলে সাঈদ বলেন যে, এরা মনে করেন বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা আধুনিক মনোভঙ্গির বিষয়, উত্তরাধুনিককালে অচল। মানবতাবাদী সাঈদ মনে করেন এ রকম বক্তব্য ক্ষতিকর ও অর্থহীন। এ কালে বুদ্ধিজীবীর দায়-দায়িত্ব কমেনি বরং বেড়েছে। আমাদের দেশের পটভূমিতেও সাঈদের এই চিন্তাভাবনা অতি জরুরি বলে মনে করি। সাঈদের কাছে ব্যক্তির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তন-উপনিবেশগুলোয় ব্যক্তিই সবচেয়ে নিপীড়িত। ব্যক্তির পক্ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথাও বলেন সাঈদ :

"বুদ্ধিজীবী যে কোনো কর্তৃত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ এখনো প্রকাশ্যে ব্যক্তিকে দমণ করছে, ন্যায় বিচারের ভয়াবহ ব্যত্যয় হচ্ছে। ক্ষমতা কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের করায়ত্ত করার প্রক্রিয়া তাদের কণ্ঠ থামিয়ে দিচ্ছে। তাই বুদ্ধিজীবীর করার মতো বহু কাজ রয়ে গেছে। (১৯৯৬, ১৮)

যেহেতু ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাড়ানো বুদ্ধিজীবীর কাজ তাই, *"বুদ্ধিজীবী ... পরবাসী, সংখ্যালঘু, অ-পেশাদার—এমন এক ভাষার অধিকারী যা ক্ষমতার মুখের উপর সত্য উচ্চারণ করে" (১৯৯৬, xvii)*। সাঈদ মনে করেন পরিচ্ছন্ন মানবিক বোধ, অবিচ্ছিন্ন সততা, চিন্তার তীব্রতা এবং সজাগ চৈতন্য—এই হল বুদ্ধিজীবীর আজন্ম সম্বল।

৫.

বিশ শতকের প্রথমার্ধ্ব থেকে পশ্চিমের উপনিবেশগুলোয় বুদ্ধিবৃত্তিতা—পশ্চিমের সাংস্কৃতিক প্রভাবনের ফলেই—আধুনিকতার নেতিবাদী বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েছে দীর্ঘদিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যারিসে প্রথমে কাঠামোবাদী আন্দোলন, পরে উত্তর-কাঠামোবাদ নতুন চিন্তাভঙ্গি হিসাবে বিপুল আলোড়ন তুলে। উত্তরাধুনিকতা পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনার ফসল; ওখানেই ষাট, সত্তর ও আশির দশকে এই নতুন চিন্তারীতির বিভিন্ন দিকগামী বিস্তার আমরা লক্ষ্য করি।

এ সময় ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো ইউরোপীয় চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেন, সন্দেহ প্রকাশ করেন এনলাইটমেন্ট ও পশ্চিমা-মানবতাবাদের যাথার্থ্য বিষয়ে। দেরিদা ভাষায় দ্যোতকের খেলার উল্লেখ করে টেক্সটকে প্রায় সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বেচ্ছাচারী অর্থ-সঞ্চারের তত্ত্ব দেন; এর ফলে পরিপার্শ্বের রাজনীতি থেকে টেক্সটকে আলাদা করে ফেলার সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

উত্তরাধুনিক চিন্তাভাবনার এই জাগরকালে পশ্চিমের ঐ সব মত ও পথ এড়িয়ে প্রাচ্যের মানুষ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ উপনিবেশিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক রূপটি পরীক্ষণে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য এ পথে অনেক অগ্রজ লেখকের রচনাই সাঈদকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মিশেল ফুকোর জ্ঞানভাষ্যের ব্যাখ্যা ও ক্ষমতা-তত্ত্বের ধারণা সাঈদকে সহায়তা করে পশ্চিমের উপনিবেশিক মনোভঙ্গিতে জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভূমিকা খুঁজে দেখতে। আবার সংস্কৃতির আধিপত্যশীল ভূমিকা সম্পর্কে গ্রামসির অন্তর্দৃষ্টি, জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের পরাস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত মতামতও সাঈদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। উপনিবেশিক মনোভঙ্গি এবং স্থানীয়দের ওপর উপনিবেশের প্রভাব চিহ্নিতকরণে ফ্রানৎজ ফানোর দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন সাঈদ। এভাবেই উপনিবেশিত মানবগোষ্ঠীর মনোজগতে দমন ও আধিপত্যের প্রভাব বিশ্লেষণে তিনি সনাক্ত করেন দুর্মর জ্ঞানভাষ্য—'প্রাচ্যতত্ত্ব'। *অরিয়েন্টালিজম* এবং (পরে *কালচার এণ্ড ইম্পেরিয়ালিজম)* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনুন্নত বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে যে অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয় তাকে প্রায়-পুনর্জাগরণ আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

এখন প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল প্রাচ্যে পশ্চিমা আধিপত্যের ব্যাখ্যা নয়, তা একটি ভাবনাভঙ্গিও যা প্রয়োগ করা হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের উপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিশ্লেষণে। যে কোনো সাংস্কৃতিক আধিপত্য/প্রভাবন/বিকৃতি সাঈদের তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাক্তন-উপনিবেশে সাঈদের উত্তর-উপনিবেশী চিন্তাভাবনা বিশেষ প্রভাবশালী, যা আত্ম-সন্ধানী, ঐতিহ্যমুখী, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির খোঁজে অবিরাম প্রশ্নমুখর। মানুষের জ্ঞানকাণ্ডে এই নতুন দিগন্তের সূচনা তার বিরাট এক অবদান।। সাঈদের গুরুত্ব বোঝার জন্য উত্তর-উপনিবেশবাদের প্রাথমিক পরিচয় নেয়া দরকার।

উত্তর-উপনিবেশবাদ উপনিবেশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং উপনিবেশের প্রভাব নির্বীজ করার লক্ষ্যে উদ্ভূত চর্চা ও আন্দোলন, মূলত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সক্রিয়। এ তত্ত্বের পরিচয় দেয়া যায় এভাবে: এ হল উপনিবেশী শাসকদের উদ্যোগে/সমর্থনে পরিচালিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার কারণে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা, ভাবনার জগত ও তার চর্চার ক্ষেত্রে যেসব নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা ও দূর করা এবং আধিপত্যমুক্ত জ্ঞানচর্চার পথ খুলে দেয়ার কিছু তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও উপায়। কাজেই এটি একটি পাল্টা জ্ঞানভাষ্য (Counter-Discourse)।

সাহিত্যের সীমিত পটভূমিতে উত্তর-উপনিবেশবাদ বলতে বোঝায়: এ তত্ত্ব প্রাক্তন বা বর্তমান উপনিবেশে রচিত সাহিত্য পাঠ করা ও লেখার উপায় নিয়ে কাজ করে; সেই সাহিত্যে উপনিবেশকের (Colonizer) সংস্কৃতি কিভাবে উপনিবেশিত'র (Colonized) ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিকৃত করে এবং উপনিবেশিতদের নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিহ্নিত করতে চায়। এককালের উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী এখন তার রচিত সাহিত্যে যেভাবে (ঐ বিকৃতি এড়িয়ে) তার স্বতন্ত্র আত্মতা খাড়া করতে চায় এবং তার অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে অতীতকে নিজের জিনিষ বলে দাবি করে তা বুঝে দেখা এবং যথাযথ উপায়ে জোরদার করাও এ তত্ত্বের জরুরি কাজ। এ ছাড়া, এ তত্ত্ব সীমানা বাড়িয়ে খোদ উপনিবেশকের নিজ দেশে রচিত সেসব সাহিত্যেও হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী, যে-গুলো ধর্মেকর্মে উপনিবেশবাদের সাফাই-গীত (দ্রঃ অ্যাশক্রফট, ১৯৯৯)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ যাবত প্রায় সব উপনিবেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, কিন্তু বিদেশী শাসনের প্রভাব শেষ হয়নি। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর

জ্ঞানজগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন চর্চায় উপনিবেশী প্রথা-পদ্ধতির উপস্থিতি এখনো অব্যাহত। কাজেই বলা উচিত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে উত্তর-উপনিবেশী প্রতিরোধ চেষ্টার সূচনা, এখনো তা চলছে— রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশগুলোয় বহাল উপনিবেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে।

উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বের কাজের পরিধি কেবল উপনিবেশী প্রভাবের মধ্যে সীমিত নয়। এখন বিশ্বায়নের নামে আর্থ-সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্য দিয়ে যে নয়া-উপনিবেশায়ন (Neocolonization) চলছে পৃথিবী জুড়ে, এ তত্ত্ব তাকেও চর্চার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। উত্তর-উপনিবেশী তাত্ত্বিকদের মধ্যে ফ্রান্‌ৎজ ফানোর লেখায় নয়া-উপনিবেশবাদ বিকাশের ব্যাপারে গূঢ় ইঙ্গিতও আছে। ফানোর সূত্র ধরে মোটাদাগে বলা যায় উপনিবেশী প্রভাব নয়া-উপনিবেশবাদ বিস্তারের সহায়ক এক পরিস্থিতি।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদকে উত্তর-উপনিবেশবাদের তাত্ত্বিক গুরু বলা যেতে পারে; বিশেষত তার *অরিয়েন্টালিজম* গ্রন্থের কারণে। অবশ্য ফ্রান্‌ৎজ ফানোর লেখা এক্ষেত্রে প্ররোচক ও দিকনির্দেশকের মতো। সাঈদ নিজেও ফানো থেকে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন; বিভিন্ন উপলক্ষে তা স্বীকারও করেছেন। উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ফানোর পর্যবেক্ষণ তাত্ত্বিকদের জন্য জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংগঠিতভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক অধ্যায়ন শুরু হয় *অরিয়েন্টালিজম*-এর আশ্রয়ে। সাঈদের বিশ্লেষণের সূত্রে আমরা দেখেছি প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে উপনিবেশকেরা উপনিবেশিতদের চিহ্নিত করে নিকৃষ্ট 'আন'রূপে। এই যে নিকৃষ্ট, অসভ্য, নিয়ন্ত্রণযোগ্য 'আন'রূপে চিত্রিত করার প্রবণতা, এক সময় তা-ই পরিণত হয় জ্ঞানচর্চার ধরনে। ক্রমে এই জ্ঞান সংক্রামক পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে আরো জ্ঞান ও ভবিষ্যত জ্ঞানচর্চার ধারা। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্ররোচনাও এর মধ্যে নিহিত ছিল। এটিই উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্বের গোড়ার কথা। উপনিবেশী জ্ঞানভাষ্য কেবল তার মূল্য আরোপ করেই বসে থাকেনি, বরং নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রচার করে স্থানীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছে যেন এরাও ইউরোপীয়দের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। এটিই মানুষের বিশ্বজনীনতার (Universality) ধারণা। অর্থাৎ পশ্চিমা জ্ঞানভাষ্য মানুষের এমন একটি বিশ্বজনীন রূপ নির্মাণ ও প্রচার করেছে যা আসলে ইউরোপীয় আদর্শের প্রতিবিম্ব। আত্ম-পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতার শিকার স্থানীয়রা স্বাভাবিকভাবেই ঐ আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা লালন করে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর জ্ঞানজগতে সক্রিয় এইসব উপনিবেশী বিন্যাস অকেজো করা (বা উল্টে দেয়া) উত্তর-উপনিবেশী অধ্যয়নের লক্ষ্য। উপনিবেশী প্রভাবের ধরন এবং সেসব নিষ্ক্রিয় করার কিছু পদ্ধতিগত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় সাঈদের *অরিয়েন্টালিজম* ও *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* গ্রন্থে। পরবর্তীকালে হোমি কে. ভাবা, আবদুল আর. জানমোহামেদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, বেনিটা পারি, বিল অ্যাশক্রফট, হেলেন টিফিনসহ অনেক মেধাবী পণ্ডিতের লেখার মধ্য দিয়ে উত্তর-উপনিবেশবাদ শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি অর্জন করে। এ তত্ত্বের বড় কাজ হল উপনিবেশকালে গড়ে-ওঠা বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করে এর ভেতরের রাজনীতিটা খোলাসা করে দেখিয়ে দেয়া যে, উপনিবেশক জাতিগুলো কিভাবে কিছু একতরফা ধারণার ভিত্তিতে উপনিবেশের জনগোষ্ঠীকে প্রথমে 'আন' (Other) হিসেবে ধার্য করেছে

এবং নিজেদের থেকে এদেরকে আলাদা করে নিজেদেরকে উৎকৃষ্ট এবং এদেরকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করেছে। উত্তর-উপনিবেশবাদী তৎপরতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি সনাক্ত করা, এক অর্থে তা কাজের প্রথম ধাপও। উত্তর-উপনিবেশী পরিস্থিতি (Post-colonial Condition) বলতে বোঝায় প্রাক্তন উপনিবেশে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা যা উপনিবেশকদের শাসনের প্রভাবে গড়ে ওঠে বহাল রয়ে গেছে; ওখানে উপনিবেশের মানুষদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির উপাদান বিকৃত/দমিত; জাতির সামগ্রিক চৈতন্যে রয়ে গেছে প্রাক্তন উপনিবেশকদের চিন্তাভাবনা ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং তাদের তুলনায় হীনমন্যতার বোধ। এই প্রভাব নিষ্ক্রিয় করার কাজটাই বি-উপনিবেশায়ন (Decolonization)। আবার যে সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে কিংবা নব্য-উপনিবেশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে সেগুলোর বিরুদ্ধেও লড়তে হবে। উপনিবেশের সূচনা থেকে অদ্যাবধি বিকাশমান প্রতিরোধাত্মক প্রবণতাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাঈদ একটা দিক-নির্দেশনার মতো বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ জাতির অতীতে যা দমন করে এসেছে, চাপা দিয়ে রেখে এসেছে তা আবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বি-উপনিবেশায়নের একটা ভিত তৈরি হয়েছে, যেখানে দাড়িয়ে পরের পদক্ষেপগুলো নেয়া যায় (সাঈদ ১৯৯৪; ২৫৩)। বি-উপনিবেশায়নের একটা পথ হল উপনিবেশী প্রভাবে সৃষ্ট শঙ্কর বা মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি চিহ্নিত করা, বিকৃত অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধার করা: অতপর ওগুলোর নিজস্ব পরিসর ও মূল্য প্রদান; উপনিবেশকের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর তুলনায় ওগুলোকে বেশি গুরুত্বে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তা ঘটতে পারে। অর্থাৎ কেবল আলাদা আইডিন্টি নির্মাণ করলেই চলবে না, বরং হাইব্রিড আইডিন্টিটিকে স্বীকার করে নিয়ে সে পটভূমিতেই প্রাক-ঔপনিবেশিক উপাদানগুলোকে অধিকতর উজ্জ্বল ও নিয়ামক ভূমিকা পালনের পথ তৈরি করতে হবে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ লেখক সালমান রুশদি এই পথটিকে কার্যকর ভাবেন। সাঈদ মনে করেন *মিডনাইট চিলড্রেনস্*- এ কাজটিই করেছেন রুশদি। বি-উপনিবেশায়নের আরেকটা উপায়ের কথা বলেছেন সাঈদ : উপনিবেশকের সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা এবং তার প্রভাবজনিত বিকৃতি ঝেড়ে ফেলে প্রাক-ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয়ের ওপর ভর করে সম্পূর্ণ নতুন যাত্রাপথ তৈরি করে নেয়া। একে বলা যায় পরম উত্তর-উপনিবেশবাদ। সাঈদ আশঙ্কা করেন এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা উস্কে দিতে পারে, গোঁড়া "স্বদেশবাদী, চরম-জাতীয়তাবাদী মনোভাব যা থেকে জন্ম নিয়েছে ইসলামী মৌলবাদ, আরববাদ ইত্যাদি মতবাদ ও আন্দোলন" (সাঈদ ১৯৯৪; ২৫৮)। বি-উপনিবেশায়ন বিভিন্ন কৌশলের দু'একটি সাহিত্যিক দৃষ্টান্তও দিয়েছেন সাঈদ তার *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* গ্রন্থে (সাঈদ ১৯৯৪; ৫৪-৫৫)। জোসেফ কনরাডের *হার্ট অব ডার্কনেস*-এ অভিব্যক্ত উপনিবেশী মনকে বিশ্লেষণ করেন তিনি যার কেন্দ্র জুড়ে আছে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও সেই উপনিবেশকে নিকৃষ্ট চিত্রিত করার রোখ। এই পরিস্থিতি উল্টে যেতে পারে উত্তর-উপনিবেশী বয়ানে। যেমন দেখা যায় কেনীয় লেখক নাগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর *দি রিভার বিটুইন* (১৯৬৫) এবং আরব লেখক তাইয়্যেব সালিহ্‌র

সিজন অব মাইগ্রেশন টু দি নর্থ (১৯৭০)-এ। নাগুগি *হার্ট অব ডার্কনেস*-এ মরা নিকৃষ্ট নদীটার একটা নাম দেন, তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন আর মিলিয়ে দেন স্থানীয় জনজীবনের সাথে। নাগুগি লিখেন : "নদীটার নাম হোনিয়া; এর অর্থ হল সুস্থতা দান করা বা প্রাণ সঞ্চার করা। হোনিয়া কখনো শুকায় না, যেন খরা বা আবহাওয়ার পরিবর্তনকে অবজ্ঞা করে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা তার মধ্যে। এবং তা বয়ে চলে একইভাবে, কোনো তাড়াহুড়া নেই, দ্বিধা নেই। লোকেরা তা দেখে আর সুখ পায়।" এভাবে উপনিবেশকের বয়ানে স্থানীয় যে নদীটি মরা, বিবর্ণ, বৈশিষ্ট্যহীন নাগুগির লেখায় তা হয়ে ওঠে জীবন ও প্রাণময়তার প্রতীক। সালিহ্ ঔপনিবেশিক অভিযানের গতিমুখ উল্টে দেন। তিনি দেখান তার প্রধানতম চরিত্র মোস্তফা সুদানের পাড়াগাঁ থেকে নীল নদ ধরে উত্তরে ইউরোপের কেন্দ্রে গিয়ে হাজির হয়েছে। এবং সেখানে সে নিজের ওপর এবং ইউরোপীয় নারীদের ওপর একরকম আচারমূলক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। মানসিক আধিপত্যের উৎস ও আরোপণের অভিমুখ এখানে উল্টে গেছে। নাগুগি ও সালিহর রচনায় প্রতিরোধের সংস্কৃতিকে প্রশংসার চোখে দেখেন সাঈদ। উত্তর-উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে সাঈদ মূলত উপনিবেশী রচনার পুনঃপাঠ ও পুনঃলিখনের ওপর জোর দেন; তেমনি সাম্প্রতিক সাহিত্যে প্রতিরোধের মনোভঙ্গি সোচ্চার করার ব্যাপারেও তার আগ্রহ।

৬.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ষাট ও সত্তরের দশকে সকল ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে আনত রূঢ় একটা মানব-বিশ্বে সাঈদের আবির্ভাব। একদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জ্ঞানচর্চা ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণায় সক্রিয় উপনিবেশী প্রভাব, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ছায়া— এ দুই রাক্ষসের মুখোমুখি বসে লিখেছেন তিনি। নতুন মত ও পথের প্রতি প্রতিক্রিয়া এখানে স্বাভাবিক। সাঈদও নানা ধরনের সমালোচনার শিকার হয়েছেন। তার ভাঙ্গাচোরা ঢেউ এসে লেগেছে আমাদের এখানেও। এখানে কারো কারো লেখায় কিছু সমালোচনা চোখে পড়ে। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পরিসরে সাঈদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কিছু মন্তব্য/সমালোচনা শুনেছি। সেগুলো নিয়ে দুএকটা কথা না বললে সাঈদ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করতে এক রকম অস্বস্তি বোধ হয়।

কেউ কেউ বলেছেন সাঈদ যেমন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজনের অভিযোগ করেছেন পশ্চিমের বিরুদ্ধে, তেমনি নিজেও পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রাচ্য-দৃষ্টিকোণ খাড়া করেছেন যা সীমা-আরোপক। আমার ধারণা সাঈদের আংশিক পাঠের কারণে এ রকম অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। শুরু থেকেই সাঈদ এ ধরনের বিভাজনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তার নিজের দৃষ্টিকোণ একজন মানবতাবাদীর, প্রাচ্যপন্থীর নয়। ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন যে *অরিয়েন্টালিজম* বই লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রাচ্যের মানুষেরাও এখন পশ্চিমকে হেয় জ্ঞান করবে। বরং তিনি এ ধরনের বিভাজন সম্পর্কে সতর্ক করেন এই বলে যে: আমার অভিপ্রায় সাংস্কৃতিক আধিপত্যের দুর্মর কাঠামোটি অংকিত করা এবং বিশেষ করে প্রাক্তন-

উপনিবেশিত মানুষদের ক্ষেত্রে এই কাঠামো নিজের ও অন্যের ওপর আরোপ করার প্রলোভনে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়টি পরিষ্কার করা (২০০৫, ৫৬)। *অরিয়েন্টালিজমের* ভূমিকার শেষে আমরা জানতে পারি তার এই অভিপ্রায়ের কথা:

(*অরিয়েন্টালিজমের* আলোচনা)... যদি প্রাচ্যের সাথে একটি নতুন ধরনের আদান-প্রদানের সূচনা করে, প্রকৃতপক্ষে তা যদি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধারণাটিই মুছে ফেলে তা হলে, রেমন্ড উইলিয়ামসের ভাষায়, 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধিপত্যপ্রবণ রীতি' বি-শিক্ষণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা এগুতে পারবো আমরা (২০০৫, ৬০)।

সাঈদের এই বক্তব্য তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজমে* এবং উত্তর-উপনিবেশবাদী তত্ত্বে। ওখানে তিনি বিশুদ্ধ সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল বিভাজন অস্বীকার করেছেন। মিশ্রসংস্কৃতির মধ্যে বিভেদহীন একটা মানবসমাজের আকাঙ্ক্ষা তার রচনায় দুর্লভ নয়। আগ্রহীদেরকে সাঈদের অন্যান্য বইপত্র পড়ে দেখতে বলি। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা প্রাচ্যের সব কিছুই নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। সংস্কৃত প্রাচ্যের ভাষা বলে পশ্চিমের চোখে তাও নিকৃষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু ওরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে উৎকৃষ্ট ভাবেন, সেই সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বংশধর সংস্কৃতকেও। কেউ কেউ মনে করেন এখানে এসে সাঈদের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে সাঈদের বক্তব্য এই যে, আঠারো শতকের শেষে উদ্ভূত প্রাচ্যতত্ত্ব সমকালীন প্রাচ্যকে নিকৃষ্ট বলে মনে করে। নিকৃষ্টতার লেবেলের এই সীমা কখনো কখনো প্রসারিত হয়ে মধ্যযুগ স্পর্শ করলেও সচরাচর তা সমকালেই স্থিত। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা প্রাচ্যের অতীতের বহু অর্জনকেই গৌরবময় মনে করে, তাদের লেখালেখিতে এই ইঙ্গিত আছে। উপনিবেশী প্রশাসক ইভলিন বেয়ারিং ক্রোমার ও বেলফোর মিশর সম্পর্কে বারবার বলেছেন যে মিশরের অতীত গৌরবময় (দ্রঃ ২০০৫, প্রথম অধ্যায়ের গোটা প্রথম পরিচ্ছেদ)। সংস্কৃত ভাষাও প্রাচ্যের অতীত গৌরব। এটি একটি মৃত ভাষা। অতীতের জিনিষের গৌরবময়তা মেনে নিতে প্রাচ্যতত্ত্বের আপত্তি নেই। বরং প্রাচ্যতত্ত্ব চায় প্রাচ্যের মানুষেরা তাদের অতীতকে গৌরবময় মনে করে স্বীকার করুক যে, তারা এখন অধঃপতিত, অযোগ্য, অসভ্য, করুণার পাত্র এবং এ কারণে পশ্চিমের সহায়তা, পশ্চিমের শাসন ও জ্ঞান তাদের প্রয়োজন। প্রাচ্যতত্ত্বের এই দিকটা মনে রাখলে সংস্কৃতের প্রতি পশ্চিমা পণ্ডিতদের আগ্রহ গোলমেলে বোধ হবে না।

একই কথা খাটে ইহুদিবাদ সম্পর্কে। আরবদের মতো ইহুদিদেরকেও যে পশ্চিমারা ঘৃণা করত তার বয়ানী প্রমাণ *অরিয়েন্টালিজম*-এ উল্লেখ করেছেন সাঈদ। ইহুদিদের সাথে পশ্চিমের আঁতাত আরো পরের ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ইহুদিদের অবস্থার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। কাজেই ইহুদিবাদের প্রতি মার্কিন সমর্থনের কারণে প্রাচ্যতত্ত্বের বিন্যাস ভুল মনে হয় না।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ. সাঈদ ছিলেন পণ্ডিত, নন্দনতাত্ত্বিক ও সমালোচকের এক বিরল ও মেধাবী সংশ্লেষ। সাংস্কৃতিক আত্মসন্ধানে নিয়ত উন্মুখ নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রেরণা ও আদর্শ। সাঈদ পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। সমকালে আধুনিক মনোভাবের ধীর কিন্তু নিশ্চিত বিলুপ্তি এবং নতুন চিন্তাভঙ্গির বিচিত্র উৎসারণে যে প্রশ্নময়তা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চিত

অনুসন্ধান শুরু হয় সাঈদ তার মধ্যে কিছুটা ভিন্ন এক পথে যাত্রা শুরু করেন : সংস্কৃতি— সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি, আধিপত্য, ক্ষমতা, এবং অনুন্নত বিশ্বের মানুষের মনোজগতে এর প্রভাব ও পরিণতি হয়ে ওঠে তার পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের বিষয়। এভাবেই তিনি চিহ্নিত করেন প্রাচ্যতত্ত্বের গূঢ়-গোপন সংগঠন যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্ম-যাজকের মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে, রুশোর রাজনৈতিক তত্ত্ব কিংবা জেন অস্টিনের উপন্যাস; এর লক্ষ্য হল প্রাচ্যের মানুষদের মনোজগতকে বশে রাখা। এ ধরনের আত্মমুখী অন্বেষা উত্তরাধুনিক চিন্তাধারায় সাঈদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অনন্য অবস্থানে।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে তিনি কোনো দায় অনুভব করেননি, তার দায় ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক চৈতন্যের নিকট যা তিনি নিজেই চিহ্নিত করেছেন। মানবতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্নে তার ছিল দৃঢ় ও সক্রিয় ভূমিকা। প্রথা ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধী, ক্ষমতা-বিরোধী একজন মানবতাবাদী তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে সাঈদের পরম বাসনা ছিল সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাজনহীন পৃথিবীতে মানুষের সহাবস্থান, ব্যক্তির সুষ্ঠ বিকাশ। তার আগে অবশ্যই উপনিবেশের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে হবে। *অরিয়েন্টালিজম*-এ এর একটা ইঙ্গিত আছে। *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম*- গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে মানুষের নানা বিভাজন কখনো সুফলপ্রদ নয়। এমনকি পরম জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় অর্জনের প্রবণতাকে তিনি সমর্থন করেননি, এজন্য যে এতে অন্য জাতি ও সংস্কৃতির প্রতি একটা উপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই সূচিত হয়ে যায়। সাঈদ মনে করেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতি বলে কিছু থাকতে পারে না, সংস্কৃতির ধর্মের মধ্যেই রয়েছে দেয়া নেয়ার ঝোঁক। এ দিকটা ভেবেই তিনি মিশ্র-সংস্কৃতির (Multiculturalism) সম্ভাবনাকে বড় করে দেখতেন। কিন্তু সংস্কৃতির স্বাভাবিক লেনদেনকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। প্রথমটি মানবসমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয়টি সচেতন ও আগ্রাসী রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ। স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার অর্থ সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করা।

সাম্রাজ্যবাদ সংস্কৃতির মিশ্রণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে সেই সাথে মানুষকে শিখিয়েছে নিজেকে বিশুদ্ধ শাদা, বা বিশুদ্ধ ইউরোপীয় কিংবা কালো হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে ভাবতে, যাতে আর সব মানুষ এমনিতেই নিকৃষ্ট বলে বর্ণিত হয়। একথার অর্থ এই নয় যে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কদর করার দরকার নেই। বরং নিজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপনিবেশী প্রভাবের কবল থেকে উদ্ধার করে স্বমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করারও পক্ষপাতী সাঈদ। তবে নিজের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে অন্যকে উপেক্ষা বা উৎকৃষ্ট /নিকৃষ্ট প্রমাণ করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে হবে (১৯৯৪, ৪০৭-৮)।

ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠ বিকাশের পরিবেশের পক্ষে সাঈদ ছিলেন সোচ্চার। *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকুচয়াল*-এ ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্বের কথা তার বুদ্ধিবৃত্তিক বাসনারই অংশ। সাঈদ ব্যক্তির পক্ষে কথা বলেন এমন এক সময় যখন রাষ্ট্র, অন্যান্য সহায়ক সংস্থা, কর্পোরেট বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর চাপে ব্যক্তির অস্তিত্ব দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত কিছু নিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ।

বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে মনে হয় প্রাক্তন-উপনিবেশগুলোয় সাঈদ চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ হল তার সূচনা মাত্র। কারণ নয়া-উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে আগে উপনিবেশী জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। সে কাজে সাঈদই আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও কাছের শিক্ষাগুরু। আমার বিশ্বাস পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে মুক্তির পথে, তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের নিপীড়িক সংস্থাগুলোর চাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্ররোচনায় এডওয়ার্ড সাঈদ আরো বহুযুগ আমাদের পথ-নির্দেশক হয়ে থাকবেন।

৭.

এডওয়ার্ড সাঈদের নির্বাচিত রচনা নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা মূলত প্রকাশক পারভেজ হোসেনের। তার উদ্দেশ্য সাঈদের গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো থেকে বিভিন্ন অংশ বেছে নিয়ে একসাথে করে অল্প দামে সাঈদ আগ্রহীদের হাতে তুলে দেয়া। সাঈদের সব বই বাংলায় অনুবাদ হবে এমন আশা করি না। এ যাবত তিনটি বইয়ের অনুবাদ হয়েছে: *অরিয়েন্টালিজম, কাভারিং ইসলাম* ও *রিপ্রেজেন্টেশন অব দি ইন্টেলেকচুয়াল*। বই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সাঈদের ভাবনাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে অবশ্যই পড়তে হবে। তবে কেবল এই তিনটি বই দিয়ে তাকে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। *দি ওয়ার্ল্ড দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক, দি প্যালেস্টানিয়ান কোশ্চেন, কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম* প্রভৃতি বইও জরুরী। আবার সব বই অনুবাদ হলেও পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার প্রশ্নটা থেকে যায়। এসব কারণে 'সংবেদে'র পরিকল্পনাটা আমার মনে ধরে।

সাঈদের রচনা থেকে বাছাইয়ের কাজটা করতে হয়েছে বলে কিছু কৈফিয়ত দিয়ে রাখি। *অরিয়েন্টালিজম* আমার কাছে যতটা জরুরি, *মিউজিক্যাল ইলাবোরেশন* ততটা নয়; অথচ সঙ্গীতামোদীদের কাছে এটিও সাঈদের উল্লেখযোগ্য কাজ বলে বিবেচিত। অর্থাৎ সাঈদকে আমি পাঠ করি সামগ্রিকভাবে, কিন্তু চর্চা করি আমার উদ্দেশ্যের সাথে মিলিয়ে। সংকলনে আমার এই ভাবনার প্রতিফলন আছে। সাঈদের যে সব লেখায় উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নয়া-উপনিবেশবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য/বিশ্লেষণ আছে সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশি। আবার লেখা বাছাইয়ের সময় সংকলনের আকার এবং সংশ্লিষ্ট দামের কথা মাথায় রাখতে হয়েছে। গৃহীত সব অনুবাদের উৎকর্ষের ব্যাপারেও পাঠকের মনোভাব হয়তো একরকম থাকবে না। এইসব সীমাবদ্ধতা নিয়েই এই সংকলন।

এই বই যে সম্ভব হয়ে উঠল সে জন্য প্রকাশক পারভেজে হোসেনের পরিশ্রমের কথাই প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। অনেক জরুরি লেখা আগে বাংলায় অনুবাদ হয়নি। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুবাদকদের কাছে দিনে পর দিন ঘোরাঘুরি করে সেইসব অনুবাদ করিয়েছেন। এ কাজে তার ব্যর্থতাও চমকে উঠার মতো। আমার হিসেবে প্রায় অর্ধ-শতাধিক লেখক-অনুবাদকের নিকট মূল লেখা পৌছে দিয়ে, দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে সাকুল্যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তার হিসাব এই সংকলনে আছে। *কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম*-এর ভূমিকা অংশটি অনুবাদ করে সংকলনে যুক্ত করতে পারলাম

কবি শামীম রেজা ও সমকালের সাহিত্য সম্পাদক মাসুদ হাসানের অবিরাম তাগাদার কারণে। অন্তর্ভুক্ত অনুবাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। অক্ষরবিন্যাসে ফারুকের অসম্ভব পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করি।

ফয়েজ আলম
ঢাকা,
১লা মাঘ, ১৪১৫ সাল।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Bill Ashcroft, Garreth Griffiths, Helen Tiffin (ed.), *The Post-colonial Studies Reader*, Routledge, London & NewYork, 1999.
২. Edward W. Said, *Orientalism*, Pengiun Books, London, 1995.
৩. Edward W. Said, *Covering Islam*, Vintage, London, 1981
৪. Edward W. Said, *Culture And Imperialism*, Vintage, London, 1994.
৫. Edward W. Said, *Representation of the Intelectual*, Vintage, London, 1996
৬. এডওয়ার্ড ডব্লিউ.সাঈদ, *অরিয়েন্টালিজম;* ভূমিকা ও ভাষান্তর— ফয়েজ আলম, র‍্যামন, ঢাকা, ২০০৫

অরিয়েন্টালিজম

ভূমিকা

১৯৭৫-৭৬ সালের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধকালীন বৈরুত সফররত জনৈক ফরাসি সাংবাদিক ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরনো শহর দেখে দুঃখ করে লিখেন, "একবার মনে হয়েছিল এটি... শ্যাতেব্রাঁ ও নেরভালের প্রাচ্যেরই অংশ।"[১]

জায়গাটা সম্পর্কে তার ধারণা সঠিক, বিশেষত একজন ইউরোপীয়'র যতটা সঠিক হওয়া দরকার। প্রাচ্য তো অনেকটা ইউরোপেরই উদ্ভাবন; সেই প্রাচীনকাল থেকে রোমান্স, আশ্চর্য সব প্রাণী, মন-উতল-করা স্মৃতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি আর অন্যরকম অভিজ্ঞতার দেশ। এখন তা হারিয়ে যাচ্ছে, এক অর্থে হারিয়ে গেছে; তার দিন শেষ। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যবাসীদের নিজস্ব কিছু যে হারিয়ে যেতে বসেছে, এমনকি শ্যাতেব্রাঁ ও নেরভালের যুগেও ওরাই যে এখানে বাস করেছে এবং এখন যে প্রাচ্যের মানুষগুলোই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তা হয়তো ফরাসি সাংবাদিকের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি। একজন ইউরোপীয় পর্যটকের নিকট প্রধান ব্যাপার হল প্রাচ্য ও তার সমকালীন পরিণতিকে ইউরোপের মনমতো তুলে ধরা। দুটো বিষয়ই ফরাসি সাংবাদিক ও তার পাঠকদের কাছে সুবিধাজনক সম্প্রদায়গত গুরুত্ব বহন করে।

প্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকানদের অনুভূতি ঠিক ওরকম হবে না। তাদের কাছে প্রাচ্যের অনুষঙ্গ, সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, দূরপ্রাচ্যের (বিশেষত জাপান ও চীনের) সাথে সম্পর্কিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রাচ্য একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে ইউরোপীয়-পশ্চিমা অভিজ্ঞতায়। সে অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে যে প্রাচ্য সেই প্রাচ্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনের কৌশলকে আমি বলছি *অরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব*। আমেরিকানদের নেই, তবে *অরিয়েন্টালিজমের* দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে ফরাসি ও ব্রিটিশদের; জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ইতালীয় ও সুইসরা স্বল্প হলেও সে ঐতিহ্যের অধিকারী।

প্রাচ্য ইউরোপের সংলগ্নই নয় কেবল, তার সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে সম্পদময় বড় বড় উপনিবেশের অঞ্চলও বটে। প্রাচ্য ইউরোপের সভ্যতা ও ভাষাসমূহেরও উৎসস্থল, তার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং অন্য (আদার)-এর সবচেয়ে গভীর ও পৌনঃপুনিক চিত্রকল্পও। তাছাড়া প্রাচ্য আছে বলেই ইউরোপ (বা পশ্চিম)-কে প্রাচ্যের তুলনায় বিপরীত চিত্র, মতাদর্শ, ব্যক্তিত্বে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও প্রাচ্যের কোনো কিছু নিছক কল্পনা নয়। প্রাচ্য বস্তু-নির্ভর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনার একটি ধরন হিসাবে সহায়ক প্রতিষ্ঠান, পরিভাষা, পাণ্ডিত্য, চিত্রকল্প, তত্ত্বমালা এমনকি উপনিবেশিক আমলাতন্ত্র ও রীতির সহায়তায় সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শিকভাবে সেই অংশটিকে বর্ণনা করে এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে।

অন্যদিকে, প্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকানদের উপলব্ধি অতটা গাঢ় নয়, যদিও জাপান, কোরিয়া ও ইন্দোচীনে সাম্প্রতিক মার্কিন অভিযানসমূহ আমাদের মধ্যে আরো সুচিন্তিত ও বাস্তবমুখী 'প্রাচ্য'-সচেতনতা জাগ্রত করা উচিত ছিল। তাছাড়া নিকট প্রাচ্যে (মধ্যপ্রাচ্যে) আমেরিকার ব্যাপক ভূমিকা প্রাচ্য বিষয়ে আমাদের বিরাট উপলব্ধি দাবি করে।

পাঠকদের পরিষ্কার উপলব্ধি হবে (এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আরো পরিষ্কার হবে) যে, *অরিয়েন্টালিজম* বা প্রাচ্যতত্ত্ব বলতে আমি বেশ কিছু বিষয় বুঝিয়েছি, যেগুলো, আমার মতে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে প্রাচ্যতত্ত্বের একাডেমিক সংজ্ঞাটি প্রশ্নাতীতভাবে গৃহীত। এখনো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে এ লেবেলটিই চলছে। যিনি সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য সম্পর্কে অথবা এর বিশেষায়িত কোনো অংশ সম্পর্কে শিক্ষা দেন, লেখালেখি করেন বা গবেষণা করেন—তিনি নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী যে-ই হোন না কেন তিনি অরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যতাত্ত্বিক এবং তিনি যা করছেন তা-ই *অরিয়েন্টালিজম* বা প্রাচ্যতত্ত্ব।

স্বীকার্য যে, *অরিয়েন্টাল স্টাডিজ* (প্রাচ্যবিদ্যা), *এরিয়া স্টাডিজ* (অঞ্চল অধ্যয়ন) পরিভাষাগুলোর তুলনায় প্রাচ্যতত্ত্ব কথাটি ব্যবহারে বিশেষজ্ঞদের আগ্রহ কম। এর দুটো কারণ : এ পরিভাষাটি কিছুটা অস্পষ্ট ও খুব বেশি সামগ্রিক এবং এটা আরেক অর্থে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের কর্তৃত্বপরায়ণ ইউরোপীয় নির্বাহীদের মনোভাবও বোঝায়। এ সত্ত্বেও 'প্রাচ্য' নিয়ে বইপত্র লেখা হচ্ছে, প্রাচ্য-বিষয়ক পণ্ডিতি নিয়ে নতুন বা পুরনো সাজে তৎপর প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সেমিনার অনুষ্ঠান চলছে। মোট কথা, প্রাচ্যতত্ত্ব আগের মতো করে টিকতে না পারা সত্ত্বেও প্রাচ্য ও প্রাচ্য-বিষয়ক অভিসন্দর্ভ ও মতবাদের মধ্যে দিয়ে একাডেমিকভাবে তা প্রচলিত রয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্বের একটি সাধারণ অর্থ জড়িয়ে আছে ঐ প্রাতিষ্ঠানিক ধারার সাথে, যার সৌভাগ্য, স্থানান্তর, বিশেষায়ণ ও সঞ্চারণ আমার অধ্যয়নের আংশিক লক্ষ্য। প্রাচ্যতত্ত্ব 'প্রাচ্য' এবং (প্রায় ক্ষেত্রে) 'পাশ্চাত্যে'র মধ্যে তত্ত্ববিদ্যাগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ভাবনারীতি। এভাবে প্রাচ্য ও তার মানুষজন, আচার-প্রথা, মন, নিয়তি ইত্যাদি সম্পর্কে তত্ত্ব, মহাকাব্য, উপন্যাস, সামাজিক বর্ণনা ও রাজনৈতিক বিবরণ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌলিক পার্থক্যকে প্রারম্ভ বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন কবি, উপন্যাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ ও উপনিবেশিক প্রশাসকসহ বিশাল এক লেখকগোষ্ঠী। এস্কিলস বা ভিক্টর হুগো, দান্তে ও কার্ল মার্কসকেও এ প্রাচ্যতত্ত্বের আওতায় বিবেচনা করা সম্ভব। এমন ব্যাপক বিস্তার নিয়ে ব্যাখ্যাত একটি বিষয়ে যেসব পদ্ধতিগত সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় সেগুলো আলোচনা করা হয়েছে ভূমিকার পরবর্তী অংশে।

প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক ও কমবেশি কাল্পনিক অর্থের মধ্যে পারস্পরিক গ্রহণ চলছে নিয়মিত। আঠারো শতকের শেষদিক থেকে সুশৃঙ্খল, হয়তো বিধিবদ্ধভাবেও আদান-প্রদান চলেছে এ দুয়ের মধ্যে। এখানে আমি প্রাচ্যতত্ত্বের তৃতীয় অর্থে উপনীত হচ্ছি যা আগের দুটি সংজ্ঞার তুলনায় অধিকতর ইতিহাস-নির্ভর ও বাস্তবমুখি।

মোটামুটি হিসেবে আঠারো শতকের শেষাংশকে প্রারম্ভকাল ধরে প্রাচ্যতত্ত্বকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা যায় প্রাচ্য সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান, প্রাচ্যের মতামত অনুমোদন, প্রাচ্যকে বর্ণনা করা ও শিক্ষা প্রদান, প্রাচ্যকে শান্ত রাখা ও শাসন করার জন্যে একীভূত একটি প্রতিষ্ঠান

হিসেবে: সংক্ষেপে প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য করা, প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করা এবং প্রাচ্যের উপর কর্তৃত্বকরণের পশ্চিমা পদ্ধতিরূপে।

এখানে প্রাচ্যতত্ত্বকে যথাযথভাবে নির্দেশ করতে মিশেল ফুকোর *ডিসকোর্স*-এর ধারণাটি বেশ কার্যোপযোগী বলে মনে হয় আমার। ফুকো তার *আর্কেওলজি অব নলেজ* এবং *ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ* গ্রন্থে ডিসকোর্স নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমার বক্তব্য হল প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি ডিসকোর্স হিসেবে পরীক্ষা না করলে কারো পক্ষে এরকম বিশাল, পদ্ধতিগত একটি বিষয়কে বোঝা সম্ভব হবে না যার সাহায্যে উত্তর-আলোকপর্বীয় যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, সামরিক, ভাবাদর্শিক, বৈজ্ঞানিক এবং কাল্পনিকভাবে প্রাচ্যকে পরিচালনা এমনকি পুনঃউৎপাদন পর্যন্ত করেছে। তাছাড়া প্রাচ্যতত্ত্ব এমন এক কর্তৃত্বপরায়ণ অবস্থান অর্জন করেছে যে, চিন্তায় ও কর্মে প্রাচ্যতত্ত্বের আরোপিত নিয়ন্ত্রণ মান্য না করে কারো পক্ষে এ বিষয়ে কিছু লিখা, চিন্তা করা বা তৎপরতা পরিচালনা অসম্ভব। মোদ্দা কথা, প্রাচ্যতত্ত্বের কারণে *প্রাচ্য* চিন্তা বা তৎপরতার জন্যে মুক্ত বিষয় ছিল না (ও নেই)।

এর অর্থ এই নয় যে, প্রাচ্য সম্পর্কে কী বলতে হবে তা কেবল প্রাচ্যতত্ত্বই এককভাবে ঠিক করে দেবে। বরং এর অর্থ হল, প্রাচ্য নামের এই অদ্ভুত বিষয়টা যখনই আলোচনার লক্ষ্যবস্তু হয় তখনই তাতে আরোপিত হয় (এবং ফলত জড়িত থেকে যায়) একগুচ্ছ স্বার্থের গোটা একটি নেটওয়ার্ক। কিভাবে তা ঘটে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এছাড়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রাচ্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তার বিকল্প, এমনকি, গোপন অহং হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও শক্তি অর্জন করেছে তা-ও দেখানোর প্রয়াস আছে।

প্রাচ্যে ফরাসি, ব্রিটিশ ভূমিকা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে আমেরিকার উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য ইউরোপীয় ও আটলান্টিক শক্তির ভূমিকার মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত আর্থক্য আছে। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে কথা বলার অর্থ হল সাধারণভাবে (বিশেষভাবে নয় যদিও) একটি ব্রিটিশ ও ফরাসি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বা প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলা। সে প্রকল্পটি, মূল পরিকল্পনার মতোই, বেপরোয়াভাবে যে বিরাট বিস্তৃতি গ্রহণ করেছে তাতে আছে সমগ্র ভারত ও লেভান্ত, মূল বাইবেল ও তাতে উল্লিখিত অঞ্চল, মশলা ব্যবসা, উপনিবেশিক সেনাবাহিনী ও প্রশাসকদের দীর্ঘ ঐতিহ্য, ভয়ংকর এক পণ্ডিতসমাজ, অসংখ্য প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ ও প্রাচ্য-কর্মী, প্রাচ্য-বিশারদ অধ্যাপকগোষ্ঠী, একগুচ্ছ প্রাচ্যদেশীয় ধারণার জটিল বিন্যাস (যেমন, প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র, প্রাচ্যদেশীয় জাঁকজমক, প্রাচ্যদেশীয় নিষ্ঠুরতা, প্রাচ্যদেশীয় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি) বহু প্রাচ্য সম্প্রদায়, দর্শন এবং স্থানীয় ইউরোপীয়দের ব্যবহার উপযোগী করে পরিবর্তিত প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান—তালিকাটি অনিঃশেষ বড় করা যেতে পারে। মূল কথা হল, ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং প্রাচ্যের এক বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতার উপলব্ধি থেকে প্রাচ্যতত্ত্বের উৎপত্তি। এবং উনিশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত প্রাচ্য বলতে বোঝাতো ভারত ও বাইবেলের দেশকে। উনিশ শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের ওপর কর্তৃত্ব করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকানরা নিয়ন্ত্রণ করছে প্রাচ্যকে এবং ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মতোই আচরণ করছে প্রাচ্যের সাথে। এই ঘনিষ্ঠতা খুবই উৎপাদনমুখী, যদিও

তা বরাবরই প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের (ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও আমেরিকার) শক্তিমত্তার আধিক্য প্রদর্শন করেছে। এই ঘনিষ্ঠতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে একগুচ্ছ রচনা—আমি যেগুলোকে বলছি 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক।'

এই সঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, প্রচুর গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও আরো বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে পাঠ-তালিকার বাইরে রাখতে হয়েছে। প্রাচ্যের ওপর লিখা একগাদা রচনার ক্লান্তিকর বিশাল তালিকার ওপর নির্ভরশীল নয় আমার বক্তব্য, কিংবা নির্বাচিত কিছু গ্রন্থ, লেখক ও ধারণা-তত্ত্বের ওপরও নয়, যেগুলো একত্রে প্রাচ্যতত্ত্বের মূলনীতিগুলো রচনা করেছে। আমি বরং নির্ভর করেছি ভিন্ন এক পদ্ধতিগত বিকল্পে, যার মেরুদণ্ড হল ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ। আমি এ পর্যন্ত তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। এখন সেগুলোই খুঁটিনাটিসহ আলোচনা করতে চাই।

দুই.

প্রাচ্য প্রকৃতির কোনো নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি নয় তা ধরে নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম। এমন নয় যে প্রাচ্য 'এখানে অস্তিত্বশীল', তেমনি পাশ্চাত্যও 'ওখানে অস্তিত্ববান' নয়। ভিকোর একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হল মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে এবং সে যা সৃষ্টি করে তাই সে জানতে পারে ও ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত করতে পারে। এ পর্যবেক্ষণ আমাদের গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত। ঐতিহাসিক সত্তার কথা বলছি না, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা যেমন—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মতো স্থানিক, আঞ্চলিক, ভৌগোলিক বিভাজন মানুষের তৈরি। অতএব, 'পশ্চিম' যেমন, তেমনি 'প্রাচ্য'ও একটি ধারণা যার আছে নিজস্ব চিন্তা, চিত্রকল্প ও পরিভাষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; এগুলোই পশ্চিমের জন্যে এবং পশ্চিমের নিকট প্রাচ্যের বাস্তবতা ও উপস্থিতি নির্মাণ করেছে। এ প্রক্রিয়ায় দুটো ভৌগোলিক সত্তা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পরকে সমর্থন করে, কিছুটা প্রতিফলিতও করে।

এ মন্তব্যের পর তার সমর্থনে কিছু যুক্তিযুক্ত বক্তব্যও তুলে ধরা উচিত। আমার প্রথম বক্তব্য হল : প্রাচ্যকে কেবলই একটা ধারণা বা বাস্তবতার সাথে সম্পর্কবিহীন সৃষ্টি বলে সিদ্ধান্ত টানা ভুল হবে। যখন ডিজরাইলি তার উপন্যাস *ট্যাঙ্কেড*-এ লিখেন 'প্রাচ্য উন্নতির একটি পথ' তখন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তরুণ, প্রাণচঞ্চল পশ্চিমাদের নিকট প্রাচ্যে আগ্রহী হওয়ার ঘটনা প্রবল আবেগের বিষয় বলে মনে হবে। ডিজরাইলিকে ভুলভাবে এমন ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে, তিনি বলেছেন প্রাচ্য পশ্চিমাদের কাছে স্রেফ পেশা।

প্রাচ্যে কিছু সংস্কৃতি ও জাতি ছিল (এখনো আছে), তাদের জীবন-যাপন ও আচার প্রথার নিষ্ঠুর বাস্তব দিক আছে যা নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো খারাপ মন্তব্যের চেয়ে খারাপ। এ বাস্তব সত্য সম্পর্কে বর্তমান রচনায় কিছু করার নেই, কেবল চুপচাপ স্বীকার করে নেয়া ছাড়া। কিন্তু আমি বর্তমান অধ্যয়নে যেমন দেখেছি, প্রাচ্যতত্ত্বের বাইরের সংগঠন—প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করে না—প্রধানত প্রাচ্যতত্ত্ব ও প্রাচ্য-বিষয়ক ভাব-কল্পনা (যেমন, প্রাচ্য হল উন্নতির একটা পথ) বজায় রাখে, বাস্তব প্রাচ্যের সাথে সেই ভাব-কল্পনার সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক। আমার যুক্তি হচ্ছে, প্রাচ্য সম্পর্কে ডিজরাইলির মন্তব্য ইঙ্গিত করে ঐ কৃত্রিম আন্তরসঙ্গতির প্রতি, প্রাচ্য-বিষয়ক ভাব-কল্পনার প্রতি যা সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান। এবং তা অবশ্যই কেবল প্রাচ্যের

অস্তিত্বের কথা বলে না, যেমন মন্তব্য করেন ওয়ালেস স্টিভেন্স।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হল ভাবাদর্শ, সংস্কৃতি, ইতিহাস যথার্থ অধ্যয়ন বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যদি না তাদের পেছনে কার্যকর শক্তি—আরো সঠিক অর্থে বললে—ক্ষমতার আন্তরবিন্যাসও পরীক্ষা করে দেখা হয়।

যদি বিশ্বাস করতে হয় যে প্রাচ্য কৃত্রিম সৃষ্টি—বা আমি যেমন বলি 'প্রাচ্যায়িত'—এবং কেবল কল্পনা বিস্তারের প্রয়োজনে তা ঘটেছে, তা হলে সে বিশ্বাসে কপটতা থেকে যাবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক ক্ষমতা, আধিপত্য এবং পরিবর্তনশীল মাত্রার জটিল কর্তৃত্বের সম্পর্ক, যা খুবই সঠিকভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে কে. এম. পানিকারের ধ্রুপদ রচনা *'এশিয়া অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডমিনেন্স'*-এর শিরোনামে।[২]

প্রাচ্য কেবল এ জন্যে প্রাচ্যায়িত হয়নি যে এটি আবিষ্কৃতই হয়েছিল উনিশ শতকীয় সাধারণ ইউরোপীয়'র বিবেচনায় সম্ভাব্য সকল দিক থেকে *প্রাচ্য* হয়ে ওঠার জন্যে, বরং এ জন্যেও যে, প্রাচ্যকে প্রাচ্যায়িত করা সম্ভব ছিল—অর্থাৎ প্রাচ্যকে প্রাচ্যায়িত করতে দেয়া হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফ্লবেয়ারের সাথে জনৈক অভিজাত মিশরীয় বারাঙ্গনার পরিচয় প্রাচ্য নারীদের যে প্রভাবশালী নমুনা তৈরি করে তার সাথে একমত হওয়ার কিছু নেই। সে নারী নিজের সম্পর্কে কিছুই বলে না, নিজের উপস্থিতি, আবেগ বা ইতিহাস প্রকাশ করে না। ফ্লবেয়ার বিদেশি, তুলনামূলকভাবে বিত্তবান পুরুষ—এসবই আধিপত্যের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি যা তাকে কুচুক হানেমকে দৈহিকভাবে অধিকারে সক্ষম করে। কেবল তাই নয়, হানেমের পক্ষে কথা বলার এবং হানেম কোন, কোন দিক দিয়ে খাঁটি প্রাচ্য নারী তা পাঠককে জানানোর ক্ষমতাও দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হল কুচুক হানেমের তুলনায় ফ্লবেয়ারের অবস্থান কোনো একক বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়, এটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক শক্তির বিন্যাস এবং তা থেকে সম্ভাবিত প্রাচ্য-বিষয়ক ডিসকোর্সের একটি আদর্শ উদাহরণ বলে গণ্য হতে পারে।

এ অবস্থা আমাদেরকে তৃতীয় যুক্তিতে উপনীত করে। কারো এমন ভাবা ঠিক হবে না যে, প্রাচ্যতত্ত্বের সংগঠন একরাশ মিথ্যা ও মিথের সংগঠন, এবং সত্য প্রকাশ করে দিলেই তা উড়ে যাবে। আমি মনে করি, প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্যের ওপর ইউরোপীয়-আটলান্টিক ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে অধিকতর মূল্যবান, যতটা না প্রাচ্য-বিষয়ক ডিসকোর্স হিসেবে (প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বা পণ্ডিতি রূপ কেবল প্রাচ্য-বিষয়ক ডিসকোর্স হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি করে)।

এ সত্ত্বেও প্রাচ্যতত্ত্বের নিশ্ছিদ্র ও নিখুঁত বুননের সামগ্রিক শক্তি, তার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড় সংযোগ এবং টিকে থাকার ভয়ানক সামর্থকে আমাদের অবশ্যই সমীহ করতে হবে, একে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে। এমনকি ভাব-কল্পনার একটি প্রক্রিয়া যদি অপরিবর্তিত শিক্ষেয় জ্ঞান হিসেবে (একাডেমি, বইপত্র, সামবেশ-সম্মেলন, বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্র-বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে) ১৮৪০-এর শেষ দিকে আর্নেস্ত রেনানের যুগ থেকে এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহাল থাকতে পারে তবে তা অবশ্যই একরাশ মিথ্যার চেয়ে ভয়ানক কোনো ব্যাপার। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব প্রাচ্য বিষয়ে ইউরোপীয়দের লঘুচিত্তের কল্পনা নয়, বরং তত্ত্ব ও চর্চার সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি কাঠামো যার পেছনে রয়েছে প্রজন্মক্রমিক প্রচুর বিনিয়োগ। ক্রমাগত বিনিয়োগ প্রাচ্যতত্ত্বকে প্রাচ্য-বিষয়ক জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ারূপে পশ্চিমা চেতনায় প্রাচ্যকে সিঞ্চন করার স্বীকৃত ছাঁকনিতে

পরিণত করেছে। সেই একই বিনিয়োগ আবার প্রাচ্যতত্ত্ব থেকে সর্বজনীন সংস্কৃতিতে সংক্রমিত হতে থাকা বক্তব্যসমূহকে বহুগুণ বাড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

গ্রামসি নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে বিশ্লেষক ও ব্যবহার উপযোগী পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি গড়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবী (অন্তত যুক্তিশীল ও স্বেচ্ছামূলক) প্রতিষ্ঠান যেমন—স্কুল, পরিবার, সংঘ ইত্যাদি নিয়ে। দ্বিতীয়টি গঠিত রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ (সেনাবাহিনী, পুলিশ, কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র) নিয়ে, রাষ্ট্র-সমাজে যার কাজ আধিপত্য করা। সংস্কৃতি অবশ্যই নাগরিক সমাজে ক্রিয়াশীল দেখা যায়, যেখানে ভাবাদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাব কাজ করে—কর্তৃত্বের মাধ্যমে নয়, গ্রামসি'র ভাষায় সম্মতির ভিত্তিতে। যে সমাজ স্বৈরতান্ত্রিক নয় তাতে কিছু সাংস্কৃতিক রূপ অন্যগুলোর ওপর পূর্বাধিপত্য করে, যেমন কিছু ভাবাদর্শ অন্যগুলোর তুলনায় অধিকতর প্রভাবশালী হয়। এই সাংস্কৃতিক নেতৃত্বকে গ্রামসি বলেছেন *হেজেমনি*—পশ্চিমের শিল্পায়িত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন বোঝার জন্যে একটা অপরিহার্য ধারণা। এই *হেজেমনি*—বলা যায় ভাবাধিপত্যের ফলাফল প্রাচ্যতত্ত্বকে এমনতর দীর্ঘায়ু ও সামর্থ দিয়েছে যা এতোক্ষণ আমি আলোচনা করেছি।

যাকে ডেনিসহে বলেছেন, "ইউরোপের কল্পনা"[৩]—'ওরা' অ-ইউরোপীয়'র বিপরীতে 'আমরা' ইউরোপীয় হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হওয়ার যুক্তি-বিরহিত প্রবণতা, তা থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব খুব একটা দূরে নয়। এবং কার্যত এমন দাবিও করা যায় যে সেগুলোই ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রধান উপাদান তা-ই যা সে সংস্কৃতিকে ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে ভাবাধিপত্যবাদী করে তুলেছে—সকল অ-ইউরোপীয় মানুষ ও সংস্কৃতির তুলনায় ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। আরো কথা আছে, প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় সামাজিক আধিপত্যের ধারণা নিজেই প্রাচ্যের পশ্চাদপদতার তুলনায় ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপুনঃ দাবি করছে এবং এমন সম্ভাবনাকেও সচরাচর নাকচ করে দিচ্ছে যে, অধিকতর স্বাধীন বা সন্দেহবাতিক কোনো চিন্তাবিদ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন।

প্রাচ্যতত্ত্ব তার কৌশলের প্রয়োজনে বরাবর ঐ নিয়ন্ত্রণযোগ্য শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। এ পরিস্থিতি পশ্চিমাদের সুবিধাজনক অবস্থান নষ্ট না করেই প্রাচ্যের সাথে তাদেরকে সম্পর্কিত করে একগুচ্ছ সম্ভাব্য সম্পর্কে। রেনেসাঁর শেষ দিক থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপের অসাধারণ উত্থানের কালে কেনই-বা তা ভিন্ন কিছু হবে? বিজ্ঞানী, পণ্ডিত, মিশনারী, ব্যবসায়ী, সৈনিক সবাই প্রাচ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে অথবা প্রাচ্যের কথা ভেবেছে। কারণ চাইলেই সে ওখানে যেতে পারতো, ঐ অঞ্চলটির কথা চিন্তা করতে পারতো, প্রাচ্যের তরফ থেকে কোনো বাধা ছাড়াই। আঠারো শতকের শেষ থেকে এ যাবৎ 'প্রাচ্য-বিষয়ক জ্ঞান' শিরোনামে এবং প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের ভাবাধিপত্যের ছায়ায় জটিল এক *প্রাচ্য*-এর উদ্ভব হয়। সে *প্রাচ্য* একাডেমিতে অধ্যয়ন, জাদুঘরে প্রদর্শন ও উপনিবেশিক কার্যালয়ে পুনর্গঠনের যোগ্য, মানবজাতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নৃ-তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণবাদী ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপাত্তরূপে ব্যবহার্য, এবং সমাজবিদ্যা ও অর্থনীতির উন্নয়নতত্ত্ব, বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বা জাতীয় কিংবা ধর্মীয় চরিত্র বিশ্লেষণে নমুনারূপে ব্যবহারের উপযোগী।

তাছাড়া কোন জিনিসটি প্রাচ্যদেশীয় তা যাচাই করার কল্পনা-নির্ভর পদ্ধতিটি বিশেষভাবে

এক সার্বভৌম পশ্চিমা চৈতন্য-র ওপর নির্ভরশীল। এ পশ্চিমা চৈতন্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রমুখী প্রাধান্য থেকে জন্ম নিয়েছে প্রাচ্য-জগৎ : প্রথম দিকে কে বা কী প্রাচ্যদেশীয় সে সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা থেকে, অতঃপর একগুচ্ছ খুঁটিনাটি যুক্তি অনুসারে—যেসব যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতা দ্বারাই শাসিত নয় কেবল, একরাশ আকাঙ্ক্ষা, দমন, বিনিয়োগ ও আগাম হিসেবে-নিকেশ দ্বারাও পরিচালিত। আমরা যদি যথার্থ পণ্ডিতি কাজ যেমন, সিলভেস্ত্রা ডি সেসি'র *ক্রেস্তোমাতি অ্যারাব* বা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইনের *একাউন্ট অব দি ম্যানারস অ্যান্ড কাস্টমস অব দি মডার্ন ইজিপশিয়ান*-এর কথা নির্দেশ করি তাহলে মনে রাখা দরকার রেনান ও গোবিনোর বর্ণবাদী ভাবাদর্শের জন্যও একই প্রেরণা থেকে—ভিক্টোরীয় যুগের অনেক পর্ণোগ্রাফিক উপন্যাসও (দ্র: *দি লাস্টফুল তুর্ক*,[৪] স্টিভেন মার্কুসের বিশ্লেষণ দেখুন)।

তবু বারবার নিজেই প্রশ্ন করা উচিত প্রাচ্যতত্ত্বের কোন দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ববহ : প্রচুর বাস্তব তথ্য-উপাত্ত পায়ে দলে গড়ে ওঠা একগুচ্ছ সাধারণ ধারণা-মতাদর্শ যেগুলো ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন ধরনের বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদি 'প্রাচ্য' বিষয়ক ভাবান্ধ বিমূর্ত ধারণার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে? —নাকি, প্রায় অসংখ্য লেখকের লেখা স্বাতন্ত্র্যধর্মী গ্রন্থরাশি যে সব লেখক প্রাচ্য বিষয়ে একক তৎপরতার নমুনা হিসেবে বিবেচিত হবেন?

এক অর্থে সর্বজনীন ও বিশেষ একই বিষয়ে দুই দৃষ্টিকোণ মাত্র। উভয়ক্ষেত্রেই উইলিয়াম জোনস, নেরভাল ও ফ্লবেয়ারের মতো বিরাট শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে হবে। তাছাড়া দুই দৃষ্টিকোণ এক সাথে বা একটার পর আরেকটা প্রয়োগ করা যাবে না কেন? যদি পদ্ধতিগতভাবে খুব বেশি সর্বজনীন বা খুবই ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ বজায় রাখা হয় তা হলে কি বিকৃতির (ঠিক যা করার প্রবণতা আছে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতত্ত্বে) অনিবার্য ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে না?

আমার দ্বিবিধ ভয় হল বিকৃতি ও ভুল—খুবই অন্ধ সর্বজনীন বা খুবই স্থানিক দৃষ্টিকোণের দ্বারা সৃষ্ট ভুল। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্যে আমি সমকালীন বাস্তবতার প্রধান তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় তা আমাদের আলোচিত পদ্ধতিগত জটিলতা থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় বাৎলে দেবে। ঐ পদ্ধতিগত জটিলতা প্রথমত, কাউকে বাধ্য করতে পারে এমন অপরিশোধিত বক্তব্য রচনায় যার পেছনে শ্রম দেয়া অর্থহীন। অথবা দ্বিতীয়ত, কাউকে এমন খুঁটিনাটি পরমাণুমুখী বিশ্লেষণ লেখায় চালিত করতে পারে যার ফলে প্রাচ্যতত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্মাণ ও বিশেষ সামর্থ প্রদানে সক্রিয় উপাদানরাশির চিহ্নসমূহ আলোচনার বাইরে থেকে যেতে পারে। তাহলে, কিভাবে ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তাকে তার মেধাদীপ্ত এবং কোনোভাবেই নিষ্ক্রিয় বা কেবল স্বৈরতান্ত্রিক নয়—এমন সর্বজনীন ও আধিপত্যবাদী পটভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্থাপন করা যায়?

তিন

আমি সমকালীন বাস্তবতার তিনটি দিক তুলে ধরলাম : এখন ওগুলো বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপে আলোচনা করব যাতে বোঝা যায় কিভাবে আমি একটি বিশেষ ধারার গবেষণা ও লেখায় পরিচালিত হয়েছি।

১. রাজনৈতিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পার্থক্য : শেক্সপীয়র বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-সম্পর্কিত জ্ঞান রাজনৈতিক জ্ঞান নয়, কিন্তু সমকালীন চীন বা রাশিয়া-সম্পর্কিত জ্ঞান রাজনৈতিক—এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন খুবই সহজ। আমার নিজের প্রথাগত ও পেশাগত পরিচয় 'মানবতাবাদী'। এমন এক অভিধা যা ইঙ্গিত করে মানববিদ্যা আমার বিষয়; সুতরাং এ বিষয়ে আমি যা-ই করি তা রাজনৈতিক কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমি অবশ্যই এসব লেবেল ও পরিভাষা সূক্ষ্মতর আর্থ-ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করছি না; যে সাধারণ অর্থ বোঝাতে চাই তা সর্বজনীনভাবে গৃহীত। একজন মানবতাবাদী যিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে লিখেন বা কীট্‌স-বিশেষজ্ঞ একজন সম্পাদক রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত নন—আমার এ বক্তব্যের একটি কারণ এই যে, তিনি যা করছেন তা প্রাত্যহিক বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব ফেলে বলে মনে হয় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি যার বিষয় তিনি কাজ করেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্রে যেখানে সরকারের যথেষ্ট স্বার্থ জড়িত। তিনি গবেষণা বা প্রস্তাবনা আকারে যা সৃষ্টি করবেন তা নীতিনির্ধারক, পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিবিদ, গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দ্বারা গৃহীত হবে।

মানবতাবাদী লেখক ও নীতি-নির্ধারণী বা রাজনৈতিক গুরুত্ববহ লেখকের পার্থক্য আরো বিস্তৃত করতে চাইলে বলা যায় যে, প্রথমোক্ত জনের আদর্শগত রঙের রাজনৈতিক গুরুত্ব একটি দৈবাৎ ব্যাপার (যদিও তার সহকর্মীদের কাছে খুবই জরুরি মনে হতে পারে এবং তারা তার স্ট্যালিনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট বা সরল-উদারতাবাদী আদর্শের প্রতি আপত্তি তুলতে পারেন); অন্যদিকে, দ্বিতীয়োক্ত জনের আদর্শিক মতবাদ সরাসরি বুনে দেয়া হয় তার কর্মে—আধুনিক বিদ্যায়তনে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজতত্ত্বে যেগুলো আসলে মতাদর্শিক বিজ্ঞান মাত্র। তাই এগুলোকে 'রাজনৈতিক' আখ্যায়িত করার যোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়।

যাহোক, সমকালীন পাশ্চাত্যে (এবং এখানে আমি বলছি প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রে) সৃষ্ট জ্ঞানে যে নিয়ামক প্রভাব পড়েছে তা হল জ্ঞান হবে অ-রাজনৈতিক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বিদ্যায়তনিক, নিরপেক্ষ, দলাদলি ও সঙ্কীর্ণ মতবাদগত বিশ্বাসের উর্ধ্বে। এরকম তাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষার সাথে কারো কোনো ঝগড়া থাকার কথা নয়। তবে চর্চা ও বাস্তব অনেক বেশি সমস্যাসঙ্কুল। কেউ এমন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেনি যাতে লেখককে বিচ্ছিন্ন করা যায় তার জীবনের পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে—তার শ্রেণীর সাথে (সচেতন বা অসচেতন) সম্পর্ক, একরাশ বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান কিংবা সমাজের সদস্য হিসাবে কৃত তৎপরতা থেকে। তিনি পেশাগতভাবে যা করেন তার ওপর ছাপ পড়বে এ সমস্ত কিছুরই; যদিও খুব স্বাভাবিকভাবেই তার গবেষণা ও ফলাফল চেষ্টা করবে নির্দয় প্রাত্যহিক বাস্তবের সীমাবদ্ধতা ও রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে তুলনামূলক মুক্ত স্তরে পৌঁছার। কারণ জ্ঞানের একটি ব্যাপার হল জ্ঞান উৎপন্নকরণে সেই (মনোযোগ-বিক্ষেপক জীবন-পরিস্থিতির ফাঁদে জড়ানো) ব্যক্তির চেয়ে তার জ্ঞান কম পক্ষপাতদুষ্ট। তবু এই জ্ঞান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ-রাজনৈতিক নয়।

সাহিত্য বা ধ্রুপদ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় স্বাভাবিক বা অনিচ্ছাকৃত রাজনৈতিক প্রভাব পড়ে কি না তা অনেক বড় প্রশ্ন যা আমি অন্যত্র কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[৫] এখানে

আমি যা দেখাতে আগ্রহী তা হল বিশুদ্ধ জ্ঞান মৌলিকভাবে অ-রাজনৈতিক (এবং বিপরীতক্রমে, খুব বেশি রাজনৈতিকায়িত জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়) —এই সাধারণ উদারতাবাদী ধারণা কিভাবে জ্ঞান-সৃজন মুহূর্তে বলবৎ ও গোপনে সুসংগঠিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আড়াল করে রাখে।

আজকাল কাউকে সহজে বুঝতে দেয়া হয় না যে, অরাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভান-করা নীতি ভাঙ্গার দুঃসাহস নিয়ে যখন কিছু রচিত হয় তখন সেই রচনাকে ছোট করার জন্যে 'রাজনৈতিক' বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। আমরা, প্রথমত, বলতে পারি নাগরিক সমাজ বিভিন্ন জ্ঞান-শাখার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার রাজনৈতিক গুরুত্ব গ্রহণ করে নেয়। সীমিত ক্ষেত্রে, কোনো জ্ঞান-শাখা সরাসরি আর্থ-মাত্রায় কতটা রূপান্তরযোগ্য সেই সম্ভাবনা থেকে আসে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব; তবে বৃহত্তর অর্থে একটি বিষয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব আসে রাজনৈতিক সমাজে অর্জনযোগ্য ক্ষমতার উৎসের সাথে তার সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী সরবরাহ ক্ষমতা এবং সামরিক শক্তির ওপর এর প্রভাব-সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিযুক্তি পেতে পারে এবং এর ফলে এটি লাভ করতে পারে একে ধরনের রাজনৈতিক মর্যাদা, যা কোনো ফাউন্ডেশনের আংশিক আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত টলস্টয়ের প্রথম দিককার উপন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার ভাগ্যে জোটা অসম্ভব। তবু নাগরিক সমাজের নিকট উভয় রচনা একই বিষয় অর্থাৎ রুশ অধ্যয়ন হিসেবে গৃহীত; যদিও হতে পারে একটি কাজ খুবই রক্ষণশীল কোনো অর্থনীতিবিদ এবং অন্যটি বিপ্লবী সাহিত্য-ইতিহাসবেত্তার দ্বারা সম্পাদিত। আমি বলতে চাচ্ছি 'অর্থনীতি' বা 'সাহিত্য ইতিহাস' এর মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের চেয়ে 'রুশ' শিরোনামের সামগ্রিক ক্ষেত্রটির রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশি। কারণ গ্রামসি'র রাজনৈতিক সমাজ নাগরিক সমাজে বিদ্যায়তনের মতো জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং ওগুলোয় সঞ্চার করে দেয় তার প্রত্যক্ষ আগ্রহ-অনাগ্রহের বোধ।

আমি সাধারণ তাত্ত্বিক পটভূমিতে এসব বিষয়ে আর জোর দিতে চাই না। আমার মনে হয় আরো নির্দিষ্ট আলোচনাতেও আমার বিষয়টির মূল্য ও বিশ্বস্ততা দেখানো যেতে পারে; যেমন—সরকার পরিচালিত সামরিক গবেষণা—যার নাম দেয়া হয় 'উদ্দেশ্যমূলক পাণ্ডিত্য'—তার ধারণা এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের সহায়ক সম্পর্কের ওপর নোয়াম চমস্কির গবেষণা।[৬] এখন যেহেতু ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং সম্প্রতি আমেরিকাও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাই বিদেশে যখন যেখানেই তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয় তখনই তাদের রাজনৈতিক সমাজ নাগরিক সমাজে সঞ্চারিত করে দেয় এক ধরনের জরুরিত্বের বোধ, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রেরণা।

আমি সন্দিহান এমন বক্তব্য আদৌ বিতর্কিত কি না যে, শেষ উনিশ শতকের ভারত বা মিশরে একজন ইংরেজ ওইসব দেশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল যেগুলোর মর্যাদা তার কাছে ব্রিটিশ উপনিবেশের বেশি কিছু ছিল না। আবার পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে ভিন্ন মনে হতে পারে যদি বলা হয়—ভারত ও মিশর-সম্পর্কিত সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলির দ্বারা রঞ্জিত, প্রভাবিত ও দূষিত; প্রাচ্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় আমি আসলে তা-ই বলছি।

কারণ, যদি এ বক্তব্য সঠিক হয় যে, মানববিদ্যায় সৃষ্ট কোনো জ্ঞান কখনোই মানবীয় বিষয় হিসেবে রচয়িতার সাথে রচয়িতার আপন-পরিস্থিতির সম্পর্ক উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে

পারে না, তবে এও সত্য যে, একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকানের প্রাচ্য-বিষয়ক গবেষণা অস্বীকার করতে পারে না তার বাস্তবতার মূল এই পরিস্থিতিকে যে, তিনি প্রাচ্যের মুখোমুখি হয়েছেন প্রথমত, একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকান হিসেবে, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি হিসেবে। এবং এ পরিস্থিতিতে একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকান হওয়ার ব্যাপারটি নিছক নিষ্ক্রিয় বাস্তবতা নয়। তা বুঝিয়েছে এবং বুঝায়—যত অস্পষ্টভাবেই হোক—সচেতন হয়ে ওঠা যে, তিনি এমন একটি বিশেষ শক্তির অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যে যার নিশ্চিত স্বার্থ জড়িত; এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি এমন এক অংশের মানুষ যে অংশটির সাথে—সেই হোমারের সময় থেকে—প্রাচ্যের নিবিড় সম্পর্কের নির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে।

বলা যায়, আগ্রহ সৃষ্টির প্রশ্নে এসব রাজনৈতিক বাস্তবতা স্থূল এবং এখনো খুবই অনালোচিত। যে কেউ ঐসব বিষয়ে একমত হতে পারেন, যদিও তিনি হয়তো মানেন না যে, এগুলোর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল—বিশেষত ফ্লবেয়ারের নিকট যখন তিনি *স্যালামবো* লিখেন, কিংবা *মডার্ন ট্রেন্ড ইন ইসলাম* রচনার সময় এইচ. আর. গিব-এর নিকট। মুশকিল হল আমার আলোচিত বৃহৎ প্রভাবসম্পাতী ঘটনা আর উপন্যাস বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা লিখিত হওয়ার সময় তার অনুপুঙ্খ শৃঙ্খলার নিয়ামক দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যে পার্থক্য বিশাল।

যদি শুরু থেকেই এমন ধারণা দূরে সরিয়ে রাখি যে, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মতো বৃহৎ বাস্তবতা যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্টকরণের ক্ষমতাসহ সংস্কৃতি ও মতাদর্শের মতো জটিল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তা হলে আমরা এক আকর্ষণীয় গবেষণার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করব। আমার ধারণা, আমার প্রদত্ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী প্রাচ্য বিষয়ে ইউরোপীয়, অতঃপর আমেরিকান আগ্রহের সম্পর্কটি রাজনৈতিক। সংস্কৃতি সে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। রূঢ় রাজনৈতিক, আর্থ ও সামরিক যুক্তিবোধের পাশাপাশি সংস্কৃতিও গতিশীলভাবে কাজ করেছে বিচিত্র ও জটিল *প্রাচ্য* নির্মাণে, যে *প্রাচ্য* অবশ্যই বিচিত্র ও জটিলরূপে প্রাচ্যতত্ত্বে অস্তিত্ববান।

অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব সংস্কৃতি, পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠান নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত সাদামাটা রাজনৈতিক বিষয় বা জ্ঞান-শাখা নয়, প্রাচ্য সম্পর্কে বিরাট ও বিস্তৃত গ্রন্থরাজিও নয়, নয় তা 'প্রাচ্য' জগৎকে পরাধীন করে রাখার জন্যে দুষ্ট চক্র পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার প্রতিনিধিত্বমূলক ও অভিব্যক্তিস্বরূপ। বরং তা হল নন্দনতাত্ত্বিক, পণ্ডিতি, অর্থনৈতিক, সমাজবিদ্যাসংক্রান্ত, ঐতিহাসিক রচনায় ভূ-রাজনৈতিক সচেতনতা সঞ্চার। এ হল সযত্ন বিশদায়ন—কেবল মৌলিক ভৌগোলিক পার্থক্যেরই নয় (পৃথিবী দুটো অসমান অংশ 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্যে' বিভক্ত) একরাশ স্বার্থেরও, যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবিষ্কার, ভাষিক পুনর্গঠন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বর্ণনা প্রভৃতি উপায়ে সৃষ্টি করে এবং তা বহালও রাখে। প্রাচ্যতত্ত্ব হল দৃষ্টিগোচরভাবে ভিন্ন (বা বিকল্প ও নতুন) জগৎকে উপলব্ধি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিতকরণ এমনকি, অধিভুক্তকরণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়; সর্বোপরি, প্রাচ্যতত্ত্ব একটি ডিসকোর্স যা কোনোভাবেই স্থূল রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সরাসরি সংযোগে সম্পর্কিত নয় বরং বিভিন্ন অসমান শক্তির লেনদেনে জন্ম নিয়ে টিকে আছে। এবং ক্ষমতার রাজনীতির সাথে (যেমন উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে), ক্ষমতার বুদ্ধিবৃত্তিতার সঙ্গে (যেমন, প্রচল বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান বা

অন্য কোনো কৌশলগত নীতি বিজ্ঞানের লেনদেনে), ক্ষমতার সংস্কৃতির সাথে (যেমন, রক্ষণশীলতা, রুচিবোধ, রচনা ও মূল্যবোধের রীতিনীতির সাথে), ক্ষমতার নৈতিকতার সাথে (যেমন, এ ধারণা যে 'আমরা' পশ্চিমারা কী করি এবং ওরা 'প্রাচ্যবাসীরা' কী করতে পারে না বা বুঝতে পারে না যে, 'আমরা' কী করতে সক্ষম) —আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, আমার আসল বক্তব্য হল প্রাচ্যতত্ত্ব আধুনিক রাজনৈতিক-বুদ্ধিবত্তিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য এক মাত্রা; এটি কেবল তার প্রতিনিধিত্বই করে না। এবং তাই, তা যতটা না প্রাচ্যের সাথে তার চেয়ে বেশি 'আমাদের' জগতের সাথে সম্পর্কিত।

প্রাচ্যতত্ত্ব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয় বলে মহাফেজখানার শূন্যগর্ভে তার অস্তিত্ব নেই; বরং উল্টো দেখানো সম্ভব যে, প্রাচ্য সম্পর্কে যা চিন্তা করা হয়েছে, বলা হয়েছে, এমনকি করা হয়েছে তা ঘটেছে একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বোধগম্য সীমানা অনুসরণ করে (হয়তো তার মধ্যেই)।

এখানেও দেখা যাবে বৃহৎ উপরিকাঠামোগত চাপ এবং রচনার অনুপুঙ্খ, বয়ানের ঘটনাবলির মাঝখানে নির্দিষ্ট মাত্রার আর্থ-ব্যবধান ও বিশদায়ন ক্রিয়াশীল। আমি মনে করি, প্রকৃত মানবিক লেখক তিনিই যিনি 'পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা অস্তিত্ববান' মনে করে যথার্থ সম্ভ্রষ্ট, যিনি মনে করেন আন্তঃরচনা সম্পর্ক বলে কিছু একটি আছে এবং যিনি বিশ্বাস করেন প্রথা, অগ্রজেরা ও ভাষারীতির চাপ লেখকের প্রকাশ ক্ষমতা সীমিত করে দেয়— একদা ওয়াল্টার বেনজামিন যাকে বলেছিলেন, "সৃষ্টির রীতিনীতির নামে সৃজনশীল ব্যক্তির নিকট থেকে চড়া মাশুল আদায়", যদিও সে নীতি অনুযায়ী বিশ্বাস করা হয় কবি নিজে বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে তার রচনা সৃষ্টি করেছেন।[৭]

এ সত্ত্বেও লেখকের ওপর একইভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মতাদর্শগত চাপের বিষয়টি স্বীকার করতে অনিচ্ছা দেখা যায়। একজন মানবতাবাদী বিশ্বাস করবেন বালজাকের কোনো ভাষ্যকারের নিকট এ বিষয়টি আকর্ষণীয় বলে মনে হবে যে, তিনি *কমেডি হিউমেইন* রচনায় জিওফ্রে সেইন্ট-হিলারি ও কুভিয়েরের দ্বন্দ্ব দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু বালজাকের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে তার ওপর সক্রিয় গভীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রের একই রকম চাপের ব্যাপারটি দেখা হয়েছে একরকম অস্পষ্টতায়; তাই বিষয়টি সিরিয়াস গবেষণার অনুপযোগী মনে হয়েছে। একইভাবে— যেমন হ্যারী ব্রেকেন অবিরাম দেখিয়ে চলেছেন—দার্শনিকেরা লক, হিউম ও সাম্রাজ্যবাদের আলোচনাকালে বিবেচনাতেও আনেন না যে, ধ্রুপদ যুগের এসব লেখকদের 'দার্শনিক' মতবাদ এবং বর্ণবাদী তত্ত্ব, দাসপ্রথা ও উপনিবেশিক শোষণে সমর্থন প্রদানের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগ রয়েছে।[৮] এগুলো হল খুবই সাধারণ কৌশল যা অবলম্বন করে সমকালীন পাণ্ডিত্যধারা নিজেকে বিশুদ্ধ রাখে।

এ কথা হয়তো সত্যি যে, রাজনীতির কাদায় সংস্কৃতির নাক চোবানোর অধিকাংশ প্রয়াস কাঁচা, মূর্তি-বিনাশী। হয়তো আমার নিজের বিষয় সাহিত্যও ভাষ্য, সোজা কথায়, অনুপুঙ্খ কেতাবী-বিশ্লেষণে অর্জিত বিরাট কৌশলগত উন্নয়নের সাথে তাল রাখেনি। কিন্তু এ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই যে, সামগ্রিক অর্থে সাহিত্য সমালোচনা, নির্দিষ্ট করে বলতে আমেরিকান মার্কসীয় তাত্ত্বিকরা কেতাবী ও ঐতিহাসিক ও পাণ্ডিত্যের ধারায় মূলকাঠামো

ও উপরিকাঠোমোর ফাঁক কমানোর নিবিষ্ট প্রয়াস এড়িয়ে গেছেন। অন্যত্র আমি এও পর্যন্ত বলেছি যে, সামগ্রিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতির নিবিড় আলোচনাকে সীমাবহির্ভূত বলে ঘোষণা করে।[৯]

এ সত্ত্বেও, প্রাচ্যতত্ত্ব আমাদেরকে সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেয় এ প্রশ্নের মুখোমুখি যে, এই রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অধ্যয়ন, ভাব-কল্পনা ও পাণ্ডিত্যময় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশাল একটি ক্ষেত্রকে এমনভাবে পরিচালিত করে যে, তা উপেক্ষা করা বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক অসম্ভবতা হয়ে দাঁড়ায়। তবু থেকেই যায় ফাঁকি দেয়ার পুরনো কৌশল—এমন অজুহাত যে, একজন সাহিত্যিক ও একজন দার্শনিক যথাক্রমে সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাখ্যা রচনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত; রাজনীতি ও ভাবাদর্শ বিশ্লেষণে নয়। অন্য কথায়, বিশেষজ্ঞ যুক্তিতর্ক বৃহত্তর, আমার বিবেচনায় অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সিরিয়াস পরিপ্রেক্ষিত আড়াল করে রাখতে সক্ষম।

আমার মনে হয় এখানে দু'ভাগে বিভক্ত একটি সহজ জবাব আছে—বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ ও সংস্কৃতি (বা প্রাচ্যতত্ত্ব) বিষয়ক আলোচনার সাথে এটি যতটা সম্পর্কিত। প্রথমত, উনিশ শতকের (একইভাবে প্রযোজ্য যে তার পূর্বের যুগের) সকল লেখকই সাম্রাজ্যের ব্যাপারটি সম্পর্কে বিশেষ রকম সচেতন ছিলেন। এটি এমন এক বিষয় যা সঠিকভাবে আলোচিত হয়নি। তবে একজন আধুনিক ভিক্টোরিয় সমালোচকের স্বীকার করতে সময় লাগবে না যে, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে উদার সংস্কৃতির নায়ক—যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল, আর্নল্ড, কার্লাইল, নিউম্যান, ম্যাকলে, রাস্কিন, জর্জ এলিয়ট এমনকি ডিকেন্সের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের লেখায় যে তা সক্রিয় ছিল সেটি সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। সুতরাং, এমনকি একজন বিশেষজ্ঞকেও এই জ্ঞান নিয়ে কাজ করতে হবে যে, মিল, নমুনা স্বরূপ, *লিবার্টি অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তার মতামত ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঠিক হবে না (তার জীবনের বড় অংশ কেটেছে ভারতে পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে)। কারণ, ভারতীয়রা সভ্যতার দিক থেকে, বর্ণের দিক থেকে নয় যদিও, নিম্নমানের। একই রকম স্ববিরোধিতা মার্কসেও লক্ষণীয় যা আমি বর্তমান গ্রন্থে দেখিয়েছি। দ্বিতীয়ত, রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদরূপে সাহিত্য, পাণ্ডিত্য, সমাজবিদ্যাসংক্রান্ত তত্ত্ব ও ইতিহাস রচনায় প্রভাব ফেলে—এমন বিশ্বাস করার অর্থ এই বলা নয় যে, সংস্কৃতি একটি নিম্নমানের কলঙ্কিত বিষয়। বরং উল্টো আমার বক্তব্য হল, যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, লেখক-চিন্তাবিদদের ওপর সংস্কৃতির মতো রঞ্জক ও আধিপত্যবাদী প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ চাপ সৃজনোদ্দীপক—কেবল বাধাদায়ক নয়, তাহলে আমরা এগুলোর টিকে থাকার শক্তি এবং দীর্ঘায়ুর বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। এই ধারণাটিই গ্রামসিসহ ফুকো ও রেমন্ড উইলিয়ামসও নিজ নিজ স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এমনকি বহুখণ্ডের বয়ানী বিশ্লেষণের চেয়ে *দি লঙ রেভ্যুলেশন*-এর 'দি ইউজেস অব দি এম্পায়ার'-এ উইলিয়ামসের দু'এক পৃষ্ঠার আলোচনা আমাদেরকে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে অনেক বেশি অবহিত করে।[১০]

আমি তাই প্রাচ্যতত্ত্বকে পাঠ করি ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান—এ তিন বিশাল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ব্যক্তি লেখকের বেগবান আদান-প্রদান হিসেবে। এসব সাম্রাজ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও কাল্পনিক সীমানার ভেতরেই

উৎপাদিত হয়েছে ঐসব রচনাবলি। একজন পণ্ডিত হিসেবে আমি স্থূল রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে নয়, অনুপুঙ্খেই সবচেয়ে আগ্রহ বোধ করি। ঠিক যেমন, লেইন বা ফ্লবার্ত বা রেনানে আমাদের আগ্রহের বিষয় এই নয় যে, পশ্চিমারা যে প্রাচ্যবাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর তা (তাদের মতে) তর্কহীন সত্য, বরং এ সত্যের দ্বারা উন্মুক্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে তাদের অনুপুঙ্খ কাজের মধ্যে যথাযথ স্বাতন্ত্র্যে গড়েপিটে উপস্থাপিত প্রমাণাদিই আগ্রহের মূল বিষয়। এখানে আমি কী বলছি তা বোঝার জন্যে লেইনের *ম্যানার্স অ্যান্ড কাস্টমস অব দি মডার্ন ঈজিপশিয়ান*-এর কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট। রচনাশৈলী, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মেধাদৃপ্ত অনুপুঙ্খ উপস্থাপনের জন্যেই এটি ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ে ধ্রুপদ কাজ, এতে প্রতিফলিত বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়।

অতএব, প্রাচ্যতত্ত্ব যে সব রাজনৈতিক প্রশ্ন অনিবার্য করে সেগুলো এরকম : আর কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক, নন্দনতাত্ত্বিক, পণ্ডিতি ও সাংস্কৃতিক শক্তি প্রাচ্যতত্ত্বের মতো সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্য-ধারা সৃষ্টিতে ব্যয়িত হয়েছে? পৃথিবীর প্রতি প্রাচ্যতত্ত্বের মোটাদাগের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গঠনে ভাষাবিজ্ঞান, শব্দার্থবিদ্যা, ইতিহাস, জীববিদ্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব, উপন্যাস, গীতিকবিতা প্রভৃতি কিভাবে কাজে লেগেছে? প্রাচ্যতত্ত্বের অভ্যন্তরেই বা কী ধরনের পরিবর্তন, স্বরান্তর, পরিশোধন এমনকি বিপ্লব ঘটে গেছে? এ পটভূমিতে মৌলিকতা, অবিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রভৃতির অর্থ কী? কিভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব এক যুগ থেকে আরেক যুগে হস্তান্তরিত বা জন্মান্তরিত হয়েছে? কী উপায়ে আমরা, নিঃশর্ত যুক্তিতর্কের ফলস্বরূপ নয়—স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মানবকর্ম হিসেবে, প্রাচ্যতত্ত্বের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনামালাকে তাদের ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে পারি—এমনভাবে যেন এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কাজ, রাজনৈতিক প্রবণতা, রাষ্ট্র ও আধিপত্যের নির্দিষ্ট কিছু বাস্তব দিক নিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যটি চোখ এড়িয়ে না যায়? এসব দিক নিয়ে পরিচালিত মানবতাবাদী বিশ্লেষণ রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়েও দায়িত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, এ ধরনের আলোচনা জ্ঞান ও রাজনীতির সম্পর্কে কিছু বাঁধাধরা নিয়ম প্রতিষ্ঠা করবে। আমার কথা হল, এ রকম মানবতাবাদী অনুসন্ধানকে এ বিশ্লেষণের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত, বিষয় ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির পটভূমিতে ঐ সম্পর্কের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে।

২. পদ্ধতিগত প্রশ্ন : মানববিদ্যায় কাজ করার প্রথম ধাপ অনুসন্ধান ও নির্মাণ। যাত্রা শুরুর একটা বিন্দু—একটি প্রারম্ভনীতি প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছি পূর্বের একটি গ্রন্থে[১১] যা শিখেছি এবং উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি তা হল, প্রারম্ভবিন্দু বলে কিছু দেয়া থাকে না, সোজা কথায় পাওয়া যায় না; এবং প্রত্যেক প্রকল্পের শুরুটা হওয়া উচিত এমন যেন তা অনুবর্তী আলোচনা সম্ভাবিত করে তোলে। প্রাচ্যতত্ত্বের বর্তমান গবেষণায় এ শিক্ষার কঠিন দিকটি যতটা সচেতনভাবে অতিক্রম করেছি (সত্যিই বলা সম্ভব নয়, ব্যর্থতা না কি সাফল্যের সাথে) তা আমার অভিজ্ঞতায় আর কখনো ঘটেনি।

'প্রারম্ভ'-এর ধারণা, প্রকৃতপক্ষে 'শুরু' করার কাজটি অনিবার্য করে তোলে সীমা-নির্দেশনা—যার মাধ্যমে, বড় কিছু থেকে ছোট একটি অংশ কেটে আকার দেয়া, ছোট

অংশটিকে বড় অংশটি থেকে আলাদা করে 'শুরু'র জন্যে ও 'শুরু'র ধাপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। টেক্সট-এর ছাত্রদের জন্যে উদ্বোধক সীমা-নির্দেশনের এমন একটি ধারণা হল লুইস আলথুসারের *প্রবলেম্যাটিক*—কোনো রচনা বা রচনাগুচ্ছের নির্দিষ্ট ও সীমাচিহ্নিত ঐক্য যা গড়ে উঠেছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে।[১২] এ সত্ত্বেও প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় (যা লুইস আলথুসারের বিষয় অর্থাৎ মার্কস-এর টেক্সটেরও বিরোধিতা করে) সমস্যাটি কেবল যাত্রাস্থল খুঁজে বের করা বা *প্রবলেম্যাটিক*-ই নয়, এখানে কোন কোন রচনা, গ্রন্থকার ও সময়পর্ব আলোচনায় সবচেয়ে সাযুজ্যপূর্ণ তা স্থির করার প্রশ্নটিও যুক্ত।

প্রাচ্যতত্ত্বের এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় কাহিনীমূলক ইতিহাস রচনা আমার নিকট বোকামি বলে মনে হয়েছে। তার প্রথম কারণ, আমার নির্দেশক-নীতি যদি হয় "প্রাচ্যকে নিয়ে ইউরোপীয় ভাব-কল্পনা" তাহলে, কোন কোন রচনা আলোচনা করতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা থাকে না। দ্বিতীয়ত, কেতাবী পদ্ধতিটি আমার বর্ণনামূলক ও রাজনৈতিক আগ্রহের সাথে খাপ খায় না। তৃতীয়ত, রেমন্ড স্কোয়ারের *লা রেনেসাঁ অরিঅঁতাল*, জোহান ফাকের *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20 Jahrhunderts* এবং অতি-সাম্প্রতিক ডরোথি মেটলিৎজ্‌কির *দি ম্যাটার অ্যারাবি ইন মিডিয়াভ্‌ল ইংল্যান্ড*[১৩]-এর মতো রচনায় ইউরোপ-প্রাচ্য সম্পর্কের কিছু দিক নিয়ে জ্ঞানকোষ টাইপের কাজ করা হয়েছে যা ওপরে বর্ণিত সামগ্রিক রাজনৈতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিতে সমালোচকদের কাজ ভিন্ন করে তোলে।

তবু বিশাল গ্রন্থরাজি কেটেছেঁটে নিয়ন্ত্রণযোগ্য আকারে আনার এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, ঐ গ্রন্থরাজির মধ্য থেকেই বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলায় কিছু একটি সাজিয়ে নেয়ার সমস্যা থেকেই যায়; আবার একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে এ রচনাগুচ্ছের সময়ানুক্রমিক অমনোযোগী বিন্যাসটি যেন অনুসৃত না হয়। অতএব, আমার প্রারম্ভ বিন্দু হল প্রাচ্য সম্পর্কে একীভূত ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফরাসি অভিজ্ঞতা; আবার বিষয়টির সেই ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি যা ওই অভিজ্ঞতা সম্ভব করে তুলেছে এবং অভিজ্ঞতার মান ও চারিত্র্য। কেটেছেঁটে কমিয়ে আনা একগুচ্ছ প্রশ্ন (যদিও এখনো সংখ্যায় বহু) আমি আলোচনা করব, কয়েকটি কারণে। প্রশ্নগুলো ইসলাম ও আরব বিষয়ে ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকানদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, যা হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এ কাজটি করার সাথে সাথে প্রাচ্যের বিশাল এক অংশ—ভারত, জাপান, চীন, দূরপ্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চল—বাদ পড়ে যায় বলে মনে হয়। তার কারণ এই নয় যে, ঐসব অঞ্চল গুরুত্বহীন (ওগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ), বরং এ জন্যে যে দূরপ্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করেই নিকটপ্রাচ্য বা ইসলাম-সম্পর্কিত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করা সম্ভব। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যে সামগ্রিক ইউরোপীয় স্বার্থের ইতিহাস বিশেষ করে প্রাচ্যের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল যেমন মিশর, সিরিয়া ও আরবে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোচনা কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি প্রাচ্যের দূরবর্তী অংশে—এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারস্য ও ভারতে—ইউরোপের সংশ্লিষ্টতা আলোচনা করা না হয়।

লক্ষণীয় একটি ব্যাপার হল, মিশর ও ভারতের যোগাযোগ—বিশেষত আঠারো-উনিশ শতকের ব্রিটেন যতটা সংশ্লিষ্ট ছিল। একইভাবে জেন্দ-আবেস্তার অর্থ উদ্ধারে ফরাসি ভূমিকা, উনিশ শতকের প্রথম দশকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্যারিসের শ্রেষ্ঠত্ব, এবং

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বাস্তবতায় উদ্দীপ্ত নেপোলিয়নের প্রাচ্য-বিষয়ক আগ্রহ—দূরপ্রাচ্যে এসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিকটপ্রাচ্যে ইসলাম ও আরবদের মাঝে ফরাসি স্বার্থকে সরাসরি প্রভাবিত করেছে।

সতেরো শতকের শেষ থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় আধিপত্য করেছে। ঐ পদ্ধতিভিত্তিক স্বার্থ ও আধিপত্য সম্পর্কে আমার আলোচনা এ কটি বিষয়ের প্রতি সুবিচার করেনি : (ক) প্রাচ্যতত্ত্বে জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া, স্পেন ও পর্তুগালের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং (খ) আঠারো শতকে প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত—বিশপ লাউথ, এইখ হর্ন, হার্ডার ও মেকিয়াভেলি প্রমুখ অগ্রগামীদের দ্বারা বাইবেল গবেষণায় সূচিত বিপ্লব।

প্রথমত, আমাকে ব্রিটিশ-ফরাসি ও এরপর আমেরিকান ব্যাপারগুলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হয়েছে। কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স কেবল প্রাচ্য ও প্রাচ্যবিদ্যায় পথিকৃৎ জাতিই নয়, এই পথিকৃৎ অবস্থান তারা ধরেও রেখেছিল প্রাক-বিশ শতকের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ দুই সাম্রাজ্যবাদী নেটওয়ার্কের গুণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাচ্য বিষয়ে আমেরিকার অবস্থান হয়—আমি মনে করি, অত্যন্ত সচেতনভাবেই—পূর্বের দুই ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা খনন করা স্থানে। তাই আমি এও বিশ্বাস করি নিরেট উৎকর্ষ, পারম্পর্য ও সংখ্যাগত বিশালতা ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান রচনারাজিকে জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া ও অন্যত্র কৃত নিশ্চিত গুরুত্বপূর্ণ কাজেরও ঊর্ধ্বে তুলে এনেছে। একথাও সত্য যে প্রাচ্যবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রধানতম পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হয়েছে হয় ব্রিটেন অথবা ফ্রান্সে; অতঃপর তা বিস্তৃত করেছে জার্মানরা। যেমন, সিলভেস্ত্রা ডি সেসি কেবল প্রথম আধুনিক ইউরোপীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকই নন যিনি ইসলাম, আরবি সাহিত্য, দ্রুজ ধর্মমত ও সাসানিদ পারস্য নিয়ে কাজ করেছেন, তিনি তুলনামূলক জার্মান ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা শ্যাঁপোলিয়ঁ ও ফ্রাঞ্জ বপের শিক্ষকও। একই রকম অগ্রবর্তিতা ও উত্তরাকালীন খ্যাতি দাবি করা যায় উইলিয়াম জোনস ও উইলিয়াম লেইনের জন্যেও।

দ্বিতীয়ত, এবং এখানেই আমার প্রাচ্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় ব্যর্থতার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, এসব কারণে যে, আমার ভাষায় 'আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব' বিকাশের পটভূমি হিসেবে বাইবেল অধ্যয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে প্রাসঙ্গিক হল, ই. এস. শ্যাফার্সের-এর প্রভাবসম্পাতী *কুবলা খান ও দি ফল অব জেরুজালেম*।[৪] এটি রোমান্টিসিজমের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা অনিবার্য অধ্যয়ন, — কোলরিজ, ব্রাউনিঙ ও জর্জ এলিয়টে যা হয়েছে তার ভিত্তিমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ। জার্মান পণ্ডিতদের বাইবেল অধ্যয়ন-বিষয়ক রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত বেছে সমন্বিতকরণ এবং তা ব্যবহার করে বুদ্ধিদৃপ্ত ও মনোগ্রাহীরূপে ওই তিন ব্রিটিশ লেখককে পাঠ করার মধ্য দিয়ে শ্যাফার্সের কাজ স্কোয়াব কর্তৃক চিহ্নিত বহির্কাঠামোরেখাকে আরো পরিশুদ্ধ করেছে। তবু গ্রন্থটিতে যে জিনিসটির অভাব রয়েছে তা হল, রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক তীক্ষ্ণতা, যা আছে ব্রিটিশ-ফরাসি লেখকদের রচনায় যারা আমার মুখ্য আগ্রহ। তা ছাড়া, শ্যাফার্স করেননি, কিন্তু আমি বিদ্যায়তনিক ও সাহিত্যিক প্রাচ্যতত্ত্বে পরবর্তীকালের বিস্তারগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি। এগুলোয় একদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্বের সংযোগ, অন্যদিক উপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন

সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের ছাপ আছে। আমি এও দেখাতে চাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ সকল পূর্ব-সংঘটিত ব্যাপারগুলোই কিভাবে কম-বেশি পুনরুৎপাদিত হয়েছে আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বে।

এতদসত্ত্বেও আমার লেখায় বিভ্রম-সম্ভাবক একটি দিক রয়ে গেছে। আমি সেসি-প্রভাবিত উদ্বোধন-পর্বের পরবর্তীকালের কাজ নিয়ে, কদাচিত উল্লেখ ছাড়া, বিস্তারিত আলোচনা করিনি। বিদ্যায়তনিক প্রাচ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নিয়ে সূচিত কোনো রচনায় যদি স্টেইনথাল, মুলার, বেকার, গোলজ্জিয়ের, ব্রোকেলমান নোলডিকের মতো (কয়েকজন মাত্র উল্লেখিত) পণ্ডিতদের প্রতি সামান্যমাত্র মনোযোগ দেয়া হয় তাহলে তা সমালোচিত হওয়া উচিত; এবং আমি মুক্ত চিত্তে নিজের সমালোচনা করি। বিশেষত, আমার দুঃখ উনিশ শতকের মাঝামাঝি কালপর্বে জার্মানদের অর্জিত বিরাট বৈজ্ঞানিক মর্যাদা আরো ভালোভাবে বিবেচনায় আনিনি; এ ধরনের উপেক্ষাকেই জর্জ এলিয়ট সঙ্কীর্ণমনা ব্রিটিশ পণ্ডিতদের দ্বারা জার্মান পণ্ডিতদের নিন্দা বলে অভিহিত করেছিলেন। আমার মাথায় আছে *মিডলমার্চ*-এ জর্জ এলিয়টের বর্ণনায় ক্যাসোবনের অবিস্মরণীয় চিত্রটি। তার চাচাত ছোটভাই ল্যাডিস্লোর মতে ক্যাসোবন যে সকল পুরাণ-কাহিনীর সমাধান শেষ করতে পারেননি তার একটা কারণ তিনি জার্মান পাণ্ডিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন না। কেবল এ কারণে নয় যে, তিনি এমন বিষয়ই বেছে নিয়েছেন যা 'রসায়নের মতো পরিবর্তনশীল যেখানে নিয়ত নতুন আবিষ্কার জন্ম দিচ্ছে নতুন দৃষ্টিকোণ'। তিনি এমন এক দায়িত্ব নেন যা প্যারাসেলসাসকে ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসের সমতুল্য, এই অজুহাতে যে, "জানেন, তিনি প্রাচ্যতাত্ত্বিক নন!"[১৫]

জর্জ এলিয়ট এমন ধরে নিয়ে ভুল করেননি যে, ১৮৩০ সালের মধ্যে অর্থাৎ *মিডলমার্চ* চলমান যখন তখন জার্মান পাণ্ডিত্য পুরোপুরি ইউরোপীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। তবু উনিশ শতকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে কখনো প্রাচ্যে বলবৎ দীর্ঘকালীন জাতীয় স্বার্থ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বিকশিত হয়নি। ভারত, লেভান্ত, উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশ-ফ্রেঞ্চ উপস্থিতির তুলনায় বিশেষ কোনো অবস্থান ছিল না জার্মানির। তাছাড়া জার্মানির 'প্রাচ্য বিশেষভাবে পণ্ডিতি প্রাচ্য, অথবা অন্তত ধ্রুপদ প্রাচ্য': এ প্রাচ্য গীতিকবিতা, কল্পকাহিনী, এমনকি উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা প্রকৃত প্রাচ্য নয়—যে ভাবে শ্যাতোব্রাঁ, লেইন, ল্যামারটিন, বার্টন, ডিজরাইলি, নেরভালের কাছে সিরিয়া ও মিশর ছিল যথার্থ আসল।

প্রাচ্য বিষয়ে জার্মানির সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো কাজ—গ্যোয়েটের *Wostostlicher Diwan* ও ফ্রেডরিখ শ্লেগেলের *Uber die Sprache and Weisheit der indier* রচিত হয়েছিল যথাক্রমে রাইন নদীতে একটা ভ্রমণ এবং প্যারিস গ্রন্থাগারে কয়েক ঘণ্টা যাপনের ওপর ভিত্তি করে: এ ব্যাপারটি গুরুত্ববহ। জার্মান পাণ্ডিত্য প্রাচ্যতত্ত্বের কৌশলগুলো সূক্ষ্ম ও বিকশিত করেছে, আর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত রচনা, পুরাণ ও ভাষার ওপর এসব কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে।

ব্রিটিশ-ফরাসি ও পরবর্তীকালের আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে জার্মান প্রাচ্যতত্ত্বের সাদৃশ্য হল, পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের ওপর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্বের অনেকটাই প্রাচ্যতত্ত্ব-সম্পর্কিত যে কোনো বর্ণনার বিষয় হবে; বর্তমান রচনাতেও তাই হয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্ব নামটিই গম্ভীর, হয়তো ভাবনাসাধ্য পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত করে। যখন আমি আধুনিক আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহার করি (যেহেতু, তারা নিজেদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলেন না, তাই আমার ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ), তা করি মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে, যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যবিদরা এখনো উনিশ শতকের প্রাচ্যতত্ত্ব-বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের ছিটেফোঁটা অবশেষের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিশেষজ্ঞতা সম্পর্কে রহস্যময় বা প্রকৃতি-প্রদত্ত কিছু নেই। এটা গঠিত, আলোকোদ্ভাসিত, প্রচারিত : এটা উপায়-স্বরূপ, প্ররোচক। এর নির্দিষ্ট মর্যাদা আছে; এটা রুচি ও মূল্যবোধ-বিষয়ক নীতিমালাও রচনা করে। তা যে সব নির্দিষ্ট মতাদর্শকে সত্য বলে তুলে ধরে এবং যে ঐতিহ্য, উপলব্ধি ও বিচার-বিবেচনা সংগঠিত, সংক্রমিত ও পুনরুৎপাদন করে তা থেকে একে আলাদাভাবে সনাক্ত করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা কর্তৃত্ব বিশ্লেষণযোগ্য এবং একে অবশ্যই বিশ্লেষণ করতে হবে। কর্তৃত্বের ঐসব আরোপিত ধর্ম প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি বর্তমান অধ্যয়নে যা করেছি তার অনেকটাই হল প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক কর্তৃত্ব এবং এর ব্যক্তিক কর্তৃত্ব বর্ণনা।

আমি কর্তৃত্ব বিশ্লেষণে যেসব প্রধান প্রধান কৌশল ব্যবহার করেছি ওগুলোকে এভাবে বলা যায় : কৌশলগত অবস্থান —লেখক প্রাচ্যের যে বিষয় নিয়ে লিখছেন তার প্রেক্ষিতে রচনায় তার অবস্থান বর্ণনার উপায়, কৌশলগত গঠন—যে প্রক্রিয়ায় একগুচ্ছ রচনা, রচনার কোনো একটা ধরন বা গোটা একটি শ্রেণী ঐক্য ও পারস্পরিক নিবিড়তা পায় এবং নিজেদের মধ্যে ও সেইসূত্রে সমগ্র সংস্কৃতিতে পারস্পরিক উল্লিখন-ক্ষমতা লাভ করে সেই প্রক্রিয়ার সাথে রচনাগুচ্ছের সম্পর্ক বিশ্লেষণের উপায় হল কৌশলগত গঠন। আমি কৌশল-এর ধারণা ব্যবহার করেছি শুধু সেই সমস্যাটি চিহ্নিত করার জন্যে, প্রাচ্য বিষয়ক প্রতিটি লেখকই যা বোধ করেন : তা হল 'প্রাচ্য'কে কিভাবে বাগে আনতে হবে, কোন উপায়ে এতে ঢুকতে হবে এবং কিভাবে এর মহত্ত্ব, এর বিস্তার ও বিরাট আওতার নিকট পরাজয় বা মোহগ্রস্ততা ঠেকাতে হবে। যিনিই প্রাচ্য সম্পর্কে লেখেন তাকেই প্রাচ্যের মুখোমুখি অবস্থান নিতে হয়। তার এই অবস্থান অনূদিত হয় তার রচনায় যার মধ্যে আছে গৃহীত বয়ান-স্বর, তার নির্মিত কাঠামো, চিত্রকল্প, বিষয়বস্তু, রচনায় ছড়ানো উপাদানসমূহ; এ সমস্ত কিছুই যুক্ত হয় সুচিন্তিতভাবে পাঠকের নিকট পৌঁছার, প্রাচ্যকে ধারণ করার এবং প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করা বা তার পক্ষে কথা বলার প্রয়াসে। এর কিছুই বিমূর্তভাবে ঘটে না। প্রাচ্য বিষয়ক প্রত্যেক লেখকই (এমনকি হোমারও) প্রাচ্য-সম্পর্কিত কিছু পূর্ব-ঘটনা, কিছু পূর্ব-জ্ঞান ধরে নেন, তিনি সে সবের ওপর নির্ভর করেন, সেগুলোর উদাহরণ টানেন। তাছাড়া প্রাচ্য-বিষয়ক প্রতিটি রচনাই অন্যান্য সমধর্মী রচনা, পাঠকগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং প্রাচ্যের সাথেও নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্রাচ্য-বিষয়ক বিভিন্ন রচনা, পাঠকগোষ্ঠী এবং প্রাচ্যের কয়েকটি দিকের পারস্পরিক সম্পর্কের যূথবদ্ধতা আভাসিত করে বিশ্লেষণযোগ্য একটি কাঠামো; যেমন, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা, প্রাচ্য-বিষয়ক সাহিত্যে-নির্যাসের সংকলনসমূহ, ভ্রমণকাহিনী, প্রাচ্য কল্পকাহিনী ইত্যাদি; কালপর্ব, চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন স্কুল, লাইব্রেরি, পররাষ্ট্র দপ্তরে) এগুলোর অবস্থান প্রাচ্যতত্ত্বকে দেয় সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব।

আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রাচ্য-বিষয়ক রচনায় যা লুক্কায়িত বা সুপ্ত তার বিশ্লেষণ আমার কর্তৃত্ব-বিষয়ক আগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং রচনার উপরিতলের বিশ্লেষণ—যেখানে

বর্ণনা সেই বহিরঙ্গেই আমার আগ্রহ। এ ধারণাটি আরো বেশি বিস্তৃত করা যেতে পারে বলেও আমি মনে করি না। প্রাচ্যতত্ত্ব বিকাশর উপক্রমণিকা হয়েছে বহিরঙ্গের ওপর; অর্থাৎ এই বাস্তবের ওপর ভিত্তি করে যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক, কবি বা পণ্ডিত প্রাচ্যকে কথা বলিয়েছে, প্রাচ্যকে বর্ণনা করেছে, তার রহস্য সরলভাবে পশ্চিমের জন্যে এবং পশ্চিমের নিকট তুলে ধরেছে।

লেখক প্রাচ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন না—কেবল এটুকু ব্যতীত যে, তার কথা বলার প্রথম কারণ প্রাচ্য। তিনি যা বলেন ও লেখেন, তা কথিত ও লিখিত হওয়ার ঘটনা-গুণে ইঙ্গিত করে যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক (দৈহিক) অস্তিত্বের দিক থেকে এবং নৈতিকতার প্রশ্নেও প্রাচ্যের বাইরে আছেন। এই বহিরঙ্গের উৎপাদন হল *প্রতিনিধিত্ব*। সেই দূর অতীতে এস্কিলাসের নাটক *দি পার্সিয়ান*-এর সময়ই প্রাচ্য বহুদূরবর্তী ও প্রায়শঃ হুমকিজনক 'অন্যতা' (আদারনেস) থেকে রূপান্তরিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরিচিত অবয়বে (এস্কিলাসে শোকরত এশীয় নারীতে)। *দি পার্সিয়ানে প্রতিনিধিত্বের* নাটকীয় বর্তমানতা এ বাস্তবতা আড়াল করে রাখে যে, দর্শক খুবই কৃত্রিম একটি অভিনয় দেখছেন যাকে প্রাচ্যের বাইরের কোনো এক ব্যক্তি সমস্ত প্রাচ্যের প্রতীকরূপে হাজির করেছেন। তাই প্রাচ্য-বিষয়ক রচনার যে বিশ্লেষণ আমি উপস্থিত করি তা প্রাচ্যের স্বাভাবিক প্রতিরূপের প্রতিনিধিত্বের ওপর নয়, বরং *প্রতিনিধিত্বরূপী* প্রতিনিধিত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর গুরুত্ব দেয়, যা কোনোভাবেই অদৃশ্য নয়।

এ রকম দৃষ্টান্ত মিলে তথাকথিত 'সত্যাশ্রয়ী' রচনায় (ইতিহাস, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক গবেষণাকর্মে), তেমনি প্রকৃত সৃষ্টিশীল (সোজা কথায় কাল্পনিক) রচনায়। ওতে দেখা হয় রচনারীতি, বক্তব্যের গঠন, বিন্যাস, বর্ণনাকৌশল, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। প্রতিনিধিত্বের সঠিকতা, বা প্রকৃত বিষয়ের তুলনায় এর বাস্তবতা কতটুকু তার প্রতি নজর দেয়া হয় না। প্রতিনিধিত্বের বহিরঙ্গ সকল সময় এ ধরনের প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় : তা হল, "প্রাচ্য যদি নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারতো তাহলে তা সে করতো; যেহেতু প্রাচ্য তা পারে না, তাই *প্রতিনিধিত্ব* 'বেচারা' প্রাচ্যের জন্যে সেই দায়িত্ব পালন করে"। যেমন—"Eighteenth Brumaire of Louise Bonaparte"-এ মার্কস লিখেছেন, "Sie konnen sich nicht vertreten, sie mussen vertreten werden"।

বাইরের দিকটায় জোর দেয়ার একটা কারণ হল, আমার বিশ্বাস সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স ও কোনো সংস্কৃতিতে আদান-প্রদান সম্পর্কে একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার যে, এটি সচরাচর যা প্রচার করে তা সত্য নয়, *'প্রতিনিধিত্ব'* মাত্র। এখানে পুনর্বার দেখানোর প্রয়োজন নেই যে, ভাষা নিজে একটি সুসংগঠিত ও সংকেতাবদ্ধ পদ্ধতি যা অভিব্যক্তিকরণ, নির্দেশন, বক্তব্য ও তথ্য আদান-প্রদান, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির জন্যে অনেক কৌশল ব্যবহার করে। যে কোনো দৃষ্টান্তে—বিশেষত লিখিত ভাষায় 'প্রদত্ত উপস্থিতি' বলে কিছু নেই, আছে প্রতি-উপস্থিতি বা 'প্রতিনিধিত্ব'। অতএব, প্রাচ্য সম্পর্কিত লিখিত বক্তব্যের মূল্য, কাঙ্ক্ষিত ফলোৎপাদন ক্ষমতা, সামর্থ ও আপেক্ষিক সত্যতা প্রাচ্যের মুখাপেক্ষী নয়, এবং মূলগতভাবে প্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীলও হতে পারে না। বরং উল্টো লিখিত বক্তব্যই 'প্রাচ্য'-এর প্রকৃত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্থানচ্যুত হওয়ার গুণে এবং প্রকৃত প্রাচ্য এখানে

অপ্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে পাঠকের নিকট নিজেই এক ধরনের 'উপস্থিতি'। তাই প্রাচ্যতত্ত্বের সকল কিছু প্রাচ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ ও প্রাচ্য থেকে দূরবর্তী; অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্ব যতটা অর্থ বহন করে তা প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য-এর ওপরই বেশি নির্ভরশীল। এবং সে অর্থ আবার সরাসরি নির্ভর করে প্রতিনিধিত্বকরণে পশ্চিমের ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌশলের ওপর, যে কৌশলসমূহ প্রাচ্যকে দৃশ্যমান, পরিষ্কার এবং এতদসম্পর্কিত ডিসকোর্সে আসীন করে। এই প্রতিনিধিত্ব দূরবর্তী ও আকারহীন প্রাচ্যের উপর নির্ভর করে না; বরং নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য, প্রথা এবং তাদের কার্যকারিতার জন্যে পরস্পর-সম্মত উপলব্ধির সংকেতসমূহের ওপর।

আঠারো শতকের শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বে প্রাচ্য-এর 'প্রতিনিধিত্ব' এবং পরবর্তীকালের (অর্থাৎ আমি যাকে বলছি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ব, তার) 'প্রতিনিধিত্ব'-এর পার্থক্য হল দ্বিতীয়োক্ত কালপর্বে তা অত্যন্ত বিস্তৃত। এ কথা সত্য যে উইলিয়াম জোনস ও অ্যাঁকুইতিল দুপেরন এবং নেপোলিয়নের মিশর অভিযানের পর ইউরোপ প্রাচ্যকে পূর্বের তুলনায় আরো বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে পারে, আরো বৃহত্তর কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলার সাথে ওখানে বসবাসের সুযোগ পায়। তবে ইউরোপের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল নতুন বিস্তৃত সুযোগ এবং প্রাচ্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ব্যাপক কৌশলগত পরিশোধন। শতাব্দির শেষে যখন প্রাচ্য নিশ্চিতভাবে তার 'ভাষার যুগ' উন্মোচিত করে এবং এভাবে বাতিল করে হিব্রুর স্বর্গীয় উত্তরাধিকার, তখন একদল ইউরোপীয়ই সে আবিষ্কার সম্পন্ন করে, অন্য পণ্ডিতদের নিকট তা হস্তান্তর করে এবং এ আবিষ্কার সংরক্ষণ করা হয় নতুন বিজ্ঞান 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে'। ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করার জন্যে জন্ম হয় নতুন এক শক্তিশালী বিজ্ঞানের, সেইসঙ্গে একরাশ সম্পর্কযুক্ত বৈজ্ঞানিক আগ্রহের, ফুকো যা তার *অর্ডার অব থিংস*-এ দেখিয়েছেন। তেমনি উইলিয়াম ব্যাকফোর্ড, বায়রন, গ্যোয়েটে ও হুগো তাদের শিল্প-সৃষ্টির দ্বারা প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করেন; তাদের সৃষ্ট কল্পমূর্তি, ছন্দ, উদ্দেশ্যের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলেন এর বর্ণ, বিভা ও জনগোষ্ঠীকে। 'বাস্তব' প্রাচ্য বড়জোর একজন লেখকের উদ্দেশ্য উস্কে দেয়; তাকে পরিচালিত করে কদাচিত।

প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমের সৃষ্ট ও সাধারণভাবে গৃহীত বস্তুভিত্তির চেয়ে তার সৃজক সংস্কৃতির প্রতিই অধিক সাড়া দেয়। অতএব, প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসের রয়েছে একদিকে, আন্তরসামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে, তাকে ঘিরে থাকা আধিপত্যকারী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে সুস্পষ্ট একরাশ সম্পর্ক। আমার বিশ্লেষণ দেখানোর চেষ্টা করেছে এ ক্ষেত্রটির আকৃতি ও আন্তরসংগঠন, এর অগ্রদূতগণ, রক্ষণশীল কর্তৃত্ব, নীতি-নির্ধারক গ্রন্থরাজি, মতাদর্শ, উপমান ব্যক্তিত্ব, এর অনুসারী দল, বিকাশসাধকবৃন্দ ও নতুন বিশেষজ্ঞ দলকে। সংস্কৃতিকে শাসন করে এমন সব শক্তিশালী মতবাদ থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব কিভাবে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং তা দ্বারা অবহিত হয়েছে তা দেখানোর প্রয়াসও আছে। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচ্য, ফ্রয়েডীয় প্রাচ্য, স্পেঙলারিয়ান প্রাচ্য, ডারউইনীয় প্রাচ্য, বর্ণবাদী প্রাচ্য ইত্যাদি নানা রকম প্রাচ্য ছিল (ও আছে)। এ সত্ত্বেও বিশুদ্ধ, নিঃশর্ত 'প্রাচ্য' জাতীয় কিছু কখনোই ছিল না; একইভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের অবৈষয়িক কোনো রূপ কখনো ছিল না, প্রাচ্যের 'ভাবমূর্তি' জাতীয় নির্দোষ কিছু তো দূরের কথা।

অন্তঃস্থ এই বিশ্বাস এবং তার ফলস্বরূপ পদ্ধতিগত ঘটনাক্রমের প্রশ্নে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি, সেসব পণ্ডিতদের থেকে যারা চিন্তার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রাচ্য-বিষয়ক ডিসকোর্সের বিবৃতির বিশেষ অর্থ আরোও প্রশাসনিক ঢঙ, সবচেয়ে বড় কথা বৈষয়িক কার্যকারিতা সম্ভবপর হয়ে ওঠে এমন সব উপায়ে যা মতাদর্শের যে কোনো রুদ্ধদ্বার ইতিহাস বর্জন করতে চাইবে। তবে বাড়তি জোর প্রদান এবং বৈষয়িক কার্যকারিতা ছাড়া প্রাচ্যতত্ত্ব হয়ে উঠবে আরেকটি মতাদর্শ মাত্র; অথচ তা মতাদর্শের চেয়ে বেশি কিছু ছিল এবং আছে। আমি তাই কেবল গবেষণাকর্ম নয়, সাহিত্যিক রচনা, রাজনৈতিক বর্ণনা, সাংবাদিক লেখাজোখা, ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থ, ধর্ম ও ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নও পরীক্ষা করেছি। অন্য কথায়, আমার *বহু-আঁশলা* পরিপ্রেক্ষিত সামগ্রিকভাবে 'ঐতিহাসিক' ও 'নৃতাত্ত্বিক', এই শর্তে যে আমি মনে করি, সকল রচনাই বৈষয়িক ও পরিস্থিতি-সম্পৃক্ত—এমন এক উপায়ে যা শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে যুগে ভিন্ন ভিন্ন।

যার কাছে আমার অনেক ঋণ সেই মিশেল ফুকো যদিও মনে করেন না, কিন্তু আমি মনে করি প্রাচ্যতত্ত্বের মতো কোনো ডিসকোর্সের স্রষ্টা একই ধরনের যে-একরাশ গ্রন্থের ওপর বিভিন্ন লেখকের রচনার গভীরতর একক প্রভাবও পড়ে। বিপুল পরিমাণ গ্রন্থের স্তূপ বিশ্লেষণের একটা কারণ হল এসব রচনা পরস্পরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে; প্রাচ্যতত্ত্ব তো বিভিন্ন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে উদ্ধৃত করার একটা পদ্ধতিও। নেরভাল, ফ্লবেয়ার ও রিচার্ড বার্টনের মতো বিচিত্র ব্যক্তিত্ব এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইনের *ম্যানারস অ্যান্ড কাস্টমস্ অব মডার্ন ঈজিপশিয়ানস* পড়েছেন এবং উদ্ধৃত করেছেন। যিনি কেবল মিশর নয়, প্রাচ্যের যে কোনো বিষয়ে লিখবেন বা চিন্তা করবেন তিনিই লেইনকে ব্যবহার করতে বাধ্য কারণ লেইন এক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিবেচিত। নেরভাল যে *মডার্ন ঈজিপশিয়ান* থেকে হুবহু একটা প্যারা উদ্ধৃত করেন তা মিশরকে বর্ণনার জন্যে নয়, বরং সিরিয়ার একটা গ্রামের দৃশ্য বর্ণনায় লেইনের সহায়তা গ্রহণের জন্যে। লেইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্যে তার বিশেষজ্ঞ অবস্থান ও সুযোগ প্রস্তুত ছিল। কারণ তিনি যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন প্রাচ্যতত্ত্ব সেই গ্রহণযোগ্যতাকে ছড়িয়ে পড়ার সনদ দিতে পারত। তার রচনার উদ্ভটত্ব না বুঝলে লেইনের গ্রহণযোগ্যতাও বোঝা যাবে না। একই কথা সত্যি রেনান, সেসি, ল্যামারটিন, শ্লেগেল এবং অন্যান্য প্রভাবশালী লেখকদের গোটা একটা দল সম্পর্কেও। ফুকো বিশ্বাস করেন সচরাচর একক রচনা বা একজন লেখক অতটা গুরুত্বপূর্ণ নন; বাস্তবে, প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে (এবং অন্য কোথাও নয়) তা হয়নি। যথারীতি আমার বিশ্লেষণে নিবিড় গ্রন্থ-পাঠ ব্যবহার করেছি, যার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি লেখক বা একক রচনা এবং সেই রচনা যে একীভূত গ্রন্থরাজির দলভুক্ত তার মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উদঘাটন করা।

এ গ্রন্থে যদিও প্রচুরসংখ্যক লেখক অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তবু এটি প্রাচ্যতত্ত্বের সামগ্রিক বর্ণনা বা সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এই ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। প্রাচ্যতত্ত্বের মতো নিবিড় একটি গঠন এখনো পশ্চিমা সমাজে টিকে আছে এবং ক্রিয়াশীল রয়েছে এর সমৃদ্ধির কারণে; আমি কেবল নির্দিষ্ট সময়পর্বে ঐ গঠনের কিছু অংশ বর্ণনা করেছি, এবং বড়জোর ইঙ্গিত করেছি অনুপুঙ্খ বৃহত্তর সমগ্রের প্রতি যাতে রয়েছে আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর

পরিসংখ্যান, গ্রন্থাদি ও ঘটনাবলির ছাপ। অবশ্য এই ভেবে সান্ত্বনা পাই যে বর্তমান রচনাটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্ভাব্য অনেক কিস্তির এক কিস্তি এবং আমার আশা, অনেক লেখকই আছেন যারা বাকি অংশ রচনা করবেন। সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক প্রবন্ধও এখনো লেখা হয়নি। অন্যান্য গবেষণা হয়তো প্রাচ্যতত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক কিংবা ইতালীয়, ডাচ, জার্মান ও সুইস প্রাচ্যতত্ত্বের বা পাণ্ডিত্যময় রচনা ও কাল্পনিক রচনার পারস্পরিক গতিবেগ অথবা প্রশাসনিক মতাদর্শ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মনীতির গভীরতর স্তরে প্রবেশ করত। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হত প্রাচ্যতত্ত্বের সমকালীন বিকল্পসমূহ বিশ্লেষণের সূচনা করলে, কিভাবে অন্যান্য সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে উদারতাবাদী বা দমন-বিমুখ ও অ-প্রভাবক পটভূমিতে অধ্যয়ন করা যায় সে প্রশ্ন উত্থাপন করলে। তবে সেক্ষেত্রে জ্ঞান ও ক্ষমতার জটিল সমস্যাটি সম্পর্কেও পুনরায় ভেবে দেখতে হবে। বর্তমান রচনায় এ সকল কাজ পীড়াদায়কভাবে অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

সবশেষে, হয়তো আত্ম-তোষামোদকর ভঙ্গিতে বলব, এখানে আমি পদ্ধতিগত যে লক্ষ্য রেখেছি তা হল, এ রচনাটি আমি লিখেছি মনে মনে বেশ কিছু পাঠককে সামনে রেখে। প্রাচ্যতত্ত্ব সাহিত্য ও সমালোচনার ছাত্রদের নিকট সমাজ, ইতিহাস ও রচনার আন্তঃসম্পর্কের চমৎকার উদাহরণ তুলে ধরে; অধিকন্তু পশ্চিমা সমাজে প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক ভূমিকা প্রাচ্যতত্ত্বকে ভাবাদর্শ, রাজনীতি ও ক্ষমতার যুক্তিবোধের সাথে সম্পর্কিত করে, যা সাহিত্যিক সমাজের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে।

প্রাচ্য-বিষয়ক সমকালীন শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গ থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারকদের জন্যে আমি দুটো প্রান্ত ভেবে নিয়ে লিখেছি : এক, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জন্ম ও বংশপরিচয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছি যা আগে কখনো করা হয়নি: দুই, তাদের লেখাজোখা যেসব অ-জিজ্ঞাসিত আন্দাজের ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর সমালোচনা করেছি—বেগবান আলোচনার সূত্রপাত হবে এই আশায়। সাধারণ পাঠকদের জন্যে বর্তমান গ্রন্থে এমন সব বিষয় আলোচিত হয়েছে যা সকল মনোযোগ টেনে নেয়। তার সবই 'অন্য' (আদার) সম্পর্কে পশ্চিমের উপলব্ধি ও মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত নয় কেবল, ভিকোর ভাষায়, 'জাতিসমূহের পৃথিবীতে' পশ্চিমা সংস্কৃতির একক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সাথেও যুক্ত। সবশেষে, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের পাঠকদের কাছে এ রচনা, পশ্চিমা রাজনীতি এবং সে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত অ-পশ্চিমা জগৎকে বোঝার জন্যে ততটা নয়, বরং এটা পশ্চিমা সংস্কৃতির শক্তি উপলব্ধির একটি ধাপরূপে বিবেচনার দাবিদার, যে শক্তিকে প্রায়শই বাইরের ব্যাপার বা সাজ-সজ্জার মতো বলে ভুল করা হয়।

আমার অভিপ্রায় সাংস্কৃতিক আধিপত্যের দুর্মর কাঠামোটি অঙ্কিত করা, এবং বিশেষ করে প্রাক্তন-উপনিবেশিত মানুষদের ক্ষেত্রে, ঐ কাঠামোটি নিজেদের এবং অন্যের ওপর আরোপের প্রলোভন আরোপের ফলে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়টি পরিষ্কার করা।

গ্রন্থটি বিভক্ত তিনটি দীর্ঘ অধ্যায় ও ১২টি উপ-অধ্যায়ে। ঐ প্রদর্শনের কাজটি যত বেশি সম্ভব ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্যে এগুলো করা হয়েছে। ঐতিহাসিক কালপর্ব ও অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক ও রাজনৈতিক বিষয় উভয়দিক বিচার করে প্রাচ্যতত্ত্বের সকল মাত্রা ঘিরে একটি বিশাল রেখা অঙ্কিত হয়েছে প্রথম অধ্যায় 'প্রাচ্যতত্ত্বের সীমানা'তে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক কাঠামো ও পুনর্গঠিত কাঠামো'তে আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের বিকাশ

চিহ্নিতকরণের প্রয়াস রয়েছে সময়ানুক্রমিক বর্ণনা এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি, শিল্পী, পণ্ডিতদের রচনায় ব্যবহৃত সাধারণ কৌশলসমূহ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। তৃতীয় অধ্যায় 'বর্তমান প্রাচ্যতত্ত্ব' শুরু হয়েছে যেখানে তার পূর্ব-পুরুষেরা শেষ করে গেছেন সেখান থেকে ১৮৭০ সালের কাছাকাছি। এটি প্রাচ্যে ব্যাপক উপনিবেশ বিস্তারের কালপর্ব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা চরমে পৌঁছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশ ব্রিটিশ ও ফরাসি আধিপত্যের পরিবর্তে মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারটি তুলে ধরেছে; সবশেষে, ওখানে আমি সমকালীন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যতত্ত্বের বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বাস্তবতাসমূহ অঙ্কনের চেষ্টা করেছি।

৩. ব্যক্তিক মাত্রা : প্রিজন নোটবুকে গ্রামসি বলেন, "বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনার শুরুটা হল নিজে প্রকৃতপক্ষে কী সে-সম্পর্কিত সচেতনতা এবং নিজেকে জানা—বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার উৎপাদনরূপে, যে প্রক্রিয়া আপনার মধ্যে অসীম চিহ্নরাশি সঞ্চিত করেছে অথচ তার কোনো তালিকা রাখেনি।" এরপর গ্রামসি যে মন্তব্য করেন তা একমাত্র প্রাপ্য ইংরেজি অনুবাদে কোনো অজ্ঞাত কারণে বর্জিত হয়েছে। অথচ গ্রামসি'র মূল ইতালীয় পাঠে এ কথাগুলো যোগ করে শেষ করা হয়েছে : "অতএব, শুরুতে ওই রকম একটা তালিকা প্রস্তুতকরণ নিতান্ত জরুরি।"[১৬]

এ রচনায় আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বেশিরভাগটাই এসেছে দুটো ব্রিটিশ উপনিবেশে বেড়ে-ওঠা শিশু হিসেবে 'প্রাচ্যদেশীয়' হয়ে-ওঠার সচেতনতা থেকে। ওই দুই উপনিবেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে আমার সকল পড়াশোনা পশ্চিমা ধাঁচের। এ সত্ত্বেও কমবয়সের ওই সুগভীর সচেতনতা অক্ষয় রয়ে গেছে। আমার এই অধ্যয়ন অনেক দিক থেকে প্রাচ্যবিষয়রূপী 'আমার' ওপর সেই সংস্কৃতির চিহ্নসমূহের তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস, যে সংস্কৃতির আধিপত্য সকল প্রাচ্যবাসীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আমার বেলায় মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ইসলামী প্রাচ্য।

গ্রামসি কর্তৃক নির্দেশিত তালিকাটি আমার অর্জন কি না সে বিচার আমার কাজ নয়, যদিও অনুভব করেছি ওই রকম একটি তালিকা প্রণয়নের প্রয়াস সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। সমগ্র রচনাতেই যতটা তীব্র ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব বিশ্লেষণমুখী চেতনা সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছি; তেমনি সৌভাগ্য যে আমার শিক্ষার সুফল হিসাবে ঐতিহাসিক, মানববিদ্যা-সম্পর্কিত ও সাংস্কৃতিক গবেষণার কৌশলগুলো ব্যবহার করেছি। প্রাচ্যজনরূপে আবার এতকিছুর মধ্যেও ভুলে যাইনি যে, পরিগণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমার ব্যক্তিগত ভূমিকাজনিত এক সাংস্কৃতিক বাস্তবতা রয়েছে।

যে জটিল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিসমূহ বর্তমান গবেষণা সম্ভব করে তুলেছে এখানে আমি সেগুলোর পরিকল্পিত তালিকা তুলে দিতে পারি কেবল। ১৯৫০ সাল থেকে যিনিই পশ্চিমে বিশেষত আমেরিকার বাসিন্দা তিনিই 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' সম্পর্কের এক বিশেষ যুগ অতিক্রম করেছেন। কারো নজর এড়ানোর কথা নয় যে, এ কালপর্বে প্রাচ্য বরাবরই বিপদ ও হুমকির নির্দেশক, যা প্রথাগত প্রাচ্যকে আবার রাশিয়াকেও বোঝায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অঞ্চল-অধ্যয়ন কর্মসূচী ও ইনস্টিটিউটগুলো প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিতি গবেষণাকে জাতীয় নীতির অঙ্গে পরিণত করে। প্রাচ্যের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং ঐতিহ্যক্রমিক অদ্ভুতত্ত্বের জন্যে এদেশে জনস্বার্থমূলক বিষয়াদির মধ্যে প্রাচ্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহও

অন্তর্ভুক্ত। ইলেকট্রনিক যুগের পশ্চিমা নাগরিকদের নিকট পৃথিবী যদি তাৎক্ষণিক প্রবেশযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে প্রাচ্যও তার অনেক কাছে এসে গেছে। এবং প্রাচ্য এখন তার নিকট যতটা না মিথ তার চেয়ে বেশি পশ্চিমের, বিশেষ করে আমেরিকান স্বার্থের ছক কাটা একটি এলাকা।

উত্তরাধুনিক ইলেকট্রনিক পৃথিবীর একটি প্রবণতা হল পূর্বের নমুনা নতুনভাবে আরোপ করা এবং তার আলোকে প্রাচ্যকে বিচার করা। টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সকল প্রচারমাধ্যমের শক্তি তথ্যরাশিকে জোরপূর্বক একটি ক্রমশ আদর্শায়িত ছাঁচে রূপান্তরিত করে। প্রাচ্যের ক্ষেত্রে ওই আদর্শায়ন ও সাংস্কৃতিক ছাঁচ-ঢালাইকরণ জোরদার করেছে উনিশ-শতকীয় বিদ্যায়তনিক ও কাল্পনিক পিশাচবিদ্যার রহস্যময় *প্রাচ্য*-এর ধারণাকেই। এটি সবচেয়ে বেশি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে নিকটপ্রাচ্যকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রক্রিয়ায় (অন্য কোথাও অতটা সত্য নয়)।

আরব ও ইসলামকে সবচেয়ে সহজভাবে উপলব্ধির কাজটিও খুবই রাজনৈতিকায়িত—প্রায় গোলযোগপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করার জন্যে দায়ী হল তিনটি জিনিস। এক, পশ্চিমে জনপ্রিয় আরব ও ইসলাম-বিরোধী বোধ যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাসে প্রতিফলিত; দুই, ইসরাইলি ইহুদি-রাষ্ট্রবাদ ও আরবদের সংঘাত, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিদের উপর তেমনি উদারপন্থী সংস্কৃতি ও পরিশেষে জনগোষ্ঠীর ওপর তার প্রভাব; তিন, আরব ও ইসলামের সাথে অভিন্ন বোধ করা বা ভাবাবেগমুক্ত আলোচনা সম্ভব করে তোলার মতো সাংস্কৃতিক অবস্থানের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এ ছাড়া, বলা বাহুল্য যে, 'স্বাধীনতা-প্রিয়' ও 'গণতান্ত্রিক ইসরাইল' এবং তার বিপরীতে 'অশুভ, স্বৈরতান্ত্রিক, সন্ত্রাসী' আরবের ধারণাজাত নির্বোধ বিরোধাত্মক দ্বৈততা এবং সুগভীর শক্তি-রাজনীতি ও তেল-অর্থনীতির সাথে মধ্যপ্রাচ্য এতই জড়িয়ে গেছে যে, কেউ নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে কথা বলার সময় আসলে কী বলছে তা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারার সম্ভাবনা হতাশাজনকভাবে ক্ষীণ।

এসব বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় অংশত উদ্বুদ্ধ করেছে। পশ্চিম বিশেষ করে আমেরিকাতে একজন আরব-ফিলিস্তিনির জীবনযাপন খুবই হতাশাগ্রস্ত। এদেশে এমন একটা সর্বসম্মত ধারণা আছে যে, এখানে তার (একজন ফিলিস্তিনি/আরবের) রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। যখন তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনেও নেয়া হয় তখন মনে করা হয় তার উপস্থিতি হয় বিরক্তিকর নতুবা 'প্রাচ্যদেশীয়'। আরব বা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রক বর্ণবাদী জাল, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, মানবতা-বিরোধী মতাদর্শ প্রকৃতপক্ষে খুবই শক্তিশালী। এই জালটিকেই প্রত্যেক ফিলিস্তিনি তার অদ্বিতীয় শাস্তিমূলক নিয়তি হিসেবে অনুভব করতে বাধ্য। এ বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করেছে; ফলত সে (ফিলিস্তিনি) এমন মন্তব্য করছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে নিকট-প্রাচ্যের সাথে বিদ্যায়তনিকভাবে জড়িত প্রাচ্যতাত্ত্বিকই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রাচ্যের সাথে একাত্মবোধ করেননি। অবশ্যই নির্দিষ্ট মাত্রার একাত্মতার বোধ সৃষ্টিও হয়েছে। তবে তা কখনো ইহুদি রাষ্ট্রবাদের সাথে উদার আমেরিকান একাত্মবোধের মতো গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। এবং প্রায়শ (আরবদের সাথে) ঐ একাত্মবোধ সহজাতভাবে হয় কলঙ্কময় রাজনৈতিক ও আর্থ-স্বার্থ (উদাহরণত তেল কোম্পানি, পররাষ্ট্র দপ্তরের অ্যারাবিস্ট) অথবা ধর্মীয় সম্পৃক্তি দোষে দুষ্ট।

তাই ক্ষমতা ও জ্ঞানের জোট যে 'প্রাচ্যজন' সৃষ্টি করছে এবং এক অর্থে তার মানবিক অস্তিত্ব মুছে ফেলছে তা আমার নিকট কেবল বিদ্যায়তনিক বিষয় নয়। এ সত্ত্বেও তা কিছু অনিবার্য গুরুত্ববহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়। খুবই বৈষয়িক ব্যাপার অর্থাৎ প্রাচ্যতত্ত্বের উত্থান, বিকাশ ও একীভবন বর্ণনায় আমি আমার মানবিক ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ব্যবহার করতে পারতাম। প্রায়ই সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক এমনকি ঐতিহাসিকভাবে নির্দোষ বলে ধরে নেয়া হয়। আমার নিকট তা সবসময়ই ভিন্ন কিছু বলে মনে হয়েছে।

প্রাচ্যতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণায় আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে (আশা করি আমার সাহিত্যিক সহকর্মীদেরও বিশ্বাস জন্মাবে) যে, সমাজ ও সাহিত্য কেবল একত্রেই উপলব্ধি ও অধ্যয়ন করা সম্ভব। তা ছাড়া, প্রায় দুর্লঙ্ঘনীয় যুক্তিতে বিচার করে দেখেছি, আসলে পশ্চিমের এন্টি-সেমিটিজমের এক অদ্ভুত, গোপন অংশীদারের ইতিহাস লিখছি আমি। ইসলামি শাখায় যেরূপ আলোচনা করেছি—এই এন্টি-সেমিটিজম ও প্রাচ্যতত্ত্ব ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সত্যরূপে পরস্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এর শ্লেষার্থ বোঝার জন্যে কোনো আরব ফিলিস্তিনির নিকট কেবল এর উল্লেখ করাই যথেষ্ট। তবে সাংস্কৃতিক আধিপত্য যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়ার চেষ্টাও আমি করেছি। তা যদি প্রাচ্যের সাথে একটি নতুন ধরনের আদান-প্রদানের সূচনা করে, প্রকৃতপক্ষে তা যদি প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য ধারণাটিই মুছে ফেলে তা হলে, রেমন্ড উইলিয়ামস্-এর ভাষায়, 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আধিপত্যপ্রবণ রীতি'[১৭] বি-শিক্ষণের প্রক্রিয়ায় কিছুটা এগুতে পারব আমরা।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

তথ্যসূত্র :

1. Thierry Desjardins, *Le Martyre du Liban* (Paris: Plon, 1976), p. 14.
2. K. M. Panikkar, *Asia and Western Dominance* (London: George Allen & Unwin, 1950).
3. Denys Hay, *Europe: The Emergence of an Idea*, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).
4. Steven Marcus, *The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England* (1966; reprint ed., New York: Bantam Books 1967), pp. 200-19.
5. দেখুন, আমার লেখা *Criticism Between Culture and System* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, প্রকাশিতব্য।
6. বিশেষত তার, *American Power and the New Mandarins: Historical and Political Essays* (New York: Pantheon Books, 1969) এবং *For Reasons of State* (New York: Pantheon Books, 1973).
7. Walter Benjamin, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*, trans. Harry Zohn (London: New Left Books, 1973), p. 71
8. Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," *Hermathena* 116 (Winter 1973): 81-96.
9. *Diacritics* 6, no 3 (Fall 1976) : 38-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার।
10. Raymond Williams, *The Long Revolution* (London: Chatto & Windus, 1961), pp. 66-7.
11. আমার লেখা *Beginnings: Intention and Method* (New York: basic Books, 1975).
12. Louis Althusser, *For Marx*, trans. Ben Brewster (New York: Pantheon Books, 1969), pp. 65-7.
13. Raymond Schwab, *La Renaissance orientale* (Paris: Payot, 1950); Johann W. Fuck, *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Angang des 20. Jahrhunderts* (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955); Dorothee Methzki, *The Matter of Araby in Medieval England*

(New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977).

14. E. S. Shaffer, *"Kubla Khan" and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770-1880* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
15. George Eliot, *Middlemarch: A Study of Provincial Life* (1872; reprint. ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 164.
16. Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections*, trans. and ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), p. 324. হোয়ের ও স্মিথের অনুবাদে বাদ যাওয়া পুরো অনুচ্ছেদটির জন্য: Gramsci, *Quaderni del Carcere*, ed. Valentino (Turin: Einaudi Editore, 1975), 2: 1363.
17. Raymond Williams, *Culture and Society, 1780-1950* (London : Chatto & Windus, 1958), p. 376.

প্রাচ্যকে জানা

জুন ১৩, ১৯১০: "মিশরে আমাদের যে সব সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে" তার উপর হাউস অব কমন্সের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন আর্থার জেমস বেলফোর। 'আইলস অব উইট বা ওয়েস্ট রাইডিং ইয়র্কশায়ার'-এ উত্যক্ত করছে যে সব সমস্যা সমাধ[illegible] তিনি বলেন "এগুলো তা থেকে ভিন্ন ধরনের।" বেলফোর কথা বলেন পাণ্ডিত্যের সাথে—পার্লামেন্টের দীর্ঘকালীন সদস্যপদ, লর্ড স্যালিসবারির প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব, আয়ারল্যান্ড বিষয়ে প্রাক্তন মুখ্য-সচিব, স্কটল্যান্ড বিষয়ে প্রাক্তন সচিব, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, অসংখ্য পররাষ্ট্র-বিষয়ক সমস্যা, পরিবর্তন ও কৃতিত্বের পাণ্ডিত্য নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী কর্মতৎপরতায় জড়িত থাকার সময় বেলফোর এমন এক রানীর পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন যিনি ১৮৭৬ সালে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষিত হন। আফগান ও জুলু যুদ্ধ, ১৮৮২ সালে ব্রিটিশদের মিশর দখল, সুদানে জেনারেল গর্ডনের মৃত্যু, ফ্যাসুদার ঘটনা, ওমডারমানের যুদ্ধ, বোয়ার যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধ অনুসরণের জন্যে তাকে বিশেষভাবে অসাধারণ প্রভাবশালী সব পদে বসানো হয়। বিশেষ সামাজিক খ্যাতি ছাড়াও, তার শিক্ষা ও বুদ্ধির ব্যাপ্তি—একাধারে বার্গসঁ, ম্যান্ডেল, থেয়িজিম এবং গলফ্-এর মতো বিচিত্র বিষয়ে লিখতে পারার ক্ষমতা—ইটনে, ট্রিনিটি কলেজ ও ক্যামব্রিজে পড়াশোনা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আপাতদৃষ্টিতে তার দখল—এ সমস্ত কিছুই তাকে ১৯১০ সালের কমন্সসভায় ওইসব কথা বলার বিশেষ অধিকার এনে দেয়। আরো কথা আছে বেলফোরের বক্তব্য সম্পর্কে, কিংবা একে এত প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিকভাবে উপস্থাপনের জন্যে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। কয়েকজন সদস্য 'মিশরে ইংল্যান্ডের' প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন (এটি আলফ্রেড মিলনার্সের ১৮৯২ সালের আগ্রহ সৃষ্টিকারী গ্রন্থের বিষয়)। তবে এর মধ্যে দিয়ে তারা আসলে বলেন যে, এক সময়ের মুনাফাজনক পেশা এখন সমস্যার উৎসে পরিণত হয়েছে এবং মিশরীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছে। মিশরে ইংল্যান্ডের অবস্থান অটুট রাখা এখন আর ততটা সহজ নয়। তাই বেলফোর অবহিত ও ব্যাখ্যা করবেন। টিনিসাইডের সদস্য জে. এম. রবার্টসনের চ্যালেঞ্জের কথা স্মরণ করে বেলফোর নিজেই আবার রবার্টসনের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন : "আপনি যাদেরকে 'প্রাচ্যজন' বলবেন বলে ঠিক করেছেন, তাদের তুলনায় এমন শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব গ্রহণের কী অধিকার আছে আপনার?" 'অরিয়েন্টাল' বা 'প্রাচ্যজন'/'প্রাচ্যদেশীয়' শব্দগুলো পছন্দ করার ব্যাপারটি প্রথাগত; চসার, ম্যান্ডেভিল, শেক্সপিয়র, ড্রাইডেন, পোপ, বায়রনও এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটি ভৌগোলিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এশিয়া বা প্রাচ্যকে বোঝায়।

প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিত্ব, প্রাচ্যদেশীয় গল্প, প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র, প্রাচ্যদেশীয় উৎপাদন পদ্ধতি—এসব কথা ইউরোপে ব্যবহার করা যায়, অন্যরা বুঝতেও পারে। মার্কস এ

শব্দটি ব্যবহার করেছেন; এখন বেলফোর ব্যবহার করছেন। তার পছন্দের ব্যাপারটি বোঝা যায় এবং তা কোনোও মন্তব্যও দাবি করে না।

> "আমি বড়ত্বের ভাব দেখাচ্ছি না। তবে আমি বলি (রবার্টসন ও অন্য যে কাউকে)... ইতিহাস সম্পর্কে খুবই ভাসাভাসা জ্ঞান যার, সেই সব ঘটনারাজির চেহারাটা একটু দেখবেন কি যেগুলো নিয়ে কাজ করতে হয় একজন ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ককে, যখন তাকে প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিগুলোর তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে দেয়া হয়? আমরা অন্য কোনোও দেশের চেয়ে মিশরের সভ্যতাকে ভালোভাবে জানি; আমরা তাকে অতীত পর্যন্ত জানি, খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানি, আমরা এর সম্পর্কে অনেক বেশি জানি। আমাদের জাতির ইতিহাসের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তি যে যুগে প্রাগৈতিহাসিক কালে গিয়ে হারিয়ে গেছে, তখনই মিশরের সভ্যতা তার যৌবন পার হয়ে এসেছে। শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার কথা বলবেন না।"

বেলফোরের উপরোক্ত বক্তব্য এবং পরে যে বক্তব্য আসে তাকে প্রভাবিত করে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : জ্ঞান ও ক্ষমতা—বেকনের মূলভাব। বেলফোর যখন ব্রিটেন কর্তৃক মিশর-দখলের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন তখন তার মনে 'শ্রেষ্ঠত্ব'র ধারণা মিশরে 'আমাদের' জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ছিল, সামরিক বা অর্থনৈতিক ভাবে নয়। বেলফোরের নিকট জ্ঞানের অর্থ হল কোনো জাতিকে তার উৎপত্তি থেকে শুরু করে পরম বিকাশ ও পতন পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা—এবং, অবশ্যই, তা করতে সক্ষম হওয়াও বোঝায়। জ্ঞান হল অব্যবহিত ও অহং-এর উর্ধ্বে উঠে দূর ও অজানায় প্রবেশ। সহজাতভাবেই, এ ধরনের জ্ঞানের উদ্দেশ্য পরীক্ষার ঝুঁকির মুখে থাকে। ঐ উদ্দেশ্য হল সত্য : সভ্যতার প্রকৃতি অনুযায়ী যদি তা বিকশিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ও, তবু-যাই ঘটুক না কেন—তা মৌলিকভাবে এবং জ্ঞানগত দিক থেকে স্থিতিশীল। এরকম একটি বিষয়ে ঐ ধরনের জ্ঞান হল এর ওপর আধিপত্যকরণ এবং কর্তৃত্ব অর্জন। এখানে 'আমাদের' জন্যে কর্তৃত্বের অর্থ হচ্ছে প্রাচ্যের দেশটির স্ব-শাসনের অধিকার অস্বীকার করা; যেহেতু আমরা একে জানি, এবং এক অর্থে আমরা একে জানি বলেই এটি অস্তিত্বশীল।

মিশর সম্পর্কে ব্রিটিশের জ্ঞান হল বেলফোরের মিশর; সেই জ্ঞানের গুরুভার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টতার প্রশ্নকে তুচ্ছ মনে করতে বাধ্য করে। বেলফোর কোথাও ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠত্ব ও মিশরের নিকৃষ্টতা অস্বীকার করেননি। তা সবাই মেনে নিয়েছে বলেই তিনি ধরে নেন, যখন তিনি জ্ঞানের পরিণতিক্রম বর্ণনা করেন :

> "সর্বপ্রথম বাস্তব ঘটনাবলির প্রতি তাকান। ইতিহাসে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথেই পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ নিজস্ব শাসন পরিচালনার ক্ষমতা প্রদর্শন করে... নিজেদের মেধার বলেই.... সামগ্রিকভাবে যাকে প্রাচ্য বলা হয় সেখানে, প্রাচ্যের সমগ্র ইতিহাস দেখতে পারেন, আপনি কখনো স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন পাবেন না। তাদের মহান শতাব্দিসমূহ—খুবই মহান ছিল যেগুলো—পার হয়ে গেছে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের অধীনে। সভ্যতায় ওদের মহৎ—আসলেই খুব মহৎ যা কিছু অবদান তা সম্পন্ন হয়েছে ঐ ধরনের শাসন ব্যবস্থায়। বিজেতাকে হটিয়ে বিজেতা এসেছে। এক আধিপত্য অনুসরণ করে এসেছে আরেক আধিপত্য। কিন্তু ভাগ্য ও সৌভাগ্যের সকল বিপ্লবে আপনি কখনোই

দেখবেন না যে, ঐ সকল জাতির কোনোটি নিজ-উদ্যোগে—পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে বলা যায়—স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এ হল বাস্তবতা, শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার কথা নয়। আমি মনে করি প্রাচ্যের সত্যিকারের একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও বলবেন যে, মিশরে ও অন্যত্র আমরা যে সকল ক্ষমতাসীন সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি তা কোনো দার্শনিকের কাজ নয়—ওটি হল নোংরা কাজ, প্রয়োজনীয় শ্রম দিয়ে যাওয়ার নিকৃষ্ট কাজ।"

যেহেতু ঐসব বাস্তব ঘটনা হল বাস্তব, তাই বেলফোর অবশ্যই তার যুক্তি-তর্কের দ্বিতীয় পর্ব অব্যাহত রাখবেন :

"একনায়কতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলে ঐ সব মহৎ জাতিসমূহের জন্যে (আমি তাদের মহত্ত্ব স্বীকার করি) কি মঙ্গলকর হবে? আমি মনে করি মঙ্গলজনক হবে। অভিজ্ঞতা দেখায়, সমগ্র ইতিহাসে ওরা যে ধরনের শাসন-ব্যবস্থায় ছিল, তার চেয়ে বর্তমান সরকার-ব্যবস্থা অনেক ভালো। তা শুধু ওদের জন্যেই মঙ্গলজনক নয়, গোটা সভ্য পশ্চিমের জন্যেও শুভ। আমরা মিশরীয়দের জন্যে মিশরে আছি। তবু কেবল মিশরীয়দের জন্যে আমরা মিশরে অবস্থান করছি না, আমরা ওখানে আছি সমগ্র ইউরোপের জন্যেও।"

'আমাদের' কাজ করতে হয় যাদের সাথে তাদের জন্যে উপনিবেশিক দখলদারিত্ব মঙ্গল করছে বলে ওরা (প্রাচ্যজন) যে তার প্রশংসা করে কিংবা নিদেনপক্ষে বুঝতে পারে এমন কোনো প্রমাণ দেখাননি বেলফোর। যাই হোক, মিশরীয়কে নিজের কথা নিজে বলতে দেয়ার বিষয়টি বেলফোরের মনে উদয় হয়নি। কারণ ধরে নেয়া যেতে পারে, যে-মিশরীয়ই মুখ খুলবে সে-ই 'উস্কানিদাতা, সমস্যা সৃষ্টিতে ষড়যন্ত্ররত' হওয়ার সম্ভাবনা অধিক; বৈদেশিক আধিপত্যের 'সমস্যা' দেখেও দেখে না এমন দেশি, ভালো মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। অতএব, নৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পর বেলফোর বাস্তবের প্রতি নজর দেন : "তাহলে, যদি আমাদের দায়িত্বই শাসন করা, কৃতজ্ঞতা পেয়ে বা না-পেয়ে, ওখানকার জনগোষ্ঠীকে যে সব ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি তার সত্যিকার আন্তরিক স্মৃতিসমেত বা স্মৃতি-ছাড়া (বেলফোর এখানে অবশ্যই স্বাধীনতা হারানো বা অন্তত অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত থাকাজনিত ক্ষতি হিসাবে ধরেননি) এবং ওদেরকে আমরা যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি তার উজ্জ্বল স্মৃতিসহ অথবা স্মৃতি-ছাড়া; তাই যদি আমাদের দায়িত্ব হয়, তবে তা কিভাবে পালিত হবে?" ইংল্যান্ড 'আমাদের শ্রেষ্ঠ সবকিছু' ঐ দেশে রপ্তানি করে। ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা, জীবনযাপনের ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝখানে এই আত্মস্বার্থহীন প্রশাসকরা তাদের কাজ করে যায়। তাদের শাসন-কার্য সম্ভব হয়ে ওঠে যদি তারা বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি নিজ দেশের সরকারের সমর্থন রয়েছে, যে সরকার তাদের সকল কাজ অনুমোদন করবে।

"একেবারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর এমন সহজাত ধারণা আছে যে, ওদেরকে কাজ করতে হবে যাদের সাথে তাদের প্রেরক দেশটির শক্তি, কর্তৃত্ব, সহানুভূতি, পূর্ণ ও বিদ্বেষহীন সমর্থন এদের (উপনিবেশিক প্রশাসক-কর্মচারীদের) পিছনে নেই। ঐ জনগোষ্ঠীটি নিয়ম-শৃঙ্খলার বোধটুকু হারিয়ে ফেলে, যা তাদের

সভ্যতার ভিত্তি। ঠিক যেমন আমাদের কর্মকর্তারা হারিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বোধ। এই প্রশাসকদেরকে যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে তাদের মঙ্গলের জন্য এরা যা কিছু করতে পারে তার ভিত্তিই হল ঐ বোধ।"

এখানে বেলফোরের যুক্তিবোধ বেশ আকর্ষণীয়, তার গোটা বক্তব্যের শুরুর অংশটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নয় মোটেও। ইংল্যান্ড মিশরকে জানে; মিশর হল তাই ইংল্যান্ড যা জানে : ইংল্যান্ড জানে যে মিশর নিজস্ব সরকারে চলতে পারে না; ইংল্যান্ড তা নিশ্চিত করে মিশর দখলের মধ্যে দিয়ে; মিশরীয়দের নিকট মিশর হল ইংল্যান্ড যা দখল করেছে এবং শাসন করছে। অতএব, বিদেশি দখলদারিত্ব হল সমকালীন মিশরীয় 'সভ্যতার ভিত্তি'। ব্রিটিশ দখলদারিত্ব মিশরের প্রয়োজন ছিল; প্রকৃতপক্ষে মিশর জোর দিয়ে তা চেয়েছে। কিন্তু যদি শাসক শাসিতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিজ দেশের পার্লামেন্টের সন্দেহের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় তা হলে—"যে জাতিটি প্রভাবশালী—এবং আমি মনে করি প্রভাবশালীই থাকা উচিত—তার কর্তৃত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।" শুধু যে ইংলিশ মান-মর্যাদা নষ্ট হয় তাই নয়—'মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ কর্মকর্তার পক্ষে দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়বে—আপনারা যেমন চান ওদেরকে তেমন করে গড়ুন, যত ধরনের চারিত্রিক গুণ ও মেধা কল্পনা করা যায় তার সবই ওদের মধ্যে সঞ্চার করে দিন। ওদের পক্ষে সেই মহান দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না যা মিশরে, কেবল আমরা নই—সমগ্র সভ্য পৃথিবী তাদের ওপর অর্পণ করেছে।'[১]

বাগ্মিতা হিসেবে বেলফোরের বক্তব্য বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বিশেষত যেভাবে তিনি বিভিন্ন চরিত্র প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে (ঐসব চরিত্রের মধ্যে) অবশ্য ইংরেজরাও আছেন, যাদের বোঝাতে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একজন ক্ষমতাশালী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের গুরুত্বসমেত; এ ব্যক্তি মনে করেন তার জাতির ইতিহাসে যা কিছু ভালো তিনি হলেন তারই প্রতিনিধি।

বেলফোর সভ্য পৃথিবী পশ্চিমের হয়েও কথা বলতে পারেন, মিশরে কর্মরত ক্ষুদ্র একদল কর্মকর্তার পক্ষ থেকেও। তিনি যদি প্রাচ্যবাসীর পক্ষ থেকে কথা না-বলে থাকেন, তার কারণ, তারা যা হোক, অন্তত ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তবু তিনি জানেন ওরা কী বোধ করে, যেহেতু তিনি জানেন ওদের ইতিহাস, তার মতো লোকদের ওপর ওদের নির্ভরশীলতা এবং ওদের প্রত্যাশার কথা।

তবু তিনি ওদের পক্ষ থেকেও কথা বলেন—এই অর্থে যে, ওরা যা বলতে পারত—যদি তাদের প্রশ্ন করা হত এবং ওরা আদৌ উত্তর দিতে সক্ষম হত—তা হত এরই মধ্যে যা প্রমাণ হয়ে গেছে তা অর্থহীনভাবে নিশ্চিতকরণ : যে, ওরা প্রজার জাত, এমন এক জাতি দ্বারা শাসিত যে জাতি ওদেরকে এবং কিসে ওদের মঙ্গল-অমঙ্গল তা ওদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানে, যতটা ওদের নিজেদের পক্ষে জানা সম্ভব হত। ওদের মহান মুহূর্তগুলো অতীতের গর্ভে; ওরা যে আধুনিক পৃথিবীর যোগ্য হয়েছে তার কারণ ক্ষমতাধর ও অত্যাধুনিক সাম্রাজ্যগুলো ওদেরকে অবনতির চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে বের করে এক উৎপাদনশীল উপনিবেশের পুনর্বাসিত অধিবাসীতে উন্নীত করেছে।

বিশেষত মিশর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি চমৎকার নমুনা। নিজ দেশের পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে ইংল্যান্ড, পশ্চিম এবং পশ্চিমা সভ্যতার পক্ষ থেকে মিশর সম্পর্কে কতটা বলার অধিকার আছে তার সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন বেলফোর। কারণ মিশর যে

কোনোও উপনিবেশের মতো একটি উপনিবেশ মাত্র ছিল না। এটি ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের যথার্থ প্রদর্শনের ক্ষেত্র। ইংল্যান্ড কর্তৃক মিশরকে সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করার পূর্ব পর্যন্ত মিশর ছিল প্রাচ্যের পশ্চাদপদতার প্রায়-প্রাতিষ্ঠানিক নমুনা। ইংলিশ জ্ঞান ও ক্ষমতার পূর্ণ-বিজয়োল্লাসে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে।

যে বছর ইংল্যান্ড মিশর দখল করে এবং কর্নেল আরাবির জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমিত হয়, সেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি ও মিশরের মালিক ছিলেন ইভেলিন ব্যারিং (ওভার-বিয়ারিং হিসেবেও পরিচিত) লর্ড ক্রোমার। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের ৩০ তারিখে বেলফোরই হাউস অব কমন্সে দাঁড়িয়ে ক্রোমারকে মিশরে সম্পাদিত তার কর্মের জন্যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের অবসর-পুরস্কার প্রদানের প্রকল্পে সমর্থন করেন। 'মিশরকে নির্মাণ করেছেন' ক্রোমার, বেলফোর বলেন :

> "তিনি যা স্পর্শ করেছেন তাতেই সফল হয়েছেন... গত সিকি শতাব্দিব্যাপী ক্রোমারের অবদান মিশরকে সামাজিক ও আর্থিক অবক্ষয়ের চরম অবমাননাকর বিন্দু থেকে তুলে এনেছে প্রাচ্য জাতির মধ্যে বর্তমানের—আমি বিশ্বাস করি—সম্পূর্ণ একক, অনন্য অবস্থানে, আর্থিক ও নৈতিক সমৃদ্ধিতে।"[২]

মিশরের নৈতিক সমৃদ্ধি... কীভাবে পরিমাপ করা হল, বেলফোর তা বলার ঝুঁকি নেননি। ইংল্যান্ডে থেকে মিশরে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয় তার সমান রপ্তানি হয় বাকি সমগ্র আফ্রিকায়। তা অবশ্য মিশর ও ইংল্যান্ডের কেবল পারস্পরিক (যদিও অসম) আর্থিক সমৃদ্ধি নির্দেশ করে। তবে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একটি প্রাচ্যদেশের অভগ্ন, সর্বগ্রাসী পশ্চিমা অভিভাবকত্ব; দখলের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন যারা—পণ্ডিতবর্গ, ধর্ম-প্রচারক, ব্যবসায়ী, সৈনিক ও শিক্ষক থেকে শুরু করে ক্রোমার-বেলফোরের মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সকলই দেখলেন তারা নিজেরাই মিশরকে সহযোগিতা করছেন, পরিচালনা করছেন, এমনকি কখনো কখনো জোর করে ঠেলে দিচ্ছেন প্রাচ্যের অবহেলা থেকে বর্তমান নিঃসঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে।

মিশরে ব্রিটিশসাফল্য ব্যতিক্রমধর্মী হতে পারে—বেলফোর যেমন বলেছেন, তবে অযৌক্তিক বা অব্যাখ্যেয় নয়। ক্রোমারের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা এবং প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে বেলফোরের ধারণা—এই দু'য়ের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত একটি সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী মিশরের বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রিত হত। বিশ শতকের প্রথম দশক জুড়ে এ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল যে, এটি কার্যকর—প্রচণ্ড ভালোভাবে কার্যকর। বক্তব্যটি সংক্ষেপ ও সরল করলে যা দাঁড়ায় তা পরিষ্কার, যথাযথ, এবং হৃদয়ঙ্গম করা সহজ : এখানে পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী, প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে; সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয়োক্তদেরকে : যা সচরাচর বোঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দিবে, তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো-না-কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে। ঐ ক্রোমার ও বেলফোর, অচিরেই আমরা দেখব, মানবতাকে নগ্ন করে এমন নিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সত্তায় নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন, যা তাদের অনৈতিকতার ইঙ্গিত নয় মোটেও। বরং এ হল তারই প্রমাণ যে, একটি সাধারণ তত্ত্বকে ওরা যখন প্রয়োগ করেন তখন তা কেমন সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল—কেমন সূক্ষ্ম ও কার্যকর।

প্রাচ্যজন সম্পর্কে বেলফোরের বিশ্লেষণে বিষয়মুখী বিশ্বজনীনতার ভান আছে। তার মতো না করে, ক্রোমার কথা বলেন নির্দিষ্ট প্রাচ্যবাসী সম্পর্কে যাদের তিনি শাসন করেছেন অথবা যাদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে—প্রথমে ভারতে, পরে মিশরে পঁচিশ বছর ধরে; এবং তখনই তিনি ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কনসাল জেনারেল হিসাবে আবির্ভূত হন। বেলফোরের 'প্রাচ্যজন' হল ক্রোমারের 'শাসিত-জাতি'। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধও লেখেন ক্রোমার, ১৯০৮ সালের জানুয়ারির *এডিনবার্গ রিভিউ*-এ তা প্রকাশিত হয়। ওখানে পুনরায় দেখা যায় শাসিত জাতি বা প্রাচ্যজনদের সম্পর্কে জ্ঞানই ওদের ব্যবস্থাপনার কাজটিকে সহজ ও লাভজনক করে দিয়েছে। অধিক ক্ষমতার জন্যে প্রয়োজন অধিক তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ। ক্রোমারের ধারণা হল নিজদেশে সামরিকবাদ ও বাণিজ্যিক আত্মম্ভরিতা এবং উপনিবেশে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান (যেহেতু 'খ্রিস্টীয় নৈতিকতার সূত্র অনুসারে' ব্রিটেনের সরকারের বিরুদ্ধে যায়) নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে না। কারণ, ক্রোমার বলেন, যদি যুক্তিবোধ এমন একটি বিষয় হয়ে থাকে যে, প্রাচ্যবাসীরা তার অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতিতেই বাস করে, তাহলে তাদের ওপর অতি-বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ব্যবস্থা আরোপ বা তাদেরকে জোরপূর্বক যুক্তি মানতে বাধ্য করা শাসনের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং সঠিক পদ্ধতি হল, 'সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা এবং ধৈর্য সহকারে শাসিত জাতির সন্তুষ্টির মধ্যে শাসক ও শাসিতের আরো কার্যকর এবং, আশা করা যায়, আরো দৃঢ় সম্পর্ক খুঁজে বের করা"।

শাসিত জাতিকে এরূপ সান্ত্বনা দেয়ার পেছনে সর্বত্র ওঁত পেতে আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি : তা সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও বিরল ব্যবহারের জন্যে যতটা কার্যকর, তার সৈন্যদল, নির্দয় কর-আদায়কারী ও সংযমহীন শক্তির জন্যে ততটা নয়। এক কথায় সাম্রাজ্যকে বিচক্ষণ হতে হবে; লিপ্সাকে আত্ম-স্বার্থহীনতার সাথে এবং অসহিষ্ণুতাকে নমনীয় বিধি-বিধানের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে।

> "আরো স্পষ্ট করতে হলে বলতে পারি, যখন বলা হয় বাণিজ্যিক উৎসাহ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রয়োজন তখন এর অর্থ হল ভারতীয়, বা মিশরীয় বা শিল্লুক বা জুলুদের সথে কাজ করার সময় প্রথম যে প্রশ্নটি বিবেচনায় আনা উচিত তা হল এই মানুষগুলো—জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাদের সবাই কমবেশি *"অভিভাবকত্বের অধীন"*—কোন জিনিসটাকে তাদের স্বার্থের জন্যে সবচেয়ে ভালো মনে করে, বিষয়টি গভীরতর বিবেচনার দাবি করে যদিও। তবে স্থানীয় বিচার-বিবেচনায় সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও পশ্চিমা জ্ঞানের আলোকে সচেতনভাবে কোনটাকে শাসিত-জাতির জন্যে সর্বোত্তম মনে করি তা বিবেচনা করে প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে পরিণামে ইংরেজ জাতির পক্ষে যায় এমন প্রকৃত বা অনুমানকৃত সুবিধাদি বিবেচনায় আনা উচিত নয়। কিংবা যা সচরাচর ঘটে থাকে—কোনো প্রভাবশালী ইংরেজ বা ইংরেজদের একটি শ্রেণী কর্তৃক উপস্থাপিত স্বার্থকেও নয়।
>
> যদি সমগ্র ব্রিটিশ জাতি অটলভাবে এ নীতি মনে রাখে এবং এর প্রয়োগের ওপর জোর দেয় তাহলে—যদিও আমরা ভাষা বা জাতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট দেশপ্রেমের মতো কিছু সৃষ্টি করতে পারব না সত্যি, তবে—যারা অনুগ্রহ লাভ করেছে ও ভবিষ্যতে যারা করবে তাদের কৃতজ্ঞতা এবং

> শ্রেষ্ঠতর মেধা ও আত্ম-স্বার্থহীন আচার-আচরণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে একরকম কস্‌মোপলিটান আনুগত্য বিকশিত করতে পারব হয়তো। সেক্ষেত্রে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই কিছুটা আশা থাকে যে, মিশরীয়রা ভবিষ্যৎ কোনো আরাবির হাতে নিজের সহায়-সম্পদ ছুঁড়ে দেয়ার আগে দোনামোনা করবে। এমনকি মধ্য-আফ্রিকার আদিমরাও ঘটনাক্রমে এক আধটা মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখবে অ্যাসট্রে রেডাক্সের সম্মানে, যাকে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা জিন দেননি কিন্তু ন্যায়বিচার দিয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা বাণিজ্য লাভবান হবে।"[৩]

শাসিত জাতির তরফ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ শাসকগণ কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ক্রোমার কর্তৃক মিশরীয় জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধিতায়। স্থানীয় স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দখলের অবসান, আত্মবিকাশমান জাতীয় সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি অ-বিস্ময়কর দাবিসমূহ ক্রোমার কর্তৃক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি স্পষ্ট নিশ্চিত করেছেন মিশরের প্রকৃত ভবিষ্যৎ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে নেই—যা কেবল স্থানীয় মিশরীয়দের গ্রহণ করবে, বরং আছে বিস্তৃত কস্‌মোপলিটানিজমে।[৪] অধীনস্থ জাতির মধ্যে এই বোধ নেই, যে ওরা জানবে কোনটা তাদের জন্যে ভালো। ওরা প্রাচ্যজন, যাদের চরিত্র বিষয়ে ক্রোমার খুবই জ্ঞান রাখেন, কারণ তিনি ভারত ও মিশর উভয় দেশেই তাদের সাহচর্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পাচ্যজনের ব্যাপারে ক্রোমারের জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক কাজ হল তাদের পরিচালনা করা; পরিস্থিতি যদিও এখানে সেখানে কিছু ভিন্ন হতে পারে, তবু সর্বত্র প্রায় একই রকম। এর কারণ প্রাচ্যের মানুষ প্রায় সবখানেই এক রকম।[৫]

অবশেষে অগ্রসর হওয়া যাক দীর্ঘসময় ধরে বিকশিত, জ্ঞানের অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বিষয়ের দিকে—প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তব—উভয় জ্ঞান, আধুনিক পশ্চিমা প্রাচ্যতত্ত্বের এক শতাব্দির ঐতিহ্যসূত্রে যার উত্তরাধিকারী হলেন ক্রোমার ও বেলফোর : প্রাচ্যজন ও প্রাচ্যজন-বিষয়ক জ্ঞান, তাদের জাতিগত পরিচয়, স্বভাব-চরিত্র, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সম্ভাবনা-সম্পর্কিত জ্ঞান। এই জ্ঞান খুবই কার্যকর। ক্রোমার বিশ্বাস করেন তিনি মিশর শাসনে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। তাছাড়া, এটি পরীক্ষিত এবং অপরিবর্তিত জ্ঞান। যেহেতু 'প্রাচ্যজন' সকল বাস্তব উদ্দেশ্যেই 'আদর্শিক' মানুষমাত্র, যাকে যে কোনো প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা প্রাচ্যের শাসক পরীক্ষা করে দেখতে পারে, বুঝতে পারে, উন্মোচিত করে দিতে পারে। তাই দুই খণ্ডের *মডার্ন ঈজিপ্ট* গ্রন্থের চৌত্রিশতম অধ্যায়ে ক্রোমার নিজ অভিজ্ঞতার ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল রেকর্ডে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের একরকম ব্যক্তিগত মতামত উপস্থিত করেন :

> "স্যার আলফ্রেড লাইয়াল আমাকে একবার বলেছিলেন 'প্রাচ্যের মন যাথার্থ্যকে ভয় পায়। প্রত্যেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের উচিত এই নীতিকথাটি মনে রাখা।' যাথার্থ্যের অভাব—যা সহজেই রূপান্তরিত হতে পারে অসততায়—প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যদেশীয় মনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।
>
> ইউরোপীয় মানুষ অনেকখানি কার্যকারণবাদী। ঘটনা সম্পর্কে তার বিবরণ অস্পষ্ট থেকে মুক্ত। তিনি প্রকৃতিগতভাবে যুক্তিবাদী, যদিও তিনি হয়তো যুক্তিবাদ

অধ্যয়ন করেননি। প্রকৃতিগত কারণেই যে কোনো সত্যকে মেনে নেয়ার পূর্বে তিনি প্রমাণ চান; তার প্রশিক্ষিত বুদ্ধি কাজ করে একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মতো। অন্যদিকে, তার চিত্রবৎ রাস্তার মতোই প্রাচ্যজনের মনে সুষম গঠন-সৌষ্ঠবের অভাব প্রবল। তার যৌক্তিক বিশ্লেষণ হল তার অতীব নোংরা বর্ণনা। যদিও প্রাচীন আরবেরা কিছুটা উৎকৃষ্ট মাত্রার দ্বান্দ্বিক জ্ঞান অর্জন করেছিল, তাদের বংশধরদের মধ্যে এককভাবে যুক্তিতর্কের গুণটির অভাব প্রকট। এরা সচরাচর কোনো সাদামাটা বর্ণনার একেবারেই অনিবার্য পরিসমাপ্তি টানতেও অক্ষম, যদিও তার সত্যতা ওরা স্বীকার করতেও পারে। সাধারণ একজন মিশরীয়র নিকট থেকে কোনো ঘটনার বিবরণ জানার জন্যে রীতিমত সযত্ন-উদ্যম করতে হয়। সাধারণত তার ব্যাখ্যা হয় দীর্ঘ। স্বচ্ছতার অভাব তাতে প্রবল। সে তার গল্প শেষ করার পূর্বে অন্তত আধ ডজনবার নিজের বক্তব্যের সাথেই গরমিল করে ফেলবে। সবচেয়ে কোমল প্রক্রিয়ার জেরার মুখেও ওরা সচরাচর ভেঙ্গে পড়ে।"

অতঃপর প্রাচ্যজন অথবা আরবেরা সহজেই প্রতারিত হয় বলে দেখানো হয়েছে। 'শক্তি ও উদ্যম নেই ওদের'; জীবজন্তুর প্রতি নির্দয়তা, মাত্রাতিরিক্ত চাটুকারিতা, চক্রান্ত, চালাকিতে দিশেহারা হয়ে পড়ে। প্রাচ্যবাসীরা না পারে রাস্তায় হাঁটতে, না ফুটপাতে (চতুর ইউরোপীয়রা দ্রুত উপলব্ধি করতে পারে রাস্তা এবং ফুটপাত হাঁটার জন্যেই নির্মিত, প্রাচ্যজনের বিশৃঙ্খল মন তা বুঝতে ব্যর্থ হয়)। এরা অসংশোধনীয় মিথ্যুক। এরা 'চরম অলস ও সন্দেহপ্রবণ' এবং সবকিছুতেই অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির স্পষ্টতা, ঋজুতা ও মহত্ত্বের বিরোধিতা করে।[৬]

ক্রোমার কোথাও গোপনের চেষ্টা করেননি যে, তার নিকট প্রাচ্যজন হল সর্বদা ও একমাত্র মানব-বস্তু ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোয় তিনি যাদের পরিচালনা করেছেন। "যেহেতু আমি একজন কূটনৈতিক ও প্রশাসক যার গবেষণার প্রধান বিষয় হল মানুষ... তাকে পরিচালনার দৃষ্টিকোণ থেকে", ক্রোমার বলেন, "আমি এই পর্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট যে, কোনো-না-কোনোভাবে প্রাচ্যবাসীরা কাজ করে, কথা বলে এবং চিন্তা করে এমন এক পন্থায় যা ইউরোপীয়দের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।[৭]

ক্রোমারের বর্ণনা অবশ্যই অংশত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রদত্ত। তিনি তবু তার মতের সমর্থনে এখানে সেখানে রক্ষণশীল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের মত উল্লেখ করেছেন (বিশেষত আর্নেস্ত রেনান ও কনস্ট্যানটিন ডি ভোলনির)। আবার প্রাচ্যবাসীরা কেন ঐ-রকম সে কারণ ব্যাখ্যা করার সময় তিনি এসব বিশেষজ্ঞদের থেকে ভিন্নমতও প্রকাশ করেন। তার কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্যজন সম্পর্কে যে কোনো জ্ঞান তার মতের সত্যতা প্রমাণ করবে। জেরার মুখে মিশরীয়রা ভেঙ্গে পড়ে বলে যে, বর্ণনা দিয়েছেন ক্রোমার তাতে মনে হয় তার মতে প্রাচ্যের মানুষ অপরাধী। সেই অপরাধ হল প্রাচ্যের মানুষ 'প্রাচ্যজন'। এ হল এরই প্রমাণ যে, এরকম অনুলাপ সাধারণ্যে এতটাই গৃহীত হয় যে, ইউরোপীয় যুক্তিবোধ ও সুষম মনকে পুনর্বিবেচনার সুযোগ না দিয়েই তা লেখা সম্ভব হয়েছে। অতএব, যা প্রাচ্যজনের আচার-আচরণের আদর্শ বলে বিবেচিত হয় তা থেকে যে কোনো বিচ্যুতিকে মনে করা হয় অস্বাভাবিক; পরিণতিতে মিশর থেকে ক্রোমারের পাঠানো সর্বশেষ রিপোর্টে মিশরীয় জাতীয়তাবাদকে

দাবি করা হয় 'সম্পূর্ণ মহৎ ধারণা' এবং 'দেশীয় নয়, বরং বিদেশি (প্রভাবজাত) বিকাশের চারাগাছ'।[৮]

ক্রোমার ও বেলফোর তাদের প্রকাশ্য নীতি ও লেখার সর্বত্র যে জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক রক্ষণশীলতার সংকেতসমূহের ভাণ্ডার থেকে উল্লেখ করেছেন তাকে তুচ্ছ মনে করলে ভুল হবে। যদি সহজভাবে বলা যায়, প্রাচ্যতত্ত্ব হল উপনিবেশিক শাসনকে যৌক্তিক করে তোলা, তাহলে একটি সত্য উপেক্ষা করা হয়। তা হল উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পরে নয়, পূর্বেই প্রাচ্যতত্ত্ব উপনিবেশিক শাসনকে আগাম বহুদূর বৈধ করে তুলেছিল।

মানুষ সকল সময় বাস্তব বা কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পরম বিভাজন আত্মতৃপ্তির সাথে মেনে নিয়েছেন বেলফোর ও ক্রোমার তা গড়ে উঠেছে বহু বছর—এমনকি বহু শতাব্দি ধরে। এর মধ্যে অবশ্যই অসংখ্য আবিষ্কার অভিযান হয়েছে, সংযোগ ঘটেছে বাণিজ্য ও যুদ্ধের মাধ্যমেও। তবে এ ছাড়াও আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের দুটো মুখ্য দিক ছিল। একটি হল ইউরোপে প্রাচ্য সম্পর্কে বিকাশমান পদ্ধতিভিত্তিক জ্ঞান—সেই জ্ঞান যা জোরালো হয়েছে উপনিবেশিক সম্পর্ক-সংঘাতে, তেমনি ভিনদেশি ও অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে সর্বব্যাপী আগ্রহে বিকাশমান জাতিবিদ্যা, তুলনামূলক শরীরতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাসের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে।

এছাড়াও ঐ পদ্ধতিভিত্তিক জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়েছে উপন্যাসিক, কবি, অনুবাদক ও মেধাবী পর্যটকদের সৃষ্ট বিশাল একগুচ্ছ সাহিত্য। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কের অন্য দিকটি এই যে, প্রাচ্য-ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্কে ইউরোপ সর্বদা শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছে; আধিপত্যের কথা না হয় না-ই বললাম। এ ব্যাপারটিকে সুভাষণে কোমল করে বলা সম্ভব নয়। সত্যি যে, দুর্বলের সাথে সবলের সম্পর্ক ভিন্ন চেহারায় ঢেকে রাখা সম্ভব: যেমন বেলফোর যখন প্রাচ্যের সভ্যতাকে মহৎ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্যে—যা এখানে আমাদের বিষয়—রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভিত্তির প্রয়োজনীয় সম্পর্ককে দেখা হয় সবল ও দুর্বল পক্ষের সম্পর্করূপে। সে সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন পরিভাষা : বেলফোর ও ক্রোমার গৎবাঁধা ভঙ্গিতে অনেকগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রাচ্যের মানুষ যুক্তি-বিরহিত, পতিত, বালসুলভ, 'ভিন্নরকম'; এভাবে ইউরোপীয়রা যুক্তিবাদী, গুণী, মানসিকভাবে পরিপক্ক, 'স্বাভাবিক'। কিন্তু সেই সম্পর্কে উজ্জীবিত করার ধরনটা সবখানে এই বাস্তবতায় গুরুত্ব আরোপ করে যে, প্রাচ্যের মানুষ বাস করে ভিন্ন কিন্তু সংগঠিত নিজেদের পৃথিবীতে—নিজস্ব জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমানা ও অভ্যন্তরীণ সংসক্তির নীতিমালা-সংবলিত জগতে। এ সত্ত্বেও প্রাচ্যের মানুষদের 'জগৎ'-এর বোধগম্যতা ও স্বকীয়তা তাদের নিজস্ব চেষ্টায় অর্জিত নয়, তা এসেছে বরং (পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের ওপর) ওয়াকিবহাল, স্বার্থমুখী একগুচ্ছ প্রভাব আরোপণে, যার সাহায্যে পশ্চিম প্রাচ্যকে চিহ্নিত করে।

এতক্ষণ ধরে আমার আলোচিত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দুটো বৈশিষ্ট্য এভাবেই একত্রিত হয়। প্রাচ্যের জ্ঞানশক্তি থেকে উৎসারিত বলে—এক অর্থে সৃষ্টি করে প্রাচ্য, *প্রাচ্যজন* ও তার 'জগৎ'। ক্রোমার ও বেলফোরের লেখার ভাষায় *প্রাচ্যজন* এমন কিছু রূপে

আবির্ভূত হয়, যাকে বিচার করা হয় (যেমন, আইনের আদালতে), এমন কিছুরূপে যাকে বর্ণনা ও অধ্যয়ন করা হয় (যেমন পাঠ্যসূচিতে), এমন কিছু যাকে সুশৃঙ্খল করা হয় (যেমন প্রাণিবিদ্যা ম্যানুয়ালে)। লক্ষণীয় বিষয় হল, উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রাচ্যজন অন্তর্ভুক্ত ও উপস্থাপিত হচ্ছে একটি আধিপত্যশীল কাঠামোর দ্বারা। এ কাঠামোর উৎস কী?

সাংস্কৃতিক-শক্তি খুব সহজে আলোচ্য কিছু নয়। এবং বর্তমান রচনার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল সাংস্কৃতিক শক্তির প্রয়োগ হিসাবে প্রাচ্যতন্ত্রকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা, একে গভীরভাবে ভেবে দেখা। অন্য কথায়, প্রথমে প্রচুর পরিমাণে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত বিশ্লেষণ না করে সাংস্কৃতিক শক্তির মতো অস্পষ্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সাধারণীকরণ করে ফেলার ঝুঁকি না নেয়াই ভালো। তবে শুরুতে বলা যায় যে, উনিশ-বিশ শতকে পশ্চিম জড়িত ছিল, এমন একটি ধারণা গড়ে তোলা হয়েছিল যে, প্রাচ্য ও তার সব কিছু নিকৃষ্ট না-ও যদি হয় তবু পশ্চিম কর্তৃক সংশোধনমূলক অধ্যয়নের যোগ্য অন্তত। প্রাচ্যকে তখন দেখা হত শ্রেণীকক্ষ, ফৌজদারি আদালত, কারাগার, সচিত্র ম্যানুয়েলের দৃষ্টিকোণ থেকে। সুতরাং প্রাচ্যতত্ত্ব হল প্রাচ্য সম্পর্কে সেই জ্ঞান যা প্রাচ্যের সকল কিছুকে বাছাই, পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, বিচার, শৃঙ্খলাভুক্তকরণ ও পরিচালনার জন্য শ্রেণীকক্ষ, আদালত, কারাগার বা ম্যানুয়ালে স্থাপন করে।

বিশ শতকের শুরুর বছরগুলোতে বেলফোর ও ক্রোমারের মতো লোকেরা যা বলেছে ও যেভাবে বলেছে তা তারা বলতে পারত। কারণ এসব বলার জন্যে যে শব্দভাণ্ডার, কল্প-প্রতিমা, আলঙ্কারিক ভাষা ও নমুনা প্রয়োজন তা তারা পেয়েছে উনিশ শতকেরও পূর্বের প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহ্য থেকে। এ সত্ত্বেও, ভূ-পৃষ্ঠের বেশির ভাগ এলাকা যে আক্ষরিক অর্থে ইউরোপ বা পশ্চিম কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে—এই জ্ঞান প্রাচ্যতত্ত্বকে জোরদার করেছে, প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বারা বলশালী হয়েছে সে জ্ঞানও। প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখি ও প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক অগ্রগতি এবং ইউরোপের নজিরবিহীন সাম্রাজ্যবিস্তার ঘটে কাকাতালীয়ভাবে ঠিক একই সময়ে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়পর্বে ইউরোপের প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভূ-পৃষ্ঠের পঁয়ত্রিশ শতাংশ থেকে বেড়ে পঁচাশি শতাংশে দাঁড়ায়। প্রতিটি অঞ্চল তার শিকার হয়, তবে এশিয়া ও আফ্রিকার চেয়ে বেশি নয় কোনোটিই। সবচেয়ে বড় ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্য : কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গী, আর সব ব্যাপারে আক্রমণাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রাচ্যে, ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে শুরু করে ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া পর্যন্ত তাদের উপনিবেশিক দখল ও সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল পরস্পর সংলগ্ন; প্রায়শই একটি আরেকটির সীমানা মাড়িয়ে দিত। এ নিয়ে যুদ্ধও বাধত যখন তখন। তবে, ইসলাম যে অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের কথা ছিল, সেই নিকট প্রাচ্যে অর্থাৎ আরব ভূমিতে ফরাসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরস্পরের এবং 'প্রাচ্যে'র মুখোমুখি হয়—পূর্ব-পরিচিতি, জটিলতা ও উল্লেখযোগ্য তীব্রতার সাথে। উনিশ শতকের বেশিরভাগ সময় জুড়েই—১৮৮১ সালে লর্ড স্যালিসবারী যেমন মন্তব্য করেন—প্রাচ্য সম্পর্কে ওদের সাদৃশ্যপূর্ণ মতামত ছিল খুবই সমস্যাগ্রস্ত। "আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ মিত্র যদি এমন কোনো দেশে নাক গলায় যেখানে আপনার

গভীর স্বার্থ রয়েছে, তাহলে আপনার সামনে তিনটি পথ খোলা থাকে : আপনি তার নিন্দা করতে পারেন, বা এককভাবে সব দখলে নিয়ে নিতে পারেন, অথবা ভাগাভাগি করতে পারেন। এই অঞ্চলটি ছেড়ে দেয়ার অর্থ ছিল আমাদের ভারতগামী পথের মাঝে ফরাসিদের বসিয়ে দেয়া। একক কর্তৃত্ব নেয়ার মধ্যে যুদ্ধের সমূহ ঝুঁকি থাকত। আমরা তাই তৃতীয়টি অর্থাৎ অংশীদারত্বের পথটাই বেছে নিলাম।"[১০]

এবং তারা ভাগাভাগি করে নেয়, এমন এক উপায়ে যা আমরা এখন খুঁজে দেখব। ওখানে ওরা যা ভাগ করে তা কেবল ভূমি বা মুনাফা কিংবা প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়; ভাগ করা হয় এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাও, আমি যাকে বলেছি 'প্রাচ্যতত্ত্ব'। প্রাচ্যতত্ত্ব হল সাধারণভাবেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একরাশ তথ্যের একটি আর্কাইভ বা লাইব্রেরি। আর্কাইভকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে একরাশ মূল্যবোধ ও একগুচ্ছ ধারণা[১১], যেগুলো এরই মধ্যে নানা উপায়ে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসব ধারণা ব্যাখ্যা করেছে প্রাচ্যজনের আচার আচরণ; এগুলো প্রাচ্যজনকে সরবরাহ করেছে একরকম মানসিকতা, বংশবৃত্তান্ত ও পরিবেশ। সবচেয়ে বড় কথা এগুলো প্রাচ্যজনকে স্থায়ী চরিত্রসম্পন্ন প্রপঞ্চরূপে দেখার ও সে অনুযায়ী আদান-প্রদান করার অনুমোদন দিয়েছে ইউরোপীয়দেরকে। কিন্তু স্থায়িত্বসম্পন্ন যে কোনো ধারণার মতো প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাসমূহও সেসব মানুষদের প্রভাবিত করেছে, যাদেরকে প্রাচ্যজন বলে অভিহিত করা হয় এবং প্রভাবিত করেছে তাদেরকেও যাদের বলা হয়ে থাকে পাশ্চাত্যজন বা ইউরোপীয় বা পশ্চিমের মানুষ। মোট কথা, প্রাচ্যতত্ত্বকে ইতিবাচক মতবাদ মনে না করে চিন্তার ওপর একরাশ সীমাবদ্ধতারূপে উপলব্ধি করা ভালো। যদি পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাচ্যের নিকৃষ্টতাজনিত অমোচনীয় ব্যবধানই প্রাচ্যতত্ত্বের প্রাণ হয়ে থাকে তাহলে প্রাচ্যতত্ত্ব তার বিকাশ ও উত্তরকালীন ইতিহাসের ধারায় কিভাবে সে ব্যবধানকে দৃঢ় ও গভীরতর করেছে তা দেখার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

ভারত এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপনিবেশিক প্রশাসকদেরকে পঞ্চান্ন বছর বয়সে অবসর প্রদানের রীতি গড়ে ওঠে উনিশ শতকের ব্রিটেনে। তখন প্রাচ্যতত্ত্ব আরেক দফা পরিশোধন লাভ করে। বয়োবৃদ্ধ ও মর্যাদাহীন কোনো পশ্চিমা মানুষকে দেখার সুযোগ দেয়া হয় না প্রাচ্যজনকে; তেমনি পশ্চিমের কোনো মানুষও প্রজার জাত-এর চোখে নিজেকে তেজী, যুক্তিবাদী, সদা-সতর্ক তরুণ শাসক ছাড়া আর কোনোরূপে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন মনে করে না।[১২]

উনিশ ও বিশ শতকে প্রাচ্যতত্ত্ব বেশ ক'টি ভিন্ন ভিন্ন চেহারা গ্রহণ করে। সর্বপ্রথম, ইউরোপীয় অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রাচ্য বিষয়ে বিশাল এক সাহিত্যভাণ্ডার ছিল ইউরোপের। বর্তমান আলোচনায় আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের আরম্ভকাল বলে ধরা হয়েছে শেষ-আঠারো শতক ও উনিশ শতকের শুরু পর্বকে। এ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—এ সময়ই, এডগার কুইনেটের ভাষায়—'প্রাচ্যতত্ত্বের পুনর্জাগরণ'[১৩] ঘটে। হঠাৎই বিভিন্নমুখী একদল চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পীর মধ্যে নতুন করে সচেতনতা দেখা দেয় চীন থেকে মেডিটেরেনিয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচ্য সম্পর্কে। এ সচেতনতা অংশত ছিল সংস্কৃত, জেন্দ ও আরবি ভাষার নব-আবিষ্কৃত ও অনূদিত সাহিত্যের ফলাফল, আর অংশত নতুনভাবে উপলব্ধ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের পরিণাম। এখানে, আমার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত, মিশরে

নেপোলিয়নের দখল অভিযান নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল সুরটি সূচনা করে। ঐ দখলাভিযান ছিল সত্যিকার অর্থে এক সংস্কৃতিকে আরেক সংস্কৃতি—আপাতভাবে শক্তিশালী আরেকটি সংস্কৃতি কর্তৃক বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রাস করার সূচনা। কারণ নেপোলিয়নের মিশর দখলের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে প্রক্রিয়ার শুরু হয় তা এখনো প্রভাবিত করে চলেছে আমাদের সমকালীন সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পটভূমি।

বিশাল যৌথ পাণ্ডিত্যের মনুমেন্টস্বরূপ রচনা *ডিসক্রিপজঁ দ্য লা' ঈজিপ্ট* এর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নেপোলিয়নের অভিযান প্রাচ্যতত্ত্বের জন্যে পরিবেশন করে একটি দৃশ্যপট বা মঞ্চসজ্জা। মিশর এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইসলামি দেশসমূহ বিবেচিত হয় প্রাচ্য বিষয়ে কার্যকর পশ্চিমা জ্ঞানের থিয়েটার, গবেষণাগার, জীবন্ত প্রদেশরূপে। একটু পরে আমি নেপোলিয়নের অভিযান প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

নেপোলিয়নের অনুরূপ অভিজ্ঞতার বদৌলতে পশ্চিমে প্রাচ্য একটি জ্ঞান-বৃক্ষরূপে আধুনিকায়িত হয়। এটি হল দ্বিতীয় রূপ, যার মধ্যে অস্তিত্ববান উনিশ ও বিশ শতকী প্রাচ্যতত্ত্ব। ঐ কালপর্বেও আমি শুরু থেকে পরীক্ষা করে দেখব যে, তখন সর্বত্রই প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা ও মর্মগত উপলব্ধি নির্দিষ্ট ফর্মে, সম্ভব হলে আধুনিক ভাষায় বর্ণনা করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আধুনিক বাস্তবতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্য বিষয়ক ধারণাসমূহ উপস্থাপনের আগ্রহ জেগে ওঠে। যেমন, ১৮৪৮ সালে সেমেটিক সম্পর্কে রেনানের ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যে রীতিতে প্রকাশিত হয়েছে তা পণ্ডিত বিধর্মীর জন্যে সমকালীন তুলনামূলক ব্যাকরণ, তুলনামূলক শারীরসংস্থান বিদ্যা ও জাতিতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহ থেকে বিপুল পরিমাণে গ্রহণ করেছে। এ ঋণ রেনানের প্রাচ্যতত্ত্বকে দিয়েছে মর্যাদা। মুদ্রার উল্টোদিকে, পশ্চিমে আধুনিক ও গভীরতর প্রভাবসম্পাতী ভাবনাধারার মুখে প্রাচ্যতত্ত্বকে করেছে সমালোচনাযোগ্য, ভেদ্য; এখন পর্যন্ত তাই আছে। প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদ, দৃষ্টবাদ, ইউটোপীয়ানিজম, হিস্টোরিসিজম, ডারউইনবাদ, বর্ণবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, মার্কসবাদ, স্পেঙলারবাদ প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মতো প্রাচ্যতত্ত্বেরও রয়েছে গবেষণার নমুনা, রীতিনীতি, নিজস্ব বিদ্বৎসমাজ, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। উনিশ শতকে এ ক্ষেত্রটির মর্যাদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, তেমনি 'সোসিয়েটে এশিয়াটিক', *'দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' 'The Deutsche Morgenladische Gesellschaft'* এবং *'দি আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি'* প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতির পাশাপাশি সারা ইউরোপ জুড়ে বাড়তে থাকে প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ক অধ্যাপকের সংখ্যাও। এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্যে ব্যবহারযোগ্য মাধ্যমের সংখ্যাও স্ফীত হয়। *Fundgraben des orients* (১৮০৯) দিয়ে সূচিত প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাময়িকীর প্রকাশনাও জ্ঞান বৃদ্ধি করে, বিশেষজ্ঞ-ক্ষেত্রের সংখ্যাও বাড়ায়।

এ সত্ত্বেও ঐসব তৎপরতার অতি সামান্যই এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দু-একটি মাত্র স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বা বিকশিত হয়েছে। কারণ তৃতীয় যেরূপে প্রাচ্যতত্ত্ব ক্রিয়াশীল তা প্রাচ্য-বিষয়ক চিন্তাভাবনার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। এমনকি ঐ যুগের সবচেয়ে সৃজনশীল

কল্পনাশক্তির অধিকারী লেখক যেমন ফ্লবেয়ার, নেরভাল, স্কট প্রমুখও প্রাচ্য সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারতেন বা বলতে পারতেন, সেই বলা বা অভিজ্ঞতা অর্জনের পথে নিয়ত সীমাবদ্ধতা বোধ করেছেন। কারণ, প্রাচ্যতত্ত্ব শেষ পর্যন্ত বাস্তবতা বিবেচনার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ যার গঠন বিকশিত করেছে একটি বিভাজন : *পরিচিত* (ইউরোপ, পশ্চিম, আমরা) ও *অপরিচিত* (প্রাচ্য, পূর্ব, ওরা)। এ ধারণা, এক অর্থে, সৃষ্টি ও উপস্থাপন করেছে দুটো জগৎ যেগুলো উপলব্ধিতে এসেছে এ প্রক্রিয়াতেই। প্রাচ্যজন বাস করে 'তাদের জগতে, 'আমরা' বাস করি আমাদের জগতে। কল্প-দর্শন ও বস্তু-নির্ভর বাস্তবতা একে অপরকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে এবং অব্যাহত রেখেছে তাদের কার্যক্রম। আদান-প্রদানের একটি স্বাধীনতা ছিল বরাবরই পশ্চিমের অনুকূলে; কারণ তার সংস্কৃতি অধিকতর শক্তিশালী, সে ভেদ করে ঢুকে যেতে পারে, যুঝতে পারে; আকার ও অর্থ দিতে পারে বিশাল এশীয় রহস্যে—যেমন একবার বলেছিলেন ডিজরাইলি। তবু আমার মনে হয় এ যাবৎ যা দেখেও দেখা হয়নি, তা হল অমন আনুকূল্যের সঙ্কুচিত পরিভাষারাশি এবং ঐ রকম কল্পদর্শনের তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা। আমার বক্তব্য হল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বাস্তবতা অমানবিক এবং অটল; এর পরিধি এবং একইভাবে যতটা ওর প্রতিষ্ঠান ও সর্বব্যাপী প্রভাব এখন পর্যন্ত টিকে আছে তা-ও।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব কিভাবে কাজ করে? কিভাবে একে একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ, চিন্তার একটি ধরন, একটি সমকালীন সমস্যা ও বিষয়গত বাস্তবতারূপে বর্ণনা করা যেতে পারে? সাম্রাজ্যের এক গুণী টেকনিশিয়ান ও প্রাচ্যতত্ত্বের সুফলভোগী ক্রোমারকে আবার বিবেচনায় আনা যায়। তিনি আমাদেরকে প্রাথমিক উত্তর যোগাতে পারবেন। 'প্রজার জাতিসমূহের' সরকারে তিনি এ সমস্যা নিয়ে গলদঘর্ম হয়েছেন যে, কিভাবে ব্যক্তিগণের জাতি ব্রিটেন কিছু নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত বিশাল এক সাম্রাজ্য শাসন করবে। তিনি দেশে লন্ডনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তুলনা করে পার্থক্য দেখান স্থানীয় প্রতিনিধিদের যাদের রয়েছে অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয়দের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান। শেষোক্তরা "স্থানীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত—এমনকি সঙ্কটময় করে তুলতে পারে। এ কারণে বিপদ বা আশঙ্কা উদ্ভূত হওয়ার পূর্বেই শেষ করে ফেলার মতো অবস্থানে থাকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ।" কেন? কারণ এই কর্তৃপক্ষ "যন্ত্রটির বিভিন্ন অংশের সুসমন্বিত তৎপরতা নিশ্চিত করতে পারে" এবং প্রজাদের সরকারের ওপর আপতিত পরিস্থিতির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারে।"[১৪]

এখানকার ভাষা অস্পষ্ট এবং আকর্ষণহীন, তবে যা বলা হয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়। পশ্চিমে ক্ষমতার একটি কেন্দ্র এবং তা থেকে প্রাচ্যের দিকে বিচ্ছুরিত একটি বিরাট, সর্বগ্রাসী যন্ত্র কল্পনা করেন ক্রোমার। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেখানে অক্ষুণ্ন থাকে, যন্ত্রটির নিয়ন্ত্রণও থাকে তার হাতে। প্রাচ্যে যন্ত্রটির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যন্ত্রটিতে যা সরবরাহ করে তা হল—মানববস্তু, বস্তুগত সম্পদ, জ্ঞান, যা আপনার আছে—যন্ত্রটির দ্বারা প্রক্রিয়াজাত হয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে আরো অধিক ক্ষমতায়। বিশেষজ্ঞ জ্ঞান তুচ্ছ প্রাচ্যবস্তুকে তাৎক্ষণিক রূপান্তরিত করে দরকারি বস্তুতে : উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রাচ্যজন পরিণত হয় শাসিত জাত-এ, প্রাচ্য-মানসিকতার নমুনায়, এবং সবই ঘটে দেশে (ইংল্যান্ডে) 'কর্তৃত্ব' বৃদ্ধির

নিমিত্তে। 'স্থানীয় স্বার্থ' প্রাচ্যতাত্ত্বিকের বিশেষ স্বার্থ; সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজের প্রধান স্বার্থ হলো 'কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব'। ক্রোমার নিখুঁতভাবে যা দেখেন তা হল, সমাজ কর্তৃক জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা, এই বাস্তব ঘটনা যে জ্ঞান—যত বিশিষ্টই হোক, তা—প্রথমে একজন বিশেষজ্ঞের স্থানীয় স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পরে পরিচালিত হয় কর্তৃত্বের সামাজিক প্রক্রিয়ায়। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় স্বার্থের এ মিথস্ক্রিয়া জটিল, কিন্তু বাছবিচারহীন নয়।

ক্রোমারের নিজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি বলেন একজন উপনিবেশিক প্রশাসক হিসেবে তার 'মূল অধ্যয়নের বিষয় মানুষও'। যখন পোপ ঘোষণা করেন, মানবজাতির মূল অধ্যয়নের বিষয় হবে মানুষ। তিনি তখন সকল মানুষকেই নির্দেশ করেন, 'দরিদ্র ইন্ডিয়ানসমেত'। অথচ ক্রোমারের (মানুষ শব্দটির সাথে) 'ও'-এর ব্যবহার আমাদের মনে করিয়ে দেয় কোনো নির্দিষ্ট জাতের মানুষ, যেমন, প্রাচ্যজনকে মূল অধ্যয়নের বিষয়রূপে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং প্রাচ্যজন-সম্পর্কিত এ মূল অধ্যয়ন হল প্রাচ্যতত্ত্ব যা অন্যান্য ধরনের জ্ঞান থেকে একে সঠিকভাবে আলাদাকৃত কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোনোকালে জ্ঞানকে ঘিরে থাকা বস্তুগত ও সামাজিক বাস্তবতার জন্যে দরকারি বলে পরিগণিত হয়, ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ পায়। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে সার্বভৌমত্বের একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হয়, একটি ব্যঙ্গাত্মক শৃঙ্খল গড়ে ওঠে যার সবচেয়ে পরিষ্কার রূপ একদা বর্ণনা করেছেন রুডইয়ার্ড কিপলিঙ :

খচ্চর, ঘোড়া, হাতি, বা বলদ তার চালককে মান্য করে, চালক মান্য করে তার সার্জেন্টকে এবং সার্জেন্ট তার লেফটেন্যান্টকে, লেফটেন্যান্ট তার ক্যাপ্টেনকে, ক্যাপ্টেন মেজরকে, মেজর কর্নেলকে, কর্নেল তিন রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ারকে, ব্রিগেডিয়ার তার জেনারেলকে মান্য করে যিনি ভাইসরয়কে মেনে চলেন, ভাইসরয় আবার সম্রাজ্ঞীর সেবক।[১৫]

এই দানবীয় চেইন অব কমান্ড-এর মতো সুগঠিত ও ক্রোমারের 'হারমোনিয়াস ওয়ার্কিং'-এর মতো দৃঢ়ভাবে পরিচালিত প্রাচ্যতত্ত্ব পশ্চিমের শক্তি ও প্রাচ্যের দুর্বলতাও প্রকাশ করতে পারে—যেভাবে পশ্চিম দেখেছে। এ রকম দুর্বলতা ও সবলতা যেমন প্রাচ্যবাদে স্বাভাবিক, তেমনি সেই মতামতের সহজাত প্রবৃত্তি পৃথিবীকে মোটাদাগে বড় বড় অংশ ও অঞ্চলে বিভক্তি করেছে। এই অঞ্চলগুলো পারস্পরিক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করে। ঐ উত্তেজনার স্রষ্টা হল তথাকথিত মৌলিক পার্থক্য।

এটিই প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক উত্থাপিত প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাপার। কেউ কি মানবীয় বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে বিভাজিত করতে পারে—যেমনটি আসলেই মনে হয়; বিভিন্ন সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও জাতিকে বিভাজিত করতে পারে এবং তার পরিণামও কি মানবীয়ভাবে এড়াতে পারে? মানবীয়ভাবে পরিণতি এড়ানোর কথা বলে আমি জানতে চাচ্ছি যে, মানবজাতিকে 'আমরা' (পশ্চিম) ও 'ওরা' (প্রাচ্যজনেরা) জাতীয় বিভাজনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত পারস্পরিক শত্রুতা এড়ানোর কোনো উপায় কি আছে? কারণ এ ধরনের বিভাজন হল সর্বজনীনতা যার ব্যবহার ঐতিহাসিক ও বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিছু লোকের সাথে আর কিছু লোকের পার্থক্যের গুরুত্বকে—সাধারণভাবে, বিশেষভাবে নয়—জনপ্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে। কেউ যখন বিশ্লেষণ, গবেষণা, জননীতির শুরু এবং শেষপ্রান্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

জাতীয় বর্গ ব্যবহার করে (ক্রোমার ও বেলফোর যেমন ব্যবহার করেছেন) তখন তার ফলাফল হয় পার্থক্যের মেরুকরণ—প্রাচ্যজন আরো বেশি 'প্রাচ্যজন' এবং পাশ্চাত্যজন আরো বেশি 'পাশ্চাত্যজন' হয়ে ওঠে; বিভিন্ন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমাজের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান সীমিত করে ফেলে।

সংক্ষেপে, তার আধুনিক ইতিহাসের একেবারে গোড়া থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব ভিনদেশির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তার একটি ভঙ্গি হিসাবে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' জাতীয় বাঁধা-ধরা পার্থক্য-ভিত্তিক জ্ঞানের গৎবাঁধা নিয়মেই প্রাচ্যতত্ত্ব সর্বতোভাবে দুঃখজনক একটি প্রবণতা দেখায় : একটি 'পাশ্চাত্য' বা একটি 'প্রাচ্য' কামরায় চিন্তাকে প্রবাহিত করানোর উদ্দেশ্যে। কারণ পশ্চিমে যেসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক তত্ত্ব, চর্চা ও মূল্যবোধের দেখা মিলে এ প্রবণতা তাদের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল। প্রাচ্যের ওপর পশ্চিমের ক্ষমতার বোধ বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা সহকারে গৃহীত হয়েছে।

সমকালীন দু'একটি উদাহরণ এ পর্যবেক্ষণকে আরো পরিষ্কার করবে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষদেরকে যে জগতের সাথে আদান-প্রদান করতে হবে সে সমাজকে তারা সময় সময় জরিপ করে দেখবে, এটিই স্বাভাবিক। বেলফোর প্রায়ই তা করতেন। কিসিঞ্জারও করেন, তার প্রবন্ধ 'অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও পররাষ্ট্রনীতি'-তে অন্তত খোলাখুলিভাবে। তিনি যে নাটক বর্ণনা করেছেন তা যথার্থ : একদিকে অভ্যন্তরীণ শক্তি, অন্যদিকে বৈদেশিক বাস্তবতার চাপের মধ্যে পৃথিবীতে কৌশলে তার আচরণ পরিচালনা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। এ কারণ কিসিঞ্জারের এককভাবে অবশ্যই পৃথিবী ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বি-মেরু অবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া, তিনি সচেতন কর্তৃত্বের সাথে কথা বলেন প্রধান প্রধান পশ্চিমা শক্তির কণ্ঠ হিসাবে, যেগুলোর সাম্প্রতিক ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতা তাদেরকে এমন এক পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে যে পৃথিবী সহজে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেয় না। কিসিঞ্জার অনুভব করেন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল বিশ্বের তুলনায় শিল্পায়িত উন্নত পশ্চিমের সাথে কম সমস্যাসঙ্কুলভাবে আদান-প্রদান করতে পারে। আবার, যুক্তরাষ্ট্র ও তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের (চীন, ইন্দোচীন, নিকটপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা) সম্পর্কের সমকালীন বাস্তবতা দৃশ্যত একরাশ সমস্যায় কণ্টকময়, যা এমনকি কিসিঞ্জারও গোপন করতে পারেননি।

ভাষাতাত্ত্বিকরা যাকে বলেন জোড়-বৈপরীত্য, প্রবন্ধটিতে সে পদ্ধতিতে অগ্রসর হন কিসিঞ্জার। তিনি দেখান, পররাষ্ট্রনীতি হতে পারে দু'রকমের (ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ও রাজনৈতিক), তেমনি দু'ধরনের কৌশল, দু'টো সময়পর্ব ইত্যাদি। যুক্তি বিস্তারে ঐতিহাসিক পর্বটির শেষে এসে তিনি যখন সমকালীন পৃথিবীর মুখোমুখি হন তখন একে যথারীতি দু'ভাগে ভাগ করেন : উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ পশ্চিম গভীরভাবে এ ধারণার অনুবর্তী যে, পর্যবেক্ষকের নিকট বাস্তব পৃথিবী বাইরের জিনিস এবং জ্ঞান গঠিত হয় তথ্য সংরক্ষণ ও বিন্যাসের সমবায়ে—তা যত বেশি নিখুঁত, জ্ঞানও তত বেশি উন্নত। এর প্রমাণস্বরূপ কিসিঞ্জার বলেন যে, নিউটনীয় বিপ্লব উন্নয়নশীল বিশ্বে সংঘটিত হয়নি; "সংস্কৃতির উপর নিউটনীয় বিপ্লবের প্রথম যুগের প্রভাব পড়েনি। সংস্কৃতি অনিবার্যভাবে ধরে রেখেছে প্রাক-নিউটনীয় এ ধারণা যে, বাস্তব পৃথিবী প্রায় সম্পূর্ণতই

পর্যবেক্ষকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পরিণতিতে, তিনি যোগ করেন, "পশ্চিমের তুলনায় পৃথিবীর অন্যান্য নতুন দেশে সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতা ভিন্ন গুরুত্ববহ"। কারণ এক অর্থে এসব দেশ কখনো সে অভিজ্ঞতা আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়নি।[১৬]

প্রাচ্য যে নিখুঁত হতে অক্ষম সে প্রসঙ্গে ক্রোমারের মতো স্যার আলফ্রেড লিয়ালকে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়নি কিসিঞ্জারের। কারণ, তিনি তাঁর যুক্তি নিয়ে বিতর্কের সুযোগ রাখেননি যাতে কোনো বৈধতা প্রদানের প্রয়োজন না হয় : *আমরা আমাদের নিউটনীয় বিপ্লব সম্পন্ন করেছি, ওরা করেনি: চিন্তাবিদ হিসেবে আমরা ওদের চেয়ে ভালো।*

ভালো! চূড়ান্ত পর্যায়ে রেখা টানা হয়েছে, ঠিক যে ঢঙে টেনেছিলেন বেলফোর ও ক্রোমার। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিবর্গ ও কিসিঞ্জারের মাঝখানে পড়ে আছে ষাট কিংবা আরো বেশি কিছু বছর। অসংখ্য যুদ্ধ ও বিপ্লব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে কিসিঞ্জার যাকে 'খুঁতযুক্ত' উন্নয়নশীল দেশ এবং ভিয়েনা সম্মেলন-পূর্ব ইউরোপের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন সেই প্রাক-নিউটনীয় ভবিষ্যদ্বাণীভিত্তিক রীতি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। আবার, ক্রোমার ও বেলফোরের মতো নয়, কিসিঞ্জার অতএব, এই প্রাক-নিউটনীয় পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হন, যেহেতু, তা "সমকালীন বিপ্লবমুখী আলোড়ন সম্পর্কে যথেষ্ট নমনীয়তা দেখায়"। এভাবে নিউটন-উত্তর (বাস্তব) পৃথিবীর মানুষদের দায়িত্ব হল "কোনো সঙ্কট কোনো একটি বিন্যাস অনিবার্য করে তোলার আগেই সেই বিন্যাসটি সংগঠিত করা।" অন্য কথায়, আমাদেরকে এখনো এমন কোনো উপায় বের করতে হবে যাতে উন্নয়নশীল পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি কি ক্রোমারের কল্পনার সুসমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল যন্ত্রটির মতো নয়—যে যন্ত্রটি পরিকল্পিত হয়েছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের স্বার্থ দেখার জন্যে, যা উন্নয়নশীল পৃথিবীর বিরোধিতা করে?

কিসিঞ্জার যখন পৃথিবীকে প্রাক-নিউটনীয় ও নিউটন-উত্তর বাস্তবতার ধারণায় ভাগ করেন তখন তিনি হয়তো জানতেন না যে, বংশ-পরিচয়যুক্ত কোনো জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তিনি ঋণ গ্রহণ করছেন। কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা নির্দিষ্টকৃত রক্ষণশীল বিভাজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যারা পাশ্চাত্যবাসীদের থেকে প্রাচ্যজনকে আলাদা করে। প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মতো কিসিঞ্জারের স্বাতন্ত্র্যও মূল্যবোধমুক্ত নয়, তার সুর আপাততভাবে নিরপেক্ষ মনে হওয়া সত্ত্বেও। 'ভবিষ্যদ্বাণীভিত্তিক', 'নিখুঁততা', 'অভ্যন্তরীণ', 'পর্যবেক্ষণভিত্তিক বাস্তবতা' ও 'বিন্যাস' প্রভৃতি শব্দ ছড়িয়ে আছে তার বর্ণনায়: এগুলো হয় আকর্ষণীয়, পরিচিত, আকাঙ্ক্ষাযোগ্য গুণাবলি নতুবা বিপজ্জনক, উদ্ভট, বিশৃঙ্খল ত্রুটি নির্দেশ করে। আমরা দেখব প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও কিসিঞ্জার উভয়ই বিভিন্ন সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে ধারণা করে নেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র যা তাদের পৃথক করে এবং দ্বিতীয়ত, অন্যকে (অবশিষ্ট পৃথিবীকে) নিয়ন্ত্রণ, ধারণ এবং না হলে (উন্নত জ্ঞান ও সুষমভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দ্বারা) পরিচালনা করার জন্যে পশ্চিমকে আমন্ত্রণ জানায়। কোনো পরিণতি ও কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যয়ে এ রকম শক্তিমুখিন বিভাজন বজায় রাখা হয়েছে তা এখন আর কাউকে মনে করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

আরেকটি উদাহরণ, যা নিখুঁতভাবে, হয়তো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, কিসিঞ্জারের বিশ্লেষণে জুড়ে দেয়া। *আমেরিকান জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি* ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি

সংখ্যায় হ্যারল্ড ডব্লিউ. গ্লিডেনের লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। গ্লিডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিসার্চ-এর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য বলে পরিচয় দেয়া হয়। নিবন্ধটির শিরোনাম (*দি আরব ওয়ার্ল্ড*), মূল সুর ও বিষয়বস্তু গভীরতর বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনের প্রবণতা তুলে ধরে। দুই কলামে চার পৃষ্ঠায় গত ১৩০০ বছরকে বিবেচনায় এনে ১০০ মিলিয়নেরও বেশিসংখ্যক লোকের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় তার মতের ঠিক চারটি উৎস উল্লেখ করেন : ত্রিপলীর ওপর লিখিত একখানি সাম্প্রতিক গ্রন্থ, মিশরীয় পত্রিকা *আল-আহরামের* একটি সংখ্যা, Oriente Moderno নামের একটি সাময়িকী এবং খ্যাতনামা প্রাচ্যতাত্ত্বিক মজিদ খাদুরির একটি বই। নিবন্ধটি তার মূল লক্ষ্য হিসাবে ইঙ্গিত করে "আরবদের আচরণের অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতা উন্মোচন", যা আমাদের নিকট 'অস্বাভাবিক' মনে হলেও ওদের কাছে 'স্বাভাবিক'। অনুকূল সূচনার পর আমাদের বলা হয়েছে যে, আরবরা সাদৃশ্যের ওপর জোর দেয়, ওরা লজ্জার সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে যাতে 'মর্যাদার পদ্ধতিটি' নির্ধারিত হয় অনুগামী ও খরিদ্দার যোগানোর সক্ষমতার হিসাবে (এক ফাঁকে আমাদের এও বলা হয় যে, আরব সমাজ এখন এবং বরাবরই মক্কেল-পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কভিত্তিক); আরবরা কেবল সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতেই কাজ করতে পারে, অন্যের ওপর আধিপত্য করার ক্ষমতায় সম্পূর্ণত নির্ভর করে তাদের মর্যাদা। লজ্জার সংস্কৃতি—অতএব, ইসলাম—প্রতিশোধকে গুণে পরিণত করেছে (এখানে তিনি উল্লসিত ভঙ্গিতে আল-আহরামের জুন ২৯, ১৯৭০ সালের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চান "১৯৬৯ সালে মিশরে সংঘটিত ১০৭০টি খুনের ঘটনায়, যেখানে অপরাধীরা ধরা পড়েছে, দেখা গেছে ২০ শতাংশ খুন হয়েছে লজ্জা মোচনের আকাঙ্ক্ষায়, ৩০ শতাংশ ঘটেছে প্রকৃত বা কাল্পনিক ভুল সংঘটিত করতে গিয়ে, এবং ৩১ শতাংশ রক্তের বদলা নেয়ার আকাঙ্ক্ষায়।) পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও "আরবদের জন্যে একমাত্র যৌক্তিক কাজ হল শান্তি স্থাপন... আরবদের জন্যে পরিস্থিতি ঐ ধরনের যুক্তিদ্বারা পরিচালিত নয়, কারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যমুখী হওয়ার বিষয়টি আরব সিস্টেমে কোনো মূল্যবোধ নয়।"

গ্লিডেন চালিয়ে যান, এরপর আরও আগ্রহের সাথে। লক্ষ্য করার মতো যে, আরব মূল্যবোধ প্রক্রিয়ায় যখন দলের মধ্যে পূর্ণ একাত্মতা দাবি করা হয়, তখন একই সাথে তা দলের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে রেষারেষিও উৎসাহিত করে, যা পরিণামে ঐ একাত্মতার ধ্বংস ডেকে আনে। আরব সমাজে কেবল সাফল্যের হিসেব হয়, পরিণতি উপায়কে বৈধ করে। আরবরা 'স্বাভাবিকভাবেই' এমন পৃথিবীতে বাস করে যা সর্বব্যাপী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত উদ্বেগে ভরপুর এক জগৎ; তা সাঁটিয়ে দিয়েছে অবাধ শত্রুতার লেবেল; "এড়িয়ে যাওয়ার কলাকৌশল আরবদের জীবনে, তেমনি ইসলামেও বিশেষ বিকাশ লাভ করেছে।" আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে আরবদের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, তা করতে না পারলে তারা 'আত্মধ্বংসী' লজ্জাবোধ করে। অতএব, যদি "পশ্চিমের লোকেরা মূল্যবোধের মাপকে শান্তিকে উঁচু আসনে বিবেচনা করে" এবং যদি "সময়ের মূল্য সম্পর্কে আমাদের থেকে তাকে উঁচু মানের সচেতনতা", তবে আরবদের ক্ষেত্রে তা সত্যি নয়। 'প্রকৃতপক্ষে', আমাদের বলা হয়, "আরবদের

উপজাতীয় সমাজে (যেখানে আরব মূল্যবোধের উৎপত্তি) শান্তি নয়, শত্রুতাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। কারণ তাদের অর্থনীতির প্রধান দুটো উপায়ের একটি ছিল লুটের অভিযান।" এ ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল কিভাবে পশ্চিমা ও প্রাচ্য মূল্যবোধের মাপকে উপাদানসমূহের সাপেক্ষ অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন" তা দেখানো।[১৭]

এ হল প্রাচ্যতাত্ত্বিক আত্মবিশ্বাসের দূরতম বিন্দু। কোনো তুচ্ছ সাধারণীকরণও সত্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রাচ্যজনের ওপর আরোপিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তালিকায় একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও নেই যা বাস্তব জগতের প্রাচ্যজনের উপর প্রয়োগ করা হয় না। একদিকে আছে *পাশ্চাত্যজন*, অন্যদিকে *আরব-প্রাচ্যজন;* প্রথমোক্তরা (বিশেষ কোনো *রীতিতে* নয়) বিচারবোধসম্পন্ন, শান্তিপ্রিয়, উদার, যুক্তিবাদী, প্রকৃত মূল্যবোধ লালনে সক্ষম, স্বাভাবিক সন্দেহ থেকে মুক্ত; দ্বিতীয়োক্তরা এর কোনোটাই নয়। প্রাচ্য সম্পর্কিত কোনো যৌথ অথচ বিশেষায়িত মতামত থেকে এ ধরনের মন্তব্য উদ্ভূত হয়েছে? ক্রোমার, বেলফোর ও আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার এমন সাদৃশ্য দিয়েছে কোন বিশেষ দক্ষতা, কোন কল্পজাগতিক চাপ, কোন প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুচ্ছ, কোন সাংস্কৃতিক শক্তি?

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

তথ্যসূত্র :

1. Thierry Desjardins, *Le Martyre du Liban* (Paris: Plon, 1976), p. 14.
2. K. M. Panikkar, *Asia and Western Dominance* (London: George Allen & Unwin, 1950).
3. Denys Hay, *Europe: The Emergence of an Idea*, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968).
4. Steven Marcus, *The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in Mid-Nineteenth Century England* (1966; reprint ed., New York: Bantam Books 1967), pp. 200-19.
5. দেখুন, আমার লেখা *Criticism Between Culture and System* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, প্রকাশিতব্য।
6. বিশেষত তার, *American Power and the New Mandarins: Historical and Political Essays* (New York: Pantheon Books, 1969) এবং *For Reasons of State* (New York: Pantheon Books, 1973).
7. Walter Benjamin, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*, trans. Harry Zohn (London: New Left Books, 1973), p. 71.
8. Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," *Hermathena* 116 (Winter 1973): 81-96.
9. *Diacritics* 6, no. 3 (Fall 1976) : 38-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকার।
10. Raymond Williams, *The Long Revolution* (London: Chatto & Windus, 1961), pp. 66-7.
11. আমার লেখা *Beginnings: Intention and Method* (New York: basic Books, 1975).
12. Louis Althusser, *For Marx*, trans. Ben Brewster (New York: Pantheon Books, 1969), pp. 65-7.
13. Raymond Schwab, *La Renaissance orientale* (Paris: Payot, 1950); Johann W. Fuck, *Die Arabischen Studien in Europa bis in den Angang des 20. Jahrhunderts* (Leipzig: Otto Harrassowitz, 1955); Dorothee Metlizki, *The Matter of Araby in Medieval England* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1977).

14. E. S. Shaffer. *"Kubla Khan" and The Fall of Jerusalem: The Mythological School in Biblical Criticism and Secular Literature, 1770-1880* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975).
15. George Eliot. *Middlemarch: A Study of Provincial Life* (1872; reprint. ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 164.
16. Antonio Gramsci. *The Prison Notebooks: Selections*, trans. and ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), p. 324. হোয়ের ও স্মিথের অনুবাদে বাদ যাওয়া পুরো অনুচ্ছেদটির জন্য: Gramsci, *Quaderni del Carcere*, ed. Valentino (Turin: Einaudi Editore, 1975), 2: 1363.
17. Raymond Williams, *Culture and Society, 1780-1950* (London : Chatto & Windus, 1958), p. 376.

কাল্পনিক ভূগোল ও তার প্রতিনিধিত্ব : প্রাচ্যের প্রাচ্যায়ন

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচ্যতত্ত্ব পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়। পশ্চিমে মনে করা হয় ১৩১২ সালে ভিয়েন চার্চ কাউন্সিল কর্তৃক "আরবি, গ্রীক, হিব্রু, সিরীয় বিষয়ে প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোগনা, এ্যাভিগন ও স্যালামঙ্কায়"[১৮] একটি করে চেয়ার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই প্রাচ্যতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক সূচনা এবং প্রাচ্যতত্ত্বের যে কোনো বিবরণে শুধু পেশাদার প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও তাদের রচনা অন্তর্ভুক্ত করলেই চলবে না, প্রাচ্য নামের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও জাতিগত ঐক্যভিত্তিক অধ্যয়নক্ষেত্র ধারণাটিও বিবেচনা করতে হবে। 'অধ্যয়নক্ষেত্র' অবশ্যই সৃষ্ট। এগুলো কালক্রমে ঐক্য ও আসঞ্জন শক্তি লাভ করে। কারণ পণ্ডিতরা এমন কিছুতে আত্ম-নিয়োগ করেন যাকে মনে হয় সর্বজন-গৃহীত বিষয়বস্তু। অবশ্য একটি কথা কখনো পরিষ্কার করে বলা হয় না যে, জ্ঞানক্ষেত্র বা অধ্যয়নক্ষেত্র কদাচিৎ অতো সরলভাবে সংজ্ঞায়িত, যতটা এর প্রতিশ্রুতিশীল অনুগামী যেমন, পণ্ডিতবর্গ, অধ্যাপকবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ প্রমুখ দাবি করেন। অন্যদিকে, একটি অধ্যয়নক্ষেত্র এমনকি ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস বা ঈশ্বরতত্ত্বের মতো প্রথাগত বিষয় আগাগোড়া এতটাই বদলে যেতে পারে যে, তার সর্বকাজে ব্যবহারযোগ্য বিষয়বস্তুর সংজ্ঞায়ন প্রায় অসম্ভব। এও প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় সত্যি, মনোগ্রাহী কিছু কারণে।

ভৌগোলিক অধ্যয়নের একটি বিষয় হিসেবে পণ্ডিতি বিশেষীকরণ প্রাচ্যতত্ত্বের বেলায় যথেষ্ট উন্মোচক, যেহেতু এর সমান্তরালে পাশ্চাত্যতত্ত্ব নামে কোনো অধ্যয়নক্ষেত্র কল্পনা করার সম্ভাবনা কম। বিশেষ করে এরই মধ্যে, হয়তো এমনকি প্রাচ্যতত্ত্বের স্ব-কেন্দ্রিক মনোভঙ্গিও প্রকাশ্য রূপ পেয়েছে। কারণ যদিও অনেক পণ্ডিতি বিষয় মানববস্তুর প্রতি নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত করে (যেমন, একজন ঐতিহাসিক বর্তমানের একটি সুবিধাজনক অবস্থান থেকে মানব-অতীত নিয়ে আলোচনা করেন), কিন্তু বিচিত্র রকমের সামাজিক, ভাষাগত, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নির্দিষ্ট—কমবেশি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক—অবস্থান গ্রহণের যথার্থ উপমা নেই। একজন ধ্রুপদমুখী, একজন রোমান্স বিশেষজ্ঞ, এমনকি একজন আমেরিকানবাদীও পৃথিবীর একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে দৃষ্টিপাত করবে, গোটা অর্ধেকটার ওপর নয়।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়টির সাথে জড়িয়ে আছে উল্লেখযোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ প্রথাগতভাবে মেতে আছেন প্রাচ্য বিষয়াদি নিয়ে (যারা নিজেদের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে অভিহিত করেন, তাদের নিকট ইসলামি আইনে একজন বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যতাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচিত এবং তিনি চীনা উপভাষা বা ভারতীয় ধর্ম বিশেষজ্ঞের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নন)। আমাদেরকে তাই শিখতে হবে কিভাবে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশাল, অপরিমেয় পরিধি এবং বিভাজন উপ-বিভাজনের প্রায় অসীম ক্ষমতা উপলব্ধিতে অবধারণ করা যায়:

বিভাজন ক্ষমতা এর একটি প্রধান স্বভাবও—এমন স্বভাব যা চোখে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী অস্পষ্টতা ও খুঁটিনাটি বিবরণের সন্দেহজনক মিশ্রণে।

এ সকল কিছুই প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়রূপে বর্ণনা করে। প্রাচ্যতত্ত্বে 'তত্ত্ব' অন্যান্য সকল বিষয় থেকে এ বিষয়টির পার্থক্যের ওপর জোর দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়রূপে এর বিকাশের বিধি হল এর ক্রমশ বর্ধিত পরিধি, বাছাইপ্রবণতা নয়। রেনেসাঁস পর্বে পেনিয়াস ও গুইলাম পোস্টাল ছিলেন বাইবেলোক্ত অঞ্চলসমূহের ভাষার প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ; যদিও পোস্টাল অহংকার করতেন যে তিনি চীন অবধি এশিয়া পাড়ি দিতে পারবেন কোনো দোভাষী ছাড়াই। কমবেশি আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইবেল-বিষয়ক পণ্ডিত ও সেমেটিক ভাষার ছাত্ররা ইসলাম এবং জেসুইটরা চীন বিষয়ে নতুন অধ্যয়ন শুরু করায়, চীনাবাদীরা হলেন প্রাচ্যতাত্ত্বিক।

শেষ-আঠারো শতকে অ্যাঁকুইতিল দুপেরন ও স্যার উইলিয়াম জোনস বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আবেস্তা ও সংস্কৃতের সমৃদ্ধি আবিষ্কার করার আগ পর্যন্ত এশিয়ার গোটা মধ্য এলাকাটি প্রাচ্যতত্ত্বের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জয় করা সম্ভব হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রাচ্যতত্ত্ব যতটা কল্পনা করা যায়, তেমনই বিশাল ধনাগারের মতো এক শিক্ষণীয় জ্ঞান-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই নতুন, বিজয়ী বাছাইকরণ প্রক্রিয়ার দুটো চমৎকার সূচি আছে। এর একটি হল *লা রেনেসাঁস অরিয়েন্টাল*[১৯]-এ রেমন্ড স্কোয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ১৭৬৫ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যবর্তী প্রাচ্যতত্ত্বের বর্ণনা। এ পর্বে ইউরোপের পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রাচ্য বস্তু-বিষয়াদির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একেবারে বাইরে অনিবার্যভাবে প্রাচ্যবিদ্যা-মহামারি আক্রান্ত করেছিল ঐ কালের সকল কবি, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিকদের। স্কোয়াবের মত হল—প্রাচ্যতত্ত্ব নির্দেশ করে এশীয় সকল কিছুর প্রতি অ-পেশাদার বা পেশাদার আগ্রহ—যা অদ্ভুত, রহস্যময়, গভীরতর। এ হল হাই রেনেসাঁসের কালে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন জগতের প্রতি ইউরোপের আগ্রহের উত্তরকালীন পুবমুখী দিকবদল। ১৮২৯ সালে ভিকটর হুগো এই পরিবর্তনকে এদিকে স্থাপন করেন তাঁর রচনায়।[২০] অতএব, উনিশ শতকের প্রাচ্যতাত্ত্বিক হয় একজন পণ্ডিত (একজন চীন-বিশেষজ্ঞ, একজন ইসলাম বিশেষজ্ঞ বা একজন ইন্দো-ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ) অথবা একজন তীক্ষ্ণধী আগ্রহী (যেমন হুগো *লেস অরিয়েন্টাল*-এ, *ওয়েস্টোস্টিসলার দিওয়ান*-এ গ্যোয়েটে)—অথবা উভয়ই (যেমন, রিচার্ড বার্টন, এডওয়ার্ড লেইন, ফ্রেডরিখ শ্লেগেল)।

ভিয়েনের কাউন্সিলের পর থেকে প্রাচ্যতত্ত্ব কতটা বিস্তৃত হয়েছে তার দ্বিতীয় সূচি পাওয়া যায় বিষয়টির উনিশ শতকী কালপঞ্জীতে। ঐ ধরনের কাজের মধ্যে সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জুলস মোহল-এর *ভিনটি ডি হিস্টয়ের ডি অরিয়েন্টাল...* প্রাচ্যতত্ত্বে ১৮৪০ থেকে ১৮৬৭[২১] সালের মধ্যে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য সবকিছু নিয়ে দুই ভলিউমের চমৎকার একটি লগবুক। প্যারিসের এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন মোহল। উনিশ শতকের প্রথম আধাআধিরও বেশি সময় জুড়ে (ওয়াল্টার বেনজামিনের মতে গোটা উনিশ শতক ধরে) প্যারিস ছিল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পৃথিবীর রাজধানী। সোসাইটিতে বাস্তবে সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন মোহল। ঐ সাতাশ বছরে কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত এশিয়াকে ছুঁয়ে এমন কোনো কাজ করেছেন কিনা

সন্দেহ যাতে 'কোনো-না-কোনো শিরোনামের' অধীনে নাক গলাননি মোহল। তার নাক গলানোটা অবশ্যই প্রকাশনার ব্যাপারে, তবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের আগ্রহ-বিষয়ক প্রকাশনার আওতা ছিল বিরাট। আরবি, অসংখ্য ভারতীয় উপভাষা, হিব্রু, পহলভি, *আসিরিয়*, বেবিলোনীয়, মঙ্গোলীয়, চীনা, বার্মিজ, মেসোপটেমীয়, *জাভানিজ বিশেষজ্ঞ : প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে বিবেচিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রায় অগুণিত*। এর ওপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আপাতভাবে বিভিন্ন রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনা থেকে শুরু করে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সকল জানা নতুন/পুরনো সভ্যতার মুদ্রা—বিজ্ঞানগত, নৃতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ও সাংস্কৃতিক গবেষণাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। গুস্তাভ দুগাত-এর রচনা (*Histoire des orientalistes de l'Euroe du XII au XIX siecle*, 1868-1879)[২২] এ সম্পর্কে বাছাইকৃত প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের আলোচনা। কিন্তু এর উপস্থাপিত ব্যাপ্তি মোহলের রচনার চেয়ে কম কিছু নয়।

যাহোক, এই বাছাইকরণের মধ্যে রয়ে গেছে কালো দাগ। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা অধিকাংশ সময়ই গবেষণাক্ষেত্রের সমাজ ও ভাষার প্রাচীন স্তরের প্রতিই আগ্রহী। এ বিষয়ে শতাব্দির শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের *ইন্‌স্টিটিউট ডি'ঈজিপ্ট* একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম; এটি এই প্রথম যথেষ্ট মনোযোগ দেয় আধুনিক বা বাস্তব প্রাচ্যের প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের প্রতি। এছাড়াও, অধীত প্রাচ্য আসলে এক কেতাবী পৃথিবী; প্রাচ্যের ছাপ অঙ্কিত হয় বই ও পাণ্ডুলিপির সাহায্যে, রেনেসাঁয় ধ্রুপদ গ্রীসের প্রভাব বিস্তারের মতো ভাস্কর্য ও কাব্যসাহিত্য জাতীয় শিল্পবস্তুর তোতা-অনুকরণের মতো নয়। এমনকি প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের পেশাগত সম্পর্কও ছিল কেবল কেতাবী—এমনই যে, শোনা যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে কয়েকজন জার্মান প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রথমবারের মতো (রচনার বাইরে প্রত্যক্ষে) আট হাত বিশিষ্ট একটি ভারতীয় মূর্তি দর্শনের পর চিরতরে তাদের প্রাচ্য-বিষয়ক আগ্রহের আরোগ্য ঘটে।[২৩]

যখন কোনো বিজ্ঞ প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশটি ভ্রমণ করেন তখন তার মানসিকতায় সক্রিয় থাকে তার অধীত ঐ 'সভ্যতার' পরিবর্তন-অযোগ্য বিমূর্ত নীতিকথাগুলো। স্থানীয়, ক্ষয়ে যাওয়া, উপলব্ধি করতে অক্ষম মানুষের মধ্যে অসার্থকভাবে ঐসব জীর্ণ সত্যোক্তি প্রয়োগ করে এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো বিসয়ের প্রতি কদাচিৎ আগ্রহী হন প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা। সবশেষে, প্রাচ্যতাত্ত্বিক শক্তি ও পরিধি প্রাচ্য সম্পর্কে কেবল যথাযথ ইতিবাচক জ্ঞানই সৃষ্টি করেনি, প্রাচ্যের গল্পকাহিনী, রহস্যময় পুবের পুরাণ, এশিয়ার রহস্যময় গভীরতার ধারণা প্রভৃতিতে প্রচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয় স্তরের এক ধরনের জ্ঞানেরও জন্ম দিয়েছে—যার রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা, ভি. জি. কিয়ার্নান যুৎসইভাবে যাকে বলেছেন, "প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপের যৌথ দিবা-স্বপ্ন"।[২৪]

এর একটি সুখকর ফলাফল হল, উনিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ প্রাচ্য বিষয়ে যথার্থ কৌতূহলী : আমি মনে করি হুগো, গ্যোয়েটে, নেরভাল, ফ্লবার্ত, ফিটজেরাল্ড-এর মতো লেখকদের রচনার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এ জাতীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখার একটি শ্রেণী ধরে নেয়া যথার্থ। এ ধরনের কাজের সাথে

অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকে মুক্ত কল্পনার প্রাচ্য-পুরাণ, যে প্রাচ্য কেবল সমকালীন মনোভাব ও জনপ্রিয় সংস্কার থেকেই নয়—ভিকোর ভাষায়, পণ্ডিতবর্গ ও জাতিসমূহের আত্ম-অহংবোধ থেকেও উদ্ভূত হয়েছে। আমি এরই মধ্যে ইঙ্গিত করেছি এ ধরনের বিষয়বস্তুর রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে, যে প্রবণতা দেখা দেয় বিশ শতকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচ্যতাত্ত্বিক নিজেকে যেভাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দিতেন, এখন আর সেভাবে পরিচয় দেয়ার কথা নয়। এ সত্ত্বেও অভিধাটি এখনো ব্যবহার উপযোগী, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাচ্য ভাষা বা প্রাচ্য সভ্যতার ওপর প্রকল্প বা বিভাগ পরিচালনা করে। অক্সফোর্ডে প্রাচ্য অনুষদ রয়েছে, প্রিন্সটনে আছে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগ। সম্প্রতি, ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার "বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পাভোনিক, পূর্ব-ইউরোপীয়, আফ্রিকান ও প্রাচ্যবিদ্যা-বিষয়ে অর্জিত উন্নতি সম্পর্কে মতামত... এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানের জন্যে" একটি কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান করে।[২৫] হেইটার রিপোর্ট শিরোনামে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত ঐ রিপোর্ট 'প্রাচ্য' নামে বিস্তৃত অভিধাটি নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়েছে বলে মনে হয়নি; বরং তা পর্যবেক্ষণ করে যে, ঐ অভিধাটি যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যকরভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। এমনকি আধুনিক অ্যাংলো-আমেরিকান ইসলামচর্চায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম এইচ. এ. আর. গিবও নিজেকে অ্যারাবিস্ট না বলে প্রাচ্যতাত্ত্বিক বলেন। 'এরিয়া স্টাডিজ' ও 'প্রাচ্যতত্ত্ব' যে পরস্পর বদল সম্ভব, ভৌগোলিক শিরোনামে অন্তত তা দেখানোর জন্যে ধ্রুপদ মানসিকতার গিব শেষ পর্যন্ত কুৎসিত নতুন-শব্দায়ন 'এরিয়া স্টাডিজ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন[২৬]। কিন্তু আমি মনে করি তা জ্ঞান ও ভূগোল-এর আকর্ষণীয় সম্পর্ককে সুচতুরভাবে বিপথগামী করে। সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই আমি।

বহু বিরাট বিরাট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও চিত্রকল্প ঝরে পড়া সত্ত্বেও মন নাছোড়বান্দার মতো— ক্লদে লেভিস্ট্রশের ভাষায় বিজ্ঞান গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।[২৭] যেমন, একটি আদিম উপজাতি তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বের প্রতিটি পত্রময় উদ্ভিদ প্রজাতির জন্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান, কাজ ও গুরুত্ব আরোপ করে। এসব ঘাসপাতার অনেকগুলোই কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু লেভি স্ট্রশ যুক্তি দেখান যে, মনের প্রয়োজন বিন্যাস, এবং বিন্যাস অর্জিত হয় সবকিছু বিচার করা ও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা এবং মন যে সব বিষয়ে সচেতন সেগুলোকে পুনরায় খুঁজে পাওয়া যায় এমন একটি নিরাপদ স্থানে জায়গা করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ পারিপার্শ্ব গঠনকারী বস্তুপুঞ্জের সংগঠনে জিনিসগুলোকে এক একটি ভূমিকা প্রদান করার মাধ্যমে। এ ধরনের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাজনের নিজস্ব যুক্তি আছে। কিন্তু যুক্তির যে রীতিনীতি দ্বারা সবুজ ফার্ণ এক সমাজে দয়ার প্রতীক অন্য সমাজে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয় তা যুক্তিনির্ভর নয়, নয় সর্বজনীন।

বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবধানকে যেভাবে দেখা হয় তাতে সবসময়ই পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী একটা মাত্রা থাকে। পার্থক্যের সাথে সম্পর্ক মূল্যবোধের, যার ইতিহাস, কেউ যদি সবটুকু খুঁড়ে বের করতে পারে, সম্ভবত স্বেচ্ছাচারিতার মতো একই আদর্শ প্রদর্শন করবে। ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব দেখা যায়। কেন পরচুলা, লেস-কলার, উঁচু বকলসের জুতো চালু হয় আবার দশকের ব্যবধানে হারিয়েও যায়? এর উত্তর কিছুটা উপযোগিতা আর

কিছুটা ফ্যাশনের সহজাত সৌন্দর্যে সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু আমরা যদি একমত হই যে, ইতিহাসের সমস্ত কিছু—যেমন ইতিহাসও মানুষের সৃষ্টি, তখন এ সত্য স্বীকার করে নেব যে, এটি কতই না সম্ভব যে, অনেক বস্তু বা স্থান বা কাল যাতে কোন ভূমিকা ও অর্থ আরোপ করা হবে তা বিষয়গত বৈধতা অর্জন করবে কেবল তার ওপর সে অর্থ ও ভূমিকা আরোপ করার পর। তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত বিষয় যেমন 'বিদেশি', 'রূপান্তরিত', বা 'অস্বাভাবিক' ব্যবহার-এর ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্যি।

এমন যুক্তি দেখানো যায় যে, কিছু বিশেষ বস্তু মনের সৃষ্টি এবং এই বস্তুগুলো—যখন বস্তুগতভাবে অস্তিত্বশীল বলে মনে হয়—থাকে কেবল কাল্পনিক বাস্তবতায়। কয়েক একর জমিতে বসবাসরত একদল মানুষ তাদের জমি ও সংলগ্ন পরিবেশ এবং এর বাইরের ভূমি—যাকে ওরা বলে অসভ্যদের দেশ—এর মাঝখানে সীমানা দেয়াল তুলবে। পরিচিত 'জায়গা'কে আমার এবং অপরিচিত জয়গাকে ওর বা ওদের বলে মনের মধ্যে চিহ্নিত করার এই সর্বজনীন রীতি হল ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া যা হতে পারে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। আমি 'স্বেচ্ছাচারী' শব্দটি ব্যবহার করলাম কারণ, 'আমাদের ভূমি—অসভ্যদের ভূমি' জাতীয় বিভাজনের কাল্পনিক ভূগোলে অসভ্যর পার্থক্য স্বীকার করে নেয়ার দরকার পড়ে না। 'আমাদের' নিজেদের মনে সীমানা চিহ্নিত করাই যথেষ্ট; 'ওরা' এমনিতেই 'ওরা' হয়ে যায়, এবং আমাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় ওদের এলাকা ও মানসিকতা। ক্ষেত্রবিশেষে মনে হয় আধুনিক ও আদিম সমাজ এরকম নেতিবাচকভাবে তাদের পরিচয়ের বোধ অর্জন করতো। পঞ্চম শতকের একজন এথেনীয় খুব সম্ভবত নিজেকে যতটা ইতিবাচকভাবে এথেনীয় ভাবতো ঠিক ততোটাই 'অবর্বর' মনে করতো নিজেকে। ভৌগোলিক সীমানা কাঙ্ক্ষিত পন্থায় সাথে করে আনে সামাজিক, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সীমানা। তবু যে বোধের ভেতর মানুষ নিজেকে বিদেশি ভাবে না তা নির্ভর করে ওখানে—তার নিজের সীমানার বাইরে—কী আছে সেই ধারণার ওপর? নিজের এলাকার বাইরে অপরিচিত এলাকায় মনে হয় ভিড় করে আছে সব দরে নেয়া 'অনুষঙ্গ' ও কল্পনা।

ফরাসি দার্শনিক গ্যাস্টন বাখলার্দ একটি বিশ্লেষণ লিখেন, যার নাম দেন 'পরিসর'-এর কাব্যতত্ত্ব।[২৮] একটা বাড়ির ভেতরটা সম্পর্কে মন (তিনি বলেন) অর্জন করে এক রকম ঘনিষ্ঠতার বোধ, গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা—বাস্তব বা কাল্পনিক যাই হোক। কারণ, তার অভিজ্ঞতা এর জন্যে সঠিক বলে মনে হয়। এ ঘরটির বস্তুগত পরিসর—এর কোণা, বারান্দা, সেলার, কক্ষসমূহ—প্রভৃতির ওপর কাব্যিকভাবে যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় ওগুলোর বাস্তব গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক কম। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা নাম করতে পারি বা অনুভব করতে পারি এমন কাল্পনিক বা পরিসংখ্যানগত মূল্যসহ কোনো গুণ, যা বাড়িটির ওপর আরোপিত হয়েছে—এভাবে একটি বাড়িকে মনে হতে পারে 'ভূতুড়ে' বা নিজের বাড়ির মতো কিংবা জেলখানা টাইপ অথবা জাদুর বাড়ি। অতএব, স্থান আবেগগত, এমনকি যৌক্তিক বোধ অর্জন করে কাব্যিক প্রক্রিয়ায়, যে উপায়ে অতিক্রান্ত বা নামহীন দূরত্ব অর্থবোধে রূপান্তরিত হচ্ছে। সময় নিয়ে ভাবার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। *বহুপূর্বে, শুরুতে, সময়ের শেষে* প্রভৃতি কালপর্ব সম্পর্কে আমরা যা বুঝি বা জানি তা কাব্যিক—বানানো। মিশরে মধ্য-

রাজবংশ সম্পর্কিত একজন ঐতিহাসিকের বেলায় 'বহুপূর্ব কাল' পরিষ্কার একটি অর্থ নির্দেশ করে। এ সত্ত্বেও, মানুষ নিজের সময় থেকে খুবই ভিন্ন ও দূরবর্তী কোনো সময় বিষয়ে লুক্কায়িত যে আধা-কাল্পনিক অবস্থা অনুভব করে তা কিন্তু ঐ অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। কারণ সন্দেহ নেই যে, কল্পনাময় ভূগোল ও ইতিহাস মনের সন্নিকটস্থ ও দূরবর্তীর মধ্যকার দূরত্ব ও পার্থক্য আরো নাটকীয় করার মধ্য দিয়ে মনকে তার নিজস্বতার বোধ শাণিত করতে সহায়তা করে। তা অন্য ক্ষেত্রেও কম সত্যি নয় : যেমন, এ ধরনের যেসব অনুভূতি আমরা প্রায়ই বোধ করি যে, আমরা ষোড়শ শতকে বা তাহিতি দ্বীপে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম।

তাই এমন ভান করা অর্থহীন যে, সময় ও স্থান, কিংবা বলা যায় ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে যা জানি তা কাল্পনিক ছাড়া অন্য কিছু। ইতিবাচক ইতিহাস ও ইতিবাচক ভূগোল বলে যে ব্যাপারগুলো রয়েছে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে তার অর্জন প্রভাবিত করার মতো উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতরা এখন পৃথিবী, তার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন, যতটা জানতেন গিবনের যুগে। এর অর্থ এই নয় যে, যা জানার আছে তার সবই তারা জেনে গেছেন; কিংবা আরো গুরুত্বপূর্ণ, এও নয় যে, কাল্পনিক জ্ঞান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানকে দূর করে দিয়েছে। এ ধরনের কাল্পনিক জ্ঞান ইতিহাস ও ভূগোলকে পরিসিক্ত করে, নাকি ওগুলো চাপা দিয়ে যায় সে সিদ্ধান্ত এখনই নেয়ার প্রয়োজন নেই। আপাতত শুধু এটুকু বলে রাখি যে, তা আছে এবং যা কেবল ইতিবাচক জ্ঞান বলে মনে হয় তার চেয়ে বেশি কিছুরূপে আছে।

প্রায় আদিকাল থেকে ইউরোপে প্রাচ্য ছিল অভিজ্ঞতা-নির্ভর জ্ঞানের চেয়েও বেশি কিছু। আর. ডব্লিউ সাউদার্ন চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে, অন্তত আঠারো শতকের প্রথমপাদে এক ধরনের ইসলামি প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ইউরোপের জ্ঞান ছিল অজ্ঞতাবোধক, কিন্তু জটিল।[২৯] তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ নয় বা খুব অবহিত নয়—প্রাচ্যের সাথে এমন একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক চারদিক থেকেই প্রাচ্য-বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা টেনে এনে জড়ো করেছে।

প্রথমে পশ্চিম ও প্রাচ্যের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারটি বিবেচনা করা যাক। *ইলিয়াডের* সময় থেকেই তা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত মনে হয়। প্রাচ্যের সাথে জড়িত সবচেয়ে প্রভাবশালী দুটো বৈশিষ্ট্য আদি এথেনীয় নাটকের নিদর্শন এস্কিলাসের *দি পার্সিয়ান* ও ইউরোপিদিসের *ব্যাকি*-তে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রীক সেনাবাহিনীর নিকট জেরেক্সেসের পরিচালনাধীন পারস্যের সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর পারসিয়ানদের ওপর দুর্যোগ নেমে আসার বোধ অভিব্যক্ত করেন এস্কিলাস।

কোরাসের কণ্ঠে শোনা যায় এ শোক সঙ্গীতটি :

এশিয়ার তাবৎ ভূমি এখন
শূন্যতায় গোঙায়।
জেরেক্সেস সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! ওহ! ওহ!
জেরেক্সেস ধ্বংস হয়েছে! ওহ্! ওহ্!
জেরেক্সেসের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ
সমুদ্রের জাহাজ সারিতে।
তাহলে কেন দারিয়ূস—

সুসার ঐ প্রিয় মানব-নেতা
তার লোকদের ক্ষতি করেনি
যখন সে তাদের যুদ্ধে চালিত করে।[৩০]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এশিয়া ইউরোপের কল্পনার গুণে ও কল্পনায় কথা বলছে, যে ইউরোপ চিত্রিত হয়েছে সমুদ্রের ওপারের শত্রু 'অন্য' পৃথিবী এশিয়ার ওপর বিজয়ীরূপে। এশিয়াকে দেয়া হয়েছে শূন্যতার অনুভূতি, ক্ষতি ও দুর্যোগ, যেন পশ্চিমের প্রতি প্রাচ্যের চ্যালেঞ্জকে অলঙ্কৃত করার জন্যে। এবং দেয়া হয়েছে এই বিলাপ যে, কোনো গৌরবোজ্জ্বল অতীতে এশিয়া ছিল শক্তিশালী, ইউরোপের ওপর বিজয়ী।

সবচেয়ে বেশি এশীয়কৃত নাটক *ব্যাকি*-তে ডায়োনিসাস পরিষ্কারভাবে এশীয় বংশতালিকায় সম্পর্কিত এবং অতিমাত্রিক প্রাচ্যরহস্যের সাথে জড়িত। থিবসের রাজা পেনথিউস তার মা অ্যাগেইভ এবং অনুগামী ব্যাকেন্টিসদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। ডায়োনিসাসের অসাধারণ ক্ষমতা বা স্বর্গীয় সত্তা অস্বীকার করে পেনথিউস ভয়াবহ শাস্তি প্রাপ্ত। নাটকটি শেষ হয় আত্মকেন্দ্রিক ঈশ্বরের ভয়ংকর ক্ষমতা স্বীকার করার মধ্যে দিয়ে। *দি ব্যাকি'র অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও নন্দন-তাত্ত্বিক প্রভাবের ব্যাপ্তি চিহ্নিত করণে ব্যর্থ হননি আধুনিক ভাষ্যকাররা*। কিন্তু এর অতিরিক্ত ঐতিহাসিক এই বিবরণও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যে, ইউরোপিদিস "নিশ্চয়ই এই নতুন জ্ঞানে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, বেন্ডিস, সিবিল, সাবাজিউস, এডোনিস ও আইসিসের আনন্দময় বিদেশি ধর্মমতের প্রভাবেই ডায়োনিসিয়ান গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল হয়তো। এই ধর্মমতগুলো আবার এশিয়া মাইনর ও লেভান্ত থেকে বিস্তৃত হয়েছে এবং পেলেপোনেশীয় যুদ্ধের হতাশাময়, ক্রমশ বিচার-বিবেচনাহীন বছরগুলোতে পিরাউস ও এথেন্স হয়ে পৌঁছেছে।[৩১]

নাটক দুটোর যে দুই বৈশিষ্ট্য নিয়ে পশ্চিমে প্রাচ্যের সূচনা হয় তা ইউরোপের কাল্পনিক ভূগোলে অনিবার্য উপাদান হিসেবে বহাল থাকে। দুই মহাদেশের মাঝখানে একটি রেখা টানা হয়ে যায়। ইউরোপ শক্তিশালী ও স্পষ্ট; এশিয়া পরাজিত ও দূর। এস্কিলাস এশিয়াকে উপস্থাপন করেন, জেরেক্সেসের বৃদ্ধা পারস্য রানীর মুখ দিয়ে এশিয়াকে কথা বলান। প্রাচ্যকে কথা বলিয়ে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে সে হল ইউরোপ। এই উচ্চারণ মর্যাদাজনিত বিশেষ অধিকার—পুতুল নাচিয়ের নয়—যথার্থ এক স্রষ্টার, যার জীবন-সঞ্চারী ক্ষমতা প্রতিনিধিত্ব ও প্রাণময় করে পরিচিত সীমানার বাইরের নীরব ও বিপজ্জনক এক জগতকে। নাট্যকারের কল্পনায় সৃষ্ট এশিয়ার ধারক এস্কিলাসের অর্কেস্ট্রা এবং বিস্তৃত, আকারহীন, এলোমেলো পড়ে-থাকা এশিয়াকে কখনো কখনো সহানুভূতিশীল, অধিকাংশ সময় আধিপত্যবাদী যাচাই-বাছাই-এর মধ্যে ধরে রাখা হয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতির যে বিজ্ঞ মোড়কে সে দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয়ত রয়েছে প্রাচ্যের আরেক প্রতিরূপ যেখানে সে পরোক্ষে উদ্যত বিপদস্বরূপ। সাধারণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে রহস্যময় ঐ আকর্ষণীয় বৈপরীত্য অর্থাৎ প্রাচ্যের অমিতাচার যুক্তিবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিম থেকে প্রাচ্যকে আলাদা করার যে পার্থক্য তাকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে অনমনীয়তা হিসেবে, যার বশে পেনথিউস প্রথমে ঐতিহাসিক ব্যাকেন্টিসদের বাতিল করে দেয়। পেনথিউসের ধ্বংসের কারণ যতটা না ডায়োনিসাসের নিকট আত্মসমর্পণ, তার চেয়ে বেশি ডায়োনিসাস-ভীতি

সম্পর্কে তার ভুল আন্দাজ। ইউরোপিদিস যে শিক্ষনীয় উদাহরণ দিতে চান তা নাট্যিক রূপ লাভ করেছে ক্যাডমাস ও টাইরেসিয়াসের উপস্থিতিতে, যে জ্ঞানী বৃদ্ধদ্বয় উপলব্ধি করে কেবল সার্বভৌমত্ব মানুষদের শাসন করে না[৩২], বিচার-বিবেচনার মতো ব্যাপার রয়েছে ওখানে; এর অর্থ হল ভিনদেশি শক্তি ও ক্ষমতাকে কব্জা করা এবং দক্ষতা সহকারে তার সাথে একটি বোঝাপড়ায় আসা। এরপর থেকে প্রাচ্যরহস্যকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয়, এজন্য নয় মোটেও যে, প্রাচ্যজনেরা যুক্তি-নির্ভর পশ্চিমা মনকে তার দীর্ঘায়ু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথে চ্যালেঞ্জ করে।

পশ্চিম ও প্রাচ্যের মতো বড়সড় বিভাজন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন ডেকে আনে, বিশেষত সভ্যতার সাধারণ উদ্যমসমূহে, যেমন—ভ্রমণ, বিজয়, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের মতো বহির্মুখী তৎপরতা উস্কে দেয়। ধ্রুপদ গ্রীস ও রোমে ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক সিজারের মতো জনব্যক্তিত্ব, বাগ্মী, কবিগণ গোত্র থেকে গোত্র, অঞ্চল থেকে অঞ্চল, মন থেকে মন, জাতি থেকে জাতিকে পৃথক করে শ্রেণীকরণবিদ্যার লৌকিক জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, যার বেশিরভাগটাই আত্ম-সেবামূলক, এবং রোমান ও গ্রীকদেরকে অন্য জাতের মানুষদের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য টিকে থাকে। কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের রয়েছে শ্রেণীবিভাজনের নিজস্ব ঐতিহ্য ও যাজকতন্ত্র। ঐতিহাসিক, পর্যটক, কৌতূহলী ও বিরামহীন ধারাবিবরক হেরোডটাস এবং বীর সম্রাট, বৈজ্ঞানিক, বিজেতা আলেকজান্ডার যে পূর্বে প্রাচ্যে এসেছিলেন সে ব্যাপারটি, অন্তত দ্বিতীয় খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে কোনো পর্যটক বা পুবমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়নি।

প্রাচ্য অতঃপর পূর্বে হেরোডটাস, আলেকজান্ডার ও তাদের অনুবর্তীদের জানা ও দেখা বিজিত অঞ্চলসমূহ এবং পূর্বে জানা হয়নি এমন সব অঞ্চলে উপবিভাজিত হয়। খ্রিস্টান ধর্ম প্রাচ্য-মধ্যস্থ স্তরগুলো সাজানো সম্পন্ন করে : একটি হয় নিকট প্রাচ্য, অন্যটি দূরপ্রাচ্য; একটি পরিচিত প্রাচ্য—যাকে রেনে প্রসেত বলেন, লেভান্ত, অন্যটি নতুন প্রাচ্য[৩৩]। অতপর মনের ভূগোলে প্রাচ্য অদল বদল হয় : পুরনো জগতরূপে—যেখানে মানুষ এডেন বা বেহেশতে প্রত্যাবর্তনের মতো ফিরে আসে পুরনোর একটি নতুন রূপ সৃষ্টি করার জন্যে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নতুন অঞ্চলরূপে যেখানে কেউ আসে; কলম্বাস যেমন আমেরিকায় এসেছিলেন তেমনভাবে নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার জন্যে (যদিও, শ্লেষাত্মক যে, কলম্বাস নিজে ভেবেছিলেন তিনি পুরনো পৃথিবীর একটা নতুন এলাকা আবিষ্কার করেছেন)। ঐ সব প্রাচ্যের কোনোটিই সম্পূর্ণ কেন-একটি বা সম্পূর্ণ অন্যটি নয়; এ হল তাদের দোলাচলবৃত্তিতা, প্রভাবক ইঙ্গিতময়তা—মনকে টানা ও দ্বিধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা; এগুলো আকর্ষণীয়।

দেখা যাক, প্রাচ্য—বিশেষ করে নিকট-প্রাচ্য সুদূর অতীত থেকে কিভাবে মহৎ শ্রদ্ধাবোধের বিপরীত রূপে পশ্চিমের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখানে বাইবেল ও খ্রিস্টধর্মের উত্থান ছিল, বাণিজ্য-পথ চিহ্নিতকারী এবং নিয়ম-কানুনের মধ্যে বাণিজ্যিক বিনিময়-পদ্ধতির প্রবর্তক মার্কোপলো ছিলেন—যার পর আগে ভারথেমা ও পিয়েত্রো, মিথ্যা-কথাকার ম্যান্ডেভিল ছিরেন, অবশ্যই দুর্ধর্ষ বিজয়ী প্রাচ্য আন্দোলনসমূহ বিশেষ ইসলাম ছিল, ছিল লড়াকু তীর্থযাত্রী ক্রুসেডারগণ। এসব অভিজ্ঞতাভুক্ত সাহিত্য থেকে সব মিলিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত একটি আর্কাইভ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বেরিয়ে

আসে সীমিতসংখ্যক নিদর্শনমূলক বলয়াধার : ভ্রমণ, ইতিহাস, নীতিকথা, নমুনা, তর্কবিদ্যাগত সংঘাত। এসব লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে; এগুলো রূপ দিয়েছে পুব ও পশ্চিমের সংস্পর্শের ভাষা, উপলব্ধি, ধরন। অসংখ্য দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে যা কিছুটা ঐক্য এনে দিয়েছে তা হচ্ছে দোলাচলবৃত্তিতা, একটু আগেই যে সম্পর্কে বলছিলাম।

চিহ্নিতভাবে ভিনদেশি ও দূর কোনো-কিছু কোনো-না-কোনো কারণে অর্জন করে স্বল্প-পরিচিত-এর চেয়ে বেশি কিছু মর্যাদা। সম্পূর্ণ অভিনব অথবা সম্পূর্ণ জানারূপে বিভিন্ন বিষয় বিচারের প্রবণতা লোপ পায়; নতুন, মাঝ বরাবর একটা ধরন দেখা দেয়—এমন একটি ধরন যা কাউকে নতুন কিছু—প্রথমবারের মতো দেখা কোনো-কিছুকে পূর্বে চেনা অন্য কিছুর নতুনরূপ হিসেবে দেখার সুযোগ করে দেয়। সারগত দিক থেকে এই ধরন যতটা-না নতুন তথ্য গ্রহণের উপায়, তার চেয়ে বেশি কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মতামতের প্রতি হুমকিস্বরূপ ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। মনকে যদি হঠাৎ করে জীবনের বৈপ্লবিক ধরনরূপে ভেবে নেয়া কিছু—যেমন আদি মধ্যযুগের ইউরোপের নিকট ইসলাম-এর মতো কিছুর মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হবে রক্ষণশীল ও আত্মরক্ষামূলক। ইসলাম বিবেচিত হয়েছে পুরনো অভিজ্ঞতা—এক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের জাল সংস্করণ হিসেবে। তাই হুমকিকে নির্বাক করা হয়, জানা মূল্যবোধসমূহ নিজেরাই আরোপিত হয় এবং সবশেষে মন চাপমুক্ত হয় বিষয়টিকে হয় প্রকৃত অথবা পুনরাবৃত হিসেবে তার নিজের পরিসরে জায়গা করে দিয়ে। এরপর ইসলামকে মোকাবেলা করা হয় যাতে থেকে যায় আপেক্ষিকভাবে সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্ব। তা অসম্ভব হত যদি-না এর কাঁচা নতুনত্বের ওপর মনোযোগ দেয়া হত। প্রাচ্য সামগ্রিকভাবে পরিচিত রূপের জন্যে পশ্চিমের ঘৃণা এবং নতুনত্ব বা অভিনবত্ব-এর জন্যে পশ্চিমের আনন্দ বা ভয়ের শিহরণের মধ্যে দোল খায়।

তবু যেখানে ইসলাম জড়িত সেখানে ইউরোপের ভীতি আছেই,—যদি সব সময় শ্রদ্ধা না হয়। ৬৩২ সালে মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের সামরিক এবং পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমে পারস্য, সিরিয়া ও মিশর, পরে তুরস্ক, এরপর উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ মুসলিম সেনাবাহিনীর পদানত হয়। স্পেন, সিসিলি, ফ্রান্সের অংশবিশেষ বিজিত হয় অষ্টম ও নবম শতকে। তেরো ও চৌদ্দ শতক নাগাদ পূর্বে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ইসলামি শাসন। এই অসাধারণ ও প্রবল আক্রমণের মুখে ভীতি ও সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রদর্শন ছাড়া ইউরোপ আর বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি। মুসলমানদের শিক্ষা, বনেদী সংস্কৃতি, অবিরল মহত্ত্বের ব্যাপারে (অপর্যাপ্ত আগ্রহ ছিল ইসলামের বিজয় প্রত্যক্ষকারী খ্রিস্টান লেখকদের) গিবন বলেছেন তা ছিল, "ইউরোপের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অলস-নিষ্ক্রিয় যুগের সমবয়সী"। (তবে কিঞ্চিৎ আত্মতুষ্টির সাথে তিনি যোগ করেন "যেহেতু পশ্চিমে বিজ্ঞানের সূর্য উদিত তাই প্রাচ্যবিদ্যা ক্ষয় ও অবনতিপ্রাপ্ত হবে বলে মনে হয়"।[৩৪]) পুবের সেনাবাহিনী সম্পর্কে খ্রিস্টানরা গৎবাঁধা ধরনের যা অনুভব করে তা হল ওদের (মুসলমানদের মধ্যে) "এক ঝাঁক মৌমাছির সব লক্ষণ রয়েছে, কিন্তু বিশাল একটি হাত দিয়ে ওরা সবই ধ্বংস করেছে": এরকম লিখেছেন একাদশ শতকের মন্টে ক্যাসিনোর এক পাদ্রী এরখেমবার্ত।[৩৫]

এমন নয় যে, ইসলাম এমন কিছুই করেনি যা ত্রাস, ধ্বংস, দৈত্যসুলভ, ঘৃণ্য, অসভ্য, বর্বর জাতির সাথে সাদৃশ্যময়। ইসলাম ইউরোপের কাছে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত। সতেরো শতকের শেষ পর্যন্ত পুরো খ্রিস্টীয় সভ্যতার জন্যে এক অবিচল বিপদস্বরূপ 'অটোমান বিপদের ঝুঁকি' ইউরোপের পাশাপাশি ওঁত পেতে থেকেছে। সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতা সেই বিপদের ঝুঁকি ও তার লৌকিক জ্ঞানভাণ্ডার, তার মহৎ ঘটনারাজি, পরিসংখ্যান, গুণাবলি ও অধর্মাত্মা জীবনের বুননে মিশে যাওয়া ব্যাপার হিসেবে আত্মীকৃত করেছে।

স্যামুয়েল চিউ তাঁর ধ্রুপদ কাজ *দি ক্রিসেন্ট অ্যান্ড দি রোজ*-এ অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন যে, কেবল রেনেসাঁর ইংল্যান্ডেই "গড়পড়তা মেধা ও শিক্ষার একজন লোক"-এর আঙ্গুলের ডগায় রয়েছে অটোমান ইসলামের ইতিহাসের তুলনামূলক বিপুলসংখ্যক অনুপুঙ্খ ঘটনাবলি। লন্ডন স্টেজে সে এসব দেখতেও পারে।[৩৬] লক্ষণীয় বিষয় হল, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত রয়ে গেছে ঐ বিরাট বিপজ্জনক শক্তির অনিবার্যভাবে খাটো করা রূপ যা ইউরোপের জন্যে প্রতীকায়িত। ওয়াল্টার স্কটের *সারাসিন*-এর মতো কাজের দ্বারা মুসলমান অটোমান বা আরবদের প্রতিনিধিত্বকরণ সবসময় দুর্দম প্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় মাত্র। নির্দিষ্ট একটি মাত্রা পর্যন্ত সমকালীন জ্ঞানী প্রাচ্যতাত্ত্বিকের ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কেও ঐ কথা সত্য, যাদের লক্ষ্য যতটা-না প্রাচ্য তার চেয়ে বেশি পশ্চিমের পড়ুয়া মানুষের নিকট প্রাচ্যায়িত প্রাচ্য—অতএব, কম-ভয়ংকর প্রাচ্য।

ভিন্ন দেশের এমন ঘরোয়া সংস্করণ সৃষ্টি বিশেষ বিতর্ককর বা নিন্দনীয় না; সকল সংস্কৃতিতে সকল মানুষের মধ্যে তা ঘটে। আমার লক্ষ্য ঐ সত্যের ওপর জোর দেয়া যে প্রাচ্যতাত্ত্বিক, তেমনি প্রাচ্য সম্পর্কে ভেবেছেন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এমন যে কোনো ইউরোপীয়, পশ্চিমা ব্যক্তি, এ জাতীয় মানসিক ক্রিয়া করেছেন। তবে এরচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সীমিতসংখ্যক শব্দাবলি ও কল্প-প্রতিমা, যেগুলো নিজেরাই পরিণতি হিসেবে আরোপিত হয়েছে। পশ্চিমে ইসলামকে গ্রহণের ভঙ্গিটি একটি নিখুঁত উদাহরণ যা পছন্দনীয়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন ডানিয়েল নরম্যান। যে সব খ্রিস্টান চিন্তাবিদ ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেন তাদের ওপর সক্রিয় বাধ্যবাধকতাগুলোর একটি হল সাদৃশ্য : যেহেতু যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি, তাই সম্পূর্ণ ভুলভাবে ধরে নেয়া হয় ইসলামেও তেমনি মোহাম্মদ। অতপর ইসলামের নাম দেয়া হয় মোহামেডানিজম এবং আপনাআপনি মোহাম্মদ সম্পর্কে 'ভণ্ড' আখ্যা প্রয়োগ হয়।[৩৭] এরকম আরো অনেক ভুল ধারণা মিলে একটি বলয় সৃষ্টি করেছে যার কাল্পনিক বহিরাবরণ কখনো ভাঙা হয়নি...। ইসলাম সম্পর্কে খ্রিস্ট ধর্মের উপলব্ধি একীভূত স্ব-নির্ভর।[৩৮] ইসলাম হয়ে ওঠে একটি ইমেজ; শব্দটি ডানিয়েলের। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সামগ্রিক প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে কথাটির প্রাসঙ্গিকতা আছে; এর কাজ ইসলামকে উপস্থাপন করা ততটা নয়, যতটা মধ্যযুগীয় খ্রিস্টানদের জন্যে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা।

> "কোরআন কী বোঝায় বা কী বোঝায় বলে মনে করে মুসলমানরা, কিংবা কোনো একটি পরিস্থিতিতে মুসলমানরা কী চিন্তা করে অথবা প্রত্যক্ষ করে তা উপেক্ষা করার অপরিবর্তনীয় প্রবণতা ইঙ্গিত করে যে কোরআন-কেন্দ্রিক ও অন্যান্য ইসলামি মতবাদ এমন এক ফর্মে উপস্থাপিত যে, তা খ্রিস্টানদের

> বিশ্বাস উৎপাদন করতো মনে হয়; ইসলামের সীমানার সাথে লেখক-জনতার দূরত্ব বাড়তে থাকায়, আরো অমিত ফর্ম গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস হিসেবে যা বর্ণনা করে তারা যে তা বিশ্বাসও করে এমন মত প্রবল অনিচ্ছায় মেনে নেয়া হয়। খ্রিস্টিয় চিত্রটিও আছে, যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ (এমনকি সত্য ঘটনারাজির চাপের মুখেও) বর্ণনা যত সম্ভব বাদ দেয়া হয় না এবং সাধারণ বাহ্যিক সীমারেখা পরিত্যাগ করা হয় না। ওখানে মতভেদের ছায়া আছে, তবে কেবল একটি সাধারণ কাঠামোর ভেতরে। ক্রমবর্ধমান ক্রটিহীনতার স্বার্থে আনীত সকল সংশোধন আসলে আক্রান্ত হওয়ার মতো দুর্বলতা উপলব্ধি করায় গৃহীত ব্যবস্থা : তার নিরাপত্তা বিধান, দুর্বল কাঠামোয় কিনারা তুলে দেয়া। খ্রিস্টিয় মত এমন একটি উত্থিত জিনিস যা ধ্বংস করা যাবে না—পুনর্নির্মাণও না।"[৩৯]

মধ্যযুগ ও রেনেসাঁর প্রথম পর্বে—বিচিত্র কবিতা, পণ্ডিতি বিতর্ক ও জনপ্রিয় কুসংস্কারসহ অসংখ্য উপায়ে আরো তীব্র হয় ইসলামের এই কঠোর খ্রিস্টিয় চিত্রটি।[৪০] এর মধ্যে নিকটপ্রাচ্য লাতিন-খ্রিস্টিয়ানিটির জগৎচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়া বাকি সব সম্পন্ন হয়ে গেছে। যেমন, *চ্যানসন ডি রোলান্ড*-এ সারাসিন-এর স্তব চিত্রিত হয়েছে আলিঙ্গনরত মোহাম্মদ ও এপোলো হিসেবে। আর. ডব্লিউ. সাউদার্ন সুন্দর বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় সিরিয়াস ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রকাশ্যে অভিপ্রায় দেখা দেয় যে, "ইসলামের ব্যাপার নিয়ে একা কিছু করতে হবে"। এ প্রবণতায় পরিস্থিতি মোড় নিয়ে পূর্ব-ইউরোপে সামরিক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়।

সাউদার্ন ১৪৫০ থেকে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের একটি নাটুকে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। এ সময় চার পণ্ডিত জন অব সেগোভিয়া, নিকোলাস অব কুসা, জ্যাঁ জারমেই ও অ্যানিস সিলভিয়াস (দ্বিতীয় পায়াস) সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামের সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন। ধারণাটি জন অব সেগোভিয়ার : মঞ্চে সম্মেলন করা। এবং এতে খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে পাইকারি হারে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। "সম্মেলনকে তিনি মনে করেন রাজনৈতিক ও একইসাথে ধর্মীয় কার্যকারিতা সমৃদ্ধ একটি হাতিয়ার, যা এক কথায় আধুনিক হৃদয়ে সহানুভূতি জাগাবে। তিনি হর্ষ প্রকাশ করেন, এমনকি তা যদি দশ বছরও টিকে থাকে তাহলে তা হবে যুদ্ধের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ ও কম ক্ষতিকর।"

চার পণ্ডিতের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়নি। তবু ইউরোপের নিকট প্রতিনিধিত্বশীল প্রাচ্যকে উপস্থাপনের জন্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিশোধিত প্রয়াস চালানোর কারণে—বেদে থেকে লুথার পর্যন্ত সামগ্রিক ইউরোপীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে—প্রাচ্য ও ইউরোপকে কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত করে একত্রে প্রদর্শন করানোর লক্ষ্যে এই উপাখ্যান খুব গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা ছিল মুসলমানদের বোঝানো যে, ইসলাম খ্রিস্টধর্মের পথভ্রষ্ট একটি রূপ মাত্র। সাউদার্ন উপসংহার টানেন :

> আমাদের নিকট সব থেকে সন্দেহজনক ব্যাপার হল যা (ইসলাম) ব্যাখ্যা করার জন্যে তারা তৎপরতা শুরু করে, তার পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানে তাদের চিন্তা-পদ্ধতির ব্যর্থতা, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করা তো দূরে থাক। বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষকদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাস্তবে ঘটনাসমূহ খুব

> খারাপ বা খুব ভালো হয়ে দেখা দেয়নি। এবং এ হয়তো উল্লেখ করার মতোও নয় যে, ওদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারকরা যখন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি সুসমাপ্তির আশা করছিলেন তখনো তা বিশেষ ভালো কিছু হয়ে ওঠেনি। ঐ সময় (ইসলাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের জ্ঞানভাণ্ডারের) কোনো উন্নতি সাধিত হয় কি? আমার ধারণা উন্নতি হয়। এমনকি সমস্যার সমাধান একগুঁয়েভাবে দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেলেও তার সমস্যার ভাষ্য আরো জটিল আরো অভিজ্ঞতা-ঘেঁষা রূপ নেয়। মধ্যযুগে ইসলামকেন্দ্রিক সমস্যা দূরীকরণে শ্রম দিয়েছিলেন যেসব পণ্ডিত তাদের উদ্দীষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত সমাধান খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন তারা। কিন্তু তারা এমন এক মানস-প্রকৃতি ও উপলব্ধি-ক্ষমতা অর্জন করেন যা অন্যদের মধ্যে, অন্য বিষয়ে সাফল্য অর্জনের দাবি রাখে।[৪১]

ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এ স্থলে এবং অন্যত্র সাউদার্নের বিশ্লেষণের সবচেয়ে উত্তম অংশটি হল যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, পরিশেষে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমের অজ্ঞতাই জটিল ও পরিশোধিত হয়েছে, ক্রমশ স্ফীতকায় ও যথাযথ হয়ে-ওঠা পশ্চিমা জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো ইতিবাচক স্তর রচিত হয়নি। কারণ গল্পকাহিনীর নিজস্ব যুক্তিবিদ্যা আছে, উন্নতি বা পতনের নিজস্ব দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আছে। মধ্যযুগে মোহাম্মদের চরিত্রের ওপর রাশি রাশি বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয় "মূলত (বারো শতকের) 'মুক্ত আত্মার' এক নবীর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রেখে যিনি ইউরোপে আবির্ভূত হন এবং বিশ্বাস উৎপাদন ও ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করেন"। অনুরূপভাবে, যেহেতু মোহাম্মদ ভূয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের প্রচারক বলে বিবেচিত, তিনি হয়ে ওঠেন যৌন-উচ্ছৃঙ্খলা, সমকাম ও লাম্পট্যের সারাৎসার এবং বিভিন্ন ধরনের গোটা একরাশ বিশ্বাসঘাতকতার সমাহার, যার সবই 'যৌক্তিকভাবে' তার ভাবাদর্শগত প্রতারণা থেকেই উদ্ভূত।[৪২] এভাবে প্রাচ্য অর্জন করে প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্ব—যার প্রত্যেকটি পূর্বের চেয়ে নিরেট, অভ্যন্তরীণভাবে পশ্চিমের কোনো-না-কোনো জরুরি পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে আরো সুষম। গোটা ব্যাপারটি এমন যে, অসীমকে সীমিত কাঠামোয় মূর্ত করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে প্রাচ্যে একবার গেড়ে বসার পর তার অভ্যাস আর বদলাতে পারেনি ইউরোপ; প্রাচ্য, প্রাচ্যজন, আরব, ইসলামি, ভারতীয়, চীনা যাই হোক সেগুলো হয়ে ওঠে কোনো বিরাট আদির ছদ্ম-প্রতিমায়ন—আদতে যার অনুকরণ করার কথা ছিল তাদের। প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের এই আত্মকামমূলক ভাবাদর্শের চরিত্র বদলায়নি, সময়ে উৎস বদলেছে মাত্র। এভাবে আমরা দেখব বারো ও তেরো শতকে সর্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হত আরব "খ্রিস্টান জগতের বহির্ভাগ মাত্র, বিরুদ্ধবাদী দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল"।[৪৩] এবং মোহাম্মদ হলেন পূর্ববর্তী বিশ্বাসের (খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের) কুৎসারটনাকারী ধূর্ত এক চরিত্র; আবার কুড়ি শতকের মহাজ্ঞানীভাবাপন্ন জনৈক প্রাচ্যতাত্ত্বিক হলেন আরেক পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি দেখান ইসলাম আসলে দ্বিতীয় সারির আর্য-বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৪]

শুরুতে আমরা প্রাচ্যতত্ত্বকে পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়রূপে যে বর্ণনা করেছিলাম এখন তা আরো যৌক্তিক ভিত্তি লাভ করল। বিষয় বা অধ্যয়নক্ষেত্র সবসময় একটি বদ্ধ পরিসর। প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি নাটকীয় : প্রাচ্য হল নাট্যমঞ্চ, যেখানে গোটা পুব বন্দি। এই মঞ্চে

বিভিন্ন চরিত্র আরোহণ করবে যার ভূমিকা হবে সেই বৃহত্তর সমগ্রের প্রতিনিধিত্ব যা থেকে তারা উদ্ভূত। তাহলে মনে হয় প্রাচ্য পরিচিত ইউরোপীয় জগতের বাইরের কোনো অসীম বিস্তার নয়, বরং একটি বদ্ধ ক্ষেত্র, ইউরোপের সামনে গড়া একটি নাট্যমঞ্চ। প্রাচ্যতাত্ত্বিক একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, বৃহত্তর অর্থে সে বিশেষজ্ঞতার জন্যে দায়ী হল ইউরোপ, ঠিক যেভাবে একজন নাট্যকার কর্তৃক বিভিন্ন কারিগরী উপায়ে সৃষ্ট নাটকের জন্যে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে দায়ী (ও সংবেদনশীল) হলেন তার দর্শকরা। এই প্রাচ্য নাট্যমঞ্চের গভীরে রয়েছে বিশাল এক সাংস্কৃতিক ভাণ্ড যার প্রতিটি ধরন জাগিয়ে তুলেছে কল্পকথার রীতিতে সমৃদ্ধ এক পৃথিবী : স্ফিংস, ক্লিওপেট্রা, এডেন, ট্রয়, সমকাম ও গোমরাহ্, অ্যাস্তারতে, আইসিস ও আসিরিস, শেবা, জিনি, ম্যাগি, নিনেভাহ্, প্রেসট্যা জন, মেহমুত, আরো ডজন ডজন : সাজানো, কতক ক্ষেত্রে আছে কেবল নামগুলো— আধা-কল্পিত, আধা-জানা : দৈত্য, শয়তান, নায়কগণ; ত্রাস, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা। এই সাংস্কৃতিক ভাণ্ডের দ্বারা বিপুলভাবে উর্বর হয়েছে ইউরোপীয় কল্পনাশক্তি। মধ্যযুগ থেকে আঠারো শতকের মধ্যে আরিয়োস্তা, মিল্টন, মার্লো, টাসো, শেক্সপিয়র, সার্ভেন্টিসের মতো লেখক এবং *চেনসন ডি রোলান্ডো ও পোয়েমা ডেল সিড*-এর রচয়িতারা তাদের সৃষ্টির জন্যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধি থেকে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যা প্রাচ্যের চরিত্রসমূহ, কল্পনা, ধারণা তীক্ষ্ণতর করেছে। এছাড়াও ইউরোপের বিবেচনায় জ্ঞানগর্ভ প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতিও প্রচুর মিথকে কাজে লাগিয়েছে, এমনকি যখন আন্তরিকভাবেই মনে হয়েছে যে, জ্ঞান উন্নত হচ্ছে।

প্রাচ্য নাট্যমঞ্চে কিভাবে নাটকীয় কাঠামো ও পণ্ডিতি কল্প-মূর্তি একত্রে উঠে আসে তার একটি জনপ্রিয় উদাহরণ হল বার্থলেমি ডি হারবেলটের *বিবলিওথিক অরিয়েন্টাল;* লেখকের মৃত্যুর পর এন্টয়েন গ্যালান্ডের ভূমিকাসহ ১৬৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এটি। *ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম*-এর মতে সেল-এর কোরআন অনুবাদের প্রাথমিক আলোচনা ও সিমন অকলির *হিস্টরি অব সারাসিন* (১৭০৮-১৭১৮) সহ *বিবলিওথিক* 'ইসলাম সম্পর্কিত নতুন উপলব্ধির প্রসার' ও 'অ-প্রাতিষ্ঠানিক পাঠক-বৃত্তে' ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'।[৪৫]

এ রকম মন্তব্য ডি হারবেলটের কাজের অপর্যাপ্ত বর্ণনা দেয় মাত্র। তার গ্রন্থটি সেল ও অকলির রচনার মতো কেবল ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত জোহান এইচ. হটিংগারের *হিস্টরিয়া অরিয়েন্টালিস্‌কে* বাদ দিলে *বিবলিওথিক* ইউরোপে আদর্শ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পরিধি সত্যিকার অর্থেই যুগারম্ভমূলক। *থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস*-এর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদক গুরুত্বপূর্ণ আরববিদ গ্যালান্ড নিজে ডি হারবেলটের কাজের বিপুল আওতা তুলে ধরে তার কৃতিত্বকে পূর্ববর্তী প্রতিটি কাজের সাথে তুলনা করেন। গ্যালান্ড লিখেন যে, হারবেলট আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষার বহুসংখ্যক রচনা পাঠ করেন। এর ফলে ইউরোপীয়দের নিকট এ যাবৎ গোপন বিষয়সমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হন তিনি।[৪৬] এ তিনটি ভাষার একটি অভিধান রচনার পর ডি হারবেলট প্রাচ্যের ইতিহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কল্পকাহিনী ও বাস্তবভিত্তিক আখ্যানসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দুটো গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নেন : একটি *বিবলিওথিক* বা লাইব্রেরি—অক্ষরক্রমে সাজানো একটি

অভিধান, অন্যটি নির্বাচিত রচনার সংকলন। কেবল প্রথমোক্ত গ্রন্থটিই রচিত হয়। *বিবলিওথিক*-এর বর্ণনা দিতে গ্যালান্ড লিখেছেন যে, গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছিল প্রধানত লেভান্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে, যদিও আওতাভুক্ত কালপর্ব কেবল আদমের সৃষ্টি থেকে শুরু করে "আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়"-এ শেষ করেননি। ডি হারবেলট আরো পিছিয়ে 'প্লাস ঔট' নামে বর্ণিত কল্পকথার ইতিহাস—আদমের পূববর্তী সলিমান-এর দীর্ঘযুগে চলে যান। গ্যালান্ড-এর বর্ণনা অগ্রসর হলে জানতে পারি *বিবলিওথিক* পৃথিবীর যে কোনো সামগ্রিক ইতিহাস-এর মতোই, যেহেতু এরও লক্ষ্য ছিল সৃষ্টি, মহাপ্লাবন, বাবেলের পতন—এসব বিষয়ে প্রাপ্ত জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ সমাবেশকরণ। পার্থক্য এই যে, ডি হারবেলটের ব্যবহৃত উৎসসমূহ প্রাচ্যের।

তিনি ইতিহাসকে দুটো ধরনে ভাগ করেন : পবিত্র ও অপবিত্র (প্রথমটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের, দ্বিতীয়টি মুসলমানদের), অতঃপর দুটো পর্ব—প্রাক ও উত্তর-ভিলুভিয়ানে বিভক্ত করেন। এভাবে ব্যাপক, বিচিত্র বিপথগামী ইতিহাস যেমন—মোগল, তাতার, তুর্কি ও পাভোনিক ইতিহাস আলোচনা করতে সমর্থ হন ডি হারবেলট। তিনি মুসলমান সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশও অন্তর্ভুক্ত করেন : দূরবর্তী প্রাচ্য থেকে শুরু করে হারকিউলিসের পিলার পর্যন্ত তাদের আচার-প্রথা, ঐতিহ্য, ভাষা, শাসকগোষ্ঠী, প্রাসাদসমূহ, নদী, উদ্ভিদকূলও। *বিবলিওথিক* তার পূর্ববর্তী যে কোনো রচনার চেয়ে বিস্তৃতভাবে সামগ্রিক।

গ্যালান্ড পরিশেষে (পাঠকদের এই মর্মে নিশ্চয়তা দিয়ে) তার 'আলোচনা' শেষ করেন যে, ডি হারবেলটের *বিবলিওথিক* "অনুপমভাবে *চমৎকার ও কার্যকর*" ; পোস্টাল, স্কেলিগার, গলিয়াস, পোকক ও এরপিনিয়াসের মতো অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণের সৃষ্টি সঙ্কীর্ণভাবে ব্যাকরণিক, আভিধানিক, ভৌগোলিক বা এমন কিছু। কেবল ডি হারবেলটই এমন এক গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হন যা ইউরোপীয়দের বোঝাতে পারে যে, প্রাচ্য-সংস্কৃতি-সম্পর্কিত লেখালেখি প্রশংসাহীন ও নিষ্ফলা নয়। গ্যালান্ডের মতে প্রাচ্যকে জানা ও অধ্যয়ন করা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কেবল ডি হারবেলটই পাঠকের মনে পরিষ্কার সন্তোষজনক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন—এমন ধারণা যা মনকে পূর্ণ করে, পূর্ব-লালিত আকাঙ্ক্ষারও মোচন ঘটায়।[৪৭]

হারবেলটের কাজের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে ইউরোপ প্রাচ্যকে সামগ্রিকভাবে অবধারণ ও প্রাচ্যকরণের সামর্থ্য আবিষ্কার করে। (প্রাচ্যজনের তুলনায় পশ্চিমাদের) উৎকর্ষের বোধ প্রকাশ পায় গ্যালান্ডের নিজের ও ডি হারবেলটের *ম্যাটেরিয়াল অরিয়েন্টাল* সম্পর্কিত আলোচনায়; যেমন, সতেরো শতকের ভূগোলবিদ রাফায়েল দু' মান-এর লেখায় ইউরোপীয়রা ধারণা করতে পারে যে, পশ্চিমা বিজ্ঞান প্রাচ্যকে পেছনে ফেলে যাচ্ছে, সেকেলে করে তুলছে।[৪৮] কিন্তু কেবল পশ্চিমা পরিপ্রেক্ষিতের সুবিধার লক্ষণই দেখা দেয়নি : প্রাচ্যের উর্বরতা আত্মসাৎ করার বিজয়ী কৌশলও উদ্ভূত হয় এবং তা পদ্ধতিগতভাবে, এমনকি, অক্ষরক্রমানুসারে সাধারণ পশ্চিমাদের আয়ত্ত করানোর প্রবণতা দেখা দেয়।

যখন গ্যালান্ড ডি হারবেলট সম্পর্কে বলেন যে, তিনি পাঠকদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন, আমার ধারণা তিনি বোঝাতে চান যে, *বিবলিওথিক* প্রাচ্য সম্পর্কে সর্বজনীনভাবে গৃহীত সাধারণ ধারণাসমূহ পুনরাবৃত্তি করে না। কারণ, প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার পাঠকের চোখে প্রাচ্যকে নিশ্চিত করেন; তিনি এরই মধ্যে গৃহীত দৃঢ় বিশ্বাস উল্টে দিতে চান না, চেষ্টাও

করেন না। *বিবলিওথিক* যা করে তা হল আরো পূর্ণাঙ্গ ও পরিচ্ছিন্নভাবে প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্বকরণ : হয়তো অস্পষ্ট লেভান্তীয় ইতিহাসের ঘটনারাজি থেকে অনিয়মিতভাবে গৃহীত ঘটনাবলি, প্রাচীন কল্প-প্রতিমা, ইসলামি সংস্কৃতি, স্থান-নাম ইত্যাদির শিথিল সংগ্রহ যা রূপান্তরিত হয় একটি যৌক্তিক 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রাচ্য দৃশ্যরাজির সমাহারে। মোহাম্মদ শিরোনামে ডি হারবেলট প্রথমে নবীর আখ্যাগুলো সরবরাহ করেন, অতঃপর মোহাম্মদের ভাব ও মতাদর্শগত মূল্য নিশ্চিত করেন এভাবে :

> এই সেই ভণ্ড মেহমুত, (খ্রিস্টান) বিরোধী মতের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থলেখক, যা ধর্মের নাম নিয়েছে, যাকে আমরা বলি মোহামেডান। [ইসলাম-এ দেখুন] আর্য, পলেশীয় বা পলিয়ানিস্ট ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধবাদীরা যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত করার সময় তার যে সব প্রশংসা করেছে, কোরআনের অনুবাদক ও মোহামেডান আইন বা ইসলাম বিশেষজ্ঞরা তাই আরোপ করেছে এই ভণ্ড নবীর ওপরও...।[৪৯]

মোহামেডান শিরোনামটি প্রাসঙ্গিক এবং অপমানকর ইউরোপীয় আখ্যা; সঠিক নাম 'ইসলাম' ঠেলে দেয়া হয়েছে অন্য এন্ট্রিতে। "বিরুদ্ধবাদিতা... যাকে আমরা বলি মোহামেডান" ধরা পড়েছে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের অনুকরণেরও অনুকরণে। অতঃপর মোহাম্মদ-এর জীবনীর দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবরণে ডি হারবেলট সরাসরি বর্ণনার কৌশল নেন। তবে *বিবলিওথিকে* মোহাম্মদকে প্রদত্ত অবস্থানটিই জরুরি বিষয়। অবাধ বিরুদ্ধবাদিতাকে যখন অক্ষরক্রমিক কাঠামোয় একটি শিরোনাম করার জন্যে পরিষ্কার ভাবাদর্শিক বিষয়ে রূপান্তরিত করা হয় তখন এর বিপদের দিকটি অনুল্লিখিত থাকে। মোহাম্মদ আর হুমকিস্বরূপ নীতিহীন, লম্পটরূপে পুবের পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান না, তিনি প্রাচ্য-নাট্যমঞ্চে তার অংশের নির্ধারিত (স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ) আসনে চুপচাপ উপবিষ্ট[৫০]; তাকে দেয়া হয়েছে একটি বংশপরিচয়, এক দফা ব্যাখ্যা, এমনকি কিছুই উন্নতি—সবই এমন একটি সরল ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত যা তাকে অন্য কোথাও অবস্থান গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের চিত্রকল্প খুবই বৃহত্তর সত্তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে : সে সত্তা এমন যে, তাকে এ জাতীয় চিত্রকল্পের সাহায্যে ধরার আগ পর্যন্ত চারদিকে অসম্ভব রকম ছড়ানো-ছিটানো থাকে। সুতরাং, ধরনের চিত্রকল্প ও সত্তাকে সীমাচিহ্নিত করে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। এগুলো আবার থিওফ্রেস্টাস, লা ব্রায়ার বা লেডেনের অসার দাম্ভিক, কঞ্জুস বা পেটুক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত চরিত্রও। হয়তো এমন বলা ঠিক হবে না যে, মানুষ এসব চরিত্রকে মাইলস গ্লোরিয়াস বা ভণ্ড মোহাম্মদের মতো করে দেখে। কারণ অপ্রামাণ্য যুক্তিতর্কে অবরুদ্ধ কোনো চরিত্রের বর্ণনা পাঠককে বড়জোর কোনো জটিলতা বা অস্পষ্টতা ছাড়াই এ জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে এক ধরনের বর্গীয় ধারণা পেতে সহায়তা করে। ডি হারবেলট সৃষ্ট মেহমুত চরিত্রটিও চিত্রকল্প মাত্র। কারণ ভণ্ড নবী 'প্রাচ্যদেশীয়' নামের সামগ্রিক নাট্যিক প্রতিনিধিত্বেরই অংশ যার সমগ্রতা ধারণ করে আছে *বিবলিওথিক*।

প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিনিধিত্বের নীতিশিক্ষামূলক গুণটিকে পুরো নাট্যাভিনয় থেকে আলাদা করা যাবে না। সুশৃঙ্খল পড়াশোনা ও গবেষণার ফলস্বরূপ সৃষ্ট *বিবলিওথিক*-এর মতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় লেখক তাঁর অধীত বিষয়গুলোর ওপর যথাযথ বিন্যাস আরোপ করেছেন; তা ছাড়া তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, মুদ্রিত

পৃষ্ঠাগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরবরাহ করছে শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত সুচিন্তিত বিবেচনা। এভাবে *বিবলিওথিক* ধারণা দেয় প্রাচ্যতত্ত্বের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে, যা পাঠককে সর্বত্র মনে করিয়ে দেয় যে, প্রাচ্যে পৌঁছতে হলে তাকে অবশ্যই পার হয়ে যেতে হবে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পণ্ডিতি ছাঁকনি ও সংকেতলিখন। প্রাচ্যকে কেবল পশ্চিমা খ্রিস্টান ধর্মের জরুরি নৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়েই নেয়া হয়নি, পশ্চিমা মানসিকতা থেকে প্রেরিত একগুচ্ছ মনোভঙ্গি ও বিচার-বিবেচনার দ্বারা এর চারপাশে সীমারেখাও টেনে দেয়া হয়। কিন্তু পশ্চিমা মনোভঙ্গি ও বিচার-বিবেচনা সঠিক কিনা তা যাচাই ও সংশোধনের জন্যে প্রাচ্যের কোনো উৎসের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়নি, বরং পাঠানো হয়েছে অন্যসব প্রাচ্যতাত্ত্বিক রচনার নিকট। প্রাচ্যতাত্ত্বিক নাট্যমঞ্চ—যে নামে একে অভিহিত করছি আমি, নৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার একটি পদ্ধতিতে পরিণত হয়। এভাবে প্রাচ্য-সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক পশ্চিমা জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বকারী বিষয় হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব তিনমুখী শক্তি খাটায় : প্রাচ্যের ওপর, প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ওপর এবং প্রাচ্যতত্ত্বের পশ্চিমা ভোক্তাদের ওপর। এভাবে স্থাপিত তিনমুখী সম্পর্কের সামর্থ্যকে খাটো করে দেখাটা ভুল হবে বলে আমি মনে করি। কারণ ইউরোপীয় সমাজ অর্থাৎ 'আমাদের' জগতের সীমানার বাইরে অবস্থিত হওয়ার কারণে প্রাচ্যকে (যা ওখানে, পুবদিকে) সংশোধন করা হয়েছে, এমনকি শাস্তিও দেয়া হয়েছে। এভাবে সম্পন্ন হয়েছে প্রাচ্যের প্রাচ্যায়ন। তা এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রাচ্যকে কেবল প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের একটি প্রদেশ হিসেবেই চিহ্নিত করে না, পশ্চিমের অদীক্ষিত পাঠকদেরকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক সংকেতলিপিকেই (যেমন ডি হারবেলটের *বিবলিওথিক*) আসল প্রাচ্য বলে মানতে বাধ্য করে। মোটকথা, সত্য মূল জিনিসটাতে নেই বরং পণ্ডিতি বিচার-বিশ্লেষণের কর্মে পরিণত হয়েছে, যা মনে হয় তার অস্তিত্বের জন্যে এক সময় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের কাছেও ঋণী।

নীতিশিক্ষামূলক এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কঠিন কাজ নয়। আবার স্মরণ করে নেয়া উচিত যে, সমস্ত সংস্কৃতিই কাঁচা বাস্তবতা সংশোধন করে নেয়, মুক্ত অবস্থানরত বস্তু-বিষয়াদিকে রূপান্তরিত করে জ্ঞানাণুতে। এ রূপান্তরে কোনো সমস্যা নেই। অপরিশোধিত অজানার আপতনে মানবীয় মনের বাধা দেয়াই স্বাভাবিক। তাই অন্য সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করার ঝোঁক—অন্য সংস্কৃতি যেমন আছে তেমন নয়, বরং গ্রাহকের স্বার্থে যেমন হওয়া উচিত সেভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা সব সংস্কৃতিতে সকল সময়ই বিদ্যমান। যাহোক, পশ্চিমাদের নিকট প্রাচ্যের বিষয়গুলো সব সময়ই পশ্চিমের কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। যেমন, কিছু জার্মান রোমান্টিকের নিকট ভারতীয় ধর্ম হল অনিবার্যভাবে জার্মান-খ্রিস্টিয় সর্বেশ্বরবাদের প্রাচ্য সংস্করণ। অতঃপর প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার কর্ম হিসেবে নিয়েছেন প্রাচ্যকে 'কিছু একটা' থেকে অন্য 'কিছু একটায়' রূপান্তরিত করা; তিনি তা করেন তার নিজের জন্যে, তার সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে—তার বিবেচনায়—প্রাচ্যজনের প্রয়োজনে। রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি সুশৃঙ্খল: এটি শিক্ষালব্ধ, এর রয়েছে নিজস্ব সমাজ, সাময়িক পত্রাদি, ঐতিহ্য, শব্দসম্ভার, অলঙ্কার শাস্ত্র। এর সবই পশ্চিমে উদ্ভূত পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়মনীতির সাথে সম্পর্কিত ও ওসবের দ্বারা সরবরাহকৃত। আমি দেখাব, এ প্রক্রিয়া খুব বেশিরকম সামগ্রিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখায়। এ প্রবণতা এত প্রবল যে উনিশ-বিশ শতকের

প্রাচ্যতত্ত্ব জরিপ করার সময় গবেষকের মনে সব দূর করে যে ছাপ গভীর হয়ে বসে তাহল প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক উদাসভাবে সমগ্র প্রাচ্যের পরিলেখ তৈরির ইচ্ছা।

ধ্রুপদ গ্রীসে পশ্চিম কর্তৃক প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যে উদাহরণ আমি দিয়েছি তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কত আগে থেকেই এ ধরনের ছককাটা পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী প্রতিনিধিত্বের ওপর পরিকল্পিত পরবর্তী প্রতিনিধিত্ব কতটা দৃঢ়ভাবে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ ছিল, কতটা সতর্ক পরিকল্পনা ছিল ওদের, পশ্চিমের কাল্পনিক ভূগোলের অবস্থান নির্মাণ কতটা নাটকীয়ভাবে কার্যকর ছিল তা দেখানো সম্ভব হবে যদি আমরা নজর দিই দান্তের *'ইনফার্নো'*য়। *ডিভাইন কমেডিতে* দান্তের কৃতিত্ব পার্থিব বাস্তবতার যথাযথ বর্ণনা এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের সর্বজনীন ও অপার্থিব পদ্ধতির নিশ্চিদ্র একীভূতকরণ। *ইনফার্নো* পোরগোটেরিয়ো ও প্যারাডিসোর মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় তীর্থ-পর্যটক দান্তে যা দেখেন তা হল বিচার-বিশ্লেষণের অনুপম চিত্ররূপ। উদাহরণস্বরূপ, পাওলো ও ফ্রান্সেসকোকে দেখা যায় কৃত পাপের জন্য পরলোকে দোজখে বন্দি, তারা তাদের ভূমিকাতেই অভিনয় করছে—প্রকৃতপক্ষে জীবন যাপন করছে। পৃথিবীতে যাপিত জীবনই তাদেরকে ওখানে টেনে নিয়েছে এবং সেই পারলৌকিক বসবাস নিয়তি হিসেবে আরোপ করেছে। এভাবে দান্তের কল্পিত চিত্রে প্রতিটি ব্যক্তিই কেবল তার প্রতিনিধিত্বই করে না শুধু, তার চরিত্রের বর্গ ও তার নিয়তিরও প্রতিনিধিত্ব করে।

'মাওমেতো'—মোহাম্মদ—দেখা দেন *ইনফার্নো*'র ২৪তম ক্যান্টোতে। তাকে দেখানো হয়েছে দোজখের ৯টি বৃত্তের অষ্টমটিতে। নবমটিতে ভয়ংকর খাদের একটি বৃত্ত দোজখে শয়তানের মূল ঘাঁটি বেষ্টন করে আছে। তাই মোহাম্মদের নিকট পৌঁছানোর পূর্বে দান্তে সেসব বৃত্ত পার হয়ে যান যেগুলোয় অপেক্ষাকৃত কম পাপে পাপীরা বন্দি। যেমন, কামুক, ধনলোলুপ, পেটুক, (খ্রিস্টধর্মের) বিরুদ্ধবাদী, প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ, আত্মহননকারী, ধর্ম-নিন্দুক প্রভৃতি মানুষ। নরকের সবচেয়ে নিচে যেখানে শয়তানের দেখা পাওয়া যাবে সেখানে পৌঁছার পূর্বে, মোহাম্মদের পর আছে কেবল জালকারী ও বিশ্বাসঘাতক (যার মধ্যে জুডাস, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসও অন্তর্ভুক্ত)। অতএব, মোহাম্মদ শয়তানের পদক্রমে, দান্তের ভাষায়, 'সেমিনেটর অ. ডি. স্কেন্ডুলা সেইসমা' বর্গের অন্তর্গত। মোহাম্মদের শাস্তি, যা তার পারলৌকিক পরিণতিও, উদ্ভটভাবে রুচিগর্হিত : তাকে চিবুক থেকে শুরু করে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত অবিরামভাবে চিরে দু'ভাগ করা হচ্ছে—দান্তের ভাষায় পিপার মতো, যার দুটো অংশ দু'দিকে মেলে দেয়া হয়েছে। এ অংশে দান্তের কাব্য কেয়ামতের কোনো খুঁটিনাটি বর্ণনা থেকেই বঞ্চিত করেননি পাঠককে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওরকম ভয়াবহ শাস্তিও। মোহাম্মদের নাড়িভুড়ি ও মলমূত্রের বর্ণনাও নিরুদ্বেগে নিখুঁত। মোহাম্মদ দান্তের নিকট তার শাস্তির কথা ব্যাখ্যা করে আলীর দিকে নির্দেশ করেন। একই সারিতে মোহাম্মদের পূর্বেই আছেন আলী, তার জন্যে নির্ধারিত শয়তান তাকেও চিরে দু'ভাগ করছে। তিনি দান্তেকে অনুরোধ করেন যেনো তিনি ফ্রা ডলসিনোকে সতর্ক করে দেন। ডলসিনো এক বিদ্রোহী প্রীস্ট, তার অনুসারীরা নারী ও বস্তু-বিষয়াদির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি নারী সঙ্গিনী গ্রহণ করেছেন যা তার জন্য সঞ্চিত থাকবে। পাঠকদের ভুল হওয়ার কথা নয় যে, দান্তে ডলসিনো ও মোহাম্মদের যৌনাচরণে সাদৃশ্য দেখেন—তাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভের ভানেও।

ইসলাম সম্পর্কে দান্তে যা বলতে চেয়েছেন এটুকুই তার সব নয়। এর আগে *ইনফার্নোতে* অভিজাত একদল মুসলমানের দেখা মেলে। ঐ গুণী ম্লেচ্ছদের দলে আছে আবিসিনা, আভিরয়েস, সালাদিন প্রমুখ যারা হেক্টর, অ্যানিস, আব্রাহাম, সক্রেটিস, প্ল্যাটো, অ্যারিস্টোটলসহ নরকের প্রথমবৃত্তে বন্দি থেকে লঘুতর, এমনকি সম্মানজনক শাস্তি ভোগ করছেন। এদের একমাত্র অপরাধ এরা খ্রিস্টিয় ঈশ্বরবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করেনি। তাদের গুণের প্রশংসা করেছেন দান্তে। কিন্তু তারা খ্রিস্টান নয় বলে লঘুভাবে ওদের নিন্দা করতে হয়েছে। পরলোকে পার্থক্যের স্তর সৃজন যথাযথ, কিন্তু প্রাক-খ্রিস্টিয় জ্ঞান-জ্যোতিষ্কদের সাথে উত্তর-খ্রিস্টিয় মুসলমানদের একই বর্গে নরকবাসের মধ্যে কালগত বিভ্রাট ও শৃঙ্খলাজনিত ব্যত্যয়ে দান্তের কোনো সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি কোরআন যদিও যিশুখ্রিস্টকে একজন নবী হিসেবে উল্লেখ করেছে তবু দান্তে মহৎ মুসলিম দার্শনিক ও সম্রাটদেরকে মনে করেছেন খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা যে প্রাচীন, ধ্রুপদ সন্তদের মতো একই স্তরে বাস করতে পারেন তা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন কল্পনা। যেমন রাফায়েল কল্পনা করেছেন তার *ফ্রেসকোতে দি স্কুল অব এথেন্স-এ* সক্রেটিস ও প্ল্যাটোর সাথে আভিরয়েসও একাডেমীর মেঝেতে কনুই ঘষছেন (যেমন ফেনেলনের ডায়লগ *ডেস মটস (১৭০০-১৭১৮)*-এ একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় সক্রেটিস ও কনফুসিয়াসের মধ্যে)।

দান্তে কর্তৃক ইসলামকে কাব্যিকভাবে উপলব্ধিতে বৈষম্য ও পরিশোধন ছককাটা পরিকল্পনা, প্রায় সৃষ্টিতাত্ত্বিক অপরিহার্যতার দৃষ্টান্ত; এর আশ্রয়েই ইসলাম ও তার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সম্পর্কে পশ্চিমের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি নৈতিক ধারণার সৃষ্টি। প্রাচ্য বা তার কোনো অংশের বাস্তব তথ্যের গুরুত্ব এখানে নগণ্য; যা গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত প্রভাবক তা হল যাকে আমি বলছি প্রাচ্যতাত্ত্বিক দৃষ্টি। এ দৃষ্টি কোনোমতেই কেবল পেশাজীবী পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশ্চিমে যারাই প্রাচ্য সম্পর্কে চিন্তা করেন তাদের সকলের এজমালি সম্পত্তি। কবি হিসেবে দান্তের ক্ষমতা এ পরিপ্রেক্ষিতকে আরো প্রতিনিধিত্বমুখী, আরো তীব্র করেছে। মোহাম্মদ, সালাহউদ্দিন, আভিরয়েস, আবিসিনা অলৌকিক এক সৃষ্টিতত্ত্বে স্থির গাঁথা—অন্যকিছুকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল তাদের 'কাজ' ও মঞ্চে আবির্ভূত অবস্থায় তাদের উপলব্ধ বিন্যাস গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এ জাতীয় মনোভাবের প্রভাব সম্পর্কে ঈসাইয়াহ্ বার্লিন লিখেছেন :

> [এরকম] সৃষ্টিতত্ত্বে মানুষের পৃথিবী (কোনো কোনো সংস্করণে গোটা বিশ্ব) একটি মাত্র মাত্র সর্বব্যাপ্ত ক্রমবিন্যাসে বিন্যস্ত যাতে ব্যাখ্যা করা হয় কেন কোনো একটি বস্তু ঠিক ঐ বস্তুই: তা যা করে তা কোথায়, কখন এবং কেন করে; এর লক্ষ্য কী এবং কতটা সফলভাবে তা সে পালন করে; বিভিন্ন লক্ষ্যমুখী সত্তা একত্রে যে পিরামিড গড়ে তুলেছে তাতে এসব সত্তার লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অধীনতা ও সহযোগিতা সম্পর্ক কী। এই যদি বাস্তবতার সঠিক চিত্র হয় তা হলে অন্য সব বিশ্লেষণের মতো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণেরও মূল উপাদান হবে ব্যক্তি, দল, জাতি, প্রজাতির গুণ-স্বভাব ইত্যাদি—এবং বিশ্বজাগতিক বিন্যাসে প্রত্যেকটির নিজস্ব অবস্থানের ভিত্তিতে। এ সৃষ্টিতত্ত্ব

অনুযায়ী একজন মানুষ বা একটি বস্তুর অবস্থান জানাকে বলা যায় সেটি সম্পর্কে এই জানা যে, সেই মানুষ বা বস্তুটি কি করে এবং কেনইবা এটি ঐ নির্দিষ্ট বস্তুই হবে ও সে যা করে ঠিক তা-ই করবে। অতপর *হওয়া ও মূল্য অবধারণ*—অস্তিত্ব নিয়ে থাকা ও একটি কর্ম লাভ (এবং কমবেশি সফলভাবে তা সম্পন্ন করা) একই কথা এবং এক জিনিস। বিন্যাস এবং এককভাবে বিন্যাসই অস্তিত্ব দেয় ও বিলীন হওয়ার কারণ ঘটায়; এবং আরোপ করে উদ্দেশ্য, যাকে বলা যায় মূল্য ও অর্থবোধ; সবই ওখানে। বোঝার অর্থ হল বিন্যাসটি উপলব্ধি করা। কোনো ঘটনা বা ক্রিয়া বা চরিত্র যত বেশি অনিবার্য বলে দেখানো যাবে তা তত ভালোভাবে বোঝা যাবে, গবেষকের অন্তর্দৃষ্টি তত পূর্ণ হবে, আমরা একটি অনিবার্য সত্যের আরো নিকটবর্তী হব। কিন্তু এই মনোভাব অত্যন্ত অবাস্তব।[৫১]

এবং প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক প্রাচ্যতাত্ত্বিক মনোভাবও অবাস্তব। তা যাদুবিদ্যা ও পুরাণের সাথে একটি বদ্ধ পদ্ধতির স্ব-নিয়ন্ত্রিত, স্ব-চালিত চরিত্র ভাগাভাগি করে। এই পদ্ধতিতে বস্তু তা-ই সেটি প্রকৃতপক্ষে যা, বস্তু যা সেটি তা-ই—এখন বা চিরকাল—এই তত্ত্ববিদ্যাগত কারণে যে অভিজ্ঞতা-ধৃত বস্তুকে বদল বা স্থানচ্যুত করা যাবে না। প্রাচ্যের সাথে, বিশেষত ইসলামের সাথে ইউরোপের বোঝাপড়া প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার এ পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করেছে, ইসলামকে পরিণত করেছে, আঁরি পিরেনের ভাষায়—'বহিরাগত'-এর সারমূর্তিতে যার বিপরীতে মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের ঘটনার স্ব-বিরোধী প্রভাবে রোমান ও ভূ-মধ্যসাগরীয় সংস্কৃতিতে বর্বরতা অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ পিরেন যুক্তি দেখান যে, সাত শতকে শুরু হওয়া ইসলামি অভিযানের ফল হিসেবে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে সরে যায় উত্তরে। কারণ ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকাটি তখন আরব প্রদেশ। এ সময় "জার্মানবাদ ইতিহাসে তার ভূমিকা পালন শুরু করে। এ যাবৎ রোমান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিল। এখন শুরু হল প্রকৃত রোমানীয়-জার্মান সভ্যতার উত্থান।" ইউরোপ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হল : প্রাচ্য যখন এমন কোনো স্থানও নয় যেখানে কেউ বাণিজ্য করে তখন তা বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপ ও ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরে। পিরেনের ভাষায় যা ইউরোপ তা "বিশাল একীভূত খ্রিস্টীয় সমাজ। পশ্চিম তার নিজস্ব জীবন যাপন শুরু করেছে।"[৫২] দান্তের কবিতা, পিটার ও অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক, গুইবার্ট অব নজেন্ট ও বেদে থেকে রজার বেকন পর্যন্ত ইসলাম-বিরোধী তর্কশাস্ত্রবিদ, ত্রিপলীর উইলিয়াম মাউন্ট সিয়নের বার্চার্ড, লুথার, *পোয়েম ডেল চিড-এ, চ্যান্সন ডি রোঁলায়,* এবং শেক্সপিয়রের *ওথেলো* (পৃথিবীর নির্যাতক)-এ প্রাচ্য ও ইসলাম উপস্থিত হয়েছে *বহিরাগত*-রূপে, যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ইউরোপ অভ্যন্তরে।

কাল্পনিক ভূগোল—*ইনফার্নো*'র জীবন্ত চিত্র থেকে ডি হারবেলটের *বিবলিওথিক* এর কঠিন অবস্থান ইসলাম ও প্রাচ্য-সম্পর্কিত আলোচনা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে উদ্ভট এক প্রতিনিধিত্বমূলক ডিসকোর্সের জগৎ ও প্রয়োজনীয় শব্দসম্ভারের বৈধতা এনে দেয়। এ ডিসকোর্স যাকে সত্য বলে—যেমন বলে—মোহাম্মদ একজন ভণ্ড—তাও ডিসকোর্সের

অংশ, একটি ভাষ্য, একটি মন্তব্য। এ ডিসকোর্স সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বাধ্য করে যেন মোহাম্মদের নাম উচ্চারিত হলেই সে এই মন্তব্য প্রথমেই গ্রহণ করে নেয়। প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স—এখানে আমি বোঝাচ্ছি প্রাচ্য-বিষয়ক আলোচনা ও লেখালেখিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও শব্দরাশি—এর বিভিন্ন অংশের মূলে আছে ভাষার অলঙ্কার ও গূঢ়োক্তি। নাটকের চরিত্রের ক্ষেত্রে ফ্যাশনেবল পোশাক যেমন, প্রকৃত প্রাচ্য যা আমার মূল বিষয় ইসলামের ক্ষেত্রে এসব ভাষিক অলঙ্কারও তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এগুলো ক্রুশের মতো যা প্রত্যেকেই বহন করে অথবা *কমেডি ডেল আর্ট* জাতীয় নাটকের সঙের বহুবর্ণিল পোশাকের মতো। অন্য কথায়, প্রাচ্যকে চিত্রণের জন্যে ব্যবহৃত ভাষার সাথে আসল প্রাচ্যের সম্পর্ক খোঁজার দরকার নেই। তা যতটা-না এ জন্যে যে ভাষাটি আদৌ সঠিক নয়, তার চেয়ে বরং এ কারণে যে ভাষাটি যথার্থ হওয়ার চেষ্টা করে না। এটি চেষ্টা করে *ইনফার্নোতে* দান্তে যা করার চেষ্টা করেছেন : তা হল এক ও একই সময়ে প্রাচ্যকে বহিরাগতরূপে আঁকা এবং ছককাটা পরিকল্পনা মাফিক একটি নাটকীয় মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত করা, দৃশ্যত যার, ব্যবস্থাপক ও অভিনেতাদের সবাই ইউরোপের—কেবল ইউরোপের জন্যেই। এজন্যেই পরিচিত ও বহিরাগত-এর মধ্যে দোলাচলবৃত্তিতা; মোহাম্মদ সবসময়ই জাল বলে *পরিচিত* (কারণ তিনি আমাদের 'যিশু' হওয়ার ভান করেন) এবং সবসময়ই প্রাচ্যজন (অর্থাৎ *বহিরাগত* কারণ তিনি কোনো কোনো দিক থেকে 'যিশুর' মতো হলেও তিনি হুবহু যিশুর মতো নন)।

প্রাচ্য—এর অদ্ভুততত্ত্ব, এর পার্থক্য, এর রহস্যময়তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্যের তালিকা তৈরি না করেও আমরা বরং এগুলোর সাধারণীকরণ করে নিতে পারি, যেভাবে ওগুলো রেনেসাঁসের মাধ্যমে চলে এসেছে। এগুলো আত্ম-সাক্ষ্যধর্মী ও ঘোষণামূলক; এগুলোয় ব্যবহৃত কাল অনিশ্চিত; এরা পুনরাবৃত্তি ও সামর্থ্যের ছাপ ফেলে; এগুলো সকল সময়ই কখনো উক্ত, কখনো-বা অনুক্ত ইউরোপীয় সমরূপের সমতলে, আবার অন্যদিক থেকে নিম্ন-বর্গীয়ও। এসব মন্তব্যের জন্যে অধিকাংশ সময় 'হয়' শব্দটিই যথেষ্ট। যেমন (মোহাম্মদ) *'হন'* ভণ্ড—উক্তিটি কার্যকারিতা লাভ করে ডি হারবেলটের *বিবলিওথিকে*, এবং এক অর্থে দান্তের রচনা লাভ করে নাটকীয় গুরুত্ব। যেনো কোনো পটভূমি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মোহাম্মদকে দোষী সাব্যস্ত করার সাক্ষ্য আছে 'হয়'-এ। কেউ উক্তিটিতে গুণ বা দোষারোপ করে না, বা মোহাম্মদ 'ছিলেন' ভণ্ড এমন বলার প্রয়োজন বোধ করে না; কিংবা কারো এক মুহূর্ত চিন্তা করারও দরকার হয় না যে, উক্তিটি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে কি না। মোহাম্মদ হন 'ভণ্ড'—এটি পুনরাবৃত্ত হয়; প্রতিবার কেউ যখন উক্তিটি উচ্চারণ করে তখন তিনি (মোহাম্মদ) আরেকটু বেশি ভণ্ড হন। এবং উক্তিটির লেখক এ-জাতীয় ঘোষণা দেয়ার ব্যাপারে আরেকটু অধিকার লাভ করেন। এবাবে হামফ্রে প্রাইডেক্স-এর সতেরো শতকে লেখা মোহাম্মদের বিখ্যাত জীবনীর উপ-শিরোনাম হয় *প্রতারণার আসল প্রকৃতি (The true nature of Imposture)*। সবশেষে, অবশ্যই ভণ্ড বা প্রতারক (বা প্রাচ্যজন) হিসেবে শ্রেণীভুক্ত-করণের এই প্রক্রিয়া বৈপরীত্যের উপস্থিতি দাবি করে, কিংবা বলা যায় প্রয়োজনীয় করে তোলে এক *বিপরীত সত্তার*। সেই বিপরীত হল 'পশ্চিম', এবং মোহাম্মদের বেলায় যিশুখ্রিস্ট।

অতএব, যে ধরনের ভাষা, চিন্তা, দৃষ্টিকে আমি বলছি প্রাচ্যতত্ত্ব তা দার্শনিকভাবে সাধারণ অর্থে চরম বাস্তববাদ; প্রাচ্য-বিষয়ক প্রশ্ন, উদ্দেশ্য, গুণাগুণ, অঞ্চল নিয়ে কথা বলার অভ্যাস অনুযায়ী যে-ব্যক্তিই প্রাচ্যতত্ত্ব কথাটি ব্যবহার করবে সে-ই তার আলোচ্য বা চিন্তনীয় বিষয়টিকে পরিচিত করাবে, নাম দেবে, নির্দেশ ও নির্দিষ্ট করবে একটি শব্দ বা উক্তির দ্বারা। ঐ শব্দ বা উক্তিকে বাস্তবতা বা বাস্তবতার ধারক বলে বিবেচনা করতে হবে। আলঙ্কারিক অর্থে বলা যায় প্রাচ্যতত্ত্ব শারীরসংস্থান বিদ্যাগত ও নামকরণগত; এর শব্দরাজি ব্যবহার করার অর্থ হল নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি অংশে প্রাচ্যের জিনিসগুলোকে বিভক্তকরণ ও আলাদাকরণ। মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রাচ্যতত্ত্ব এক ধরনের আধা-দৈবিকজ্ঞান, সাধারণ ঐতিহাসিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের জ্ঞান। এগুলোই হল কাল্পনিক ভূগোল ও তার আঁকা নাটকীয় সীমানার ফলাফলের একাংশ। এই প্রাচ্যায়িত ফলাফলের নির্দিষ্ট কিছু অংশের আধুনিক রূপান্তরও ঘটেছে। আমি এখন ওদিকেই অগ্রসর হব।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

তথ্যসূত্র :

18. M. de Caix, *La Syrie* in Gabriel Hanotaux, *Histoire des colonies francaises*, 6 vols. (Paris: Societe de l'histoire nationale, 1929-33), 3: 481 এ উদ্ধৃত।
19. খুঁটিনাটি বর্ণনার জন্যে দেখুন : Vernon McKay, "Colonialism in the French Geographical Movement," *Geographical Review* 33, no. 2 (April 1943): 214-32.
20. Agnes Murphy, *The Ideology of French Imperialism, 1817-1881* (Washington: Catholic University of America Press, 1948), pp. 46, 54, 36, 45.
21. পূর্বোক্ত, pp. 189, 110, 136.
22. Jukka Nevakivi, *Britain, France, and the Arab Middle East*, 1941-1940 (London: Athlone Press, 1969), p. 13.
23. পূর্বোক্ত, p. 24.
24. D. G. Hogarth, *The Penetration of Arabia: A Record of the Development of Western Knowledge Concerning The Arabian Peninsula* (New York: Frederick A. Stokes, 1904). এ বিষয়ে চমৎকার একটি সাম্প্রতিক কাজ: Robin Bidwell, *Travellers in Arabia* (London: Paul Hamlyn, 1976).
25. Edmond Bremond, *Le Hedjaz dans la guerre mondiale* (Paris: Payot, 1931), pp. 242 ff.
26. Le Comte de Cressaty, *Les Interets de la France en Syrie* (Paris: Floury, 1913).
27. Rudyard Kipling, *Verse* (Garden City, N. Y.: Doubleday & Co., 1954), p. 280.
28. উনিশ শতকের বিচ্ছিন্নকরণ ও অবরুদ্ধকরণের সংস্কৃতি ফুকোর রচনায় গুরুত্বপূর্ণ; এ বিষয়ে তার অতি সাম্প্রতিক কাজ *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1977), এবং *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction* (New York: Pantheon Books, 1978).
29. *The Letters of T. E. Lawrence of Arabia*, ed. David Garnett (1938; reprint ed., London: Spring Books, 1964), p. 244.
30. Gertrude Bell, *The Desert and the Sown* (London: William Heinemann, 1907), p. 244.
31. Gertrude Bell, *From Her Personal Papers, 1889-1914*, ed. Elizabeth Burgoyne (London: Ernest Benn, 1958), p. 204.
32. William Butler Yeats, "Byzantium," *The Collected Poems* (New York: Macmillan

Co., 1959), p. 244.

33. Stanley Diamond, *In search of the Primitive: A Critique of Civilization* (New Brunswick, N. J.: Transaction Books, 1974), p. 199.
34. দ্রষ্টব্য : Harry Bracken, "Essence, Accident and Race," *Hermathena* 116 (Winter 1973): pp. 81-96.
35. George Eliot, *Middlemarch: A Study of Provincial Life* (1872; reprint ed., Boston: Houghton Mifflin Co., 1956), p. 13.
36. Lionel Trilling, *Matthew Arnold* (1939; reprint ed., New York: Meridian Books 1955), p. 214.
37. দ্রষ্টব্য: Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1973), p. 180, note 55.
38. W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, ed. Stanley Cook (1907; reprint ed., Oesterhout, B. B.: Anthropological Publications, 1966), pp. xiii, 241.
39. W. Robertson Smith, *Lectures and Essays*, ed. John Sutherland Black and George Chrystal (London: Adam & Charles Black, 1912), pp. 492-3.
40. পূর্বোক্ত, pp. 492, 493, 511, 500, 498-9.
41. Charles M. Doughty, *Travels in Arabia Deserta*, 2nd ed, 2 vols. (New York: Random House, n.d.), 1: 95. এছাড়া দেখুন রিচার্ড বেভিসের চমৎকার প্রবন্ধ: "Spiritual geology: C. M. Doughty and the Land of the Arabs", *Victorian Studies* 16 (December 1972), 163-81.
42. T. E. Lawrence, *The Seven Pillars of Wisdom: A Triumph* (1926; reprint ed., Garden City, N. Y.: Doubleday, Doran & Co., 1935), 28>
43. এ সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন: Talal Asad, "Two European Images of Non-European Rule," *Anthropology and the Colonial Encounter*, ed. Talal Asad (London: Ithaca Press, 1975), pp. 103-18.
44. Arendt, *Origins of Totalitarianism*, p. 218.
45. T. E. Lawrence, *Oriental Assembly*, ed. A. W. Lawrence (New York: E. P. Dutton & Co., 1940), p. 95.
46. Stephen Ely Tabachnick, "The Two Veils of T. E. Lawrence," *Studies in the Twentieth Century* 16 (Fall 1975): 96-7 এ উদ্ধৃত।
47. Lawrence, *Seven Pillars of Wisdom*, pp. 42-3, 661.
48. পূর্বোক্ত, pp. 549, 550-2.
49. E. M. Forster, *A Passage to India* (1924; reprint ed., New York: Harcourt, Brace & Co., 1952), p. 322.
50. Maurice Barres, *Une Enquete aux pays du Levant* (Paris: Plon, 1923), 1: 20; 2: 181, 192, 193, 197.
51. D. G. Hogarth, *The Wandering Scholar* (London: Oxford University Press, *1924*). হোগার্থ তার স্টাইল সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, "প্রথমত: অভিযানকারী, দ্বিতীয়ত: পণ্ডিতের"। (p. 4).
52. H. A. R. Gibb, "Structure of Religious Thought in Islam," *Studies on the Civilization of Islam*, ed. Stanford J. Shaw and William R. Polk (Boston: Beacon Press, 1962), p. 180-এ উদ্ধৃত।

সর্বশেষ পর্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে প্রতিটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর আরব মুসলমানরা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে জনপ্রিয় মার্কিন সংস্কৃতিতে; এমনকি প্রতিষ্ঠান ও নীতি-নির্ধারকদের বলয় ও ব্যবসার জগতে আরবদের প্রতি খুবই মনোযোগ দেয়া হয়। এটি আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রতীক। ফ্রান্স ও ব্রিটেন এখন আর বিশ্বরাজনীতির মঞ্চের কেন্দ্রে নেই। তাদেরকে স্থানচ্যুত করেছে মার্কিন সাম্রাজ্য। স্বার্থের এক বিরাট নেটওয়ার্ক এখন সকল প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করেছে, ঠিক যেমন আগের সকল ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় এবং প্রাচ্যতত্ত্বের মতো ইউরোপ-ভিত্তিক জ্ঞান-শাখাকে বিভাজিত (আবার যুক্ত) করছে প্রাতিষ্ঠানিক উপ-বিশেষজ্ঞতা। অঞ্চল-বিশেষজ্ঞ—আজকাল যে নামে ডাকা হয় প্রাচ্যতাত্ত্বিককে—দাবি করছেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের; তা আবার সরকার ও ব্যবসাক্ষেত্রে কাজে লাগছে। আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের কালানুগ বিবরণে সঞ্চিত—যেমন জুলস্ মোহলের উনিশ শতকীয় লগবুকে লিপিবদ্ধ—আধা-বস্তুবাদী জ্ঞানের অবসান হয়েছে, জন্ম নিয়েছে নতুন রীতি। মিশ্র প্রজাতির প্রতিনিধিত্বের বিচিত্র রীতি এখন সংস্কৃতিকে উত্তপ্ত করে রাখে। জাপান, ইন্দোচীন, চীন, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান—এগুলোর প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নির্দিষ্ট কিছু কারণে সর্বত্র আলোচনার সূচনা করেছে ওরা। ইসলাম ও আরবের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বও আছে। খণ্ডিত, কিন্তু ভাবাদর্শিকভাবে ও যথেষ্ট ক্ষমতাসমেত পরস্পর আসঞ্চিত অবস্থায় একগুঁয়েভাবে সংগঠিত ঐ ব্যাপারগুলো এখানে আলোচনা করবো আমরা। এগুলো কদাচিৎ আলোচিত হয়; আমেরিকায় এর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে প্রথাগত ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ব।

১. *জনপ্রিয় কল্পমূর্তি এবং সামাজিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব :* আজকাল কোনরূপে আরবদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া হল। লক্ষ্য করুন রূপান্তর ও সংকোচনের সাথে 'আরব' আখ্যাটি কেমন খাপ-খাইয়ে যায়; সহজ একটা প্রবণতা—যার মধ্যে জোর করে ঠেসে দেয়া হচ্ছে তাকে (অর্থাৎ যাকে 'আরব' বলে নির্দেশ করা হচ্ছে)। ১৯৬৭ সালের জুনের যুদ্ধের পূর্বে প্রিন্সটনের দশম পুনর্মিলনীতে আরব সাজার পরিকল্পনা করা হয় : পোষাক হল আলখাল্লা, মস্তকাবরণ ও স্যান্ডেল। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক পর পর যেহেতু দেখা যায় আরবের ছদ্মবেশ বিব্রতকর, পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের মটিফে পরিবর্তন আনা হয়। ঠিক হয় ক্লাসের ছাত্ররা মাথার ওপর হাত তুলে মৌন মিছিল করবে, যা হবে আরবদের পরাজয়ের প্রতীক—উটের পিঠের সওয়ার থেকে ক্যারিকেচার এবং তা থেকে অযোগ্যতা ও সহজ পরাজয়ের প্রতীয়কায়ন; আরবদেরকে কেবল এটুকু সুযোগই দেয়া হয়।

আরব কল্পমূর্তি আরো হুমকিদায়করূপে সর্বত্র দেখা দেয় ১৯৭৩ সালের যুদ্ধের পর। গ্যাসোলিন পাম্পের পেছনে দাঁড়ানো আরব শেখের কার্টুন সে সময়ের একটি জনপ্রিয় প্রবণতা। এসব আরবেরা পরিষ্কার 'সেমেটিক'; ওদের খাড়া বাঁকানো নাক, মুখের ওপর এসে উঁকি দেয়া শয়তানী গোঁফ নিশ্চিত মনে করিয়ে দেয় (প্রধানত অ-সেমেটিক জনগোষ্ঠীর কথা) যে, সেমেটিকরা আমাদের সকল সমস্যার মূল। যে গণ-ঘৃণাবোধ ছিল সেমেটিক ইহুদিদের প্রতি তার অভিমুখ খুবই চমৎকারভাবে সেমেটিক আরবদের দিকে সরিয়ে দেয়া হয়; কারণ উভয়েই সেমেটিক ফিগার।

কাজেই যদিও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পরিসর আরবদের দেয়া হয়, তার অবস্থান হয় মূলত নেতিবাচক মূল্যবোধক। তাকে দেখা হয় ইসরাইল বা পশ্চিমের অস্তিত্বে বিপর্যয়-সৃজক উপাদানরূপে, বা ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পথে ধ্বংসযোগ্য বাধার মতো। এদের যদি কোনো ইতিহাস থেকেও থাকে তবে সে ইতিহাস হল প্রথমে প্রাচ্যতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, পরে ইহুদি ধারা কর্তৃক আরবদেরকে দেয়া (অথবা আরবদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া, পার্থক্য সামান্যই) ইতিহাসের অংশ মাত্র। ল্যামারটিন ও প্রথমযুগের ইহুদিবাদীরা ফিলিস্তিনকে দেখেছেন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে অপেক্ষমান শূন্য মরুভূমি রূপে : এর অধিবাসীরা তো যাযাবর! এই ভূমির ওপর তাদের কোনো দাবি নেই, অতএব, কোনো সাংস্কৃতিক বা জাতীয় বাস্তবতাও নেই! এভাবে আরব হয়ে ওঠে ছায়ামাত্র। যেহেতু, আরব ও ইহুদি উভয়ই প্রাচ্য সেমেটিক। তাই এই ছায়ার মধ্যে বসিয়ে দেয়া যেতে পারে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের ঐতিহ্যিক অবিশ্বাস। যেহেতু নাজী-পূর্ব ইউরোপে ইহুদি ছিল বিনষ্টের প্রতীক। এখন (বার্টন, লেইন, রেনান প্রমুখ আদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সহায়তায়) ইহুদিদের চিত্রিত করা হয় 'নায়ক'রূপে, আর আরবরা তাদের ছায়ামাত্র—ধীরগতির, রহস্যময়, ভয়ানক। পশ্চিমের সৃষ্ট অতীত ছাড়া আর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আরবরা। নির্দিষ্ট এক নিয়তির সাথে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেয়া হয়। তারা কেবল একরাশ পূর্ব-নির্ধারিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সংকুচিত হয়ে যায়। এর জন্যে ইসরাইল মাঝে মধ্যে, বারবারা টুচমানের ঈশ্বরতাত্ত্বিক ভাষায় 'ইসরাইলের ভয়ঙ্কর দ্রুততর তরবারির' সাহায্যে, তাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়। ইহুদি-বিরোধিতা ছাড়া, আরবরা তেল রপ্তানিকারকও। এটিও তার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। কারণ ১৯৭৩-৭৪ সালে সকল আরব তেল রপ্তানিকারক বয়কটে অংশগ্রহণ করে (যদিও এতে লাভবান হয় পশ্চিমের কয়েকটি তেল কোম্পানি এবং কিছু আরব এলিটই)। তবে সত্য যে, তেলের এমন বিশাল সঞ্চয়ের মালিকানা লাভের উপযুক্ত নৈতিক যোগ্যতা নেই ওদের। অতএব, প্রায়শই এমন প্রশ্ন উচ্চারিত হয় যে, কেন আরবদের মতো মানুষ উন্নত (স্বাধীন, গণতান্ত্রিকম নীতিবোধসমৃদ্ধ) বিশ্বকে হুমকির মুখে রাখবে? এ থেকে এমন পরামর্শও উত্থাপিত হয় যে, আরব তেলক্ষেত্রগুলো মার্কিন মেরিন সেনাদের দিয়ে দখল করিয়ে নেয়া উচিত।

সিনেমা, টেলিভিশনে দেখা যায় আরব প্রতিমূর্তি হয় লম্পট, নয়তো রক্তপিপাসু। তাকে দেখানো হয় অতি-কামুক, দুশ্চরিত্র, চতুর, ষড়যন্ত্রে কেমন দক্ষ ও উদার; কিন্তু অনিবার্যভাবে মর্যকামী, বিশ্বাসঘাতক, নিচু, দাস-ব্যবসায়ী, উটের চালক, মানিচেঞ্জার, রঙ্গিলা, চরিত্রহীন—এগুলো সিনেমার প্রথাগত আরব চরিত্র। (চোর,

ডাকাত, স্থানীয় বিদ্রোহীদের) আরব নেতাদেরকে প্রায়ই দেখা যায় আটককৃত পশ্চিমা নায়ক ও তার সাদাচুলের নায়িকার প্রতি হুমকি দিচ্ছে (উভয়কেই উলঙ্গ করা হয়েছে) : "আমার লোকেরা তোমাদের খুন করবে, তবে তার আগে ওরা একটু মজা লুটবে"। সংবাদে, সংবাদচিত্রে সর্বত্র আরবরা দলবদ্ধভাবে প্রদর্শিত, কোনো ব্যক্তিক চরিত্র বা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ নেই। বেশিরভাগ চিত্রই তুলে ধরে দলগত রোষ, দুর্দশা বা অসহিষ্ণু দৃষ্টি। এ সকল ছবির পেছনে আছে *জিহাদ*-এর হুমকি। এসবের পরিণতি হল সাধারণ পশ্চিমাদের মনে এই ভীতি যে, মুসলমান (বা আরবরা) দখল করে নেবে গোটা পৃথিবী।

ইসলামের ওপর নিয়মিত প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদিতেও মধ্যযুগের ও রেনেসাঁর ইসলাম-বিরোধী মনোভাবে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। অবশ্য এও সত্য যে, এমন আর কোনো ধর্ম নেই যার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জে পড়ার ঝুঁকি ছাড়া আয়েশে লেখা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে কলাম্বিয়ার আন্ডার-গ্রাজুয়েট কলেজের আরবি কোর্স-গাইডে লেখা হয় যে, এ ভাষার প্রতিটি শব্দই সন্ত্রাসের সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত এবং ভাষাটিতে প্রতিফলিত আরব মন অপরিবর্তনীয়ভাবে বাক-সর্বস্ব। *হার্পার ম্যাগাজিনে* এমিট টাইরিলের একটি প্রকাশিত নিবন্ধে আরো ভয়ংকর বর্ণবাদী মনোভাব নিয়ে মন্তব্য করা হয় যে, আরবরা মৌলিকভাবেই খুনী, এদের জিন প্রজন্মক্রমে বহন করে আনে সন্ত্রাস ও প্রতারণা।[১০২]

আরবস ইন আমেরিকান টেক্সট বুকস শিরোনামের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য-বিভ্রান্তি বা একটি জাতি-ধর্মভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে নির্মম প্রতিনিধিত্ব। একটি গ্রন্থে প্রশ্ন করা হয়েছে, "কোন জিনিসটি আরবদের ঐক্যবদ্ধ রাখে"; নির্দ্বিধায় দেয়া উত্তর হল, "ইহুদি ও ইসরাইলি জাতির প্রতি ঘৃণা ও আগ্রাসনই তাদের ঐক্যবদ্ধতার সর্বশেষ সূত্র"। আরেকটি গ্রন্থে লেখা হয়েছে, "মুসলমানদের ধর্ম, যাকে বলা হয় ইসলাম, সূচিত হয় সাত শতকে—মোহাম্মদ নামে আরবের এক সম্পদশালী ব্যবসায়ীর মাধ্যমে। তিনি নিজেকে নবী ঘোষণা করেন, কিছু সমর্থকও পেয়ে যান। তাদেরকে তিনি বলেন তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে পৃথিবী শাসন করার জন্যে।" এরপর আসে আরেক টুকরো জ্ঞান : "মোহাম্মদের মৃত্যুর কিছুকাল পরই তার দেয়া শিক্ষা একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়, যার নাম হয় কোরআন। এটি ইসলামের পবিত্র গ্রন্থে পরিণত হয়।[১০৩]

প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তে নিকট প্রাচ্য অধ্যয়নে নিয়োজিত পণ্ডিতরা এসব ভ্রান্ত তথ্যকে সংশোধন করেননি, বরং সমর্থন করেছেন (উল্লেখ্য যে, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরব পোষাক পরিধানের যে ঘটনার দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি তা এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যা ১৯২৭ সালে দেশে প্রথমবারের মতো নিকট প্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়নের জন্যে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে)। প্রিন্সটনে সমাজবিজ্ঞান ও নিকট-প্রাচ্য বিষয়ের অধ্যাপক মোরো বার্গারের ১৯৬৭ সালের রিপোর্ট উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়; তখন তিনি মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন সংঘের (MESA) সভাপতি। এটি পণ্ডিতদের সংঘ, "প্রাথমিকভাবে ইসলামের উত্থানের কাররণে, দ্বিতীয়ত, সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে" প্রতিষ্ঠিত।[১০৪] তিনি তার অভিসন্দর্ভের নাম দেন 'মিড্‌ল ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকান স্টাডিজ :

ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড নীড্‌স্'। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত দিক—ন্যাশনাল ডিফেন্স এডুকেশন প্যাক্ট ১৯৫৮ ইত্যাদি বিচার করে বার্গার উপসংহার টানেন এভাবে :

> আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের অঞ্চল নয়, ভবিষ্যতে তেসন সম্ভাবনাও নেই। আধুনিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গে বলা যায়, অঞ্চল সম্পর্কিত অধ্যয়ন নিজে কোনোরূপ লাভজনক হতে পারবে না।
>
> ... আমাদের অঞ্চলটি কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তির আবাস নয়, ভবিষ্যতে তেমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই... মধ্যপ্রাচ্য (উত্তর আফ্রিকা ততটা নয়) যুক্তরাষ্ট্রের অব্যবহিত রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে সরে যাচ্ছে (এমনকি 'শিরোনামে' বা 'বিরক্তিকর' মূল্যবোধেও)—আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যের তুলনায়।
>
> ফলত সমকালীন মধ্যপ্রাচ্য সামান্য মাত্রায় পণ্ডিতি আগ্রহের যোগ্য। তা এ ইঙ্গিত করে না যে, এর ওপর অধ্যয়নের বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্য কমে গেছে, বা তা পণ্ডিতি কাজকে প্রভাবিত করবে না। যে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত তা হল এ পরিস্থিতি আসলে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে ক্ষেত্রটির ওপর—এর বিকাশের ক্ষমতায়, যারা অধ্যয়ন করবে ও শিক্ষা দেবে তাদের সংখ্যার ওপরও।[১০৫]

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে শোক করার মতো। পরিস্থিতি আরো খারাপ হওয়ার কারণ হল বার্গার তার অধ্যয়নের জন্যে সরকারি নিয়োগ পেয়েছিলেন, কারণ, তিনি এই অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। মধ্যপ্রাচ্য যে বিরাট রাজনৈতিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্র হয়ে উঠছে তা বুঝতে বার্গারের ব্যর্থতা উদ্ভূত হয়েছে প্রথম এবং শেষ প্যারা থেকে, যার পরম্পরা হল প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস। মধ্যপ্রাচ্য যে বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের জায়গা নয় এবং শক্তিহীন—বার্গারের এমন ধারণার উৎস যথাক্রমে প্রাচ্যতত্ত্বের মতাদর্শিক ঘোষণা যে সেমেটিকদের কোনো সমৃদ্ধ সংস্কৃতি থাকতে পারে না এবং রেনানের এই বক্তব্য যে, সেমেটিক জগৎ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে খুব বেশি হতদরিদ্র। বার্গারের এ বিচার-বিশ্লেষণ সময়োচিত; চোখের সামনের বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি যেনো অন্ধ। কারণ তিনি পঞ্চাশ বছর পূর্বে লিখছেন না, এমন এক সময় এ মন্তব্য লিখছেন যখন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রয়োজনীয় তেলের ১০ শতাংশ আমদানি করছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, এলাকাটিতে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগও তখন প্রচুর। আসলে এর মধ্য দিয়ে বার্গার নিশ্চিত করেন তার প্রাচ্যতাত্ত্বিক অবস্থান। অর্থাৎ তিনি বলতে চান এই অঞ্চলকে বুঝতে হলে তার ভাষ্য ও আলোচনা প্রয়োজন। অংশত এ কারণে যে, ওখানে সামান্য যা কিছু আছে তা কিছুটা অদ্ভুত; আরেকটি কারণ হল কেবল প্রাচ্যতাত্ত্বিকই প্রাচ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারে, প্রাচ্য আত্ম-বিশ্লেষণে অক্ষম। সমাজবিজ্ঞানী বার্গার ধ্রুপদ প্রাচ্যতাত্ত্বিক না হয়েও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাচ্যতত্ত্বের ধারণাগুচ্ছ থেকে ঋণ গ্রহণ এড়াতে পারেননি। এর কারণ হল তার অধ্যয়নের জন্যে গৃহীত বিষয়বস্তুর প্রতি ঘৃণা, যা তার নিকট সেগুলোর মর্যাদা খাটো করে ফেলে। এর প্রভাবে বার্গার এতোটাই অন্ধ হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজেকে একবারও প্রশ্ন করেননি

যে মধ্যপ্রাচ্য যদি "বিরাট সাংস্কৃতিক অর্জনের অঞ্চল নয়" তবে তিনি কেন পরামর্শ দিচ্ছেন যেন কেউ ঠিক তার নিজের মতোই, ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি অধ্যয়নে আত্মোৎসর্গ করে। যেমন, ডাক্তারদের তুলনা পণ্ডিতেরা তাদের পছন্দের ও আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। কেমন একরকম সাংস্কৃতিক দায়বোধ থেকেই একজন পণ্ডিত সে বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন যা তার নিকট সঠিক মনে হয় না। প্রাচ্যতত্ত্ব এমন এক দায়বোধই জন্ম দিয়েছে। কারণ, প্রজন্মক্রমে সংস্কৃতি প্রাচ্যতাত্ত্বিককে তিনদিক আটকে ঠেলে দিয়েছে; ওখানে পেশাগত কাজে প্রাচ্যতাত্ত্বিক মোকাবেলা করেন 'পুব'কে-এর অসভ্যতা, উৎকেন্দ্রিকতা, অনাচারকে; এবং পশ্চিমের পক্ষ থেকে একে সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখেন।

আমি বার্গারের প্রসঙ্গ এনেছি প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্যে, কিভাবে কোনো জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে প্রচলিত ক্যারিকেচারকেও সমর্থন করতে পারে তা প্রদর্শনের জন্যে। তবু বার্গার প্রাচ্যতত্ত্বের সমকালীন পরিবর্তনমুখী স্রোতের পক্ষে : মূলত ভাষাতাত্ত্বিক বিষয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞানে রূপান্তরেরও সমর্থক। প্রাচ্যতাত্ত্বিক এখন প্রথমেই প্রাচ্য ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবেন না, বরং তিনি প্রশিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে শুরু করবেন। এই পরিবর্তনের অবদান আমেরিকার, মোটামুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পরিত্যক্ত জায়গায় আমেরিকা নিজেকে অধিষ্ঠিত দেখার পর সূচিত। এর পূর্বে প্রাচ্য বিষয়ে আমেরিকার অভিজ্ঞতা ছিল সীমিত। সংস্কৃতির বিভাজক মেলভিল এ সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সন্দেহবাদী মার্ক টোয়েন প্রাচ্য ভ্রমণ করে এর সম্পর্কে লিখেছেন : ইন্ডিয়ান চিন্তাধারার সাথে নিজেদের ভাবনা-চিন্তার কিছুটা সাযুজ্য দেখেছেন মার্কিন শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা। গুটিকয় ধর্মতাত্ত্বিক ও প্রাচীন বাইবেল বিষয়ের কিছু ছাত্র অধ্যয়ন করেছেন প্রাচ্যের কয়েকটি প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে। এছাড়া বর্বর-ডাকাতদের সাথে কয়েকবারের সামরিক ও কূটনৈতিক সংযোগ এবং দূরপ্রাচ্যে বিশ্রী নৌ-সেনা অভিযান ও ধর্মপ্রচারকদের সংসর্গের কথা উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্বের গভীরতর ঐতিহ্য নেই আমেরিকার। এর ফলে ইউরোপে যেমন প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞান ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সূচিত হয়ে বিভিন্ন সময় পরিশোধন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, আমেরিকায় সে জ্ঞানকে এসব স্তর অতিক্রম করতে হয়নি। তেমনি ওখানে কাল্পনিক বিনিয়োগও হয়নি। তার কারণ সম্ভবত বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা ছিল পশ্চিমমুখী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর মধ্যপ্রাচ্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী গুরুত্ব লাভ করে। তবে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্বে শতশত বছর ধরে মূল উপাদান হিসেবে বহমান ক্যাথলিক ধর্মীয় আবেগের ঐতিহ্য নেই আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বে। এবার আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা মঞ্চে প্রবেশ করেন। তারা এমন সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন নিয়ে আসেন যা কোনোক্রমে শনাক্তযোগ্য। যাই হোক, নতুন প্রাচ্যতত্ত্ব মদদ দেয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে এবং তা লালনও করে। নতুন আমেরিকান প্রাচ্যতত্ত্বের একটি লক্ষ্যযোগ্য দিক হল তা সাহিত্যকে পুরোপুরি এড়িয়ে যায়; নিকট প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের লেখা শত শত পৃষ্ঠা পড়লেও সাহিত্যের একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। ঘটনাই তাদের নিকট

গুরুত্বপূর্ণ। এর মোট সামগ্রিক প্রভাব হল ঐ অঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীকে মূক করে 'মনোভাব', 'প্রবণতা', পরিসংখ্যান ইত্যাদিতে সঙ্কুচিত রাখা—এক কথায় বি-মানবীকৃত অবসথায় সীমাবদ্ধ রাখা। কারণ আরব কবি ও উপন্যাসিক তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখেন যা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে প্রাচ্যকে প্রতিনিধিত্ব করার বিভিন্ন মাধ্যম, বিভিন্ন নমুনা (কল্পমূর্তি, জীর্ণ নীতিকথা, বিমূর্ত ধারণা ইত্যাদি)। সাহিত্যিক রচনা সরাসরি জীবন্ত বাস্তবতার কথা বলে। আরব, ফরাসি বা ইংলিশ পরিচয়ে নয়—এর শক্তি নিহিত শব্দের ক্ষমতা ও গুরুত্বের ওপর। তাই তা প্রাচ্যতত্ত্বের হাত থেকে মূর্তিগুলো বের করে আনবে, ফলে হাত ফসকে পড়ে যাবে প্রাচ্যতাত্ত্বিকের সৃষ্ট ঐসব পঙ্গু সন্তানেরা অর্থাৎ প্রাচ্যে চালিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ধারণা-কল্পনা।

আমেরিকায় নিকট প্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়নে সাহিত্যের অনুপস্থিতি প্রাচ্যতত্ত্বের নতুন উদাসীনতার উদাহরণ। ওখানে নিকটপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞরা এমন কিছুই করছেন না যা গিব ও ম্যাসিগননে পরিসমাপ্ত প্রথাগত প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উৎপত্তিগত দিক থেকে বলা যায় আধুনিক মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছে যুদ্ধ-পূর্ব ও পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত আর্মির ভাষাশিক্ষা স্কুলে, যুদ্ধোত্তর অ-পাশ্চাত্য পৃথিবীতে সরকার ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থ চিন্তায়, স্নায়ুযুদ্ধ এবং প্রাচ্যদেশীয়দের প্রতি মিশনারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যা মনে করে ওরা এখন সংস্কার ও শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত। কিছু অনিবার্য প্রাথমিক কারণে প্রাচ্যের দুবোধ্য ভাষার অ-ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কার্যকর বোধ হয়। তবে যেসব 'বিশেষজ্ঞ'-কে অর্থহীনভাবে অস্পষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম বলে মনে হয় তাদেরকে কর্তৃত্বের সনদপত্র প্রদানের জন্যেও ঐ অধ্যয়ন প্রয়োজনীয়।

সামাজিক বিজ্ঞানে বস্তুর বিন্যাস, ভাষা ইত্যাদি উচ্চতর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার অবলম্বন মাত্র—তবে সাহিত্যিক রচনা পাঠের জন্যে নয়। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের দিকে নজর রাখা ও গবেষণা পরিচালনার জন্যে প্রতিষ্ঠিত আধা-সরকারি সংঘ *মিড্‌ল ইস্ট ইন্‌স্টিটিউট* তার *রিপোর্ট অন কারেন্ট রিসার্চ* উপস্থাপন করে। মজার ব্যাপার হল এতে 'প্রেজেন্ট স্টেট অব অ্যারাবিক স্টাডিজ ইন আমেরিকা' শিরোনামের লেখাটি লিখেন হিব্রুর এক অধ্যাপক। ভূমিকায় ঘোষণা করা হয়, "বিদেশি ভাষা এখন আর কেবল মানববিদ্যার পণ্ডিতদের এখতিয়ার নয়; এটি প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও অন্য অনেক বিশেষজ্ঞের কাজের হাতিয়ার।" সমগ্র রিপোর্টটি আরব অঞ্চলের তেল কোম্পানির নির্বাহী, প্রকৌশলী ও সামরিক ব্যক্তিদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তবে এর সার কথা আছে এ তিনটি বাক্যে : "রুশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরবিতে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম জনবল প্রস্তুত করছে। মানুষের নিজের ভাষায় তাদের মনে আবেদন রাখার গুরুত্ব তারা অনুভব করতে পেরেছে। বিদেশি ভাষা কর্মসূচি উন্নয়নে আমেরিকার আর কালক্ষেপণ করা উচিত হবে না।"[১০৬]

এভাবে প্রাচ্যদেশীয় ভাষা হল এবং অতীতেও ছিল নীতি বিষয়ক জিনিস বা প্রচারণার হাতিয়ার। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাচ্যদেশীয় ভাষার অধ্যয়ন হ্যারল্ড লাসওয়েলের প্রচারক এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, মানুষ কিভাবে তা জরুরি নয়—মানুষকে কি ভাবতে বাধ্য করা হয় তা-ই জরুরি।

> প্রচারণার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতার সমন্বয়। বিস্তৃত কর্মতৎপরতায় গণমানুষের অভিমত এবং মানবীয় পছন্দের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ উদ্ভূত।... আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর মতো আধুনিক প্রচারক মানুষের নিজের আগ্রহ বিচারের অক্ষমতাকে চিহ্নিত করতে পারেন, মানুষ নিশ্চিত কারণ ছাড়াই এক বিকল্প থেকে অন্য বিকল্পে ঘোরাফেরা করে অথবা কোণে বহু পুরনো শ্যাওলাধরা পাথর টুকরোয় লেপ্টে থাকে। স্বভাবে ও মূল্যবোধে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ধরে রাখার সম্ভাবনার অঙ্ক কষা সাধারণভাবে মানুষের পছন্দের অগ্রাধিকার হিসেব করার চেয়ে অনেক বড় কিছু। এর অর্থ মানুষ যেসব টিস্যুতে গঠিত সেগুলো সব পর্যবেক্ষণ করা এবং দেখা এদের কোনটিতে বিবেচনাহীন পছন্দের ব্যাপারটি রয়েছে; অতঃপর সমাধানের জন্যে একটি কর্মসূচি স্থির করা যা আসলে... ঐ সব খাপ-খাইয়ে নেয়ার ব্যাপারে শ্রদ্ধাবোধ রেখেই বলা যায় প্রচারকের কাজ হল এমন লক্ষ্যের প্রতীক উদ্ভাবন করা যা একই সাথে গ্রহণ ও অভিযোজনে সহায়তা করবে। সেই প্রতীককে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন আদায় করতে হবে।... প্রচারক মেনে নেন যে, গোটা পৃথিবীটাই কারণযুক্ত, কিন্তু কেবল তার অংশ বিশেষ সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব।...[১০৭]

অতএব, অর্জিত বৈদেশিক ভাষা সংশ্লিষ্ট জনগণের ওপর আঘাতের একটি অংশ। এ ধরনের কর্মসূচির থাকে একটি উদারতার মুখোশ এবং সচরাচর তার দায়িত্ব পড়ে পণ্ডিত, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌতূহলী মানুষের ওপর। এতে উৎসাহিত পরিকল্পনাটি এ রকম যে আরব বা মুসলমানদের সম্পর্কে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আমরা তো ভিন্ন একটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পারছি। এক্ষেত্রে, ওদের নিজেদের কথা নিজেরাই বলুক, নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করুক (অবশ্য এর তলে তলে আছে লুই নেপোলিয়নের জন্যে বলা মার্কসের এ বক্তব্য : ওরা নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; অবশ্যই ওদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে)। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এবং এক বিশেষ উপায়ে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে আরব ইসরাইল যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলোয় *দি নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন* ইসরাইল ও আরবদের পক্ষ থেকে দুটো নিবন্ধ প্রকাশ করে। ইসরাইলের পক্ষের বিন্ধটি লিখেন জনৈক ইসরাইলি আইনজীবী। আরবরে পক্ষের প্রবন্ধটি লিখেন এমন এক আমেরিকান যিনি আরব অঞ্চলে রাষ্ট্রদূত ছিলেন, প্রাচ্য সম্পর্কে যার কোনো প্রশিক্ষণ বা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নেই। আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি যে, আরব ও ইহুদি উভয়ই সেমেটিক এবং উভয়ের পক্ষেই জোরপূর্বক প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে। প্রাউস্ট-এ, যেখানে একটি অভিজাত সেলুনে কোনো এক ইহুদি প্রবেশ করে সে দৃশ্যের বর্ণনা থেকে এই অনুচ্ছেদটি এ প্রসঙ্গে তুলে দেয়া যেতে পারে :

> রোমানীয়, তুর্কি ও মিশরীয়রা ইহুদিদের ঘৃণা করতে পারে। কিন্তু কোনো ফরাসি বৈঠকখানায় এসব লোকদের মধ্যে পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এবং এক ইসরাইলি এমনভাবে প্রবেশ করে যেনো সে মরুভূমির বুক থেকে

> উঠে এসেছে, তার শরীর হায়েনার ভঙ্গিতে অগ্রসরমান, তার গলা সামনের দিকে বাড়ানো—'সালাম'-এর মধ্যে দিয়ে সে গর্বের সাথে নিজেকে বিস্তৃত করে দিচ্ছে : তা এক ধরনের প্রাচ্যদেশীয় রুচির সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধন করে।[১০৮]

২. *সাংস্কৃতিক সম্পর্কের নীতি* : বিশ শতকের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব সাম্রাজ্য হয়ে ওঠেনি তা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, উনিশ শতক জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রাচ্যের ব্যাপারে এমনভাবে সজাগ ছিল যা তার উত্তরকালীন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ১৮০১ ও ১৮১৫ সালে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা বাদ দিলে বিবেচনায় আনা যায় ১৮৪২ সালে আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৩ সালে এর বাৎসরিক সভায় সভাপতি জন পিকারিং পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, আমেরিকা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অনুকরণে প্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়নের প্রস্তাব করছে। পিকারিং-এর বক্তব্য ছিল প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল সোজাসাপটা পণ্ডিতি ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক বিষয়ও। নিম্নোক্ত সার-বক্তব্যে বোঝা যায় প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনায় সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নেই :

> ১৮৪৩ সালের বাৎসরিক সভায় সভাপতি পিকারিং প্রস্তাবিত বিষয়টির চমৎকার নকশা তুলে ধরেন। সময়ের অনুকূল পরিবেশ, সর্বত্র বিরাজমান শান্তি, প্রাচ্যদেশসমূহে প্রবেশের মুক্ত অধিকার এবং যোগাযোগের উত্তম সুযোগ ইত্যাদি অনুকূল পরিবেশে নতুন ক্ষেত্রটি আবাদের প্রস্তাব করা হয়। লুই ফিলিপ ও মেটারনিকের সময় পৃথিবী ছিল শান্ত-সুবোধ। নানকিং চুক্তি চীনা বন্দরগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। সমুদ্রগামী জাহাজে যুক্ত হয় স্ক্রু-প্রপেলার। মোর্স তার টেলিগ্রাফ যোগাযোগ সম্পন্ন করেছেন এবং এরই মধ্যে প্রস্তাব করেছেন একটি ট্রান্স আটলান্টিক তার বসানোর জন্যে। সোসাইটির উদ্দেশ্য হল এশীয়, আফ্রিকি ও পলিনেশীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়ন এবং যা কিছু প্রাচ্যদেশীয় তার সবকিছু সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া যাতে দেশে প্রাচ্যতত্ত্ব অধ্যয়নের ব্যাপারে উৎসাহ দেখা দেয়; এ ছাড়া বিভিন্ন পুস্তক, অনুবাদ ও পত্রযোগাযোগ প্রকাশ করা, একটি লাইব্রেরি স্থাপন করাও সোসাইটির লক্ষ্য। বেশিরভাগ কাজই হয় এশীয় বিষয়ে এবং সংস্কৃত ও সেমেটিক ভাষায়।[১০৯]

মেটারনিক, লুই-ফিলিপ, নানকিং চুক্তি, স্ক্রু-প্রপেলার—সবই প্রাচ্যে ইউরোপ-আমেরিকার অবাধ প্রবেশের প্রস্তুতির নির্দেশক। এ প্রস্তুতি কখনো থামেনি। এমনকি প্রাচ্যে উনিশ ও বিশ শতকে কিংবদন্তীতুল্য মার্কিন ধর্মপ্রচারকরাও এমন ভূমিকা গ্রহণ করেন, যা তাদের ঈশ্বরের জন্যে ততটা নয়, যতটা তাদের নিজেদের সংস্কৃতির জন্যে ও উদ্দেশ্যের দিকে।[১১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদিবাদে এবং ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে আনার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বেলফোর ঘোষণার আগে ও পরে (নভেম্বর ১৯১৭) ব্রিটিশ আলোচনা থেকে আন্দাজ করা যায় যুক্তরাষ্ট্র কতটা গুরুত্বের সাথে এ ঘোষণা গ্রহণ করে।[১১১] এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ও তার পরবর্তী সময়ে। যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয় কায়রো, তেহরান, উত্তর আফ্রিকা। এ অবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক

মধ্যপ্রাচ্যের তেল, কৌশলগত অবস্থান ও জনসম্পদ শোষণের দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত হয় তার যুদ্ধোত্তর নতুন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালনের জন্যে।

এ ভূমিকার সাংস্কৃতিক দিকটি উপেক্ষণীয় নয়, ১৯৫০ সালে যার বর্ণনা দিয়েছেন মরটিমার গ্রেভ। গ্রেভ যুক্তি দেখান যে, ওখানে তাদের ভূমিকা প্রয়োজন—"ঐ সব শক্তিসমূহকে ভালোভাবে উপলব্ধির জন্যে যেগুলো নিকট প্রাচ্যের অনুমোদনের জন্যে আমেরিকান মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। অবশ্যই, এর মধ্যে প্রধান হল কমিউনিজম ও ইসলাম।"[১১২] এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে পিছিয়ে থাকা আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটির সহায়করূপে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গবেষণার জন্যে গড়ে ওঠে বিরাট এক মানব-যন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে না হলেও, নজরদারীতে, ১৯৪৬ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ এসোসিয়েশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ক্ষমতাধর সমর্থন, বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে বিভিন্ন প্রকল্প, বিচিত্র কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রকল্প, প্রতিরক্ষা বিভাগ, র‍্যান্ড (RAND), হাডসন ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ; এছাড়া ব্যাংক, তেল কোম্পানি, বহুজাতিক কোম্পানির যোগাযোগ।

প্রাচ্যে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় সাদৃশ্য স্বাভাবিক। যা অনিবার্য নয় তা হল : (ক) যুদ্ধোত্তর কালে আমেরিকায় নিকট প্রাচ্য সম্পর্কিত অধ্যয়নের প্রাবল্যে ইউরোপীয় ঐতিহ্য যতটা গৃহীত হয়, জনপ্রিয়তা পায় বা আত্মীকৃত হয়, কিংবা ইউরোপীয় ঐতিহ্য বা তা থেকে যতটা গ্রহণ করে, (খ) সমকালীন পরিশোধন-প্রবণতা ও সামাজিক বিজ্ঞানের মতো সূক্ষ্ম কৌশলের ব্যবহার সত্ত্বেও ইউরোপীয় ঐতিহ্য মার্কিন পণ্ডিতবর্গ, ইন্‌স্টিটিউট, ডিসকোর্স নির্মাণ ও পরিচিতি অর্জনে এতোটা ঐক্যবদ্ধতার যে বোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

আগে উল্লেখ করেছি ১৯৫০ সালে হার্ভার্ডের সেন্টার ফর মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ-এর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন গিব। যুক্তরাষ্ট্রে গিবের উপস্থিতি আর প্রিন্সটনে ফিলিপ হিট্টির উপস্থিতি এক জিনিস নয়। প্রিন্সটনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৈরি করে একদল গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিত যাদের মুখ্য আগ্রহ প্রাচ্য বিষয়ে মহান পণ্ডিতি গবেষণা। অন্যদিকে গিব প্রাচ্যতত্ত্বের রাষ্ট্রীয় নীতির দিকটি সম্পর্কে অনেক সচেতন। হার্ভার্ডে তার অবস্থান প্রাচ্যতত্ত্বকে স্নায়ু-যুদ্ধকালীন অঞ্চল অধ্যয়নের মনোভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট করে।

রেনান, বেকার ও ম্যাসিগননের মতো গিব নিজের কাজে সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সের ভাষা বিশেষ প্রয়োগ করেননি। এসত্ত্বেও এই ডিসকোর্স, এর বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলসমূহ, এর অন্ধ মতাদর্শ গুস্তাভ ভন গ্রুনেভমের কর্তৃত্বময় পাণ্ডিত্য ও রচনারাজির প্রবলভাবে উপস্থিত। ফ্রাসিজম থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসা বুদ্ধিজীবীদের মতোই গুস্তাভ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।[১১৪] তিনি তার প্রাচ্যতাত্ত্বিক লেখালেখিতে এই মতো তুলে ধরেন যে, ইসলাম হল প্রতিশোধাত্মক এক সংস্কৃতি। এরপর থেকে আজীবন তিনি এই মতকেই লালন করেন, তার সমর্থনে অব্যাহত রাখেন সংকোচক ও নেতিবাচক সাধারণীকরণ। তিনি দেখান যে ইসলাম মানবতা-বিরোধী, উন্নয়নে অক্ষম, আত্মজ্ঞানহীন, অ-সৃজনশীল, অ-বৈজ্ঞানিক, কঠোর নিয়ন্ত্রণমুখী। আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রুনেভম যুক্তরাষ্ট্রে বসে লিখেন একজন

ইউরোপীয় পণ্ডিতের কর্তৃত্বের সাথে; শিক্ষা দেন, পণ্ডিতদের বড় একটি নেটওয়ার্কে অনুদান প্রদান করেন, তা পরিচালনাও করেন :

> আমাদের বুঝতে হবে যে, মুসলিম সভ্যতা একটি সাংস্কৃতিক ব্যাপার যা আমাদের প্রাথমিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তা নিজের একটি প্রান্ত হিসেবে কিংবা নিজের প্রকৃতি ও ইতিহাস পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির উপায় হিসেবেও অন্য সংস্কৃতির কাঠামোভিত্তিক অধ্যয়নে আগ্রহী নয়। এই পর্যবেক্ষণ যদি সত্য হয় তাহলে কেউ হয়তো একে ইসলামের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল পর্যায়ের সাথে যুক্ত করতে চাইবে। কিন্তু ইসলাম কখনো তার বাইরে কাউকে তাকাতে দেয় না, যদি না তা করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু যেহেতু তা অতীতের জন্যেও প্রযোজ্য তাই কেউ হয়তো একে যুক্ত করতে চাইবে ইসলামের মানবতা-বিরোধী সভ্যতার সাথে—অর্থাৎ বস্তুর বিচারকরূপী মানুষকে সরাসরি অস্বীকার করার স্বভাব এবং মানসিক গঠন থেকে উদ্ভূত বর্ণনার সত্য অর্থাৎ মানসিক সত্যে সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতার সাথে।
>
> [আরব বা ইসলামি জাতীয়তাবাদে] একটি জাতির ঐশ্বরিক অধিকারের ধারণাটিই অনুপস্থিত। তাতে গঠনমূলক নৈতিকতার অভাব, উনিশ শতকের যান্ত্রিক উন্নতির ধারণাও নেই। সবচেয়ে বড় কথা এতে কোনো প্রাথমিক প্রপঞ্চের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক তেজ-দীপ্তি নেই। ক্ষমতা এবং ক্ষমতার ইচ্ছা উভয়ই নিজেদের মধ্যেই সমাপ্ত। রাজনৈতিক তুচ্ছতার ক্ষোভ জন্ম দেয় অসহিষ্ণুতা, বাধাগ্রস্ত করে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের বৃহত্তর বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা।[১১৫]

ভন গ্রুনেভম-এর রচনা প্রশ্ন ছাড়াই গৃহীত হয়, যদিও এখন চেষ্টা করলেও এই জ্ঞানক্ষেত্রটি এরকম ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতে পারবে না। কেবল একজন সমালোচক—মরোক্কান ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ লারোই গ্রুনেভমের লেখা সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন যে, এমন বিস্তৃত পরিসর ও খুঁটিনাটি ধারণ করেও গ্রুনেভমের লেখা সঙ্কোচক রীতি গ্রহণ করলো কেন? লারোই বলেন যে, গ্রুনেভম ইসলামের সাথে যে সব বিশেষণ (আদি, মধ্যযুগীয়, আধুনিক) ব্যবহার করেছেন সেগুলো নিরপেক্ষ, "কারণ ধ্রুপদ ইসলাম ও মধ্যযুগীয় ইসলাম কিংবা সহজ ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এখানে একটি মাত্র ইসলাম রয়েছে যা নিজের মধ্যেই পরিবর্তিত হয়"।[১১৬] লারোই উল্লেখ করেননি যে পশ্চিমের নিকট থেকে প্রাচ্যের শেখার প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি, সম্ভব, গ্রুনেভমের প্রভাবেই *কথিত-সত্যে* পরিণত হয়। (যেমন *সেলফ ডিটারমিনিজম অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন দি এগার্ড ওয়ার্ল্ড*[১১৭]-এ ডেভিড গর্ডন যুক্তি দেখান যে আফ্রিকি, এশীয় ও আরবদের প্রয়োজনীয় পরিপক্কতা অর্জন করতে হবে পশ্চিমের জাগতিক মনোভাব থেকে।)

ভন গ্রুনেভম আসলে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তার অন্তস্থ অন্ধ মতাদর্শ এবং ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এই উভয়ের শিকারে পরিণত হন। ইসলামের যে বৈশিষ্ট্যকে তিনি বলেন দুর্বলতা, তা হল : ইসলামে উচ্চাঙ্গের ধর্মীয় তত্ত্ব আছে, কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনা স্বল্প; রাজনৈতিক তত্ত্ব আছে, কিন্তু প্রকৃত দলিল সামান্যই; সমাজ কাঠামোর তত্ত্ব আছে, কিন্তু ব্যক্তিক ক্রিয়াশীলতার উদাহরণসুলভ নয়; ইতিহাসের তত্ত্ব

আছে, কিন্তু সন-তারিখসহ ঘটনার বিবরণ অত্যল্প; অর্থনীতির বিরাট তত্ত্ব আছে কিন্তু প্রায়োগিক বিবরণ নেই; এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।[১১৮] গ্রুনেবমের ইসলাম আসলে ইউরোপীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ইসলাম—মধ্যযুগীয়, সাধারণ মানবীয় অভিজ্ঞতার ঘৃণায় ভরপুর, স্থূল, সঙ্কোচক, অপরিবর্তনীয়।

নতুন প্রজন্মের পাচ্যতাত্ত্বিকদের নিকট এ জাতীয় মতের প্রভাব বিস্তারের একটি কারণ এর প্রথাগত গুরুত্ব; অন্য আরেকটি কারণ হল এমন বিশাল একটি অঞ্চলকে একত্রে অবধারণের জন্যে হাতের কাছে প্রস্তুত একটি হাতিয়ার রূপে এর ব্যবহার। লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আরব জাতীয়তাবাদীরা প্রকাশ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের নিন্দা করার এ জাতীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আরেক জন পণ্ডিত ইসলামি সমাজকে অভিহিত করে "একটি আবদ্ধ সমাজের প্রত্নরূপ" হিসেবে। তিনিও 'আমাদের'-'ওদের' মতাদর্শিক চিত্র ব্যবহার করেন :

> মধ্যপ্রাচ্যের সমাজকে সামগ্রিকভাবে বোঝার কাজটি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে থাকা উচিত। যে সমাজ বহুমাত্রিক স্থায়িত্ব অর্জন করেছে কেবল ['আমাদের' সমাজের মতো] এমন কোনো সমাজই অস্তিত্বের স্বায়ত্তশাসিত জগতের বিষয়াদিরূপে যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির চর্চা করতে পারে। প্রথাগত যে সমাজ শাসকের বিষয়সমূহকে ঈশ্বরের বিষয়গুলো থেকে আলাদা করতে পারে না, কিংবা রাজনীতির সাথে জীবনের অন্য সকল বিষয় গুলিয়ে ফেলে তা-ই আলোচনার মূলবিন্দু। এ মুহূর্তে একজন মানুষ চারজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, না একজন; খাবে, না উপোস করবে; জমি ত্যাগ করবে, না ধরে রাখবে—এসবই মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত।... মুসলমান এবং প্রাচ্যতাত্ত্বিককেও গুরুত্বের সাথে নতুন করে ভেবে দেখতে হবে ইসলামি সমাজের বিশিষ্ট কাঠামো ও সম্পর্ক কি হতে পারে।[১১৯]

জীবনের সামগ্রিকতাকে ইসলামে অন্তর্ভুক্তকরণ ও দমনের প্রদত্ত উদাহরণগুলো নিঃসন্দেহে তুচ্ছ। তাছাড়া কোথায় এগুলো ঘটছে তা বলা হয়নি। তবে আমাদেরকে এই অ-রাজনৈতিক ঘটনা মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, "প্রাচ্যদেশীরা নিজেদের অতীত সম্পর্কে ভালো বলে, তার জন্যে দায়ী প্রাচ্যতাত্ত্বিকেরাই"।[১২০]

নব্য মার্কিন প্রাচ্যতত্ত্বের কঠোরপন্থীদের মত যখন এই, তখন 'নরমপন্থীরা' আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা আমাদেরকে ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, সমাজের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয়, তবে "প্রায়শই কয়েকটি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে একটি সভ্যতাকে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়"।[১২১] অতএব, প্রথানুগ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের বিপরীতে নতুন অঞ্চল বিশেষজ্ঞরা দার্শনিক যুক্তি দেখান :

> গবেষণা পদ্ধতি ও বিষয়ভিত্তিক আদিকল্প অধ্যয়নের জন্যে নির্বাচিত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করলে চলবে না; এগুলোর দ্বারা পর্যবেক্ষণও সীমাবদ্ধ হওয়াও উচিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলবিদ্যা মনে করে যে প্রকৃত জ্ঞান কেবল অস্তিত্বশীল জিনিসের ক্ষেত্রে সম্ভব—যখন পদ্ধতি ও তত্ত্ব বিমূর্ত, যেগুলো

> অভিজ্ঞতা-বিরহিত মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ সুশৃঙ্খল করে এবং তার ব্যাখ্যা প্রদান করে।[১২২]

ভালো! কিন্তু কেউ কিভাবে জানবে কোনটি 'অস্তিত্বশীল জিনিস' এবং যিনি জানবেন তিনি 'অস্তিত্বশীল জিনিসকে' কতটা প্রদর্শন করতে পারবেন? এর উত্তর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বিতর্কের ওপর। বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী প্রবণতা ছাড়া ইসলাম কদাচিৎ অধীত ও গবেষিত হয়েছে, বা কদাচিৎ ইসলামকে জানা হয়েছে। উদ্ধৃতিটির অর্থ দাঁড়ায় যে, জ্ঞানের বস্তু ও প্রক্রিয়ায় মানুষের কোনো ভূমিকা নেই, সুতরাং প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতা সম্পূর্ণ স্থির ও 'অস্তিত্বশীল'।

চরম ও নরমপন্থীদের মাঝখানেও পুরনো প্রাচ্যতত্ত্বের কিছু দূষিত সংস্করণ বিকশিত হয়েছে। তবে প্রাচ্যতত্ত্বের গোঁড়া ধারণাগুলো বিশুদ্ধরূপে টিকে আছে আরব ও ইসলাম বিষয়ক অধ্যয়নে। একটি হল পশ্চিম ও পুবের পার্থক্য : পশ্চিম যুক্তিবাদী, উন্নত, মানবিক, উৎকৃষ্ট; প্রাচ্য নিকৃষ্ট, অনুন্নত। আরেকটি হল বিমূর্ত আখ্যা—বিশেষত 'ধ্রুপদ' প্রাচ্য সভ্রতার ভিত্তিতে সৃষ্ট বিমূর্ত আখ্যা আধুনিক প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতার প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির ক্ষেত্রে বেশি পছন্দনীয়। তৃতীয় আরেকটি এই যে, প্রাচ্য চিরন্তন, একক, অবিচল—নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না; তাই প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে পশ্চিমের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয়, খুবই সাধারণীকৃত ও পদ্ধতিভিত্তিক শব্দভাণ্ডার ও বাক্যাবলি জরুরি এমনকি 'বৈজ্ঞানিকভাবে' অত্যাবশ্যক। চতুর্থ, গোড়া ধারণাটি হল প্রাচ্য এমন কিছু যাকে ভয় পেতে হবে (হলুদ ভীতি, মোগল দস্যুদল, বাদামি উপনিবেশ) অথবা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (গবেষণা, অধ্যয়ন কিংবা যখন সম্ভব সরাসরি দখলের মাধ্যমে)।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল এসব ধারণা কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সরকারের ভেতর কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই টিকে থাকে। আরব পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে কোনো সুশৃঙ্খল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়ার অন্যান্য এলাকায়, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকে প্রতিরোধী স্রোত উত্থিত হয়। কেবল আরব ও ইসলামের তাত্ত্বিকরাই উদাসীন।

এদিকে মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ প্রতিষ্ঠান একটি সংযোজক প্রস্তুত করে যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক জগতের সাথে যুক্ত হয় করপোরেট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তেল কোম্পানি, ধর্মীয় মিশন, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে অনুদান ও অন্যান্য পুরস্কার, পদবিন্যাস, ইন্‌স্টিটিউট, সেন্টার, ফ্যাকাল্টিজ, ডিপার্টমেন্ট—যার সবই বিকশিত হয়েছে ইসলাম, প্রাচ্য ও আরবদের সম্পর্কে গুটিকয় মৌলিক, অপরিবর্তিত ধারণাকে বৈধতা প্রদানের ও প্রচলিত রাখার প্রয়োজনে। আমেরিকায় মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন কর্মসূচির একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ দেখায় যে, অধ্যয়ন-ক্ষেত্রটি আদিম নয়, বরং জটিল যার মধ্যে "পুরনো ধারার প্রাচ্যতাত্ত্বিক, সংখ্যাল্প বিশেষজ্ঞ, বিদ্রোহী-বিশেষজ্ঞ, নীতি-নির্ধারক তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার দালালদের[১২৪] সংখ্যালঘু একটি দল" আছে। যাই হোক, মূল গোঁড়া-প্রাচ্যতাত্ত্বিক ধারণাগুলো যথারীতি টিকে থাকে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে, এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ দুই ভলিউমের *ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম* আলোচনা করা যায়। এটি প্রকাশিত ১৯৭০ সালে। বহু প্রখ্যাত

সমালোচকের সাথে সুর মিলিয়ে যদি বলি গ্রন্থটি এক প্রাচ্যতত্ত্ব ছাড়া আর যে কোনো মানদণ্ডেই বিরাট এক ব্যর্থতা, তাহলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর সার্থকতার সম্ভাবনাও ছিল। আসলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্ডিতও বলেছেন যে,[১২৪] এ ধরনের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনাতেই ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়ে যায়, তা আর কোনোক্রমেই উৎকৃষ্ট বা ভিন্নভাবে রচিত হতে পারে না। বহু মতাদর্শকে একসাথে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করেছেন সম্পাদকগণ, অস্পষ্ট ধারণায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নটিকে মোটেও বিবেচনায় আনেননি। *ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম* ইসলামকে মৌলিক দিক থেকেই ভুলভাবে উপলব্ধি ও প্রতিনিধিত্ব করেছে। এর কোনো কেন্দ্রীয় আদর্শ নেই, পদ্ধতিগত বুদ্ধিমত্তাও প্রায়-অনুপস্থিত।

প্রাক-ইসলামি আরবের ওপর এরফান শহীদ কর্তৃক রচিত অধ্যায়টিতে চমৎকারভাবে তৎকালীন আরবের ফলপ্রসূ পরিবেশ ও মানব-বিন্যাসের বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্য থেকে ইসলামের আবির্ভাব। কিন্তু পিএম হল্ট-এর সূচনায় যখন ইসলামকে অভিহিত করা হয় 'সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ'রূপে[১২৫], তখন কি-ই বা বলার থাকে। তার সেই সূচনা প্রাক-ইসলামি আরব থেকে সোজা মোহাম্মদ সম্পর্কিত আলোচনায়, অতঃপর চার উত্তরাধিকারী খলিফাগণ এবং উমাইয়া শাসনের প্রসঙ্গে প্রবেশ করে; ধর্মমত, বা বিশ্বাস বা মতবাদ হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা নেই। প্রথম খণ্ডের শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে ইসলামকে উপলব্ধি করা হয়েছে যুদ্ধ, শাসন, মৃত্যু আর উত্থান-পতনের একঘেঁয়ে কাহিনীরূপে।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা আছে তারাই একমত হবেন যে, আট থেকে এগারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত আব্বাসীয় শাসনামল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অধ্যায়। অথচ চল্লিশ পৃষ্ঠার বিবরণে আমরা কোথাও সেই সমৃদ্ধির চিহ্ন মাত্র পাই না। তার বদলে পাই এ ধরনের মন্তব্য : "খলিফা (আল-মামুন) তার বিশ্বস্ত লোক আল-ফজল-এর ভাই আল-হাসান বি. শাহলের ওপর বাগদাদের দায়িত্ব দিয়ে বাগদাদের সমাজ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে মারভ-এ স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করার সাথে সাথে প্রচণ্ড শিয়া বিদ্রোহ দেখা দেয়া বাগদাদে, দ্বিতীয় জুমাদা, ১৯ জানুয়ারি ৮১৫-এ। হাসানিদ ইব্‌ন তবাতবাঈ'র সমর্থনে কুফা থেকে সশস্ত্র সেনাদল চাওয়া হয়।"[১২৬]

অ-মুসলিম পাঠক বুঝতে পারবেন না দ্বিতীয় জুমাদা আসলে কি। তার নিকট মনে হবে হারুন-অর-রশীদসহ আব্বাসীয় খলিফারা নির্বোধ খুনী ছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলামের মূলভূমির বর্ণনা থেকে উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়াকে বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রথম খণ্ডে ইসলাম আসলে নির্বাচিত সময়ক্রমে বর্ণিত ভৌগোলিক ব্যাপার মাত্র। আধুনিক আরবে বিপ্লবী পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা ছাড়াই, কেবল আরবদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ সম্বল করে রচনা করা হয়েছে আধুনিক আরব সম্পর্কিত অধ্যায়টি। (উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ সময় আদর্শ ও আবেগে উদ্দীপ্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত আরব তরুণরা পরিণত হয় রাজনৈতিক শোষণের উর্বর ক্ষেত্রে এবং চরমপন্থী তৎপরতার বাহনে।[১২৭] তিরিশের দশকে অল্পসংখ্যক আরব তরুণের মধ্যে ফ্রাসিজম আলোড়ন তোলার ঘটনা কথিত হলেও বলা হয়নি যে, এই ফ্রাসিজমে উদ্বুদ্ধ

লেবানীজ মেরোনাইট খ্রিস্টানরা ১৯৩৬ সালে মুসোলিনির ব্ল্যাক শার্ট-এর আদলে ফেলাঞ্জিস লিবানাইজেস্ গঠন করে।) ১৯৩৬ সালের ওপর অস্থিতিশীলতা ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের অপবাদ ছাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও ইহুদিবাদী তৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়নি; উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ধারণাও বর্ণনার শান্ত মসৃণতা ক্ষুণ্ন করেনি কোথাও। পরিবর্তন ও রূপান্তর আলোচিত হয়েছে আধুনিকতার সাথে তুলনা করে এবং ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি কেন অন্য কোনো পরিবর্তন আলোচনায় আসার প্রয়োজন নেই। যেহেতু ধরে নেয়া হয় একমাত্র পশ্চিমের সাথেই ইসলামের সম্পর্ক তাই বান্দুং সম্মেলন বা আফ্রিকা কিংবা সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বও উপেক্ষিত। পার্থিব বাস্তবতার প্রায় তিন-চতুর্থাংশের প্রতি অবজ্ঞা এই মজার মন্তব্যটিকে চমৎকার ব্যাখ্যা করে : "সমতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে... পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির জন্যে ঐতিহাসিক পটভূমি পরিষ্কার করা হয়ে গেছে [কার দ্বারা, কার জন্যে, কিভাবে?]।"[১২৮]

প্রকৃত অর্থে ইসলাম কী তা জানতে গিয়ে আমরা যদিও প্রথম খণ্ড পাঠ শেষে বিভ্রান্ত, দ্বিতীয় খণ্ডেও কোনোরূপ সহায়তার আশা দেখি না। গ্রন্থের অর্ধেক ব্যয় হয়ে যায় দশ থেকে বিশ শতকের ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি সম্পর্কে; এভাবে বারোশ' পৃষ্ঠার মতো শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায় ইসলাম আর সাংস্কৃতিক সংশ্লেষ নয়—যুদ্ধ, শাসক-বংশ আর সম্রাটদের নাম ডাকার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ অর্ধেকে 'ভৌগোলিক বিন্যাস', 'ইসলামি সভ্যতার উৎস', 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' এবং 'যুদ্ধ' বিষয়ে নিবন্ধ নিয়ে মহাসংশ্লেষণ নিজেই সমাপ্ত হয়।

এখানে একটি বৈধ প্রশ্ন ওঠে যে, ইসলামি যুদ্ধ বলে কিছু কি আছে, বা খ্রিস্টীয় যুদ্ধ? না হলে এ বিষয়ে আলাদা অধ্যায় রচিত হয় কি করে? ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্ক থেকে উদ্ধৃতির প্রাসঙ্গিকতা কী? —কেবল ভন গ্রুনেভমের অবিবেচনাপ্রসূত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ছাড়া? দেখা যায় গ্রুনেভমের তত্ত্বই যেনো ছদ্মবেশে উপস্থাপিত : অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতা মুসলমানদের দ্বারা ইহুদি-খ্রিস্টীয়, হেলেনিস্টিক ও অস্ট্রো-জার্মান সভ্যতা থেকে ধার করা জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মন্তব্য করা হয় 'তথা-কথিত আরবি সাহিত্য' পারস্যবাসীদের দ্বারা লিখিত (কোনো তথ্য-প্রমাণের উল্লেখ নেই)। 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ের শুরুতে ব্যাখ্যা ছাড়াই জানানো হয় ইসলামি সভ্যতার প্রথম পাঁচশ' বছরই কেবল আলোচিত হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে বারো শতকেই ইসলামি সভ্যতার বিকাশ সম্পন্ন ও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে? 'ইসলামি ভূগোল' বলে কিছু কি আসলে আছে? এসব কি তাহলে ভৌগোলিক-বর্ণভিত্তিক নির্ধারণবাদ নয়?

ইসলামি বিষয়সমূহ বিশ্লেষণে মতাদর্শের আধুনিক ইতিহাস, মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি বা নব-ইতিহাসের কোনো পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়নি। কিছু লেখকের নিকট ইসলাম রাজনীতি ও ধর্ম, অন্যদের নিকট তা অস্তিত্বের একটি ধরন, অন্য কারো মতে এটি "মুসলিম সমাজ থেকে চিহ্নিত করা যায়", আরেক দলের নিকট ইসলাম রহস্যময় উপায়ে জ্ঞাত কিছু। সবকিছুর ওপর আছে *ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম*-এর অপরীক্ষিত বিবৃতিকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার পুরনো এই মতবাদ যে, ইসলাম কেবলই কেতাবী ব্যাপার, জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত কোনো কিছু নয়।

কিন্তু কথা হল জাতিগত উৎস ও ধর্মীয় পরিচয়ই কি মানবীয় অভিজ্ঞতার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা? 'এক্স' ও 'ওয়াই' কোন উপায়ে অসুবিধাজনক বা ওগুলো কি মুসলিম অথবা ইহুদি, এ তথ্য ইসলামকে বোঝার ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে কি?

৩. *তুচ্ছ ইসলাম* : সেমেটিকদের সরলতা সম্পর্কিত তত্ত্বটি আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্বের অতোটাই গভীরে প্রোথিত যে, এটি প্রায় একইভাবে প্রযুক্ত হয় *দি প্রটোকলস্ অব দ্য এল্ডার্স অব জিয়ন*-এর মতো গ্রন্থ বা চায়েম ভাইজম্যানের এ মন্তব্যেও :

> হাবে ভাবে চতুর আরবরা একটি জিনিস—কেবল একটি জিনিসের পূজারী। তা হল ক্ষমতা ও সাফল্য... আরবদের বিশ্বাসঘাতক চরিত্র, তা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জানা বিধায়... সতর্কতার সাথে অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ইংরেজ শাসন যত নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে আরবরা ততই উদ্ধত হয়... ফিলিস্তিনে যদি আরব বাসিন্দা থাকে তবে বর্তমান পরিস্থিতি আরব ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকবে। কারণ ফেলাহ্ [মিশরীয় কৃষক] যুগের তুলনায় অন্তত চারশ' বছর পিছিয়ে। এবং এফেন্দি [সম্মানসূচক তুর্কি সম্বোধন] যেমন অসৎ, অশিক্ষিত, লোভী, দেশপ্রেমহীন, তেমনি অযোগ্য।[১২৯]

ভাইজম্যান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক শ্রেণীবিভাজক হল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত—প্রাচ্যদেশীয়দের এমনভাবে দেখা যে পশ্চিমের আকাঙ্ক্ষিত কোনো গুণ তাদের মধ্যে নেই। তবু রেনান ও ভাইজম্যানের পার্থক্য এখানে যে, দ্বিতীয়োক্তজন এরই মধ্যে তার বক্তব্যের সপক্ষে নিরেট প্রাতিষ্ঠানিক ভিত পেয়েছেন, রেনানের তা নেই। এর অর্থ কি এই নয় যে, রেনান সেমেটীয়দের মধ্যে যা দেখেছিলেন অর্থাৎ অপরিবর্তিত সত্তা, সেই অপরিবর্তনীয় 'দয়ার্দ্র শৈশবকাল'-এর ধারণাই কি এখন রাষ্ট্র ও সকল প্রতিষ্ঠানসমেত পাণ্ডিত্যের সাথে মিশে যায়নি?

তবু এসব মিথের বিশ শতকী সংস্করণ আরো বেশি ক্ষতিকর ক্রিয়াশীলতা বজায় রেখে চলেছে। সে অনুযায়ী, উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ফিলিস্তিনিরা হয় নির্বোধ ও আদিম, নয়তো নৈতিক ও অস্তিত্বগতভাবে উপেক্ষণীয়। আরবদের অধিকার সামান্যই : ওরা ইসরাইলে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে পারবে না; ওদের যে সমান অধিকার নেই, তার কারণ ওরা অনুন্নত। আরবদের প্রতি ইসরাইলি নীতি শুরু থেকেই প্রাচ্যতত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়েছে; তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে সম্প্রতি প্রকাশিত কোয়েনিগ রিপোর্টে। আরবদের আবার ভালো আরব (যারা কথা শুনে) ও খারাপ আরব (যারা শুনে না, তাই সন্ত্রাসী) ভাগ করা হয়েছে। রবার্ট অল্টার *কমেন্টারিতে*[১৩০] চমৎকার ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, জেনারেল ইয়েহোশাফাত হারকাবি'র *আরব এটিচুড টু ইসরাইল*-এর ওপর একবার চোখ বুলালেই বোঝা যাবে আরব মন দূষিত, মৌলিকভাবে সেমেটিক-বিরোধী, সন্ত্রাসী, ভারসাম্যহীন, কেবল জানে কথা বলতে। এভাবে একটি মিথ সৃষ্টি করে আরেকটি মিথ, তাকে সমর্থনও করে।

একরাশ বিশ্বাস হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ব তার নিজের থেকে এবং নিজের মধ্যে বিকশিত হতে পারে না। কারণ এটি নিজেই উনয়নের মতাদর্শ বিরোধীতত্ত্ব। এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল সেমেটীয়দের উন্নয়ন-স্থবিরতা। ঘটনা ও পরিস্থিতির প্রভাবে সেমেটিক মিথ ইহুদিবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় : একদল সেমেটিক মিশে যায়

প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে, অন্যদল, অর্থাৎ আরবরা বাধ্য হয়ে যায় 'প্রাচ্যদেশীয়'-তে। প্রাচ্যতত্ত্ব কর্তৃক সৃষ্ট মিথের স্বল্পায়ুর কারণে প্রত্যেক প্রাচ্যতাত্ত্বিকের থাকে অস্থিতিশীল ক্ষমতার এক বাড়তি সমর্থক পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি এখন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এসে তুঙ্গীভূত হয়েছে। কাজেই আরব প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে কিছু সৃষ্টির অর্থ হল একটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ে লেখা; এবং রূঢ় ভাবাদর্শ নয়, এক পরম ক্ষমতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে প্রশ্নহীন নিশ্চিত 'সত্য' নিয়ে লেখা।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার *কমেন্টারি*-তে গিল কার্ল এলরয়ের প্রবন্ধ 'ডু দি আরবস ওয়ান্ট পীস' প্রকাশিত হয়। এলরয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক এবং *এটিচুড টুওয়ার্ডস জু'য়িশ স্টেটহুড ইন আরব* এবং *দি আরব ওয়ার্ল্ড ও ইমেজেস অব মিড্‌ল ইস্ট কনফ্লিক্ট* গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। তার বক্তব্য আঁচ করা যায়। তা এই যে, আরবরা ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চায়, আরবরা যা বলে প্রকৃতপক্ষে তা-ই নির্দেশ করে। এলরয়কে তা-ই প্রমাণ করতে হবে। কারণ, তার মতে আরবরা প্রথমত, প্রতিশোধপরায়ণ রক্তখেকো, দ্বিতীয়ত, শান্তি বজায় রাখতে অক্ষম, তৃতীয়ত, এমন ন্যায়বিচারের ধারণায় সম্পৃক্ত যা আসলে উল্টো অর্থ নির্দেশ করে। তাই ওদের বিশ্বাস করা যাবে না; যেভাবে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়তে হয় সেভাবেই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি অলিম্পীয় নিশ্চয়তার সাথে বলেন, আরবরা "বুঝে শুনেই প্রকৃত শান্তি প্রত্যাখ্যান করে"—তার কথা অনুযায়ী, তিনি আরবদের মধ্য থেকেই তার প্রমাণ পেয়েছেন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও তার মতের সমর্থক।[১৩১]

এ বিবৃতি থেকে উপলব্ধি করা যায় প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার ও প্রাচ্যজনের মধ্যে আরো স্পষ্ট ও শক্তিশালী আরেক পার্থক্য সূচিত করেন। এখানে প্রাচ্যতাত্ত্বিক লিখেন, আর প্রাচ্যজন লিখিত হয়। দ্বিতীয়োক্তজনের জন্যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্ধারিত, প্রথমজনের থাকছে পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ইত্যাদির ক্ষমতা। রোঁলা বার্থ যেমন বলেন মিথ (ও তার সংরক্ষকরা) অবিরাম নিজেই (তারাই) উদ্ভাবন করতে পারে।[১৩২] দু'জনের সম্পর্ক মূলত ক্ষমতার সম্পর্ক, যার অসংখ্য কল্পমূর্তি রয়েছে। এখানে রাফায়েল পেটাই-এর *গোল্ডেন রিভার টু গোল্ডেন রোড* থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া যায় :

> পশ্চিমের বিব্রতকরভাবে সমৃদ্ধ সভ্যতার ভাণ্ডার থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি স্বেচ্ছায় কি গ্রহণ করবে তা সঠিকভাবে হিসেব করতে হলে আগে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে হিসেব করতে হলে আগে মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিকে ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করা দরকার। প্রথানুসারী জনগোষ্ঠীর ওপর নতুন সংস্কৃতির প্রভাবের ফলাফল আন্দাজ করার জন্যেও এই জ্ঞান প্রয়োজন। কোন উপায়ে *নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণযোগ্য করে* উপস্থাপন করা যায় তার জন্যেও প্রয়োজন পূর্বের তুলনায় আরো গভীরতর অধ্যয়ন। মোট কথা, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমায়নের প্রতি *প্রতিরোধের গর্ডিয়ান নট মুক্ত করে দেয়ার* একমাত্র উপায় হল এর প্রথাগত সংস্কৃতির *পূর্ণাঙ্গ চিত্র আয়ত্ত করা*, ওখানে *চলমান পরিবর্তনকে* আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে *গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি* লাভ করা। *কাজটি দুরূহ*, তবে তার *পুরস্কার*—পশ্চিম ও তার এক

> গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী জগতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক—তেমনিই মূল্যবান।[১৩৩]

ফ্লবেয়ারের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমের সম্পর্কের যৌনগত রূপ আছে। এখানেও তা অব্যাহত। মধ্যপ্রাচ্য কুমারীর মতো বাধা দেয়, আর তরুণ পুরুষ পণ্ডিত প্রবল পরিশ্রমের পর 'গর্ডিয়ান নট'-এর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে পুরস্কার লাভ করে।

পেটাই-এর লেখার মতো লেখালেখিতে কণ্ঠ-নির্ভর ক্রিয়া বিশেষ এক ঘনীভবন ও সংকোচনের লক্ষ্যে ধাবিত (পূর্বের চেয়ে তার বর্তমান রচনা *দ্য আরব মাইন্ড*-এ[১৩৪] তিনি আরো একধাপ এগিয়ে)। তার অধিকাংশ কৌশলই নৃ-তাত্ত্বিক। মধ্যপ্রাচ্যকে তিনি বর্ণনা করেন 'সংস্কৃতি অঞ্চল' রূপে; মূল লক্ষ্য হল আরবদের আন্তঃপার্থক্য দূর করা যাতে আসল পার্থক্য অর্থাৎ আরবদের সাথে আর সকল মানুষের পার্থক্যকে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়, যাতে ওদেরকে গবেষণা ও বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। তা ছাড়া, এর ফলে সাধারণ প্রলাপকেও ওদের দিয়ে নির্বোধের মতো বৈধতা ও গুরুত্ব দিতে বাধ্য করা সম্ভব হবে, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সানিয়া হামাদির *টেম্পার‍্যামেন্ট অ্যান্ড ক্যারেক্টর অব দি আরবস*-এ :

> এখন পর্যন্ত দেখা যায় আরবরা শৃঙ্খলা ও সর্বজনমান্য ঐক্য অর্জনে অক্ষম। এরা আবেগের ক্ষেত্রে একসাথে ফেটে পড়ে, কিন্তু ধৈর্য্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারে না; এরা তা করে আধখানা মনে। সংগঠন ও কাজেকর্মে এরা সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রদর্শন করে, সহযোগিতা করার ক্ষমতাও এরা দেখাতে পারে না। সবার জন্যে বা পারস্পরিক স্বার্থের জন্যে যৌথ কর্ম-তৎপরতা এদের অজানা।[১৩৫]

হামাদি যা বলতে চেয়েছেন তার গদ্যের ভঙ্গি এর চেয়ে বেশি কিছু বলে : 'প্রদর্শন', 'উন্মোচন' প্রভৃতি ক্রিয়া উদ্দেশ্য ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে। আরবরা কার নিকট উন্মোচন করছে, কার সামনে প্রদর্শন করছে? বিশেষভাবে কারো নয়, সাধারণভাবে সবার সামনে ; তার গদ্য যত এগোয়, নিশ্চয়তা যেন ততই বাড়ে : "যৌথ কর্ম-তৎপরতা... ওদের অজানা।" আরবরা মানবীয় সত্তা থেকে রূপান্তরিত হয় হামাদির গদ্য ভঙ্গির সামান্য বিষয়ে। অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিকের লেখাও এ রকম কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে পূর্ণ—হতে পারে তা ম্যানফ্রেড হালফার্নের এই মন্তব্য যে, যদিও সকল মানুষের চিন্তন-প্রক্রিয়ার আটটি ধরন রয়েছে, আরবরা তার মধ্যে কেবল চারটি ধরনে সক্ষম[১৩৬], কিংবা মুর বার্গার এর এ আন্দাজ যে, আরবরা বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত বলে কখনো সত্য চিন্তা করতে পারে না।[১৩৭] প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের অনুকারক বর্ণনায় আরব চরিত্র, আরব পরিবার, আরব বাগ্মিতা বি -প্রাকৃত, বি-মানবীকৃত রূপলাভ করে, যদিও এই বর্ণনাতেই জড়িয়ে থাকে বিষয়ের ওপর তাদের প্রবল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। হামাদি থেকেই উদাহরণ দেয়া যাক :

> এ কারণে আরবদের বাস কঠিন, হতাশ এক পরিবেশে। সমাজে তার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করা বা তার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার সুযোগ তার নেই। পরিবর্তনও প্রগতিতে তার বিশ্বাস নিতান্ত সামান্য; উদ্ধারের আশ্রয় কেবল ভবিষ্যৎ।[১৩৮]

অর্থাৎ আরবরা যা অর্জন করতে পারে না, তারে সম্পর্কিত লেখায় তা পাওয়া যায়। প্রাচ্যতাত্ত্বিক তার নিজের এবং প্রাচ্যজনের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আরবদের

ব্যাপারে দুটো দিক রয়েছে : সংখ্যা ও প্রজনন ক্ষমতা। উভয় গুণ পরস্পরে রূপান্ত রযোগ্য। বার্জার যেদিকে নির্দেশ করেন—মানুষ তার যৌন-দক্ষতাকে মহত্তর মূল্য দিয়েছে[১৩৯]—তা পৃথিবীতে আরবদের অবস্থানের পেছনে সংগুপ্ত এক ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। যদি কেবল নেতিবাচক ও নিষ্ক্রিয়তার ধারণা দিয়ে আরব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করা হয় তবে এ ধরনের প্রতিনিধিত্বকে মনে করতে হবে আরবদের বিচিত্র মাত্রাগত বিস্তার ও বিরাট পৌরুষত্বকে মোকাবেলার কৌশলমাত্র। আর এই পৌরুষত্বের উৎস যদিও সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, তবে তা যৌনবিষয়ক। অথচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্সের অলঙ্ঘনীয় ট্যাবু হল এই যৌনতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যাবে না। হামাদি, বার্গার, ও লার্নাররা আরব পরিবারের শক্তি চিহ্নিত করতে পারে, আরব মনের দুর্বলতা লক্ষ্য করে, পশ্চিমের নিকট আরবজগতের গুরুত্বও স্বীকার করে। তাদের আলোচনা ইঙ্গিত করে যে, আরবদের সম্পর্কে সবকিছু বলা হয়ে যাওয়ায় বাকী থাকে কেবল তাদের যৌন-তাড়নার প্রসঙ্গ। কদাচিৎ—যেমন লিয়ন মুগনিয়ারীর রচনায় অস্পষ্টকে স্পষ্ট করা হয়; তা এই যে, "ঐসব গরম রক্তের দক্ষিণাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল... উদ্দাম যৌন-তাড়না।[১৪০]

প্রাচ্যতাত্ত্বিক এ সম্পর্কে কিছুই বলেন না, যদিও তার যুক্তি-বিন্যাস এর ওপর নির্ভরশীল : নিকট-প্রাচ্যে সহযোগিতা প্রধানত পারিবারিক ব্যাপার এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দল বা গ্রাম-সমাজের বাইরে তা দেখা যায় না।[১৪১] এর অর্থ হল আরবদের গণনা করা হয় কেবল জৈব-সত্তা রূপে। প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ওরা শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি। কেবল সংখ্যাগতভাবে এবং পরিবার প্রজননকারী হিসেবে ওরা প্রকৃত বাস্তব।

সাম্প্রতিক কালে প্রাচ্যদেশীয় রাজনৈতিক আচরণ আলোচনায় আরবদের ঐ প্রতিরূপ কিছুটা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে বলে মনে হয়। এর সাথে বিপ্লব ও আধুনিকতাও আলোচনায় আসে। পি. জে. ভ্যাটিকিয়োটিস কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৭২ সালে প্রকাশিত *রেভ্যুলিউশান ইন দি মিড্‌ল ইস্ট অ্যান্ড আদার কেস স্টাডিজ*-এর শিরোনামটা চিকিৎসা বিদ্যাসদৃশ। বিপ্লবের আধা-চিকিৎসাবিদ্যাগত সংজ্ঞা দিয়ে ভ্যাটিকিয়োটিস সংকলনটির অভিমুখ সূচিত করেন। যেহেতু তা তার ও পাঠকদের মাথায় রয়েছে তাই বিপ্লবের সংজ্ঞার শত্রুতা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। ভ্যাটিকিয়োটিস বলেন :

> সকল বিপ্লবী মতাদর্শ মানুষের যৌক্তিক, জৈবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সজ্জার ওপর সরাসরি (আসলে মুখোমুখি) আক্রমণ। বিপ্লবী মতাদর্শ তার অনুসারীদের নিকট থেকে অন্ধ গোঁড়ামি দাবি করে।... মানুষের প্রয়োজনে রাজনীতি একটি সূত্র, যা বিপ্লবের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ বরং বেঁচে থাকে রাজনৈতিকভাবে পরিকল্পিত কিন্তু নিষ্ঠুরতার সাথে প্রদত্ত এক আদেশে কাজ করার জন্যে।[১৪২]

অনুচ্ছেদটিতে আর যাই বলা হয়ে থাকুক, এটি অন্তত এই নির্দেশ করছে যে, বিপ্লব খারাপ প্রকৃতির যৌনতা এবং ক্যান্সারের মতো এক রোগ। এর পরই স্ববিরোধী হয়ে ওঠেন ভ্যাটিকিয়োটিস। তার কাছে মনে হয় আরবরা বিপ্লবের যোগ্য নয়। সুতরাং আরবদের যৌনতাকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। মোটকথা ভ্যাটিকিয়োটিস তার পাঠকদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের ভয় আছে, কারণ

সেখানে বিপ্লব অর্জনের সম্ভাবনা নেই।[১৪৩]

ভ্যাটিকিয়োটিসের সংকলনের প্রধান রচনা বার্নার্ড লুইসের প্রবন্ধ 'ইসলামে বিপ্লবের ধারণা'। এখানে ব্যবহৃত কৌশল আরো পরিশোধিত। অনেক মুসলমানই বুঝবেন যে আরবি তওরা অর্থ বিপ্লব। ভ্যাটিকিয়োটিসের অভিমতও তাই। কিন্তু লুইস তার প্রবন্ধের একেবারে শেষ অংশে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এ কথাটি কোথাও বলেননি। শেষ দিকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় :

> আরবিভাষী দেশগুলোয় বিপ্লব নির্দেশের জন্যে একটি ভিন্ন শব্দ আছে। তা হল : তওরা। প্রাচীন আরবি শব্দটির অর্থ উত্থান করা (যেমন, উটের উত্থান), উত্তেজিত হওয়া এবং বিশেষ করে মাগরিবী ব্যবহারে, বিদ্রোহ করা। এটি সচরাচর ছোটোখাটো সার্বভৌম এলাকা প্রতিষ্ঠা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।[১৪৪]

গোটা অনুচ্ছেদটি ঔদ্ধত্য ও অসততার ছড়াছড়ি। বিপ্লবকে বোঝানোর জন্যে প্রাচীন আরবির সূত্রে উটের উত্থানের প্রসঙ্গে আনার কারণ কি, যদি এর আধুনিক অর্থকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্য না থাকবে? লুইসের উদ্দেশ্য বিপ্লবকে তার বর্তমান মহত্ত্বের বদলে শুয়ে থাকা উটের উঠে দাঁড়ানোর চেয়ে ভালো কোনো মূল্য না দেয়া। বিপ্লব হল উত্তেজনা, বিদ্রোহ, ক্ষুদ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা—এরচেয়ে বেশি কিছু নয়।

লুইসের মূলকথা এই যে, ইসলাম কখনো পরিবর্তিত হয় না। এখন তার প্রধান কর্তব্য হল ইহুদিদের রক্ষণশীল অংশের পাঠককে ও আগ্রহী অন্য সকলকে জানানো যে, মুসলমানদের সম্পর্কে রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতি বিবরণের শুরু ও শেষ হওয়া উচিত এই সত্য দিয়ে যে, মুসলমান হল মুসলমান।[১৪৫] তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইল ছাড়া আর কোথাও গণতন্ত্র পান না, যদিও আরবদের শাসনের জন্যে ইসরাইলের গৃহীত ইমার্জেন্সি রেগুলেশন এ্যাক্ট-এর কথা উল্লেখও করেননি। এমনকি লুইস পণ্ডিতি স্বাধীনতা নিয়ে মন্তব্য করেন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের আধুনিক নাম মাত্র।[১৪৬]

৪. *প্রাচ্যদেশীয়, প্রাচ্যদেশীয়, প্রাচ্যদেশীয়* : প্রাচ্যতত্ত্ব শিরোনামে আমি যে ভাবাদর্শিক কল্পকাহিনীর বর্ণনা দিলাম তার একটি অর্থ আছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে খুব বেশি নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারকদের উপদেষ্টারা আবার জড়িয়ে আছে প্রাচ্যতত্ত্বের সাথে। প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা প্রাচ্যকে দেখেন পশ্চিমের নকলরূপে, যা বার্নার্ড লুইসের মতে—কেবল তখনই উন্নতি করতে পারবে যখন তার জাতীয়তাবাদ "পশ্চিমের সাথে আপোস-রফায় প্রস্তুত হবে"।[১৪৭] এর মধ্যে যদি আরব বা মুসলিম জনগোষ্ঠী অথবা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বিশ্ব অনাকাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হতে শুরু করে তা হলে, অবাক হবো না যদি প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ প্রাচ্যজনদের দুর্জ্ঞেয়তার দোষ দেন এবং তাদেরকে বিশ্বাস না করার পরামর্শ দেন।

অথচ প্রাচ্যতত্ত্বের পদ্ধতিগত ভুলকে দায়ী করা যাবে না। বলা যাবে না যে, প্রাচ্যতত্ত্বের *প্রাচ্য* আর আসল প্রাচ্য এক জিনিস ছিল না। এমন বললেও গ্রহণযোগ্য হবে না যে, প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা মূলত পশ্চিমা বলে প্রাচ্যদেশীয়দের সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সঠিক নয়। উভয় ধারণাই ভূয়া। প্রকৃত বা আসল প্রাচ্য বলে কিছু প্রমাণ করাও এ গ্রন্থের লক্ষ্য নয়—কিংবা 'বহিরাগত'-এর পরিপ্রেক্ষিত ও 'অন্তর্গত'-এর পরিপ্রেক্ষিত বলে কিছুর

দাবিও নয়, যে গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন দেখান রবার্ট কে. মার্টন[১৪৮]। বরং আমার বক্তব্য হল, প্রাচ্য নিজেই প্রকাশিত একটি সত্তা। মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রাচ্যবাসীদেরকে তাদের ভৌগোলিক পরিসরের ধর্ম, সংস্কৃতি বা জাতিগত নির্যাসের আলোকে চিহ্নিত করা জরুরি কি না তাও একটি বিতর্কিত ধারণা। আমি অবশ্য এমন সীমাবদ্ধ বক্তব্যে বিশ্বাস করি না যে, কেবল কালোরাই কালোদের সম্পর্কে লিখবে, মুসলমান মুসলমানদের সম্পর্কে।

ব্যর্থতা, প্রকাশ্য বর্ণ-বিদ্বেষ, এর কাগজ-সদৃশ পাতলা বুদ্ধিজীবী হাতিয়ার সত্ত্বেও আমার বর্ণিত রীতির প্রাচ্যতত্ত্ব সমৃদ্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সতর্কতামূলক বিসয় হল 'প্রাচ্যে'ও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমান আরবজগৎ যুক্তরাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সাঙস্কৃতিক ভূ-উপগ্রহ। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথাই ধরা যাক। আরব অঞ্চলের বিশ্বদ্যিালয়গুলো সাধারণত প্রাক্তন উপনিবেশিক শাসন সূত্রে বিকশিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে। কিন্তু নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূচিসমূহ এরই মধ্যে উদ্ভট পাঠ্যসূচিতে পরিগণিত হয়েছে। শিক্ষকরা যৎসামান্য বেতন পান। রাজনৈতিক নিয়োগ সাধারণ ব্যাপারমাত্র। তাই ক্লাসগুলো ছাত্র/ছাত্রীতে ঠাসা থাকলেও যথার্থ শিক্ষা পায় না ওরা। উচ্চতর গবেষণার সুযোগ ও ইচ্ছা দুটোরই অভাব। সবচেয়ে বড় কথা পুরো আরব অঞ্চলে একটিও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার নেই। অথচ এই অঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের নিয়ন্ত্রক যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় মেধাবীদের উৎসাহিত করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায় গবেষণা করার জন্যে। কিন্তু ওখানে যে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র পড়ার সুযোগ পায় তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য খুবই স্বাভাবিক।

দু'টো উপাদান পরিস্থিতিকে প্রাচ্যতত্ত্বের বিজয়ের উপযোগী করেছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নিকট প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক প্রবণতা মার্কিন আদর্শে পরিচালিত। ১৯৩৬ সালে তাহা হুসাইন আধুনিক আরব সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি যে মিশরীয় সংস্কৃতির মুখোমুখি হয়েছেন তা প্রাচ্যের নয়, ইউরোপের সংস্কৃতি। আজকের আরব এলিটদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ও কথা সত্য। ১৯৫০-এর দশক থেকে এই অঞ্চলকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তাকা তৃতীয়-বিশ্বের ধারণা মার্কিন সংস্কৃতির প্রভাবক ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বিকাশে আরব ও ইসলামি বিশ্ব এখনো দ্বিতীয় সারির শক্তি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পত্রপত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা ঘটছে কোনো আরব পণ্ডিতের পক্ষে তা উপেক্ষা করা অসম্ভব; কিন্তু তার উল্টোটা প্রযোজ্য নয়। যেমন, সমকালীন আরব বিশ্বে কোনো উল্লেখযোগ্য সাময়িকী নেই, তেমনি হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ডকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। এই অবস্থার ফলাফল সম্পর্কে আগাম বলে দেয়া সম্ভব ছিল : আরব ছাত্র ও অধ্যাপকেরা এখনো মার্কিন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের পায়ের কাছে বসতে পারলে ধন্য হয়ে যায়, এবং পরে প্রাচ্যতত্ত্বের অন্ধ মতবাদ ও জীর্ণ উক্তিগুলো নিজের দেশের মানুষদেরকে শুনিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। এরকম পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে ভিন্ন এক প্রবণতা : প্রাচ্যের পণ্ডিতরা তার দেশবাসীর মর্যাদা ও খ্যাতি আকর্ষণ করার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাকে ব্যবহার করে।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য যেভাবে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে তার আরো কিছু আলামত পাওয়া যায়। আরব ও ইসলামি প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে ডজন

ডজন প্রতিষ্ঠান সক্রিয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে আরব অঞ্চলে একটিও প্রতিষ্ঠান নেই। এমনকি পাচ্য সম্পর্কে গবেষণার জন্যে কেনো নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া অর্থনৈতিক চাপ তো আছেই। তবে এ সকল কারণ আমার উল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়ামক উপাদানটির তুলনায় নিতান্ত সামান্য; দ্বিতীয় উপাদানটিই এই অঞ্চলে প্রাচ্যতত্ত্বের বিজয় সম্ভব করে তুলেছে। তাহল, প্রাচ্যের সর্বত্র ভোগবাদের ব্যাপক বিস্তার : পশ্চিমের বাজার নীতির সাথে গেঁথে আছে গোটা আরব ও মুসলিম বিশ্ব। অঞ্চলটির একমাত্র সম্পদ তেল যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সম্পর্কটা একেবারেই এক-পার্শ্বিক; যুক্তরাষ্ট্র কেবল বাছাই করা দু'একটি পণ্যের আমদানিকারক (প্রধানত তেল ও সস্তা মানব-সম্পদ)। অথচ আরবরা বিচিত্র মার্কিন পণ্য ও আদর্শের ক্রেতা।

এর বহুমুখী পরিণতি রয়েছে। এই অঞ্চলে রুচির আদর্শ বৈচিত্র নিয়ে সক্রিয়। তার প্রকাশ কেবল ট্রানজিস্টর ও ব্লু-জিন্সে সীমাবদ্ধ নেই; আমেরিকার গণমাধ্যমগুলো প্রাচ্যদেশীয়'র যে কল্পমূর্তি সরবরাহ করে বিচার-বিচেনা ছাড়াই তা গোগ্রাসে গিলে এখানকার টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যম। আরেকটি সমস্যা হল, পশ্চিমের বাজার অর্থনীতি ও ভোক্তাকেন্দ্রিক আবহ এখানে এমন এক দল বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করেছে যারা বাজারের চাহিদা মেটানোকেই পরম ধর্ম বলে মনে করে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটি পশ্চিমের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রবণতাসমূহের সহায়ক শক্তি মাত্র। প্রগতি, আধুনিকায়ন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত যে সব ধারণা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে তাকে বৈধতা দেয়াই এদের কাজ। অর্থশাস্ত্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিনিময়ও এই অবস্থাটি জোর প্রভাব খাটায়। এক কথায়, প্রাচ্য নিজেই এখন তার প্রাচ্যায়নে অংশগ্রহণকারী।

সবশেষে, প্রাচ্যতত্ত্বের বিকল্প কোথায়? এ রচনা কি কেবল কোনো কিছুর বিরুদ্ধে যুক্তিবিন্যাস, ইতিবাচক কিছুর আবেদন নয়? আলোচনায় মাঝে মধ্যে *বি-উপনিবেশায়ন*-এর কথা বলেছি আমি, যা অঞ্চলবিদ্যার নতুন পথে বেদায় : যেমন আনওয়ার আবদেল মালেকের রচনা, মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়নে হাল গ্রুপের সদস্যদের কাজ—ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন পণ্ডিতের বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব।[১৪৯] তবে আমি কেবল ওগুলো উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও, মানবীয় অভিজ্ঞতার সমস্যা আলোচনায় প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করেছি আমি। মানুষ কিভাবে অন্য সংস্কৃতিকে বিবৃত করে? অন্য সংস্কৃতি কী? নির্দিষ্ট কোনো সংস্কৃতির (জাতি, ধর্ম বা সভ্যতার) ধারণা কি কার্যোপযোগী, না কি তা কেবল আত্ম-প্রশংসা (নিজের সংস্কৃতির আলোচনায়) বা শত্রুতা ও আগ্রাসন (অন্যের সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনায়)? সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্য বেশি প্রভাবশালী নাকি আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক বর্গ? মতাদর্শ কিভাবে 'স্বাভাবিকতা' বা 'প্রাকৃতিক' সত্যের মর্যাদা অর্জন করে? বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা কী? তার অবস্থান কি আসলে নিজের সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রকে বৈধতা দেয়ার জন্যে? মুক্ত সমালোচক চৈতন্য ও *বিরুদ্ধবাদী* সমালোচক চৈতন্যে কতটা গুরুত্ব আরোপ করবেন তিনি?

আশা করি কোনো কোনো প্রশ্নের পরোক্ষ জবাব এর মধ্যেই দেয়া হয়েছে। তবু এখানে আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট আলোচনা করতে চাই। বর্তমান গ্রন্থে আমি দেখানোর

চেষ্টা করেছি যে, প্রাচ্যতত্ত্ব কেবল অ-রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের সম্ভাবনাকেই নয়, রাষ্ট্র ও পণ্ডিতবর্গের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেও সংশয়ান্বিত করেছে। এও পরিষ্কার যে, যে পরিস্থিতি প্রাচ্যতত্ত্বকে নিরবিচ্ছিন্ন প্ররোচক চিন্তায় পরিণত করেছে তা অব্যাহত থাকবে : সব মিলিয়ে এক হতাশাজনক ব্যাপার। তবে আমার মনে কিছু যৌক্তিক প্রত্যাশা আছে—প্রাচ্যতত্ত্বকে সবসময় বুদ্ধিবৃত্তিক, মতাদর্শিক ও রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ না করে ছাড়া উচিত নয়, যেমন এখন চলছে।

যে রকম বিনষ্ট, মানবীয় অভিজ্ঞতার প্রতি অন্ধ পাণ্ডিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করেছি তার বাইরেও মুক্ত পাণ্ডিত্য সক্রিয় রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস না থাকলে আমি এ কাজটিতে হাতই দিতাম না। আজকাল ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সমাজতত্ত্ব ও নৃ-তত্ত্বে এমন পণ্ডিত রয়েছেন যাদের কাজ পণ্ডিতি মানদণ্ডেও মূল্যবান। সমস্যা হয় যখন প্রাচ্যতত্ত্বের সংঘ-স্বভাব সেই সব পণ্ডিতকে অধিগত করে নন যারা সতর্ক নন, নিজের ওপর বিভিন্ন উৎসের সম্ভাব্য প্রভাবের বিরুদ্ধে জাগ্রত থাকেন না। কাজেই যেসব পণ্ডিত প্রাচ্যতত্ত্বকে একটি ভৌগোলিক বা মতবাদগত কিংবা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিতে বর্ণিত 'জ্ঞানক্ষেত্র' হিসেবে না দেখে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়রূপে দেখেন তাদের দ্বারাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা। চমৎকার এক সাম্প্রতিক উদাহরণ হল ক্লিফোর্ড গিরৎজ্-এর নৃ-বিজ্ঞান। ইসলাম বিষয়ে তার আগ্রহ এতোটা পরিষ্কার ও নিরেট যে, তা কয়েকটি সমাজ সম্পর্কে তার অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা কর্তৃক উদ্দীপ্ত হয়েছে—প্রথাচার, প্রাক-ধারণা ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক নীতিমালায় অনুপ্রাণিত হয়নি।

অন্যদিকে, প্রথাগত প্রাচ্যতত্ত্বে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত ও সমালোচকগণ নিজেদেরকে পুরনো জোব্বা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। জ্যাক বারাক্ ও ম্যাক্সিম রডিনসনের প্রশিক্ষণ সবচেয়ে বেশি; কিন্তু পদ্ধতিগত সচেতনতা তাদের অনুসন্ধানকে গভীরতর করেছে। সূচনা থেকেই প্রাচ্যতত্ত্ব খুববেশি অহংকেন্দ্রিক, খুব বেশি সীমাবদ্ধ ও নিজের অভিমুখ সম্পর্কে একশ ভাগ নিশ্চিত। এ প্রেক্ষিতে প্রাচ্য বা প্রাচ্যের অধীত বিষয়ে কোনো লেখক যদি নিজেকে খোলাসা করে দিতে চান তাহলে তাদের গৃহীত পদ্ধতিকে সমালোচনামূলক পরীক্ষণে রাখতে হবে। এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বারাক্ ও রডিনসনে। ওদের কাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যক্ষ আবেগ, অতঃপর পদ্ধতি ও চর্চার অবিরাম স্ব-পরীক্ষণ, যাতে তাদের রচনা বিষয়বস্তুর প্রতি নিবেদিত থাকে এবং কোনোমতেই প্রাক-ধারণার শিকার না হয়। বারাক্ ও রডিনসন, আবদেল মালেক ও রজার ওয়েন একটা বিষয়ে সচেতন যে, প্রাচ্যদেশীয় বা অন্য যে কোনো মানুষ ও সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায় সকল মানব-বিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে। তাই এসব পণ্ডিত অন্যান্য জ্ঞান-ক্ষেত্রের সমালোচনাধর্মী পাঠক এবং শিক্ষার্থীও। কাঠামোবাদী নৃ-বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের প্রতি বারাক্-এর মনোযোগ, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রতি রডিনসনের, অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতি ওয়েনের—এসবই নির্দেশনামূলক সংশোধক—সমকালীন মানব-বিজ্ঞান থেকে গৃহীত হয়েছে তথাকথিত প্রাচ্যদেশীয় সমস্যা অধ্যয়নে।

কিন্তু একটি সত্য এড়ানোর উপায় নেই : প্রাচ্যতাত্ত্বিকের 'আমরা'-'ওরা' বিভাজনকে

যতই উপেক্ষা করা হোক না কেন, একরাশ শক্তিশালী রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শিক বাস্তবতা সাম্প্রতিক পাণ্ডিত্যকে অবিরাম প্রভাবিত করে চলেছে। পুব/পশ্চিম না হয় বাদ দিলাম, উত্তর/দক্ষিণ, আছে/নেই, সাম্রাজ্যবাদী/সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সাদা/বর্ণ, ইত্যাদি বিভাজন এড়ানো প্রায় অসম্ভব। এমন ভানও কার্যকর নয় যে, এগুলো আদৌ নেই বা ছিল না। বরং উল্টো প্রাচ্যতত্ত্ব আমাদেরকে এ ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক লুকোচুরির অসততা সম্পর্কে অনেক কিছু শেখাতে পারে, যার ফলাফল হল বিভাজনের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও দূষণ। এ সত্ত্বেও প্রকাশ্যে সোচ্চার কণ্ঠের কোনো ডান-পন্থী 'প্রগতিশীল' পণ্ডিত সহজেই আক্রান্ত হয়ে ডুবে যেতে পারেন অন্ধ মতবাদের নিষ্ক্রিয়তায়। এ এম এক আশঙ্কা যা পরিণতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে শিক্ষা দেয় না।

সমস্যা সম্পর্কে আমার নিজের মত উপযুক্ত প্রশ্নগুচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক চিন্তা আমাদেরকে প্রতিনিধিত্বের সাথে জড়িত বিষয়সমূহের ব্যাপারে সতর্ক হতে শিখিয়েছে; অন্যকে সতর্কতার সাথে বিচার-বিবেচনা করা, বর্ণবাদী চিন্তা-ভাবনায় সংবেদনশীল হওয়া, কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ববাদী মতাদর্শকে নির্ভাবনায় ও সমালোচনাহীন গ্রহণ না করা এবং বুদ্ধিজীবীর আর্থ-সামাজিক ভূমিকা এবং তার সংশয়ী-সমালোচনামুখী চৈতন্যের বিরাট মূল্যের প্রতি সচেতন হওয়া শিখিয়েছে। আমরা যদি স্মরণ করি যে, মানবীয় অভিজ্ঞতা অধ্যয়নের একটি নৈতিক, যদিও অরাজনৈতিক, খারাপ/ভালো ক্রমপরিণতি রয়েছে, তাহলে আমরা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাদের কাজ সম্পর্কে আর অতোটা উদাসীন থাকতে পারবো না। এবং একজন পণ্ডিত মানুষের জন্যে আর কি থাকবে, মানবীয় স্বাধীনতা ও জ্ঞানের আদর্শ ছাড়া? আমাদের হয়তো এরও মনে রাখা উচিত সামাজিক মানুষের অধ্যয়ন মানুষের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল—প্রাতিষ্ঠানিক বিমূর্তায়ন বা অস্পষ্ট আইন কিংবা স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতির ওপর নয়। অতএব, সমস্যাটি হল অধ্যয়নকে যথাযোগ্য করা এবং কোনো উপায়ে অভিজ্ঞতার সাহায্যে কাঠামো দেয়া, যা হবে আলোকোদ্ভাসিত এবং হয়তো গবেষণা-অধ্যয়নের দ্বারাই প্রয়োজনে পরিবর্তিত। যে কোনো মূল্যেই হোক, প্রাচ্যের বার বার প্রাচ্যায়ন ঠেকানো দরকার। ফলে জ্ঞান পরিশোধিত হবে, হ্রাস পাবে পণ্ডিতের অহং-এর বিস্তৃতি। 'প্রাচ্য' না থাকলেও পণ্ডিত, সমালোচক, বুদ্ধিজীবী প্রমুখ থাকবেন যাদের নিকট মানব সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উদ্যোগের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে গোত্রীয়, জাতিগত ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য।

আমি বিশ্বাস করি এবং অন্যান্য লেখায় দেখিয়েছিও মানব বিজ্ঞানের সমকালীন পণ্ডিতদের মধ্যে এমন সব অন্তর্দৃষ্টি, পদ্ধতি ও ধারণা সঞ্চারের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে, যেগুলো প্রাচ্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক উত্থানের যুগে সৃষ্ট জাতিগত, ভাবাদর্শিক ও সাম্রাজ্যবাদী ছাঁচসমূহ দূর করতে পারে। আমি মনে করি প্রাচ্যতত্ত্বের ব্যর্থতা মানবিক, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক। পৃথিবীর একটি অঞ্চলকে নিজের নিকট অচেনা মনে করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের কারণে প্রাচ্যতত্ত্ব মানবীয় অভিজ্ঞতার সাথে একাত্ম হতে বা একে মানবীয় অভিজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্বের পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য এবং এর সমর্থিত সকল কিছুকে এখন চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব, যদি আমরা বিশ শতকের পৃথিবীর এতো এতো মানুষের নবজাগ্রত রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সচেতনতা থেকে কিছু গ্রহণ করতে পার। এ বইটি যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজে লাগে

তবে তা হবে ঐ চ্যালেঞ্জের সামান্য এক অবদান, এবং সতর্ক-সংকেত যে : প্রাচ্যতত্ত্ব, ক্ষমতার ডিসকোর্স, ভাবাদর্শের কল্প-কাহিনী প্রভৃতি চিন্তন-প্রক্রিয়া খুব সহজে নির্মিত, প্রযুক্ত এবং রক্ষিত। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আমার পাঠকদের দেখাতে পেরেছি যে, প্রাচ্যতত্ত্বের উত্তর পাশ্চাত্যবাদ নয়। কোনো প্রাক্তন প্রাচ্যজনই এমন চিন্তায় আনন্দ পাবেন না যে, তিনি নিজে 'প্রাচ্যজন' হয়েছিলেন বলে এখন তার নিজের গড়া নতুন 'প্রাচ্যজন' বা 'পশ্চিমা' নিয়ে অধ্যয়ন করবেন। প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের যদি কোনো অর্থ থেকে থাকে তাহলে তা জ্ঞানের—যে কোনো সময়ে, যে কোনো জ্ঞানের—প্রলুব্ধকর অধঃপতনের স্মারক মাত্র; পূর্বের যে কেনো সময়ের চেয়ে হয়তো এখনই অধিক।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

তথ্যসূত্র :

102. R. Emmett Tyrel, Jr., 'Chimera in the Middle East," *Harper's*, November 1976, pp. 35-8.
103. Ayad al-Qazzaz, Ruth Afiyo, et al., *The Arabs in American Texbooks*, California State Board of Education, June 1975, pp. 10, 15-এ উদ্ধৃত।
104. "Statement of Purpose," *MESA Bulletin* 1, no. 1 (May 1967): 33.
105. Morroe Berger, "Middle Eastern and North African Studies: Developments and Needs," *MESA Buletin* 1, no. 2 (November 1967): 16.
106. Menachem Mansor, "Present State of Arabic Studies in the United States," *Report on Current Research 1958*, ed. Kathleen H. Brown (Washington: Middle East Institute, 1958), pp. 55-6.
107. Harold Lasswell, "Propaganda," *Encyclopedia of the Social Sciences* (1934), 12: 527. এ তথ্যের জন্যে আমি অধ্যাপক নোয়াম চমস্কির নিকট কৃতজ্ঞ।
108. Marcel Proust, *The Guermantes Way*, trans. C. K. Scott Moncrieff (1925; reprint ed., New York: Vintage Books, 1970), p. 135.
109. Nathaniel Schmidt, "Early Oriental Studies in Europe and the Work of the American Oriental Sociwty, 1842-1922," *Journal of the American Oriental Sociwty* 43 (1923): 11. এছাড়াও দেখুন E. A. Speiser, "Near Eastern Studies in America, 1939-45," *Archiv Orientalni* 16 (1948): 76-88.
110. উদাহরণ স্বরূপ: Henry Jessup, *Fifty-Three Years in Syria*, 2 vols. (New York: Fleming H. Revell, 1910).
111 বেলফোরের ঘোষণা ও আমেরিকার যুদ্ধনীতির সম্পর্ক বোঝার জন্যে দ্রষ্টব্য: Doreen Ingrams, *Palestine Papers 1917-1922: Seeds of Conflict* (London: Cox & Syman, 1972), pp. 10 ff.
112. Mortimer Graves, "A Cultural Relations Policy in the Near East," *The Near East and the Great Powers*, ed. Frye, pp. 76, 78.
113. George Camp Keiser, "The Middle East Institute: Its Inception and Its Place in American International Studies," *The Near East and the Great Powers*, ed. Frye, pp. 80, 84.
114. এ পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের দেশত্যাগের বিবরণের জন্যে: *The Intellectual Migration: Europe and America, 1930-1960*, ed. Donald Fleming and Bernard Bailyn (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969).
115. Gustave von Grunebaum, *Modern Islam: The Search for Cultural Identity* (New York: Vintage Books, 1964), pp. 55, 261.
116. Abdullah Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques: L'Islam au miroir

de Gustave von Grunebaum." *Diogene* 38 (July-September 1973): 30. পরে এই প্রবন্ধটি লা'রুই-এর *The Crisis of the Arab Intellectuals: Traditionalism or Historicism?* trans. Diarmid Cammell (Berkeley: University of California Press, 1976)-এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

117. David Gordon, *Self-Determination and History in the Third World* (Princeton, N. J.: Princetion University Press, 1971).
118. Laroui, "Pour une methodologie des etudes islamiques," p. 41.
119. Manfred Halpern, "Middle Eastern Studies: A Review of the State of the Field with a Few Examples," *World Politics* 15 (October 1962): 121-2.
120. পূর্বোক্ত, p. 117.
121. Leonard Binder, "1974 Presidential Address," *Mesa Bulletin* 9, no. 1 (February 1975): 2.
122. পূর্বোক্ত, p. 5.
123. "Middle East Studies Network in the United States," *MERIP Reports* 38 (June 1975): 5.
124. *Cambridge History* সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো দুটো সমালোচনা হলো: Albert Hourani, *The English Historical Review* 87, no. 343 (April 1972): 348-57, এবং Roger Owen, *Journal of Interdisciplinary History* 4, no. 2 (Autumn 1973): 287-98.
125. P. M. Holt, Introduction, *The Cambridge History of Islam*, ed. P. M. Holt, Anne K. S. Lambton, and Bernard Lewis, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 1: xi.
126. D. Sourde, "The Abbasid Caliphate," *Cambridge History of Islam*, ed. Holt et al., 1: 121.
127. Z. N. Zeine, "The Arab Lands," *Cambridge History of Islam*, ed. Holt et al., 1: 575.
128. Dankwart A. Rustow, "The Political Impact of the West," *Cambridge History of Islam*, ed. Holt et al., 1: 697.
129. Ingrams, *Palestine Papers*, 1917-1922, pp. 31-2-এ উদ্ধৃত।
130. Robert Alter, "Rhetoric and the Arab Mind," *Commentary*, October 1968, pp. 61-85. অল্টারের নিবন্ধটি আসলে জেনারেল ইহোশাফাত হারকাবির *Arab Attitudes to Israel* (Jerusalem: Keter Press, 1972) গ্রন্থের উচ্চসিত প্রশংসামূলক আলোচনা মাত্র।
131. Gil carl Alroy, "Do The Arabs Want Peace?" *Commentary*, February 1974, pp. 56-61.
132. Roland Barthes, *Mythologies*, trans. Annette Lavers (New York: Hill & Wang, 1972), pp. 109-59).
133. Raphael Patai, *Golden River to Golden Road: Society, Culture, and Change in the Middle East* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1962; 3rd rev. ed., 1969), p. 406.
134. Raphael Patai, *The Arab Mind* (New York: Charles Scribner's Sons, 1973). এর চেয়ে প্রবল বর্ণবাদী কাজ: John Laffin, *The Arab Mind Considered: A Need for Understanding* (New York: Taplinger Publishing Co., 1976).
135. Sania Hamady, *Temperament and Character of the Arabs* (New York: Twayne Publishers, 1960), p. 100. হামাদির বইটি ইসরাইলি ও ইসরাইলি-সমর্থকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। এলরয় তাকে উল্লেখ করেছেন। তেমনি অ্যামোস এলন তার *The Israelis: Founders and sons* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1971) গ্রন্থেও হামাদির প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মরো বার্জারও হামাদিকে প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। হামাদি তার মডেল হিসেবে নিয়েছেন *Manners and Customs of the Modern Egypyians*, গ্রন্থটিকে; লেইনের জ্ঞানগত সমৃদ্ধির সামান্যতমও তার মধ্যে নেই যদিও।
136. Manfred Halpern "Four Contrasting Repertories of Human Relations in Islam: Two

ভূমিকা

পশ্চিম—ফ্রান্স, বৃটেন ও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসলাম, আরব ও প্রাচ্যের আধুনিক সম্পর্কটা কি রকম আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি তিনটি ধারাবাহিক বইয়ে; *কাভারিং ইসলাম* তার শেষ কিস্তি। এগুলোর মধ্যে *অরিয়েন্টালিজম* সবচেয়ে সামগ্রিক আলোচনা; ঐ সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়গুলো সনাক্ত করা হয়েছে ওতে। মিশরে নেপোলিয়ানের অভিযান থেকে শুরু করে মূল উপনিবেশী কাল এবং উনিশ শতকের ইউরোপে প্রাচ্যতত্ত্বের রমরমা বিস্তার থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচ্যে ফরাসি-বৃটিশ আধিপত্যের যুগ, এরপর মার্কিন মাতবরির সূচনা। *অরিয়েন্টালিজমের* অন্তর জুড়ে আছে ক্ষমতার সাথে জ্ঞানের একাত্ম হওয়ার প্রসঙ্গ।[১] পরের বই *দি কোশ্চেন অব প্যালেস্টাইন* একটা লড়াইয়ের কেস হিস্ট্রী। লড়াইটা স্থানীয় আরবদের সাথে ইহুদিবাদী আন্দোলনের (পরে ইসরাইল); আরবদের বেশিরভাগই মুসলমান। এ আন্দোলনের উদ্ভব এবং ফিলিস্তিনের প্রাচ্যদেশীয় বাস্তবতা আঁকড়ে ধরার কায়দাটা পশ্চিমা। *অরিয়েন্টালিজম*-এর তুলনায় (পরের বইয়ে) ফিলিস্তিন নিয়ে আমার অধ্যয়ন অনেক খোলাখুলিভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমের মতামত অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন লাভের উদ্দেশ্য নিবেদিত ফিলিস্তিনী জাতীয় সংগ্রামের প্রতি পশ্চিমের মনোভাবের পেছনে কোন কারন ঘাপটি মেরে আছে[২]।

কাভারিং ইসলামে আমার বিষয় একেবারেই সাম্প্রতিক: পশ্চিমের চৈতন্যে ইসলামের যে ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে তার প্রতি পশ্চিমের বিশেষ করে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া। সত্তর দশকের শুরু থেকে তা একইসাথে খুবই প্রাসঙ্গিক, আবার বিরূপভাবে সমস্যাগ্রস্ত ও সঙ্কটসৃজক। পশ্চিমের এমন উপলব্ধির পেছনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে সবচেয়ে শক্ত কারণটি হল জ্বালানি তেলের স্বল্পতা; আর তার কেন্দ্রে আছে আরব ও পারস্য উপসাগরীয় তেল, ওপেক এবং পশ্চিমে জ্বালানি খরচের উর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি। তা ছাড়া, তথাকথিত 'ইসলামের প্রত্যাবর্তন'-এর ধারণায় জ্বলজ্বলা সতর্কতামূলক প্রমাণ হিসেবে ঘটে যায় ইরানের বিপ্লব ও জিম্মি সংকট। সবশেষে, মুসলিম বিশ্বে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যেন পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে, ঐ অঞ্চলে পরাশক্তির রেষারেষি। যেমন ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্ত ক্ষেপ, উসাগরীয় অঞ্চলে দ্রুত সৈন্য সমাবেশের জন্য মার্কিন প্রস্তুতি।

কাভারিং ইসলাম-এর পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারবেন এর ভেতরের কথাটা কি। তবু শুরুতে একটু ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। *অরিয়েন্টালিজম* ও এখানে যে ব্যাপারগুলো

বোঝানোর চেষ্টা করেছি তার একটা হচ্ছে যে, 'ইসলাম' পরিভাষাটির সাম্প্রতিক ব্যবহার একটি মাত্র অর্থ নির্দেশ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অংশত কাল্পনিক, অংশত ভাবাদর্শিক মার্কা, অংশত ধর্ম অর্থে ইসলাম-নির্দেশক। পশ্চিমে সাধারন ব্যবহারিক পরিভাষা "ইসলাম" এবং আশি কোটি মানুষের বিচিত্র জীবন নিয়ে বিস্তৃত বিশাল ইসলামী জগতের মধ্যে কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। সে বিরাট জগতে আছে আফ্রিকা ও এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা, কয়েক কুড়ি সমাজ, রাষ্ট্র, ইতিহাস, ভুগোল ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে, আজকের পশ্চিমা বিশ্বে "ইসলাম" উদ্ভটভাবে এক তীব্র বেদনাদায়ক "খবর" ; এর কারনগুলো আমি এ বইয়ে আলোচনা করেছি। বিগত বছরগুলোতে, বিশেষত ইরানের ঘটনাবলী ইউরোপ ও আমেরিকার গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করার পর, প্রচার মাধ্যম ইসলাম সম্পর্কে প্রতিবেদন করে: তারা একে চিত্রিত করে, বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট নিরূপণ করে, এর ওপর ঘণীভূত পাঠ করায় শিক্ষার্থীদেরকে; এবং এভাবে ইসলামকে পরিণত করে 'জানা' ব্যাপারে।

কিন্তু, আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, এই (ইসলামের) প্রচারণা এবং সেইসাথে ইসলামের ওপর বিদ্যায়তনিক পণ্ডিতদের কাজ— ভূ-রাজনৈতিক কৌশলবিদ যেমন বলেন 'চাঁদের সঙ্কট চলছে', সংস্কৃতির ভাবুকরা যেমন আবিষ্কার করেন 'পশ্চিমের পতন হচ্ছে'— তার সবই বিভ্রান্তিকরভাবে পূর্ণ। এগুলো পশ্চিমা সংবাদ-ভোক্তাদের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা ইসলামকে বুঝে ফেলেছে, কিন্তু তাদের কাছে কখনো প্রকাশ করে না যে, বিপুল শক্তি খরচ করে সৃষ্ট এই প্রচারণার ভিত্তি লক্ষ্যমুখি বিষযবস্তুর ওপর দাড়িয়ে নেই। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যাবে "ইসলাম" যেন মার্কামারা ভুল করার লাইসেন্স দিয়েছে; কেবল ভুলই নয়, লাগামহীন নৃ-কেন্দ্রিকতা, সাংস্কৃতিক ও বর্ণবাদী ঘৃণা, সুগভীর অথচ উন্মুক্ত শত্রুতার লাইসেন্সও। সব কিছু ঘটেছে ইসলাম সম্পর্কে সেই প্রচারণার মধ্যে যাকে বলা হচ্ছে নিরপেক্ষ, ভারসাম্যপূর্ণ, দায়িত্বপূর্ণ। অথচ খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যেও পুনরুজ্জীবন (বা প্রত্যাবর্তন) চলছে, সেই ব্যাপারে এমন আবেগময় আলোচনা চোখে পড়ে না। আসলে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কিছু দায়-দায়িত্বহীন ও বহুব্যবহৃত ছাল-ওঠা উক্তির সাহায্যে সীমাহীনভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা সম্ভব। এবং সবসময় ধরে নেয়া হয় আলোচ্য 'ইসলাম' ওখানে স্থির ও প্রকৃত কোনো বস্তু, যেখানে ঘটনাক্রমে পাওয়া গেছে আমাদের তেল সরবরাহকারীদের।

এমন কায়দার প্রচারের সাথে সাথে আড়াল করার কাজটাও চলেছে অনেকদূর। ইরাকী অনুপ্রবেশে ইরানের প্রবল প্রতিরোধের ব্যাখ্যায় *নিউ ইয়র্ক টাইমস* অবলম্বন করে "শহীদ হওয়ার জন্য শিয়াদের অতি আগ্রহ"-এর সূত্র। বাক চাতুর্যের কারণে এমন কথা সীমিত অর্থে সঠিক মনে হতেও পারে; কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মন্তব্য ব্যবহার করা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্টারের পূর্ণ অজ্ঞতা আড়াল করার উদ্দেশ্যে। সংশ্লিষ্ট ভাষা না জানার ব্যাপারটা আসলে বড় মাপের অজ্ঞতার একটা অংশ মাত্র। অজ্ঞতার কারণ হল, রিপোর্টারদেরকে সচরাচর কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই

একটি অপরিচিত দেশে পাঠানো, শুধু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যে তিনি খুব দ্রুত সবকিছু জেনে নেয়ার মত চালাকচতুর, কিংবা ঘটনাটি যেখানে ঘটছে তিনি ঠিক সেখানে গিয়েই হাজির হচ্ছেন। এ অবস্থায় সংশিষ্ট রিপোর্টার দেশটি সম্পর্কে আরো বেশি জানার চেষ্টা করেন না, বরং নির্ভর করেন হাতের কাছে যা পাওয়া যায়- যেমন বহু পুরনো জীর্ণ উক্তিতে, অথবা সাংবাদিকসুলভ এমন জ্ঞানের ওপর নির্ভর করেন যার সঠিকতার প্রশ্ন তুলতে পারবে না স্বদেশী পাঠকেরা। জিম্মি সংকটকালীন তেহরানে প্রায় শ'তিনেক সাংবাদিক জড়ো হয়েছিলেন, যদিও কারো সাথে ফারসি জানা দোভাষী ছিল না। ফলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইরান থেকে পাঠানো সব রিপোর্টে থাকে ঘটনার একই জীর্ণ ভাষ্য। এরমধ্যে ইরানে অন্যান্য ঘটনা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ঘটে যেতে থাকে রিপোর্টারদের দৃষ্টির আড়ালে; যদিও ঐসব ঘটনাকে 'মার্কিন-বিরোধী' বা 'ইসলামী মনোভঙ্গির' বলে চালানো যাবে না।

ইসলাম সম্পর্কে 'প্রতিবেদন রচনা' এবং 'ইসলামকে আড়াল করে রাখা'র এই যে তৎপরতা তা আসলে একটা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থার লক্ষণ; যদিও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাটি সম্পর্কে সামান্য সচেতনতার বোধও নষ্ট হয়ে গেছে ঐ দুই ধরনের তৎপরতার কারণে। সেই অবস্থাটি হল: এমন এক বিশ্বে জানা ও বসবাসের সমস্যা যে-বিশ্ব সহজ ও তাৎক্ষণিক সাধারণীকরণের যোগ্য নয়, বরং খুব বেশি জটিল ও বৈচিত্রময়। এ ক্ষেত্রে ইসলাম একটি চলতি উদাহরণ আবার বিশেষ দৃষ্টান্তও, যেহেতু পশ্চিমে এর রয়েছে এত পুরনো ও সু-কথিত ইতিহাস। এ কথায় আমি বোঝাতে চাই যে, বহু উত্তর-উপনিবেশী দেশের মত ইসলাম ইউরোপের অংশ নয়, আবার জাপানের মত, অগ্রসর শিল্পায়িত জাতিগুলোর অন্তর্ভুক্তও নয়। একে বিবেচনা করা হয় "উন্নয়ন দৃশ্যপট"-এর বৃহত্তর আওতার মধ্যে; ভিন্নভাবে বলা যায়, গত তিন দশক ধরে মনে করা হচ্ছে ইসলামী সমাজের 'আধুনিকায়ন' প্রয়োজন। আধুনিকায়নের ভাবাদর্শে ইরানের শাহকে ইসলামের উন্নতির পরম চূড়া বলে মনে করার রীতি গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী অবস্থানের শাহ হলেন আধুনিক শাসক। আর তার পতনকে ধরে নেয়া হয় মধ্যযুগীয় গোঁড়া ধর্মান্ধতার কাজ হিসেবে।

অন্যদিকে, ইসলাম পশ্চিমের নিকট নির্দিষ্ট এক ভীতির প্রতিনিধিত্ব করে; তার কারণগুলো আমি আলোচনা করেছি *অরিয়েন্টালিজম*-এ, আরেকবার উল্লেখ করেছি বর্তমান বইয়েও। আজকের দুনিয়ায় যেরকম জোর দিয়ে ইসলামকে পশ্চিমের প্রতি হুমকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়, অন্য কোনো ধর্ম বা সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এভাবে বলা অসম্ভব। কাজেই মুসলিম বিশ্বে চলমান বিক্ষোভ ও প্রবল আলোড়ণ আকস্মিক দুর্ঘটনা নয় (ইসলামের ব্যাপারে এই আলোড়নকে যা করতে হবে, তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক নিয়ামক গুলোতে)। এ উত্থান গোবেচারা প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের 'অদৃষ্টবাদী মুসলমান!' জাতীয় জীর্ণোক্তির সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করে দিয়েছে। কিন্তু তার স্থান অন্য কিছু দিয়ে পুরণ করেনি, কেবল ঠেলে দিয়েছে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণের দিকে যখন ইউরোপীয় সেনাবাহিনী

গোটা মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছে—ভারত উপমহাদেশ থেকে একেবারে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত। বিশাল একগুচ্ছ সাম্প্রতিক বইপত্র, সাময়িকী, জনব্যক্তিত্ব যে উপসাগরীয় এলাকা পুনরদখল করার সফল আহবান জানাচ্ছে এবং যুক্তি হিসেবে ইসলামের 'বর্বরতার' কথা বলছে তার মূলে আছে (ওপরে বর্ণিত) ঐ ব্যাপার। আরেকটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল মার্কিন বিশেষজ্ঞের খ্যাতির জগতে নিউজিল্যান্ডের জে. বি. কেলির মত 'বিশেষজ্ঞদের' উত্থান কাল দেখেছে। আবুদাবীর শেখ জায়েদের[৩] এককালের উপদেষ্টা কেলি উইসকনসন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইম্পেরিয়াল হিস্ট্রী'র অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এখন মুসলমান ও নরম পশ্চিমাপন্থীদের সমালোচনায় মুখর, যারা তার মত না করে, আরবদের তেলের নিকট বিক্রি হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে তার বইয়ের সমালোচনা চোখে পড়ে। কিন্তু এসব সমালোচনার কোথাও বলা হয় না যে, তার বইয়ে শেষের অনুচ্ছেদে সচরাচর খোলাখুলিই পূর্ব-পুরুষের চরিত্র অনুযায়ী (মানুষের) দোষ/গুণ নির্ধারণ করার প্রবণতা আছে। সাম্রাজ্যবাদী জয়ের জন্য প্রবল আকুতি ও খোলামেলা বর্ণবাদী মনোভাবের সেসব অনুচ্ছেদের অংশ বিশেষ এখানে উল্লিখিত হওয়ার দাবি রাখে:

> সুয়েজের পুবে তার কৌশলগত উত্তরাধিকার সংরক্ষণ/পুনরুদ্ধারের জন্য পশ্চিম ইউরোপের হাতে কতটা সময় আছে সে ভবিষ্যতবাণী করা অসম্ভব। যখন বৃটেনে প্যাক্স-বৃটানিকা গৃহত হয়, অর্থাৎ উনিশ শতকের চার বা পাঁচের দশক থেকে বর্তমান (বিশ) শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের পশ্চিম দিকের তীরভূমি ও পুব অঞ্চলে ছিল সমাহিত শান্তির বিস্তার। পুরনো সাম্রাজ্যিক বিন্যাসের পদচিহ্ন হিসেবে এখনো সেখানে একরকম ক্ষনস্থায়ী শান্তির ছাপ আছে। গত চার বা পাঁচ শ' বছরের ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে তবে তা এই যে, এ শান্তি বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল ফিরে যাচ্ছে স্বৈরতন্ত্রে, আফ্রিকার বেশিরভাগ এলাকা বর্বরতায়—এমন এক অবস্থায় যা বিরাজ করছিল ভাস্কো দ্য গামার সময়, যখন তিনি পুবে পুর্তগীজ আধিপত্যের ভিত্ পাতার জন্য অন্তরীপটি ভ্রমণ করেন। উপসাগর ও বাইরের দিকে বেরোবার পথের ওপর নিয়ন্ত্রণের জন্য ওমান চাবির মতো, তেমনি রেড সীতে ঢোকার বেলায় এডেন। পশ্চিমা শক্তিপুঞ্জ এরই মধ্যে একটা চাবি দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে, আরেকটা এখনো তাদের নাগালের মধ্যে। এখন দেখার বিষয় হাতের নাগালের চাবিটা ধরার জন্য বহুযুগ আগের পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনস-জেনারেলের প্রবল ও দৃঢ় মনোভাব তাদের মধ্যে আছে কি না।[৪]

পনর-ষোল শতকের পর্তুগীজ উপনিবেশবাদকে সঠিক দিক-নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণের জন্য এ কালের পশ্চিমা রাজনীতিবিদদেরকে যে-পরামর্শ দেন কেলি তা খেয়ালী কথা বলে মনে করতেন পারেন কেউ কেউ। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কেলি ইতিহাসের যে-সরল ভাষ্য উপস্থিত করেন তাই এখনকার প্রচলিত মনোভঙ্গি। তিনি বলেন উপনিবেশবাদ নিয়ে এসেছিল সমাহিত প্রশান্তি; যেন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে

পদানত করার বিষয়টি তার কাছে সরল, মিলনাত্মক কিস্‌সার মতো ব্যাপার। আর ঐসব মানুষদের জন্য ঐ যুগটাই ছিল যেন শ্রেষ্ঠ সময়। তাদের আহত অনুভূতি, বিকৃত ইতিহাস, অসুখী গন্তব্য বুঝি কোনো ব্যাপারই নয়; বিশেষত যতদিন আমাদের স্বার্থ উদ্ধার অব্যাহত থাকে, যেমন- মূল্যবান সম্পদ, ভৌগোলিক ও কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব, সস্তা স্থানীয় শ্রমের বিরাট এক উৎস। বুঝি শত শত বছরের পরাধীনতার পর আফ্রিকা ও এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারটি স্বৈরতন্ত্র ও বর্বরতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কেলির মতে এখন একমাত্র করণীয় হল একটি নতুন দখলাভিযান চালানো; এ কর্তব্য প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন বহু আগে রাজকীয় ব্যবস্থা সমর্পণ করে দেয়া হয়েছিল। যা ন্যায়সঙ্গতভাবে 'আমাদের' তা আবার দখল করার জন্য পশ্চিমের প্রতি কেলির আহবানের পেছনে আছে এশিয়ার ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি পরিপূর্ণ অবজ্ঞা। 'আমাদেরকে' সে সংস্কৃতি শাসন করতে বলেন কেলি।

এ জাতীয় উল্টা যুক্তিই কেলিকে ডানপন্থী মার্কিন বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে প্রভুত সম্মান এনে দিয়েছে—উইলিয়াম এফ. বাকলে থেকে *নিউ রিপাবলিক*-এর কাছেও। আমরা না হয় উদারতাগুণে উল্টোযুক্তির ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। তার দৃষ্টিভঙ্গির যে দিকটি আরো মজার বলে মনে হয় তা হচ্ছে গোলমেলে ও খুঁটিনাটি একটি সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের বিষয়টি কি করে সহজেই অন্য কিছু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, বিশেষত যখন ইসলামের বিরুদ্ধে আসে শক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ। কেউ জানে না হয়তো কি ঘটছে ইয়েমেন বা তুরস্কে, কিংবা লোহিত সাগর পেরিয়ে সুদান, মৌরিতানিয়া, মরক্কো এমনকি মিশরে। প্রচার মাধ্যমে নিরবতা, কারণ ওরা ব্যস্ত জিম্মি সংকটের প্রতিবেদন করা নিয়ে। প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিরবতা, কারণ ওরা ব্যস্ত তেল-কোম্পানীগুলোকে উপদেশ প্রদান এবং গালফের মতিগতি সম্পর্কে কি ভাবে ধারণা করতে হবে সরকারকে সে পরামর্শ দেয়ার কাজে। সরকারে নিরবতা, তা কেবল সেখানেই তথ্য খুঁজে দেখতে যায় যেখানে 'আমাদের বন্ধুরা' (যেমন শাহ বা আনোয়ার সাদাত) তথ্য খুঁজে দেখতে বলে। 'ইসলাম' কেবল এইটুকুই যে তা আমাদের তেলের মজুদ; আর কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর কিছু আমাদের মনোযোগ দাবির করার মতো নয়।

ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক অধ্যয়নের কথাই ধরা যাক। ওখানে পরিশোধনমূলক তেমন কোনো কাজ চোখে পড়ে না। যেভাবেই হোক, সাধারণ সংস্কৃতির তুলনায় তা প্রান্তিক বিষয়ে পরিনত হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটিই আবার গৃহীত হচ্ছে সরকার ও করপোরেশনগুলোর দ্বারা। এই পরিস্থিতির কারণে ইসলামকে প্রচার করা হয় এমন ভাবে যা ইসলামী সমাজের বাইরের চেহারাটার তলে তলে অস্তিত্বশীল বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিতে বাধা দিয়ে অন্য অনেক কিছুই বলে যাচ্ছে। এরপর আছে পদ্ধতিগত ও বৃত্তিবৃত্তিক সমস্যারাজি, যার সমাধান হওয়া দরকার। যেমনঃ ইসলামী আচার-আচরণ বলে কি কিছু আছে? বিভিন্ন ইসলামী সমাজে কোন

Pre-Modern and Two Modern Ways of Dealing with Continuity and Change, Collaboration and Conflict and the Achieving of Justice," নিবন্ধটি 22nd Near East Conference at Princeton University on Psychology and Near Eastern Srudies, May 8, 1973-এ পাঠ করা হয়। এটি হালপার্নের "A Redefinition of the Revolutionary Situation." *Journal of International Affairs* 23, no. 1 (1969): 54-75-এর অংশ বিশেষ।

137. Morroe Berger, *The Arab World Today* (New York: Doubleday Anchor Books, 1964), p. 140. জুয়েল কারমাইকেল এবং ড্যানিয়েল লার্নারের বিশৃঙ্খল রচনাও এ ধারণায় পরিচালিত। Theodore Draper, Walter Laqueur, এবং Elie Kedourie-এর মতো ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পণ্ডিতেরা এ ক্ষেত্রে আরো সূক্ষ্ম মাত্র। Gabriel Baer's *Population and Society in the Arab East*, trans. Hanna Szoke (New York: Frederick A. Praeger, 1964), এবং Alfred Bonne *State and Economics in the Middle East: A Society in Transition* (London: Routledge & Kegan Paul. 1955) প্রভৃতি প্রচুর-পঠিত রচনাতেও এর প্রকাশ দেখা যায়। তাদের ভাবখানা এমন যে, আরবরা যদি আদৌ চিন্তা করতে পারেও তবু সে চিন্তাধারা অন্যরকম কিছু—যুক্তিহীন। এ বিষয়ে আরো দেখুন: Adel Daher's RAND study, *Current Trends in Arab Intellectual Thought* (RM-5979-FF, December 1969) এবং তার উপসংহার—"যথার্থ সমাধানমুখী মনোভাব আরবদের মধ্যে নেই প্রায় (p. 29)। *Journal of Interdisciplinary History* (see note 124 above), রজার ওয়েন ইতিহাসের অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে 'ইসলাম' ধারণাটিকেই গুরুত্বহীন মনে করেন। তার মডেল হলো *Cambridge History of Islam*, যা তার মতে ইসলাম সম্পর্কিত ধারণার জন্ম দিয়েছে: "একে (ইসলামকে) বর্ণনা করেছে ধর্মীয়, সামন তান্ত্রিক, যুক্তি-বিরহিত পদ্ধতিরূপে; যে সব কারণে ইউরোপে প্রগতি সম্ভব হয়েছে ওতে সেগুলো নেই।" সমজাতীয় ধারণার প্রকাশ আছে কার্ল বেকার ও ম্যাক্স ওয়েবারের রচনায়। ওয়েবারের রচনায়। ওয়েবারের বিভ্রান্তির প্রমাণের জন্যে দেখুন : Maxime Rodinson' *Islam and Capitalism*, trans. Brian Pearce (New York: Pantheon Books, 1974), pp. 76-117.

138. Hamady, *Character and Temperament*, p. 197.

139. Berger, *Arab World*, p. 102.

140. Irene Gendzier *Frantz Fanon: A Critical Study* (New York: Pantheon Books, 1973), p. 94-এ উদ্ধৃত।

141. Berger, *Arab World*, p. 151.

142. P. J. Vatikiotis, ed., *Revolution in the Middle East, and Other case Studies; Proceedings of a seminar* London: George Allen & Unwin, 1972), pp. 8-9.

143. পূর্বোক্ত, pp. 12, 13.

144. Bernard Lewis, "Islamic Concepts of Revolution," ibid. pp. 33, 38-9. লুইস-এর রচনা *Race and Color in Islam* (New York: Harper & Row, 1971)-তেও ফাঁকা পাণ্ডিত্য আর ঘৃণাবোধের প্রকাশ। তার *Islam in History: Ideas, Men and Events in the Middle East* (London: Alcove Press, 1973) গ্রন্থটিও রাজনৈতিক, কিন্তু কম বিদ্বেষপূর্ণ নয়।

145. Bernard Lewis, "The Revolt of Islam," *The Middle East and The West* (bloomington: Indiana University Press, 1964), p. 95.

146. Bernard Lewis, "The Return of Islam," *Commentary*, January 1976, p. 44.

147. পূর্বোক্ত, p. 40.

148. Bernard Lewis, *History-Remembered, Recovered, Invented* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1975), p. 68.

149. Lewis, *Islam in History*, p. 65.

কাভারিং ইসলাম

জিনিষটি দৈনন্দিন জীবনের ইসলামকে যুক্ত করে মতবাদের স্তরের ইসলামের সাথে? মরক্কো ও সৌদী আরব অথবা সিরিয়া ও ইন্দোশিয়াকে বোঝার জন্য 'ইসলাম' নামক ধারণাটি কতটা কার্যকর? আজকাল অনেক পণ্ডিতই যেমন সচেতন হয়ে উঠছেন, এই ব্যাপারগুলো যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তাহলে বোঝা যাবে যে, ইসলামী মতবাদ আসলে পুঁজিবাদ এবং এমনকি সমাজতন্ত্রকেও বৈধ করছে, বৈধতা দিচ্ছে জঙ্গীবাদ ও নিয়তিবাদকে, তেমনি বিশ্বজনীন খ্রিস্ট্রিয় ঐক্য ও স্বাতন্ত্রিক রক্ষণশীলতাকেও। এবং কেবল তখনই আমরা দেখতে পাবো ইসলাম সম্পর্কে বিদ্যায়তনিক বিবরণ (প্রচার মাধ্যমে যা অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে ক্যারিকেচার) এবং ইসলামী সমাজের নির্দিষ্ট বাস্তবতার মধ্যে আসমান-জমিন তফাত।

এ সত্ত্বেও ইসলাম যেন বলির পাঁঠা। পৃথিবীর নতুন নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে-সব বিন্যাস আমাদের পছন্দ হয় না তাই ইসলামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার যৌথ মনোভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। ডানপন্থীদের কাছে ইসলাম বর্বরতা, বামপন্থীদের মতে মধ্যযুগীয় ধর্মতন্ত্র; আর মাঝপন্থীরা মনে করেন এটি রুচিবনষ্টকারক, আকর্ষণীয় রহস্যময় ব্যাপার। সকল দলের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য এই যে, ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, অনুমোদন করার মত বিশেষ কিছু নেই ইসলামে। ইসলামে যা মূল্যবোধের ব্যাপার তা মুলত এন্টি-কমিউনিজম; এবং মজার ব্যাপার হল ইসলামের এন্টি-কমিউনিজম দমন-মূলক মার্কিনপন্থী শাসনব্যবস্থারই একটা রূপ। এর চমৎকার দৃষ্টান্ত হল পাকিস্তানের জিয়াউল হক।

আমার এই বই কোনো অবস্থাতেই ইসলামকে সমর্থন করার জন্য নয়; তা করলে মাটি হয়ে যেত আমার পুরো পরিকল্পনাই। এটি মূলত বর্ণনা করে পশ্চিমে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ইসলাম' ধারণাটিকে। মুসলিম বিশ্বে এর ব্যবহারও আমার আলোচনায় এসেছে, তবে এ দিকে বেশি সময় দিতে পারিনি আমি। পশ্চিমে ইসলামের অপব্যবহারের সমালোচনার করার অর্থ এ নয় যে, ইসলামী বিশ্বে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকাশ মার্জনার চোখে দেখা হচ্ছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, অপ্রতিনিধিত্বমূলক এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাল্প সদস্যের শ্রেণীর হাতে শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি হয় প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে ইসলামের নামে বৈধ করা হয়, অথবা ইসলামের ওপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা বিশে-ষণের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত বলে দেখানো হয়। এ অপকর্মটি অন্যান বিশ্বজনীন ধর্মে যেমন, তেমন ইসলামেও দোষহীন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেও ঘটনাক্রমে ইসলামের ব্যাপার বলে মনে হয়।

যাই হোক, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু অস্বাস্থ্যকর তার সকল কিছুকেই না হয় দোষারূপ করলাম না। এ সত্ত্বেও, আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিম কি বলছে, আর তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন মুসলিম সমাজ কি করছে; এ দুয়ের পারস্পরিক প্রভাব অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। এই দুয়ের দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ বেশিরভাগ মুসলিম দেশে উদ্ভুত হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতি—টমাস ফ্র্যাঙ্ক ও

এডওয়ার্ড ওয়েজব্যান্ডের কথায় 'বিশ্বরাজনীতি'[৫]। মনে রাখতে হবে যে, ঐ সব দেশে প্রাক্তন উপনিবেশী শক্তিরূপে অথবা বর্তমান বানিজ্যিক প্রতিপক্ষ হিসেবে পশ্চিম গুরুত্বপূর্ণ কথক। এই 'বিশ্বরাজনীতির' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা এই বইয়ে আমার লক্ষ্য। পশ্চিম ও ইসলামের মধ্যে এই পালাক্রম ধাক্কাধাক্কি, চ্যালেঞ্জ ও তার জবাব, এক ধরনের কথার জায়গা তৈরি করা ও অন্যধরনের কথার জায়গা বন্ধ করে দেয়া—-এসব নিয়েই 'বিশ্বরাজনীতি'। এ দিয়েই উভয়পক্ষ তাদের পরিস্থিতি তৈরি করে, গৃহীত পদেক্ষেপের বৈধতা দেয়, আগাম জায়গা দখল করে, নির্দিষ্ট কোনো বিকল্প গ্রহণে বাধ্য করে প্রতিপক্ষকে। এ ভাবে, ইরানীরা যখন তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে তখন তারা কেবল যুক্তরাষ্ট্রে শাহর অবস্থানের বিরুদ্ধেই প্রতিক্রিয়া করে না, বরং তারা যাকে মনে করে শক্তিশালী আমেরিকা কর্তৃক তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বিভিন্ন অপমানমূলক পদক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস, তার একটা জবাবও দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অতীত কর্মকাণ্ড বলে তাদের (ইরানীদের) জীবনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবিরাম হস্ত ক্ষেপের কথা। মুসলমান হিসেবে তাদের মনে হয় যুক্তরাষ্ট তাদেরকে নিজদেশে বন্দী করে রেখেছিল। ওরা তাই আমেরিকার এলাকায়, অর্থাৎ তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে বন্দী করে খোদ আমেরিকানদের। তাদের কাজই তা প্রমাণ করে; এ সত্ত্বেও মূলত তাদের কথা এবং কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ক্ষমতাপ্রবাহের ইঙ্গিত তৈরি করে প্রয়োজনীয় পথ, এমনকি অনেকাংশে সম্ভব করে তোলে মূল ক্রিয়াটি।

এই বিন্যাসকে গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। কারণ এতে রাজনীতি ও বাস্তবতার ঘনিষ্ট সম্পর্ককে উপেক্ষা করা হয়; অন্তত ইসলাম সম্পর্কিত আলোচনায়। ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিতদের অনেকেই হয়তো এমন কথা স্বীকার করবেন না যে, পণ্ডিত হিসেবে তারা যা বলেন/লিখেন তা খুব চমৎকারভাবে—কখনো কখনো বিদ্বেষমুলকভাবে—রাজনৈতিক পটভূমির ওপর দাড়ানো। সমকালীন পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত সকল অধ্যয়নই রাজনৈতিক গুরুত্ব দ্বারা সিক্ত, বিশেষজ্ঞ বা সাধারণ আলোচকেরা স্বীকার করুন আর নাই করুন। পশ্চিম বা ইসলামী সকল সমাজেই ভিনদেশী বা আগুন্তক ও 'অন্যরকম' সম্পর্কে চিন্তাভাবনায় রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এ সত্ত্বেও এমন ধরে নেয়া হয় যে, আন সমাজ (Other Society) সম্পর্কিত পণ্ডিতি জ্ঞানভাষ্য হবে দৃঢ়ভাবে বিষয়মুখি। ইউরোপে প্রাচ্যতাত্ত্বিকরা ঐতিহ্যগতভাবেই সরাসরি উপনিবেশিক কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকতেন; উপনিবেশী সামরিক বিজয়াভিযান এবং পাণ্ডিত্যের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক কতদূর বিস্তৃত ছিল সে সম্পর্কে আমরা মাত্র এই সাম্প্রতিককাল থেকে কিছু কিছু জানতে শুরু করেছি, যা একই সাথে খুবই দুঃখজনক আবার নৈতিক উন্নতিকারকও (যেমন মহতী বলে শ্রদ্ধেয় ডাচ প্রাচ্যতাত্ত্বিক সি. স্নোক হারগ্রোনেই সুমাত্রার এজেনিজ মুসলমানদের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হন; এরপর সেই বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে এজেনিজদের বিরুদ্ধে বর্বর ডাচ যুদ্ধ পরিচালিত হয়[৬])। অথচ পশ্চিমা পাণ্ডিত্যের অ-রাজনৈতিক চরিত্র, প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের সুফল এবং 'বিষয়মুখি' বিশেষজ্ঞতার প্রংশসা করে নিয়মিত লেখা হচ্ছে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ,

বইপত্র। আবার ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রায়-প্রত্যেকেই হয় প্রচার মাধ্যম অথবা কোনো করপোরেশন কিংবা সরকারে উপদেষ্টা, এমনকি চাকুর। আমার কথা হচ্ছে এই যে সহযোগিতার সম্পর্ক তা স্বীকার করে নিতে হবে, কেবল নৈতিক কারণে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনেও।

ধরা যাক, আমরা মেনে নিলাম ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানভাষ্য এর পরিপার্শ্বের রাজনৈতিক, আর্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতির দ্বারা সম্পূর্ণ কলঙ্কিত হয়নি; তাহলেও এটকু স্বীকার করতে হবে যা তা এসব পরিস্থিতির রঙে রঞ্জিত হয়েছে অন্তত। পুব পশ্চিম সবখানেই তা সত্যি। প্রকাশ্য অনেক প্রমাণের কারণে এমন বলা অতিরঞ্জন হয় না যে, ইসলাম বিষয়ে যে কোনো জ্ঞানভাষ্যের স্বার্থ রয়েছে কোনো না কোনো কর্তৃত্ব অথব ক্ষমতায়। আবার, ইসলাম সম্পর্কিত সব লেখাজোখা ও পাণ্ডিত্যকে আমি অর্থহীন বলছি না। বরং বলছি এই পাণ্ডিত্য ও রচনা অনেক কাজের জিনিষ, কোন স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে তা বোঝার ক্ষেত্রে একটা সূচীর মত উপকারী। মানব সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে পরম সত্য কিংবা পরম জ্ঞান বলে কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। হয়তো তা আছে কেবল বিমূর্ত ধারণা হিসেবে এবং সেক্ষেত্রে তা আপাতভাবে গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু 'ইসলাম' জাতীয় বিষয়ে সত্য তার সাথে সম্পর্কিত যিনি তা সৃষ্টি করেন। এখানে বলে রাখা দরকার, এ অবস্থান গ্রহণ করলেও জ্ঞানের বিভাজন (যেমন ভালো, মন্দ, নিরপেক্ষ) বাতিল হয়ে যায় না, কিংবা নষ্ট হয় না কোনো কিছু সঠিকভাবে বলার সম্ভাবনাও। বরং এর অর্থ হচ্ছে যে-ই 'ইসলাম' সম্পর্কে কথা বলুন না কেন, তার মনে চলে আসে সেই সব প্রসঙ্গও যা সাহিত্যে নবাগত কোনো ছাত্রর মনেও কাজ করে: তা এই যে, মানবীয় বাস্তবতা সম্পর্কে লেখার বা কোনো রচনা পাঠ করার কাজে এমন বহু উপাদান সক্রিয় হয়ে ওঠে যে-গুলো 'বিষয়মুখিনতা'র লেবেলে বিবেচনা করা অসম্ভব।

এ কারণেই আমি মন্তব্য বা ভাষ্য-উৎপাদক পরিস্থিতি সনাক্ত করার সময় বেদনা বোধ করি। এ কারণেই সমাজে 'ইসলাম' সম্পর্কে আগ্রহী দলগুলো সনাক্তকরণ এত জরুরী। সাধারণভাবে পশ্চিমে—বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলাম'-এর ওপর ক্ষমতার প্রভাবে সৃষ্ট প্রবাহরূপ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়; এর উপাদান-দলগুলোর জন্য যেমন (প্রচার মাধ্যম, করপোরেশন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সরকার), তেমনি এর উৎপাদিত রক্ষণশীল বলয় থেকে ভিন্নমতের নির্বাসনের কারনেও। তার ফলাফল হল ইসলামের মারাত্মক সরলীকরণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেকগুলো পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জন: একটি নয়া ঠাণ্ডা যুদ্ধ উস্কে দেয়া থেকে শুরু করে জাতিগত বিদ্বেষ প্ররোচিত করা, সম্ভাব্য দখলাভিযানের অজুহাত তৈরি, ইসলাম ও আরবদেরকে অব্যাহতভাবে কলঙ্কিত করা[৭]। আমার বিশ্বাস এসব কিছুই সত্য উদঘাটনের জন্য ঘটছে না; এই পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জনের মধ্যে যে-সত্য নিহিত তা তো বরাবরেই আড়ালে। এর বদলে আমরা পাণ্ডিত্যের—এমনকি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞতার চাদরে ঢেকে বিবৃতি দিই, উদ্দেশ্য সফল করি। এর একটা ফলাফল হচ্ছে যখন মুসলিম দেশগুলো থেকে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে

আরব বা ইসলাম বিষয়ক অধ্যয়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হয় তখন বিদেশী হস্ত ক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরাট অ-সাম্প্রদায়িক হাউকাউ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু জাপান বা জার্মানী থেকে প্রাপ্ত অনুদান এলে কোনো কথাবার্তা নাই। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর করপোরেট চাপের ফলাফলকেও মনে করা হয় ভালো ব্যাপার।[৮]

ওস্কার ওয়াইল্ড যেমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত (সিনিক) সম্পর্কে বলেছেন যে—তিনি সব কিছুর দাম জানেন কিন্তু কোনোটার মূল বোঝেন না—আমাকে আবার ওমন মনে করা না হয়, তাই সবশেষে বলে রাখি তথ্যনির্ভর বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করি। আরো স্বীকার করি যে: বৃহৎ শক্তি হিসেবে বাইরের পৃথিবীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা থাকারই কথা যুক্তরাষ্ট্রের, ক্ষুদ্র শক্তিগুলোর যা নেই; এবং বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে উন্নয়ন ঘটবে এমন আশা করা যায়। এ সত্ত্বেও বহু বিশেষজ্ঞ, নীতি-নির্ধারক ও সাধারণ বুদ্ধিজীবী যেমন 'ইসলাম' ধারণাটিতে দৃঢ় ও প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন, আমি ততটা করি না। আমি মনে করি মানুষ ও তার সমাজকে কোন জিনিষটি ধাক্কা দেয় তা বোঝার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস সহায়ক না হয়ে বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমি সত্যিই বিশ্বাস করি সমালোচনামুখি চৈতন্য এবং ইচ্ছুক মানুষও রয়েছে, যারা ধারণাটিকে ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞদের স্বার্থ ও তাদের *আইডিজ রিসিজ*-এর সীমানা ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম। ভালো ও সমালোচনামুখি পাঠ-দক্ষতায় কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থেকে কাণ্ডজ্ঞানকে মুক্ত করার মাধ্যমে, সঠিক প্রশ্ন করা ও যথাযথ উত্তর আশা করার মধ্য দিয়ে যে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারেন ইসলাম ও ইসলামী জগত সম্পর্কে, সে জগতের বাসিন্দা নারী-পুরুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে।

ভালো সমালোচনামুখি, পাঠ-দক্ষতায় কাণ্ডজ্ঞানকে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে, সঠিক প্রশ্ন করে যথার্থ উত্তর চাওয়ার মধ্য দিয়ে যে কেউ ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন, জ্ঞান অর্জন করতে পারেন ইসলামী বিশ্ব ও তার বাসিন্দা নারী-পুরুষ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে, যারা ঐ জগতের বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়, এর ভাষায় কথা বলে, সৃষ্টি করে এর সমাজ ও ইতিহাস। এই জায়গা থেকেই মানবতাবাদী জ্ঞানের শুরু, জ্ঞানের সম্প্রদায়গত দায়ভার কাঁধে নেয়ারও সূচনা। এ উদ্দেশ্যকে পুরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এ বই।

বইটির এক ও দুই নম্বর অধ্যায়ের কিছুটা করে ছাপা হয়েছে *দি ন্যাশন* ও *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ* পত্রিকায়। খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*-এর সম্পাদনাকের দায়িত্ব পালন কালে রবার্ট ম্যানফ একে একটি চমৎকার প্রকাশনায় পরিণত করেছিলেন। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা। বইটির কোনো কোনো অংশের মালমশলা যোগার করার কাজে ডগলাস বান্ডউইন ও ফিলিপ শেহাদের সক্ষম সহযোগিতা লাভ করেছি। সব লেখাজোখা একসাথে কওে সাহিত্যিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন পল লিপারি। অ্যালবার্ট সাঈদের উদার সহযোগিতার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাই। সুপ্রিয় কমরেড একবাল আহমেদের কাছে বিশেষ ঋণ স্বীকার করি। সন্দেহময়, কঠিন প্রয়াসের কালে তার বিশ্বকোষ-সদৃশ জ্ঞান

ও সীমাহীন সনির্বন্ধ অনুরোধ শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে আমাদের অনেককে। পাণ্ডুলিপিটি প্রথম অবস্থায় পাঠ করে পুনর্বিবেচনার জন্য অনেক খুঁটিনাটি পরামর্শ দিয়েছেন জেমস পেক; অবশ্য, এখনো যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তবে এর দায়-দায়িত্ব কিছুতেই তার নয়। তার অতি-প্রয়োজনয়ি সহায়তার কথা সানন্দে স্বীকার করি। প্যান্থিয়ন বুকস-এর জাঁ মর্টন যথেষ্ট দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে পাণ্ডুলিপির কপি-সম্পাদনা করেছেন, তার নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আঁন্দ্রে জিফ্রিনকেও ধন্যবাদ। এই বই যাকে উৎসর্গ করেছি, সেই মরিয়ম সাঈদ বইটি লেখার সময় লেখককে প্রাণবন্ত রেখেছেন। তার ভালোবাসা, সঙ্গ ও উজ্জীবক উপস্থিতির জন্য সহৃদয় ধন্যবাদ।

পুনশ্চ :

তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাসের অভ্যন্তরে ৪৪৪ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ১৯৮১ সালের জানুয়ারির কুড়ি তারিখে ইরান ত্যাগ করেন ৫২ জন আমেরিকান জিম্মি; আমেরিকায় ফিরে আসেন আরো কয়েকদিন পর। তাদের ফিরে আসার আনন্দে উদ্বেল সারা দেশ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। ঘটনাটিকে অভিহিত করা হয় 'জিম্মি প্রত্যাবর্তন' নামে। 'জিম্মি প্রত্যাবর্তন' গোটা সপ্তাহ ধরে দখল করে রাখে মার্কিন প্রচার মাধ্যমকে। 'ফেরতীরা' প্রথমে আলজিরিয়া, অতপর জার্মানী, এরপর পশ্চিমে ওয়াশিংটনে এবং সবশেষে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। গোটা ঘটনাটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় বহু ঘন্টার টেলিভিশন অনুষ্ঠানে, যা প্রায়ই হয়ে ওঠে 'অনধিকার প্রবেশমূলক' ও ভাবোন্মাদ প্রতিবেদনের মত। অধিকাংশ দৈনিক ও সাপতাহিক প্রকাশ করে বিশেষ ক্রোড়পত্র। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত চুক্তিতে উপনীত হওয়ার কাহিনী এবং এতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে মার্কিন বীরত্ব ও ইরানী বর্বরতাও এন্তে অন্তর্ভুক্ত থাকে; আর জিম্মিদের অগ্নিপরীক্ষার গল্প ছড়ানো ছিটানো, যেগুলো প্রায়ই অতি-উদ্যমী সাংবাদিকদের নিজস্ব কারুকাজমণ্ডিত। যে জিনিষটা সতর্কতাজনক তা হচ্ছে বেশ কিছু সংখ্যক মনস্তত্ত্ববিদের উপস্থিতি: জিম্মিরা কোন অবস্থায় সময় কাটিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে যেন উন্মুখ এইসব মনস্তত্ত্ববিদ। যখন একদিকে অতীত নিয়ে আলোচনা, অন্যদিকে, ইরানী বন্দীত্বের প্রতীকস্বরূপ হলুদ ফিতার সীমানা মাড়িয়ে গেছে যে ভবিষ্যত তা নিয়েও আলোচনা চলমান, তখন নতুন প্রশাসন নির্ধারণ করে দেয় এসব আলোচনার স্বর ও সীমানা। যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি করা উচিত হয়েছে কি না অথবা এখন সেই চুক্তি মানা দরকার কি না। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীর ৩১ তারিখে *নিউ রিপাবলিক* আক্রমণ করে মুক্তিপণের বিষয়টিকে, সঙ্গে সঙ্গে কার্টার প্রশাসনকেও—সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পনের অভিযোগে। অতপর ইরানীদের দাবি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার গোটা প্রস্তাবটি সম্পর্কে বলা হয় "আইনের দিক থেকে বিতর্কসৃজক প্রস্তাব"। মাধ্যম হিসেবে ব্যহৃত আলজিয়ারও সমালোচনা করা হয়; আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ

এই দেশ সন্ত্রাসীদেরকে নিয়মিত আশ্রয় দেয়, মুক্তিপণের টাকা হস্তান্তরে সহায়তা করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রিগান প্রশাসনের যুদ্ধ ঘোষণা ভবিষ্যত সম্পর্কিত আলোচনায় বাধা তৈরি করে। মানবাধিকার নয়, সন্ত্রাস-বিরোধিতা জায়গা করে নেয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতামালায়, এমনকি এও বলা হয় যে সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধে প্রয়োজনে 'সহনশীল' মাত্রার নিপীড়ক শাসকদেরকেও সহায়তা করা হবে, যদি তারা মিত্র হয়ে থাকেন।

যথারীতি *খ্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর*-এর জানুয়ারী ২৯, ১৯৮১ সংখ্যায় পিটার সি. স্টুয়ার্ট জানান "জিম্মি মুক্তির চুক্তির শর্তাবলী... জিম্মিদের চিকিৎসা... দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (এবং পরের চিন্তা হিসেবে) ভবিষ্যত ইরান-মার্কিন সম্পর্ক " বিষয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেসে শুনানীর তারিখ ঠিক করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সঙ্কট চলাকালীন মূল সমস্যার যে সঙ্কীর্ণ চিত্রটি চিহ্নিত হয়েছে (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) প্রচার মাধ্যমের দ্বারা, তার সাথে তাল মিলিয়েই যেন এ নিয়ে আর কোনো মনোযোগী চিন্তা ভাবনা হয় না। ইরানী ট্রমা আসলে কি, ভবিষ্যত বিষয়ে তার ইঙ্গিত কি, এর শিক্ষনীয় দিক কোনটি—এসব বিষয় নিয়ে কোনো বিশ্লেষানত্মক ভাবনার ছাপ নাই। *লন্ডন সানডে টাইমস রিপোর্ট* করে যে, অফিস ছাড়ার আগে প্রেসিডেন্ট কার্টার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন যেন "সাধারণ মানুষের সকল মনোযোগ এক করে ঘৃণা ও ক্রোধের ঢেউ জাগিয়ে তোলা হয় ইরানীদের বিরুদ্ধে।" এ কথা সত্য হোক বা না হোক, এমন বলা সম্ভব। কারণ দুয়েকজন সাংবাদিক-কলামিষ্ট ছাড়া, কোনো সরকারী কর্মকর্তা বা লেখক-সাংবাদিক ইরান ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপের দীর্ঘ ইতিহাস পুনর্মূল্যায়িত করতে চাননি। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী রাখার ব্যাপারে অনেক কথা হয়; অন্যদিকে, জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে তায়েফে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ঘটনাটিকে সোজাসুজি উপেক্ষা করে মার্কিন প্রচার মাধ্যম।

প্রতিশোধের পরিকল্পনা এবং মার্কিন শক্তিমত্তা নিয়ে নানা কথা হয় উচ্চস্বরে, সাথে থাকে জিম্মিদের দুর্ভোগ ও ফিরে আসার বীরত্বগাঁথার বহুগুন বর্ধিত জারিগান। ঘটনার স্বীকার জিম্মিদেরকে সরাসরি বীর এবং স্বাধীনতার প্রতীক-এ রূপান্তরিত করা হয় (বোঝাই যায়, ব্যাপারটা ভালো লাগার কথা নয় যুদ্ধফেরত প্রাক্তন বীর সৈনিক ও পি.ও.ডব্লিউ গ্রুপের সদস্যদের), আর তাদের আটককারীদের চিত্রিত করা হয় মানবেতর প্রাণী হিসেবে। এ পর্যায়ে ২২শে জানুয়ারী *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয় "মুক্তির এই প্রথম প্রহরে ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠুক।" আবার ২৮শে জানুয়ারীতে লেখা হয়, "কি করা উচিত ছিল? বন্দরে মাইন পেতে রাখা, বা মেরিন নামিয়ে দেয়া, অথবা কয়েকটা বোমা ফেললে হয়তো এই জাতীয় শত্রু ভয় পেতো। কিন্তু ইরান কি যুক্তি বুঝতো কিংবা, (এখন) বুঝে?" অবশ্য ইরানকে সমালোচনার করার মতও অনেক কিছু আছে, জানুয়ারীর ২৫ তারিখের লস *এঞ্জেলেস টাইমসে* লিখেছেন ফ্রেড হেলিডে: একটি আধুনিক রাষ্ট্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যানের লক্ষ্যে যেভাবে প্রতিদিনের কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়, ইরানের ধর্ম ও অ-দমিত বিপ্লবোত্তর উত্তাপ তা করতে সক্ষম নয়। আন্তর্জাতিকভাবে

ইরান একঘরে এবং নিরাপত্তাহীন। এবং এও পরিষ্কার যে, দূতাবাসের অভ্যন্তরে ছাত্ররা জিম্মিদের সাথে সবসময় হয়তো ভদ্র থাকেনি। কিন্তু, এমনকি ৫২জন জিম্মির কেউ-ই বলেননি যে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে বা তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে; ওয়েস্ট পয়েন্টে ওদের সংবাদ সম্মেলন থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় (দ্রঃ *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, জানুয়ারী ২৮)। ওখানে এলিজাবেথ সুইফট পরিষ্কার করেই বলেছেন যে, তিনি যা বলেছেন *নিউজ উইক* তর ওপর মিথ্যাচার করেছে, নির্যাতনের কাহিনী বানিয়েছে (প্রচার মাধ্যমে যা আরো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নেয়া হয়), বাস্তবের সাথে এর সম্পর্ক নাই। জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন প্রচার মাধ্যম ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এমন এক লাইসেন্স দেয় যার বলে জিম্মিদের অস্বস্তিকর, উদ্বেগজনক, দু:খজনকভাবে দীর্ঘ নির্দিষ্ট একরকম অভিজ্ঞতা আকস্মিক এক লাফে ইরান ও ইসলাম বিষয়ক সাধারণীকরণে রূপান্তরিত হয়। অন্যকথায়, একটি জটিল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সহসা রূপান্তরিত করে নিয়োগ করা হয় স্মৃতি বিলোপের কাজে। এভাবে আবার আমরা পুর্বের মৌলভিত্তিতে ফিরে আসছি। জানুয়ারীর ২৩ তারিখের *আটলান্টা কনস্টিটিউশন*-এ বব ইনজেলের লেখায় ইরানীদেরকে সংকোচিত করে পরিণত করা হয় "মৌলবাদী উন্মাদ"-এ; সেদিনের *ওয়াশিংটন পোস্টে* ক্লেয়ার স্টার্লিং লিখেন ইরানের ঘটনা হল "ভীত যুগ-১"—সভ্যতার বিরুদ্ধ সন্ত্রাসের যুদ্ধ। অথচ *ওয়াশিংটন পোস্টের* একই সংখ্যায়, বিল গ্রীনের মনে হয় "ইরানীদের নোংরা কাজটি" সম্পর্কে সংবাদ প্রচারক প্রচার মাধ্যমগুলো "প্রেসের স্বাধীনতাকে" বিকৃত করে শেষে মার্কিন জাতীয়তাবাদ ও আত্মশ্রদ্ধাবোধের প্রতি তাক করা একটা অস্ত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতার সমন্বিত এই বোধ খানিকপরই বাতিল হয়ে যায় যখন গ্রীন প্রশ্ন করেন, প্রচার মাধ্যম কি "ইরানী বিপ্লব" বুঝতে "আমাদেরকে" সহায়তা করেছে। এ প্রশ্নের উত্তর দেন মার্টিন কনড্রাক, *ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল*-এর জানুয়ারীর ২৩ তারিখের সংখ্যায়। তিনি লিখেন, "(দুএকটা মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া) মার্কিন টেলিভিশন ইরানের ঘটনাটিকে এমনভাবে প্রচার করেছে যেন তা সোপ অপেরা, বা ফ্রিক শো': মুষ্টির খেলা আর আত্ম-পীড়ন দেখানোর ব্যাপার।

কিছু সাংবাদিক আছেন যাদের লেখা সত্যিই কিছু বলে। যেমন এইচ. ডি. এস. গ্রীনওয়ে জানুয়ারীর ২১ তারিখের *বোস্টন গ্লোব*-এ স্বীকার করেন "জিম্মি সংকট নিয়ে আমেরিকার ভাবোন্মোত্ততা অন্যান্য গরুত্বপূর্ণ ইস্যু চাপা দিয়ে মার্কিন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে"। তবে তিনি পরিষ্কার এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন যে, "বহুপাক্ষিক পৃথিবীর বাস্তবতা পরিবর্তিত হবে না। বিশ শতকে ক্ষমতার বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন প্রশাসন তা মানতে বাধ্য হবে।" সেদিনের *গ্লোব* পত্রিকাতেই স্টিভেন এরল্যাঙ্গার সঙ্কট উত্তরণ এবং এর মধ্য দিয়ে এ বিষয়ক বিতর্ক "কম আবেগ ও অধিকতর যুক্তির" দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় প্রশংসা করেন কার্টার প্রশাসনের। অন্যদিকে, এর জবাবে *নিউ রিপাবলিক* 'বরাবর তাল-দিয়ে চলা গ্লোব'-এর সমালোচনা করে, যার অর্থ দাড়ায় ওদের মতে মার্কিন শক্তির পুনর্বিন্যাস

ও কমিউনিজম-বিরোধী যুদ্ধে ইরানকে অস্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এই জঙ্গী মনোভাবই এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যুক্তরাষ্ট্রের সেমি-অফিসিয়াল মতবাদে। *ফরেইন এ্যাফেয়ার্স* শীত ১৯৮০-৮১ সংখ্যায় রবার্ট ডব্লিউ থুকার "দি পারপাস অব আমেরিকান পাওয়ার" শিরোনামে দাবি করেন তিনি "পুনর্জাগ্রত আমেরিকা" ও "বিচ্ছিন্নতা নীতির" মাঝ বরাবর একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলে সরাসরি হস্তক্ষেপের নীতিতেই সমর্থন করেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্র ওখানকার আভ্যন্তরীণ বিন্যাসে পরিবর্তন কিংবা সোভিয়েত প্রভাব বিস্তার কোনোটাকেই 'অনুমোদন' করতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করতে হবে অনুমোদযোগ্য ও অনুমোদন-অযোগ্য পরিবর্তনের লক্ষণ কি। থুকারের সমমনা সহকর্মী হার্ভার্ডের রিচার্ড পাইপস পরামর্শ দেন নতুন প্রশাসনের উচিত গোটা পৃথিবীকে সরল দুই ভাগে ভাগ করে নেয়াঃ কমিউনিস্টপন্থী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী।

ঠাণ্ডা যুদ্ধে ফেরার মধ্যে যদি এক রকম প্রবল দৃঢ়তা থাকে বলে মনে হয়, তা হলে তা অন্য দিকে ডেকে আনে আত্ম-বিভ্রমের পুনর্জাগরণও। সেক্ষেত্রে যিনিই—অপরাধীর মন নিয়ে না হোক, অন্তত আত্মসচতেনতার প্রয়োজনে— যুক্তরাষ্ট্রকে তার অতীত পুনর্বিবেচনা করতে বলবেন তিনিই গণ্য হবেন শত্রুরূপে। স্রেফ উপেক্ষা করা হবে এ ধরনের লোকদেরকে। ওয়েস্ট পয়েন্টের সংবাদ সম্লেলনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতে অংশগ্রহণকারীদের একজন ঘোষণা করেন যে, যেহেতু রেজা শাহ পাহলভীর শাসনামলে ভিন্ন মতাবলম্বী ইরানীদের ওপর নির্যাতনে যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহ দিয়েছে, তাই এখন যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষ থেকে নির্যাতনের অভিযোগ তোলা ভণ্ডামি মাত্র। এ প্রশ্নের মুখে তেহরানে প্রবীন মার্কিন কূটনৈতিক ও চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স দুই দুই বার বলেন তিনি প্রশ্নটি বুঝতে পারেননিঃ অতপর তিনি তড়িঘড়ি করে তুলে আনেন ইরানীদের বর্বরতা ও মার্কিন বীরত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গ।

বিশেষজ্ঞ, প্রচার মাধ্যমের লোকজন, কিংবা সরকারী কর্মকর্তারা একবারও ভেবে দেখেননি যে, অন্যায়ভাবে দূতাবাস দখল ও জিম্মি প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে বিচ্ছিন্ন, নাটকীয় ও অমানবিক রূপে প্রচার করার জন্য যতটা সময় ব্যয় করা হয়েছে তার ক্ষুদ্র এক অংশেও যদি শাহ-আমলের পাশবিক দমন-নির্যাতন বর্ণনা করা হতো তা হলে কি ঘটতো। যথার্থই উদ্বিগ্ন আমেরিকানদের ইরানের প্রকৃত ঘটনা অবহিত করার জন্য তথ্য-সংগ্রাহক যন্ত্রগুলো ব্যবহারের ধারণাটির কি কোনো সীমা চিহ্নিত করা হয় নাই? কেবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা উন্মাদ ইরানের প্রতি মানুষের ক্রোধ জাগিয়ে তোলা ছাড়া আর কোনো বিকল্পও কি ছিল না?

এগুলো বেকার প্রশ্ন নয়। দুঃখজনকভাবে ফুলানো-ফাঁপানো সেই অধ্যায়ের অবসান হয়েছে। পরিবর্তনশীল নতুন বিশ্ব-বিন্যাসের জটিলতাগুলোর সমাধান অর্জন পশ্চিমাদের জন্য, বিশেষ করে আমেরিকানদের জন্য উপকারী ও বাস্তব কাজ। "ইসলাম" কি কেবলই সন্ত্রাসী তেল-সরবরাহকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে যাচ্ছে?

"কে ইরানকে হারিয়ে ফেললো" কেবল এই বিষয়েই জার্নালগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে, নাকি বিশ্ব সম্প্রদায় ও শান্তিদায়ী উন্নয়নের সাথে অধিকতর সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা-সমালোচনার সূচনা করবে?

দায়িত্ববোধের সাথে জনগণকে তথ্য সরবরাহে প্রচার মাধ্যম কতটা সক্ষম তার প্রমাণ ১৯৮১ সালের জানুয়ারী ২২ ও ২৮ তারিখে প্রচারিত এবিসির তিনঘন্টার বিশেষ অনুষ্ঠান "গোপন আলোচনা"। জিম্মি উদ্ধারে ব্যবহৃত কিছু প্রক্রিয়া প্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠানটিতে। এ ছাড়াও এতে এমন কিছু অজানা তথ্য পরিবেশন করা হয় যার ক্ষুদ্র একটা অংশও ঐসব মুহূর্তের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বলে, যে-সব মুহূর্তে আচমকা উন্মোচিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন অসচেতন ও বদ্ধমূল ধারণা। এমনই একটা মুহূর্ত হল যখন খ্রিস্টিয়ান বোরগুয়েত বর্ননা করেন ১৯৮০ সালের শেষ মার্চে হোয়াইট হাউসে কার্টারের সাথে অনুষ্ঠিত তার বৈঠকের কথা। ফরাসি উকিল বোরগুয়েত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিলেন। তিনি ওয়াশিংটনে যান। কারণ প্রাক্তন শাহকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে পানামিয়ানদের সাথে কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর হঠাৎ মিশরে পাড়ি জমান ক্ষমতাচ্যুত রেজা শাহ। ফলে আলোচকরা আবার সেই শুরুর জায়গায় এসে দাঁড়ান:

> বোরগুয়েত: একটা বিশেষ মুহূর্তে জিম্মিদের কথা উল্লেখ করেন (কার্টার), বলেন- আপনি বুঝতে পারছেন যে, এরা আমেরিকান। এরা নিরপরাধ। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ মি. প্রেসিডেন্ট! আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি বলছেন ওরা নিরপরাধ। তবে আমার বিশ্বাস আপনিও বুঝবেন ইরানীদের কাছে ওরা নিরপরাধ নয়। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে ওরা কিছুই করেনি, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এমন এক দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, যে দেশটি বেশ কিছু কাণ্ড ঘটিয়েছে ইরানে।
>
> আপনি বুঝবেন যে, তাদের ব্যক্তি-অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা সংঘটিত হয়নি। আপনি নিজেই তা দেখতে পারেন। ওদের কোনো ক্ষতি করা হয়নি, ওদেরকে আঘাত করা হয়নি, হত্যা করার চেষ্টা হয়নি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন এ হচ্ছে প্রতীক, প্রতীকের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ঘটনাটি নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে। উদ্ধৃত অংশটি এবিসি, নিউইয়র্কের ভেরোনিকা পোলার্ডের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কার্টার নিজেও হয়তো দূতাবাস দখলের ব্যাপারটিকে প্রতীক হিসেবেই দেখেছেন। কিন্তু তার ছিল নিজস্ব তথ্য-সংযোগ-কাঠামো, ফরাসি ভদ্রলোকের থেকে আরেক রকম। তার কাছে আমেরিকানরা নিরপরাধী এবং এক অর্থে ইতিহাসের বাইরে: অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দুর্দশার কারনস্বরূপ ইরানী তৎপরতা এক প্রাচীন ইতিহাস। আর এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ইরান সন্ত্রাসী, হয়তো চিরকালই ছিল সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। যে-ই আমেরিকাকে অপছন্দ করে এবং আমেরিকানদের জিম্মি করে সে-ই বিপজ্জনক, অসুস্থ, অযৌক্তিক, মানবতার বাইরে, সাধারণ ভব্যতারও বাইরের মানুষ।

কিছু বিদেশী ব্যক্তিত্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্থানীয় স্বৈর-শাসকদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘকালীন সমর্থনের সাথে সম্পর্ক আছে জিম্মি সঙ্কটের। কিন্তু কার্টার যে তা বুঝতে অক্ষম তা পূর্বভাসের মত। কেউ হয়তো জিম্মি-ঘটনার বিরোধিতা করতে পারেন, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ইতিবাচক অনুভূতি পোষন করতে পারেন; কিন্তু এই ঘটনা থেকে—বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু বাস্তব ব্যাপার চাপা দেয়ার জাতীয় সরকারী প্রবণতা থেকে তারও কিছু শেখার আছে। মানুষ ও জাতিসমূহের সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। "ওদেরকে" পছন্দ বা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে কোনোকিছু নির্দেশ দেয় না, নিষেধও করে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে: (ক) ওরা ওখানে আছে এবং (খ) ওদের জড়িত থাকার সাপেক্ষে, আমরা তা-ই আমরা আসলে যা, এবং আমরা তা-ও ওরা যেভাবে আমাদেরকে দেখে ও আমাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এটা নিষ্পাপ হওয়া বা অপরাধী হওয়া না হওয়ার ব্যাপার নয়। অথবা দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারও নয়। বাস্তবের ওপর কোনো একটা দিকেরও এমন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই যে অন্য দিকটাকে বাদ দেয়া যাবে। অবশ্য আমরা আমেরিকানরা বিশ্বাস করি অন্য দিকটা যেহেতু তত্ত্বগতভাবে দোষী, তাই আমরা নিষ্পাপ।

প্রচার মাধ্যমের পরিবেশিত আরেকটা দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক: ১৯৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট তেহরান থেকে ক্রস লেইনজেন কর্তৃক সেক্রেটারী ভ্যান্সকে পাঠানো তারবার্তা। বোরগুয়েতের সাথে আলোচনায় কার্টার যে মনোভাব দেখান তার সাথে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ এই তারবার্তাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের জানুয়ারীর ২৭ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমসে*। হয়তো এর উদ্দেশ্য ছিল ইরান কি জিনিষ তা বোঝার ব্যাপারে জাতিকে সহায়তা করা, অথবা হয়তো সদ্য-শেষ সঙ্কট সম্পর্কে একটা তেছ্‌রা কথা সামনে নিয়ে আসা। প্রশান্ত বিষয়মুখিতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ধধরনের ভাণ করা হয়েছে তারবার্তাটিতে। তবু, ইরানী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক বিবরণ নয় এটি। এটি মূলত একটি ভাবাদর্শিক বিবৃতি। আমার ধারণা এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য "পারস্য"কে সময়াতীত, খুবই বিরক্তিকর এক সত্তারূপে দাঁড় করানো, যাতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মার্কিন অর্ধেক অর্থাৎ মার্কিন অংশটির জাতীয় সুস্থতা ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আরো বাড়ে। এভাবে "পারসি"দের সম্পর্কে প্রতিটি ঘোষণা ক্ষতিকর প্রমাণরূপে যুক্ত হয় পারস্যের ভাবমূর্তিতে; অন্যদিকে পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে আড়াল করে রাখে আমেরিকাকে।
এই যে স্বেচ্ছা-অন্ধত্ব, তা সাজানো ভাষায় অর্জিত হয় দুইভাবে; এগুলোকে পরীক্ষা করা দরকার। প্রথমে, ইতিহাসকে নিজে নিজেই দূর করে দেয়া। "ইরানী বিপ্লবের প্রভাব" সরিয়ে রাখা হয় "পারসিয়ান আত্মার" তলে তলে "তুলনামূলকভাবে স্থির... সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্টগুলোর স্বার্থে"। ফলে আধুনিক ইরান হয়ে ওঠে কালোত্তীর্ণ পারস্য। এধরনের অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ইতালীয়রা হয় দাগোজ, ইহুদিরা ইয়াইদ, কালো মানুষেরা নিগার, ইত্যাদি। (ভদ্র কূটনৈতিকদের তুলনায় রাস্তার দাঙ্গাবাজরা কেমন উজ্জীবক!) দ্বিতীয়ত, ইরানীদের কল্পনা-নির্ভর বাস্তববোধের (প্যারানয়েডের) সাথে মিলিয়ে অঙ্কিত হয়"পারসিয়ান" জাতীয় চরিত্র। বিশ্বাসঘাতকতা

ও দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার জন্য ইরানীদের কোনো কৃতিত্ব দেন না লেইনজেন, তেমনি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তার বিচারে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝার অধিকারও ইরানীদেরকে মঞ্জুর করেন না। এর অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে কিছুই করে নাই; এর অর্থ হল যা ইচ্ছা তা-ই করার অধিকার আছে যুক্তরাষ্ট্রের; এ ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া করতে পারবে না ইরানের মানুষ। লেইনজেনের নিকট একমাত্র গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার হল পারসিয়ান আত্মা, যা মাড়িয়ে যায় সব ধরনের বাস্তবতাকে।

লেইনজেনের মতই তার বার্তাটির পাঠকরাও হয়তো একটা বিষয় উপেক্ষা করে যাবেন যে, অন্য মানুষ বা সমাজকে এভাবে একটি মূল ছাঁচে ছোটো করে আনা অনুচিত। গণ-জ্ঞানভাষ্যে কালো ও ইহুদিদেরকে এভাবে ছোটো করার ব্যাপারটি আমরা আজকাল মেনে নিই না; তেমনি ইরান কর্তৃক আমেরিকাকে মহা-শয়তান রূপে চিত্রিত করার চেষ্টাকেও হেসে উড়িয়ে দিই। খুব বেশি সরল, খুব ভাবাদর্শিক, প্রচণ্ড বর্ণবাদী! কিন্তু "পারসিয়া" নামের ঐ শত্রুর বেলায় ছোটো করার কায়দাটা কাজ করে যায়। যেমন সতর শতকে এক ইংরেজ ভদ্রলোক কর্তৃক "তুর্কীদের সম্পর্কে" লেখা বর্ণবাদী একটি গদ্য থেকে একটা পৃষ্ঠা পুনর্লিখন করেন *নিউ রিপাবলিকের* মার্টিন পেরেজ (১৯৮১, ফ্রেব্রুয়ারী ৭)এবং মন্তব্য করেন এটি মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য "ধ্রুপদ" জিনিষ। মুসলমানদের আচরণ কি রকম এ গদ্যটি আমাদের জানায়। আজকের "ইহুদিদের: আচরণ জানার জন্য সতর শতকের "ইহুদিদের" সম্পর্কে লেখা একটি গদ্য থেকে এক পৃষ্ঠা তুলে দিলে কেমন লাগতো পেরেজের? পরে আমি বিশ্লেষণ করে দেখাবো লেইনজেন বা পেরেজের লেখার মত জিনিষগুলো ইসলাম বা ইরান সম্পর্কে কিছুই শিখায় না, আবার বিপ্লবোত্তর ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান পারস্পরিক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ওখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে নির্দেশনাও দেয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের দলিলপত্র তাহলে কোন কাজে লাগে?

লেইনজেনের এক কথা : ইরানে যা-ই ঘটে থাকুক "পারসিয়ানদের" স্বাভাবিক ঝোঁক (পশ্চিমে দৃষ্টিকোণ থেকে) "যৌক্তিক আলোচনা প্রক্রিয়ার ধারণায়ই বাধা সৃষ্টি করে। আমরা যৌক্তিক হতে পারি, পারসিয়ানরা পারে না। কেন? তিনি বলেন: কারণ এরা অসম্ভব অহংবাদী; ওদের বিবেচনায় বাস্তব হল অশুভ ব্যাপার; "বাজারী মনোভাবের" কারণে দীর্ঘ মেয়াদী লাভের পরিবর্তে ত্বরিৎ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ওদের; ইসলামের সর্বশক্তিমান আল্লাহ ওদের জন্য ক্ষয়ক্ষতি বোঝার কাজ অসম্ভব করে রেখেছে; ওদের কাছে কথা ও বাস্তবতা পরস্পর সম্পর্কিত নয়। লেইনজেনের বিশ্লেষণ থেকে আহরিত পাঁচটি শিক্ষা অনুযায়ী পারস্যবাসীরা বিশ্বাসঅযোগ্য আলোচক; "অন্য পক্ষ" ব্যাপারটা সম্পর্কে ওদের ধারনাই নেই, বিশ্বাস বা দিচ্ছার ক্ষমতা নেই, নিজের কথা রাখার মত চরিত্রও নেই ওদের।

এই বিনীয় প্রস্তাবটির চমৎকার দিক হল, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পারসিয়ান ও মুসলমানদের ওপর আক্ষরিক অর্থে যতগুলো দোষ আরোপ করা হয়েছে তার সব ক'টি আমেরিকানদের জন্য প্রযোজ্য। এই বার্তায় আধা কাল্পনিক বেনামী লেখক মূলত আমেরিকাই। ইতিহাস ও বাস্তবতা পারসিয়ানদের কাছে কিছুই না বলে আমেরিকাই

ইতিহাসের বাস্তবতাকে খারিজ করে দিয়েছে। এখন তাহলে এই পার্লার খেলাটি চলুক: লেইনজেনের পারসিয়ান বৈশিষ্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইহুদি-খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক-সামাজিক তুলনা খুঁজে দেখা যাক। যেমন, অতিরিক্ত অহংবাদ? -রুশো। বাস্তবকে অশুভ মনে করা?- কাফকা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান?— আদি ও নয়া টেস্টামেন্ট। কার্যকারণ বোধের অভাব?- বেকেট। বাজারী মনোভাব?- নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ। শব্দ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব? - অস্টিন ও সিয়ার্ল। তবে এমন লোক খুব বিরল যে নার্সিসিজম সম্পর্কে ক্রিস্টোফার ল্যাচের বক্তব্য বা মৌলবাদী প্রীস্টের কথাবার্তা, বা প্ল্যাটোর *ক্র্যাটিলাস* কিংবা দুএকটি বিজ্ঞাপণের রুনুঝুনু শব্দ অথবা (সুস্থির ও মঙ্গলজনক বাস্তবতায় বিশ্বাস রাখতে পশ্চিমের অক্ষমতার প্রমাণস্বরূপ) লেভিসাসের কিছু পংক্তির সাথে মেশানো ওভিদের *মেটামরফসিস*- আলোকে পশ্চিমের ভাবমূর্তি নির্মাণের চেষ্টা করেন। লেইনজেনের মেসেজ এমনই এক ভাবমূর্তির মত। এটি অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষিতে খবু ভালো কেরিকেচার মনে হতো, আর খারাপ হলেও অত ক্ষতিকর কিছু হয়ে উঠতে পারতো না।

এটি এমনকি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেরও উপযোগী নয়। কারণ এতে লেখকের দুর্বলতা তার শত্রুদের দুর্বলতার চেয়েও বেশি প্রকট। যেমন, লেখাটি বোঝায় লেখক বিপরীত পক্ষের সংখ্যার কারণে নার্ভাস; তিনি তার নিজের হুবহু প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। ইরানী দৃষ্টিকোণ বোঝার এবং তার জন্য ইসলামী বিপ্লব উপলব্ধির ক্ষমতা কই তার, যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে অসহনীয় *পারসিয়ান* শাসন-নিপীড়নের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সে শাসন উৎখাতের জন্যই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আপোষের আলোচনার যৌক্তিকতার প্রতি বিশ্বাস ও সদিচ্ছার প্রসঙ্গে বলবো, এমনকি ১৯৫৩ সালের ঘটনা বাদ দিলেও, বিপ্লবের বিরুদ্ধে ক্যু ঘটানোর চেষ্টা সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়; ১৯৭৯ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে মার্কিন জেনারেল হাইসার আর্মি ক্যু'র পরিকল্পনাকে সরাসরি উৎসাহিত করেন। এরপর আছে যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন ব্যাংকের কীর্তিকলাপ (যেগুলো শাহ্‌র শাসনামলে তাল মিলিয়ে বিধি-বিধান পরিবর্তন করে নিতো, খানিকটা অস্বাভাববিকভাবেই)। ১৯৭৯ সালে ব্যাংকগুলো ইরানের সাথে চলমান ঋণচুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেয; এগুলো স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। তাদের অভিযোগ ছিল ইরান সময় মতো সুদ পরিশোধ করেনি। অথচ *লো মঁদ* পত্রিকার এরিখ রোলো ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরের ২৫-২৬ তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করেন, তিনি প্রমাণ দেখেছেন, সময় হওয়ার আগেই সুদ পরিশোধ করে দিয়েছে ইরান। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, "পারসিয়ান" ধর নিয়েছে তার বিপরীত সংখ্যাটি শত্রু। লেইনজেন খোলাখুলিই বলেন: তিনি শত্রু এবং নিরাপত্তাহীন।

আমরা বরং স্বীকার করে নিই নিরপক্ষেতা নয়, যাথার্থ্যের প্রশ্ন এটি। ঘটনাস্থলে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের লোকটি পরামর্শ দিচ্ছে ওয়াশিংটনকে। কিসের ওপর নির্ভর করছে সে? গুটিকয় ছাল-ওঠা প্রাচ্যতাত্ত্বিক উক্তি; আলফ্রেড লাইয়ালের প্রাচ্যতাত্ত্বিক সম্পর্কিত লেখা থেকেও এগুলো তুলে দেয়া যেত, কিংবা মিশরে স্থানীযদের সাথে

কাজ করার ব্যাপারে ক্রোমারের বিবরণ থেকে। লেইনজেনের বক্তব্য অনুযায়ী, তৎকালীন ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইব্রাহিম ইয়াজদী যদি এধারণার প্রতিবাদ করে থাকেন যে "ইরানের আচরণ যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলেছে", তাহলে কোন আমেরিকান নীতি-নির্ধারক এ বক্তব্য আগাম মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের আচরণও ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তির ওপর প্রভাব ফেলেছিল? তা হলে শাহ্‌কে এখানে জায়গা দেয়া হল কেন? "কারো কৃতকর্মের দায় মেনে নিতে" আমাদেরই বা এত অনীহা কেন, যে প্রবণতা আছে "পারসিয়ানদের"?

লেইনজেনের বার্তাটি আসলে একীভূত বোধহীন ক্ষমতার উৎপাদন; অন্য সমাজকে বোঝার কাজে তা কোনো সহায়তাই করে না। কিভাবে আমরা বিশ্বের মুখোমুখি হবো তার উদাহরণ হিসেবে আমাদের মধ্যে কোনো আত্মবিশ্বাস যোগায় না এ বার্তা। তাহলে কোন কাজে লাগে এই জিনিষ? এটি আমাদেরকে বলে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ ও প্রাচ্যতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশ মিলে এমন এক বাস্তবতা তৈরি করে যার সাথে না আছে আমাদের জগতের মিল, না ইরানের। কিন্তু এ বার্তা যদি দেখাতে না পারে কিভাবে এ ধারার ভুল প্রতিনিধিত্ব দূরে ছুঁড়ে ফেলাই ভালো, তাহলে আমেরিকানরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরো সমস্যার মুখোমুখি হবে। এবং আবার বেকার আক্রমণের শিকার হবে ওদের অপরাধহীনতা।

স্বীকার করি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর প্রচণ্ড অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে, এবং এও স্বীকার করে নিই যে, দূতাবাস দখলের ঘটনাটি ইরানের অনুৎপাদনমুখি, পশ্চাদপদ বিশৃঙ্খলার সুচক। তাহলেও, সমকালীন ইতিহাস থেকে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের এঁটো কুড়ানোর দরকার নেই। প্রকৃত সত্য হল "ইসলাম" এবং "পশ্চিম" উভয়েরই পরিবর্তন চলছে। ভঙ্গি ও পদক্ষেপে ফারাক আছে, কিন্তু উভয়ের বেলাতেই কিছু বিপদ ও অনিশ্চয়তা একইরকম। সমর্থকদের জন্য উচ্চকিত জিকিরে "ইসলাম" ও "পশ্চিম"(বা "আমেরিকা") উভয়েই অন্তর্দৃষ্টির চেয়ে বেশি করে সরবরাহ করে উত্তেজনা। নয়া বাস্তবতায় পরিপার্শ্বকে চিনতে না পারার ঘোর থেকে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় "ইসলাম" ও "পশ্চিম" তাদের বিশ্লেষণকে পরিণত করতে পারে সরল বিতর্কে, কল্পজাগতিক অভিজ্ঞতায়। মুখোমুখি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কোচক শত্রুতার চেয়ে মানবীয় অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটির প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যকে সহানুভূতির সাথে দেখার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠা উপলব্ধি ক্ষমতা, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততার মধ্য দিয়ে পাওয়া ও ছড়িয়ে দেয়া জ্ঞান— এগুলো যদিও কঠিন, তবু উৎকৃষ্ট লক্ষ্য। এবং এই প্রক্রিয়ায় যদি আমরা "মুসলিম", "পারসিয়ান", "তুর্কি", "আরব", বা "পশ্চিম" ইত্যাদি লেবেলগুলোর আক্রমণাত্মক সামগ্রিকতা ও অস্বাভাবিক বিদ্বেষ মুছে ফেলতে পারি তাহলেই ভালো।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

ই. ডব্লিউ. এস.
ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৮১
নিউইয়র্ক।

তথ্যসূত্র :

1. Edward W. Said, *Orientalism* (New York : Pantheon Books, 1978; reprint ed., New York : Vintage Books, 1979).
2. Edward W. Said, *The Question of Palestine* (New York : Times Books, 1979; reprint ed., New York : Vintage Books, 1980).
3. এ বিষয়ের জন্য দেখুন : Robert Graham, "The Middle East Muddle," *New York Review of Books*, October 23, 1980, p. 26.
4. J.B. Kelly, Arabia, *The Gulf, and the West : A Critical View of the Arabs and Their Oil Polich* (London : Weidenfeld & Nicolson, 1980). p. 504.
5. Thomas N. Franck and Edward Weisband, *World Politics : Verbal Strategy Among the Superpowers* (New York : Oxford University Press, 1971).
6. দেখুন : Paul Marijnis, "De Dubbelrol van een Islam-Kennen," *NRC Handelsbland*, December 12, 1979.
7. দেখুন : Noam Choam Chomsky and Edward S. Herman, *The Washington Connection and Third World Fascism and After the Cataclysm : Poswar Indochina and the Reconstruction of Imperial Ideology*, vol. 1 and 2 of *The Political Economy of Human Rights* (Boston : South End Press, 1979).
8. দেখুন : David F. Noble and Nancy E. Pfund, j "Business Goes Back to College," *The Nation*, September 20, 1980, pp. 246-52.

ইসলাম ও পশ্চিম

আমেরিকানদের জন্য জ্বালানীর বিকল্প উৎস খোঁজার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কের কনসলিডেটেড এডিসন (কন এড) একটি টিভি বিজ্ঞাপন প্রচার করে ১৯৮০ সালের গ্রীস্মে। বিজ্ঞাপনটি ছিল চিন্তায় ধাক্কা দেয়ার মত। ওপেকের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ যেমন ইয়ামেনী, গাদ্দাফী, এবং কমপরিচিত, আলখাল্লা গায়ে আরব ব্যক্তিত্বের টুকরো টুকরো ফিল্ম দেখানো হয় বিজ্ঞাপনটিতে। এর ফাঁকে ফাঁকে থাকে তেল ও ইসলামের সাথে জড়িত আরো কিছু আরব নেতার চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র; যেমন- খোমেনী, আরাফাত, হাফেজ আল আসাদ। চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্রগুলো এমন যে, দেখামাত্র প্রত্যেকটি লোককে চেনা যায়। কারো নাম নেয়া হয় না। অথচ আমরা বুঝে যাই এই লোকগুলোই নিয়ন্ত্রণ করছে মার্কিন তেলের উৎস। ব্যাকগ্রাউন্ডের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর উল্লেখ করে না এরা কারা, কোত্থেকে এসেছে; বরং দর্শকদেরকে এমন অনুভূতির দিকে ছেড়ে দেয় যে, এই পুরুষ শয়তানের দলই আমেরিকাকে ঠেলে দিয়েছে অনিয়ন্ত্রিত ধর্ষকামের মধ্যে। 'এইসব লোকদের' জন্য কেবল টিভির পর্দায় ভেসে ওঠাই যথেষ্ট, যেমন ওরা সংবাদপত্র ও টিভিতে উপস্থিত হয় বানিজ্যিক স্বার্থে মার্কিন দর্শকদের মনে ক্ষোভ, অসন্তোষ, ভয় ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য। ঠিক এই মিশ্রিত অনভূতিটা জাগাতে চেয়েছে কনএড। আভ্যন্তরীণ নীতি বিষয়ে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারের তৎকালীন উপদেষ্টা স্টুয়ার্ট আইজেনস্ট্যাটও এক বছর আগে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন "দৃঢ় কর্মসূচী নিয়ে প্রকৃত একটি সংকটকে কেন্দ্র করে সুনির্দিষ্ট শত্রু ওপেক-এর দিকে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলার।" এই আইজেনস্ট্যাট এখন ক্লিনটন প্রশাসনের উঁচু পদে আসীন।

কনএডের বিজ্ঞাপনটির দুটো দিক এক করে আমার এই বইয়ের বিষয় গঠিত। এর একটি হচ্ছে সাধারণভাবে পশ্চিমে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম বা ইসলামের ভাবমূর্তি। দ্বিতীয়টি হল পশ্চিমে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে "ইসলাম"-এর ব্যবহার। আমরা দেখব এই দুই দিক যে-উপায়ে পরস্পর সম্পর্কিত তা একদিকে পশ্চিম ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়, অন্যদিকে তা ইসলাম সম্পর্কেও অনেক কথা পরিষ্কার আলোয় নিয়ে আসে— অবশ্য আরো মজার ও হালকা কায়দায়।

অন্তত আঠারো শতকের শেষ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত ইসলামের প্রতি পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে চরম সরল চিন্তাধারায়, যে-চিন্তাধারাকে বলা যায় 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক'। প্রাচ্যতাত্ত্বিক ভাবনার ভিত্তি হল পৃথিবীকে কল্পনায় অসম দুই ভাগে বিভক্তকারী তীব্র দ্বিমেরুকেন্দ্রিক ভূগোল। 'ভিন্ন ধরনের' বড় অংশটার নাম 'প্রাচ্য';

'আমাদের' বলে পরিচিত অন্য অংশটিকে বলা হয় পাশ্চাত্য বা পশ্চিম। কোনো সমাজ বা সংস্কৃতি যখন তার থেকে অন্যরকম কোনো সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে তখনই এমন ভাগাভাগির বোধ সৃষ্টি হয়। মজার ব্যাপার হল প্রাচ্যকে যখন পুরোপুরি নিকৃষ্ট রূপেও কল্পনা করা হয়েছে, তখনও প্রাচ্যকে মনে করা হয়েছে পশ্চিমের তুলনায় বড় বেশি শক্তির সম্ভাবনাময় (সচরাচর ধ্বংসাত্মক শক্তি)। এ যাবত প্রাচ্যের জিনিষ বলেই ভাবা হয় ইসলামকে। তাই ইসলামকে প্রথমেই প্রাচ্যতত্ত্বের সামগ্রিক কাঠামোর সাথে জড়িয়ে বিদ্বেষ ও ভয়ের সাথে আদিম ব্যাপার হিসেবে দেখার রীতি পরিণত হয় ইসলামের নিয়তিতে। অবশ্য এর অনেক ধর্মীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণও আছে। কিন্তু এসব কারণের পেছনেও রয়েছে এই রকম বোধ যে, ইসলাম কেবল পশ্চিমের প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়, বিলম্বে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জও।

প্রায় গোটা মধ্যযুগ এবং ইউরোপে রেঁনেসাসের প্রথম দিকে মনে করা হতো ইসলাম স্বধর্মত্যাগী, ঈশ্বরনিন্দুক, অস্পষ্ট শয়তানী ধর্ম। মুসলমানরা যে মোহাম্মদকে খোদা নয়, নবী মনে করে তা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। খ্রিস্টানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মোহাম্মদ ভণ্ড নবী, মতভেদের বীজরোপক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভাণকারী, শয়তানের প্রতিনিধি। এমন নয় যে এইসব ধারণা মতবাদে পরিণত হয়েছে। বাস্তব পৃথিবীতে বাস্তব ঘটনাবলী ইসলাম থেকে সৃষ্টি করে যথেষ্ট বেগবান এক রাজনৈতিক শক্তি। ইসলামী সেনা ও নৌবাহিনী শত শত বছর ধরে ইউরোপকে হুমকির ওপর রাখে, এর সীমানা ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে ফেলে, উপনিবেশ বানায় ইউরোপের দখলাধীন এলাকায়। এ যেন প্রাচ্যে খ্রিস্ট ধর্মেরই কমবয়সী, আরো পৌরুষময় ও শক্তিশালী এক সংস্করণের উত্থান; প্রাচীন গ্রীকশিক্ষায় সমৃদ্ধ, সহজ, নির্ভিক, তেজোদীপ্ত যুদ্ধংদেহী এই ধর্ম যেন খ্রিস্টধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্ধত। পরবর্তী কালে ইসলামের পতন এবং ইউরোপের উত্থান সূচিত হলেও 'মোহামেডানিজম'-এর ভয় থেকেই যায়। অন্য যে কোনো ধর্মের তুলনায় নিকটবর্তী ইসলাম তার নৈকট্যের কারণেই ইউরোপের মনে জাগরূক রাখে ইউরোপের ওপর ইসলামের চড়াও হওয়ার স্মৃতি। এর প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা সবসময়ই বিচলিত করে ইউরোপকে। প্রাচ্যের অন্যান্য সভ্যতা, যেমন চীন ও ভারতকে পরাজিত ও দূরবর্তী বিবেচনা করা সম্ভব ছিল। তাই এরা সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তা হয়ে ওঠেনি। কেবল ইসলামকেই মনে হয় যেন কখনই পশ্চিমের কাছে পুরোপুরি নুয়ে পড়ছে না। ১৯৭০ সালের শুরুতে তেলের দাম দপ করে ওঠে যাওয়ার পর মনে হয় ইসলাম তার আগের বিজয়-গর্বিত দিনে প্রত্যাবর্তনের কাছাকাছি দাড়িয়ে। যেন কেঁপে ওঠে গোটা পশ্চিম। এ আঘাত আরো গভীর ও তীব্র হয় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে "ইসলামী সন্ত্রাসী তৎপরতা"র কারণে।

সেই সময় মঞ্চের কেন্দ্র জুড়ে ভেসে ওঠে ইরান। দিন দিন তীব্র উদ্বেগ ও আবেগে আক্রান্ত হতে বাধ্য করে যুক্তরাষ্ট্রকে। অত দূরবর্তী ও ভিন্ন স্বভাবের খুব কম জাতিই যুক্তরাষ্ট্রকে অতটা ব্যস্তসমস্ত রাখতে পেরেছে, যা করেছে ইরান। চোখের সামনে একটার পর একটা নাটকীয় ঘটনা থামানোর প্রচেষ্টায় আর কখনো অত শক্তিহীন, অত অসাড় মনে হয়নি যুক্তরাষ্ট্রকে। এতসবের মধ্যেও আমেরিকানরা ইরানকে কখনো ভাবনা

থেকে বের করতে পারেনি। জ্বালানী সংকটের সময় ইরান ছিল সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী। সামগ্রিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এমন এক অঞ্চলে দেশটির অবস্থান। বিপ্লবের বছর আমেরিকা তার এই সাম্রাজ্যবাদী দোসরকে হারায়, বিশ্বরাজনীতির হিসেব-নিকেশে এর সেনাবাহিনী, এর অবস্থানগত মূল্য সবই হাতছাড়া হয়ে যায়। আর সে বিপ্লব বিস্তারে ও বেগে ছাড়িয়ে যায় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব পরবর্তী সকল গণঅভ্যুত্থানকে। তখন নতুন এক রকম বিন্যাস জন্ম নেয়ার কসরতে ব্যস্ত, যা নিজেই নিজেকে 'ইসলামী' বলে ঘোষণা দেয়, জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মতবাদ হিসেবে। প্রচার মাধ্যম জুড়ে চলে আসে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ভাবমূর্তি ও উপস্থিতি। কিন্তু তাকে ঠিকমতো উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয় প্রচার মাধ্যম। তাকে দেখানো হয় কেবল দুর্দম, ক্ষমতাশালী এক মানুষ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যার প্রবল ক্রোধ। সবশেষে, ১৯৭৯ সালের ২২শে অক্টোবর ইরানের প্রাক্তন শাহ আমেরিকায় পালানোর পর প্রতিক্রিয়া হিসেবে একদল ছাত্র দখল করে নেয় তেহরানের মার্কিন দূতাবাস। অবরুদ্ধ আমেরিকানরা ছাড়া পায় বহু মাস পর।

ইরানে যা ঘটে তার প্রতিক্রিয়া শূন্যে শেষ হয়ে যায় না। গণ-মানসের মগ্ন চৈতন্যে ছিল আরব ও প্রাচ্যের প্রতি বিশেষ এক মনোভাব, যাকে আমি বলেছি প্রাচ্যতত্ত্ব। সাম্প্রতিক কাজকর্ম, যেমন ভি.এস. নাইপলের *বেন্ড ইন দি রিভার'* , জন আপডাইকের *দ্য ক্যু*-এর কথাই ধরা যাক, কিংবা স্কুলের টেক্সট বই, কমিক, টিভি সিরিয়াল ইত্যাদির কথা বিবেচনা করা যাক। দেখা যাবে ইসলামের বিশেষ এক মূর্তি সাদৃশ্যপূর্ণভাবে আঁকা, সবখানে ছড়ানো। আর এগুলোর মালামাল সংগৃহীত হয়েছে একই কালপর্বে, ইসলামের প্রতি লালিত মনোভাব থেকে: অর্থাৎ তেল-সরবরাহকারীর মুসলমানের বহু-প্রচারিত ক্যারিকেচার, সন্ত্রাসী চেহারা এবং সম্প্রতি নির্মিত রক্তপিপাসু খুনির ভাবমূর্তি থেকে। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিতে—বিশেষ করে অ-পশ্চিমাদের বিষয়ে জ্ঞানভাষ্যে—সহানুভূতির সাথে ইসলামের ভাবমূর্তি নির্মান তো দূরের কথা, কিছু বলার বা চিন্তার সুযোগও নেই। যদি জিজ্ঞাস করা হয় একজন ইসলামী লেখকের নাম বলেন, বহু লোক একবাক্যে বলবে খলিল জিবরান (যদিও তিনি ইসলামী লেখক নন)। ইসলাম বিষয়ক বিদ্যায়তনিক বিশেষজ্ঞরা এ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিবেচনা করে নির্ধারিত মতবাদগত পরিকাঠামোর মধ্যে। সেই পরিকাঠামোটি আবেগ, আত্মরক্ষামূলক ডাঁটফাট, কখনো কখনো উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে ঢেলে দেয়ার ঘটনায় পরিপূর্ণ; চিন্তার এই পরিকাঠামোর কারণে ইসলামকে বোঝার কাজটি এক দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৯ সালের বসন্তে ইরানী বিপ্লবের সময় প্রচারিত সিরিয়াস প্রতিবেদনগুলোয় দেখা যায় ইরানের বিপ্লবকে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় (যা কেবল এক নির্দিষ্ট অর্থে সত্য) কিংবা আলোর ওপর অন্ধকারের বিজয় ছাড়া আর কিছু মনে করার বিন্দুমাত্র প্রবণতা নেই।

১৯৯০-এর দশকেও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনা জুড়ে থেকে যায় ইরান। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই দেশটি এবং এর সাথে "ইসলাম" পরিণত হয় আমেরিকার এক নম্বর ভিনদেশী শয়তানে। কারণ তা দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর মত সংগঠনকে মদদ দেয়। ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননের এক অংশ দখল করে নেয়ার পর অবৈধ ইসরাইলী

দখলদারিত্ব উচ্ছেদের জন্য হিজবুল্লাহর জন্ম। ইরানকে মনে করা হয় মৌলবাদ সরবরাহকারী। সবচেয়ে বড় কথা মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যে ইরানের অনমনীয় বিরোধিতায় একরকম ভয় দেখা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের মনে। ১৯৯১ সালের জানুয়ারীর ২৬ তারিখে প্রকাশিত একটি কলামে *লস এঞ্জেলেস টাইমসের* প্রধান ইসলাম বিশেষজ্ঞ রবিন রাইট লেখেন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পশ্চিমের কর্মকর্তা এখনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুৎসই কৌশল নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। বুশ প্রশাসনের কোনো এক প্রধানতম কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন যে, ওরা স্বীকার করেন "তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে কমিউনিজমকে মোকাবিলার তুলনায় ইসলামকে মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরো চতুর হতে হবে তাদেরকে।" সহজভাবে অসংখ্য দেশকে একত্রিত করে ফেলার বিপদের কথাটাও তিনি বলেন। তবে পাঁচ কলামের লেখায় থাকে কেবল আয়াতুল্লাহ খোমেনির ছবি। ইসলামের যা কিছু আপত্তিকর তার সবই যেন মূর্ত হয়ে উঠে খোমেনি ও ইরানের মধ্যে : সন্ত্রাস ও পশ্চিম-বিরোধিতা, কিংবা "এমন একমাত্র একেশ্বরবাদী জাতি" হয়ে ওঠা "যা সমাজ পরিচালনার জন্য প্রস্তাব করে একরাশ রীতিনীতি এবং তুলে ধরে একগুচ্ছ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস"। রীতিনীতিগুলো আসলে কি এবং "ইসলামই" বা কি তা নিয়ে তখন খোদ ইরানে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে, প্রশ্ন উঠছে খোমেনির অবস্থান নিয়েও। তার কিছুই উল্লেখ করা হয় না রবিনের কলামে। যেন বিশ্বব্যাপী যে-বিষয়টি নিয়ে "আমাদের" দুশ্চিন্তা সেটাকে কেবল "ইসলাম" শব্দটি দিয়ে নির্দেশ করাই যথেষ্ট। পরিস্থিতি উস্কে দেয়ার জন্য নতুন আইন পাশ করে ক্লিনটন প্রশাসন: যে-সব দেশ ইরানের সাথে (তেমনি, লিবিয়া ও কিউবার সাথে) ব্যবসা করবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

ইসলামের প্রতি এই সাধারণ শত্রুতা আরো পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বেশ মজার ভূমিকা রেখেছেন ভি. এস. নাইপল। *নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালকে* দেয়া এক সাক্ষাৎকারে (আগষ্ট ১৮, ১৯৮০) তিনি জানান ইসলাম সম্পর্কে একটি বই লিখছেন তিনি। তারপর নিজ থেকেই মন্তব্য করেন, "মুসলিম মৌলবাদে বুদ্ধিবৃত্তিক সারবত্তা কিছু নাই, তাই এটি নিশ্চিত ব্যর্থ হবে।" নেইপল উল্লেখ করেননি কোন মুসলিম মৌলবাদের কথা বলেছেন তিনি, আর কেমন বুদ্ধিবৃত্তিক সারবত্তার প্রসঙ্গ ছিল তার মনে। নিঃসন্দেহে ইরানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে তাও অস্পষ্ট ধারণা। তেমনি ইরানের মত তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজবাদ-বিরোধী আন্দোলনের কথাও বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ছিল নাইপলের মনে। তার প্রকাশ দেখি *"এ্যামঙ দি বিলিভার্স: এন ইসলামিক জার্নি*-তে। নাইপলের সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে *গেরিলা* ও *দি বেন্ড ইন দি রিভার*-এ ইসলাম জিজ্ঞাসার সম্মুখীন, যা তৃতীয় বিশ্বের বিরুদ্ধে তার (সেইসঙ্গে উদার পশ্চিমা পাঠকদের জনপ্রিয়) অভিযোগেরই অংশ। তৃতীয় বিশ্বকে তিনি বিবেচনা করেন কয়েকজন অদ্ভুত শাসকের কলঙ্ক, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পতন, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা হিসেবে স্থানীয় সমাজগুলোর উত্তর-উপনিবেশী পুনর্গঠন প্রয়াস—এ তিনের সমন্বয়ে। তার মতে এক্ষেত্রে ইসলাম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে; তা হতে পারে ইসলামের প্রতি সহনাভূতিশীল ওয়েস্ট ইন্ডিজ গেরিলাদের ইসলামী নাম গ্রহণে বা

আফ্রিকায় দাস ব্যবসার পুরোনো সাক্ষ্যে। মোটকথা, নাইপল ও তার পাঠকের জন্য "ইসলাম" ধারণাটি এমন ভাবে বানানো যে, তা নির্দেশ করে সেইসব তাবৎ বিষয় যা সভ্য ও পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ-অযোগ্য। যেন ধর্মীয় আবেগের মধ্যে বৈষম্য, ন্যায়সঙ্গত কারণে সংগ্রাম, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নারী-পুরুষ-সমাজের ইতিহাস— যাকে ভাবা হয় ইরানে ও অন্যত্র চলমান 'ইসলামের' কারণে নারী-পুরুষ-সমাজের না-হয়ে ওঠার ইতিহাসরূপে—এ সকল কিছুকে মোকাবেলা করছেন উপন্যাসিক, রিপোর্টার, নীতি-নির্ধারক ও বিশেষজ্ঞরা। "ইসলাম" শব্দটি যেন বৈচিত্রপূর্ণ মুসলিম বিশ্বের সকল বৈশিষ্টের ধারক, যেন তা সবছুকে সংকুচিত করে পরিণত করে অশুভ, অচিন্তনীয় এক সত্তায়। এরই পরিণতি হল বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির পরিবর্তে সবখানে "আমরা-ওরা" পরিকাঠামো সৃষ্টি। যখন ইরানী মুসলমানরা তাদে ন্যায়বিচারবোধের কথা বলে, তাদের দমণের ইতিহাসের কথা বলে, নিজেদের সমাজের ভবিষ্যত কল্পনা করে, তখন এগুলোকে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল এই মুহূর্তে ইসলামী বিপ্লব ঠিক কি করছে, খোমাইটদের হাতে কত লোক মারা গেছে, আয়াতুল্লাহ কতগুলো উদ্ভট দৌরাত্মপুর্ণ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের নামে, ইত্যাদি। কিন্তু কেউ কখনো জোনসটাউনের গণহত্যা বা ওকলোহামা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা অথবা ইন্দোচীনের ধ্বংসযজ্ঞের সাথে খ্রিস্টান ধর্মকে কিংবা পশ্চিমা বা মার্কিন সংস্কৃতিকে এক করে দেখে না। ঐ রকম মিল-দেখানোর রীতি তুলে রাখা আছে কেবল "ইসলাম"-এর জন্য।

কেন বিশাল একরাশ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এমনকি অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে এমন প্যাভলোভিয়ান কায়দায় "ইসলাম" শব্দটিতে সঙ্কুচিত করে আনা হয়? এই "ইসলাম"-এর ব্যাপারটাই বা কি যা দ্রুত ও লাগামহীন প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়? পশ্চিমের কাছে ইসলামী জগত কোন দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ থেকে ভিন্ন, কিংবা স্নায়ুযুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অন্যরকম? জটিল প্রশ্ন এগুলো। কাজেই জবাব দেয়া উচিত প্রশ্নগুলোকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে, যথাযথ বৈশিষ্ট ও পার্থক্য বিবেচনায় রেখে। খুবই ব্যাপ্ত জটিল বাস্তবতাগুলোকে আখ্যায়িত করার জন্য নাম উদ্ভাবনের ব্যাপার আসলে জঘণ্যরকম অস্পষ্ট একটি বিষয়, তা আবার এড়ানোও যায় না। যদি "ইসলাম" লেবেলটি বেঠিক হয়ে থাকে এবং মতাদর্শের ভারে বোঝাই হয়ে থাকে, তাহলে এও সত্য যে "পশ্চিম" এবং "খ্রিস্টানত্ব" কথাগুলোও বিতর্কিত। অথচ এ জাতীয় লেবেল এড়ানো কঠিন। কারণ মুসলমানরা ইসলামের কথা বলে—খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানত্বের, ইহুদিরা ইহুদিবাদের এবং অন্য সবাই সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলোর কথা বলে থাকে; বলে এমনভাবে যেন এগুলো খুবই গ্রহণযোগ্য সোজাসাপ্টা সত্য। এই লেবেলগুলো ছাড়িয়ে যাওয়ার উপায় না বাৎলে বরং আপাতত স্বীকার করে নেয়া ভালো যে, এগুলো আছে এবং উদ্দেশ্যমুলক শ্রেণিবিভাজনরূপে নয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এ অধ্যায়ের শেষে আমি দেখাবো এগুলো আসলে তাফসীর মাত্র। যাদের প্রয়োজনে এবং যাদের দ্বারা এগুলো বানানো আমি তাদের নাম দিয়েছি তাফসীরকারী দল। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে "ইসলাম", "পশ্চিম", "খ্রিস্টান বিশ্ব" ইত্যাদি ধারণা যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই এগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে

অন্তত দুভাবে এবং সৃষ্টি করে দুই রকম অর্থ। প্রথমটি হল চিহ্নিত করার কাজ; যেমন আমরা যখন বলি খোমেনী একজন মুসলমান বা পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন খ্রিস্টান। এ ধরনের বিবৃতি আমাদেরকে বলে কোনো একটি জিনিষ বা বিষয় বা মানুষ নুন্যতম কী; তা জানায় অন্যসব কিছুর বৈপরীত্যের ভিত্তিতে। এ স্তরে আমরা কমলা বা আপেলের (বা মুসলিম ও খ্রিস্টানের) পার্থক্য এইটুকু বুঝতে পারি যে, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফল, একেকটা একেক গাছে জন্মায়।

বহুস্তরের দ্বিতীয়টির কাজ সৃষ্টি করে অনেক জটিল অর্থ। পশ্চিমে "ইসলাম" কথাটি উচ্চারণ করার অর্থ হল অনেক অপ্রিয় ব্যাপার বোঝানো যেগুলো এতক্ষণ ধরে উল্লেখ করেছি। আবার "ইসলাম" এমন কিছুই বোঝায় না শ্রোতা চাইলে যা বিষয়মুখিভাবে সরাসরি জানতে পারবেন। একই কথা খাটে যখন আমরা "পশ্চিম"। যারা ক্ষোভ বা নিশ্চয়তা নিয়ে নামগুলো ব্যবহার করে তাদের কয়জন পাশ্চাত্য ঐতিহ্য বা ইসলামী নীতিমালা অথবা ইসলামী বিশ্বের আসল ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে? এ সত্ত্বেও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে "ইসলাম" বা "পশ্চিম" ধারণাগুলোর ব্যবহার বন্ধ হয় না। এই বিশ্বাসেও চিড় ধরে না যে, বিষয়টি সম্পর্কে তারা যা জানে তা-ই পরম সত্য।

এ কারণে এইসব লেবেলকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যে মুসলমান পশ্চিম সম্পর্কে বলেন কিংবা যে খ্রিস্টান কথা বলেন কথা বলেন "ইসলাম" সম্পর্কে, তার জন্য আছে এই বহু-বিস্তৃত সাধারণীকরণের পেছনের এক দীর্ঘ ইতিহাস; তা তাদেরকে যেমন সক্ষম করে, তেমনি অক্ষমও বানায়। এগুলো মতবাদভিত্তিক মার্কা, তীব্র আবেগের মধ্যে গড় ওঠা। এগুলো পার করে এসেছে অনেক অভিজ্ঞতা; এগুলো নতুন তথ্য ও বাস্তবতার সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম। এই মুহূর্তে "ইসলাম" ও পশ্চিম নতুন জরুরী গুরুত্বের সাথে জড়ানো। এবং সাতে সাথে এও লক্ষ্যনীয় যে, খ্রিস্টান বিশ্ব নয়, বরাবর পশ্চিমই ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয়। নে? কারণ ওরা অনুমানে ধরে নিয়েছে যে, পশ্চিম তার প্রধানত ধর্ম খ্রিস্টানত্বের স্তর ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত ও বড় হয়ে গেছে; কিন্তু ইসলামী বিশ্ব এখনো তার ধর্মীয় আদিমতা ও পশ্চাদপদতার পাঁকে আটকা। অথচ ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে এমন অনুমানের ক্ষেত্রে এই জগতটির বিচিত্রধর্মী সমাজ, ইতিহাস ও ভাষার প্রসঙ্গটি তাদের বিবেচনায় আসেনি। সুতরাং পশ্চিম আধুনিক, এর বিভিন্ন অংশের যোগফলের চেয়েও বড়, সমৃদ্ধিকারক বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ; এ সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে তা বরাবরই "পশ্চিমা"।

অন্যদিকে, ইসলামের জগত কেবলই "ইসলাম"—কিছু অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্টে সংকুচিত করার যোগ্য, আর কিছুই নয়। অথচ পশ্চিমের মত ইসলামেও রয়েছে প্রচুর আভ্যন্তরীণ সংঘাত, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র।

আমি কি বোঝাতে চাই তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৮০ তারিখের *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর, "নিউজ অব দি উইক ইন রিভিউ" সেকশনে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে। লেখাটি *টাইমস*-এর সুযোগ্য বৈরুত-প্রতিনিধি জন কিফনারের লেখা, মুসলিম বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ সম্পর্কে। শিরোনামে ["মার্কস এন্ড মস্ক আর লেস কম্প্যাটিবল দ্যান ইভার": (*মার্কস ও মসজিদ এসময়ই সবচেয়ে কম খাপ-*

খাওয়াতে পারছে)। কিফনারের মনোভাবের প্রকাশ আছে। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় হল বিমূর্ত একটি বিষয়ের সাথে বিশাল এক জটিল বাস্তবতার সরাসরি, গাছে-আর-মাছে জাতীয় সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ইসলাম-কথাটির ব্যবহার। অন্য জায়গায় এটি গ্রহণঅযোগ্য ব্যাপার বলে গণ্য হতো। ধরা যাক, আর সব ধর্মের বিপরীতে ইসলাম একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী বিশ্বাস এবং চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনে কোনো পার্থক্য করে না। তা সত্যি হলেও, নিচের মন্তব্যের মধ্যে নজিরহীন ও সুচিন্তিত অজ্ঞতা ও অজ্ঞতাসৃজক একটা ব্যাপার থেকে যায়, যদিও তা যথেষ্ট প্রচলিত ধাঁচের:

> মস্কোর প্রভাব কমে আসার নিশ্চিত সরল কারণ হল: মার্কস ও মসজিদ খাপ-খায় না। (কিফনারের কথা অনুযায়ী আমরা কি তাহলে ধরে নেব মার্কস ও চার্চ বা মার্কস ও মন্দির বেশি খাপ-খায়?)

সংস্কারের যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের যুগ পর্যন্ত পশ্চিমা মন এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যাতে ধর্মের ভূমিকা কেবল হ্রাস পেয়েছে (এখানে 'পশ্চিমা মন' কথাটাই আসল)। এই মনের পক্ষে বোঝা কঠিন ইসলাম কি ধরনের ক্ষমতা সক্রিয় করে তুলতে পারে (এখানেও ধরা নেয়া হয়েছে ইতিহাস বা বুদ্ধিবৃত্তির কোনোটার দ্বারাই কোনো বিকাশ হয়নি ইসলামের)। এ সত্ত্বেও বহু শতাব্দী ধরে ইসলাম এ অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের কেন্দ্রীয় শক্তি, আর অন্তত এই মুহূর্ত পর্যন্ত, এর ক্ষমতা হঠাৎ করে তুঙ্গে ওঠে যাচ্ছে।

> ইসলামে মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ফারাক নাই। এটি বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি, যাতে আছে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নির্ধারিত বিধি-বিধান এবং অবিশ্বাসীদেরকে হয় ধর্মান্তরিত করা অথবা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মেসিয়ানিক তাড়না। গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ, বিশেষত আলেম ও মোল্লাদের নিকট, তেমনি সাধারণ জনতার কাছেও (অন্য কথায়, কেউই বাদ থাকছে না) মার্কসবাদ কেবল অন্য জগতের ব্যাপারই নয়, বিরুদ্ধবাদী মতবাদও।

কিফনার এখানে ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন এবং মার্কসবাদ ও ইসলামের মধ্যে একগুচ্ছ সীমিত সমান্তরাল তুল্য অবস্থার জটিলতা অস্বীকার করে গেছেন (এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ম্যাক্সিম রডিনসন তার একটি বইয়ে, যাতে তিনি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন বিগত বছরগুলোয় মার্কসবাদ কেন ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে খানিকটা প্রবেশ করতে পেরেছিল বলে মনে হয়)। অধিকন্তু, কিফনারের যুক্তিবিন্যাস সেই 'ইসলাম' ও পশ্চিম-এর- প্রচ্ছন্ন তুলনার ওপর নির্ভরশীল; আদিম, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ইসলামের তুলনায় এ পশ্চিম বৈচিত্রময়; একে কোনো নির্দিষ্ট প্রকৃতির ছাঁচে চিহ্নিত করা যায় না। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কিফনার যা বলতে চান তা-ই বলে যেতে পারেন; কোনো ভুল করার বা নিজের বক্তব্য অদ্ভুত কিছু মনে হওয়ার বিপদের ভয়ও যেন তার নেই। মুল সমস্যা হল, কিফনারের মত ভাষ্যকাররা দুইবার চিন্তা না করেই বিমূর্ত রূপের ইসলাম থেকে এক লাফে চলে যান অত্যন্ত জটিল এক বাস্তবে।

ইসলাম বনাম পশ্চিম: বিস্ময়কর উর্বর একরাশ পার্থক্যের মুল সুর। তা নিজের মধ্যে টেনে নেয়, আমেরিকা বনাম ইসলামের মতই, ইউরোপ বনাম ইসলাম-এর তত্ত্ব। তবে

সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের নিরিখে কিছু নিরেট অভিজ্ঞতাও তলে তলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ ইসলাম বিষয়ে ইউরোপীয় ও মার্কিন মনোভাবের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য যথাযথভাবে নির্দেশ করা জরুরী। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এই কিছুদিন আগেও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ছিল বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য। ইসলামী বিশ্বের সাথে সরাসরি সংযোগজনিত অভিজ্ঞতা রয়েছে এই দুটো দেশের। তেমনি স্বল্পমাত্রার একইরকম অভিজ্ঞতা আছে মুসলিম উপনিবেশের অধিকারী ইতালী ও হল্যান্ডেরও। তা ছাড়া, মেট্রোপলিটান ফ্রান্স ও বৃটেনে এখন বসবাস করছে আফ্রিকা ও এশিয়ার মিলিয়ন মুসলমান। এ পরিস্থিতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যায়তনিক বিষয় প্রাচ্যতত্ত্ব-এ। উপনিবেশক দেশগুলোয় তো ছিলই, এ ছাড়া অন্য যে-সব দেশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতো বা মুসলিম দেশের নিকটবর্তী ছিল, কিংবা একসময় ছিল মুসলিম এলাকা সেগুলোতেও প্রাচ্যতত্ত্বের চর্চা ছিল (যেমন জার্মানী, স্পেন, প্রাক-বিপ্লবকালীন রাশিয়া)। এখন রাশিয়া ও তার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ কোটি। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান ছিল রাশিয়ার সামরিক দখলাধীন। এই সব বিষয়ের কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় ঘটেনি; যদিও এখানে এখন ক্রমশ বর্ধিষ্ণু সংখ্যক প্রচুর মুসলমানের বসবাস। এবং পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় সম্প্রতি অনেক বেশি আমেরিকান ইসলাম সম্পর্কে লিখছে, ভাবছে অথবা আলোচনা করছে। উপনিবেশী অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এবং ইসলামের প্রতি দীর্ঘকালীন সাংস্কৃতিক মনোনিবেশের অভাবে আমেরিকার বর্তমান আবেগাচ্ছনতা হয়ে উঠেছে আরো উদ্ভট, আরো বিমূর্ত ও পরোক্ষ। তুলনামুলকভাবে বলা যায়, প্রকৃত মুসলমানদের সাথে উঠা-বসার মতো ব্যাপার ছিল খুব কম আমেরিকানেরই। সে তুলনায়, ফ্রান্সে ধর্মের হিসেবে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী; অবশ্য এরফলে ইসলাম ওখানে কোনো জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়নি, তবে বেশ জানাশোনা একটা ব্যাপারে দাড়িয়েছে অন্তত। ইসলামে ইউরোপীয় আগ্রহের আকস্মিক ধাক্কা তথাকথিত "অরিয়েন্টাল রেঁনেসাঁর" অংশ। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুর সেই যুগে "প্রাচ্য" অর্থাৎ ভারত, চীন, জাপান, মিশর, পবিত্র ভূমি মেসোপটেমিয়াকে নতুন করে আবিষ্কার করে ফরাসি ও বৃটিশ পণ্ডিতরা। ভালো বা মন্দ যে কারণেই হোক, ইসলামকে দেখা হয় প্রাচ্যের সাথে মিলিয়ে। একে মনে করা হয় প্রাচ্যের রহস্যময়তা, চমক, দুর্নীতি ও সুপ্ত ক্ষমতার ঐতিহ্যে পুষ্ট। এ কথা সত্য যে, এর আগে কয়েক শতক ধওে ইসলাম ছিল ইউরোপের প্রতি সরাসরি সামরিক হুমকি। তেমনি গোটা মধ্যযুগ ধরে এবং রেঁনেসার প্রথম দিকে এটি ছিল খ্রিস্টীয় চিন্তাবিদদের নিকট এক সমস্যার মতো। সে কালে তারা মনে করতেন ইসলাম ও মোহাম্মদ হল সবচেয়ে জঘন্য একরকম ধর্মত্যাগী। তা সত্ত্বেও ইউরোপীয়দের নিকট ইসলামকে মনে হয়েছে বহুযুগের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ; তবে তা ইসলামী এলাকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাড়ায় না। এবং যত শত্রুতাই থাকুক, ইসলাম ও ইউরোপের পরস্পরের মধ্যে সরাসরি অভিজ্ঞতাও ছিল। গোয়েতে, গেরার্ড ডি নেরভাল, রিচার্ড বার্টন, ফ্লবেয়ার ও লুই ম্যাসিগননের মত পণ্ডিত, কবি, উপন্যাসিকদের বেলায় ছিল কল্পনা ও পরিশোধন।

এরা এবং এদের মত আরো অনেক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও ইসলামকে কখনো

ইউরোপে স্বাগত জানানো হয়নি। হেগেল থেকে স্পেঙলার পর্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিক কোনো আগ্রহ বোধ করেননি ইসলামের ব্যাপারে। বিশ্বাসের একটি পদ্ধতিরূপী ইসলামের ওপর এই বিরামহীন, চোখে পড়ার মতো ক্ষতিকর চাপের কথা আলোচনা করেছেন আলবার্ট হোরাইনি তার সহজবোধ্য চমৎকার প্রবন্ধ "ইসলাম এবং দর্শনের ইতিহাস"-এ। দু'একজন বিচ্ছিন্ন সুফী লেখক ও সাধক ব্যক্তিত্বের প্রতি কদাচ আগ্রহের কথা বাদ দিলে বলা যায়, "প্রাচ্যের জ্ঞান" নিয়ে ইউরোপীয়দের হালফিল রীতির চর্চা কখনো ইসলামী জ্ঞানতাপস বা কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেনি। মোটামুটি হিসেবে শিক্ষিত আধুনিক ইউরোপীয়দের কাছে ইসলামী ব্যক্তিত্বের তালিকায় সবমিলিয়ে আছে ওমর খৈয়াম, হারুন-আল-রশিদ, সিনবাদ, আলাদীন, হাজী বাবা, শেহেরজাদ, সালাদীন এই কয়েকটা নাম। কার্লাইলও মোহাম্মদকে সবখানে গ্রহণযোগ্য করতে পারেননি। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের পটভূমিতে দীর্ঘকাল ধরে গ্রহণ-অযোগ্য ছিল মোহাম্মদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাস, যদিও ঠিক এ কারণে সে বিশ্বাসের প্রতি আগ্রহ থেমে থাকেনি। উনিশ শতকের শেষ দিকে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলামী জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সবখানে এমন একটি সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে যে, মুসলিম উপনিবেশগুলোকে ইউরোপীয় অভিভাবকত্বে রাখতে হবে: কারণ এগুলো অনুন্নত আবার লাভজনক, তেমনি এদের দরকার পশ্চিমের জ্ঞান। এ অবস্থা এবং মুসলিম বিশ্বে প্রায়শই বর্ণবাদ আরোপ ও আগ্রাসন চালানো সত্ত্বেও ইসলাম ইউরোপের কাছে কী বোঝায় তার একটা প্রাণচঞ্চল প্রকাশ আমরা ইউরোপের মধ্যে পাই। এখান থেকে ইউরোপ কর্তৃক ইসলামের প্রতিনিধিত্বকরণ শুরু—পাণ্ডিত্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও গণপর্যায়ের জ্ঞানভাষ্যে—ইউরোপীয় সংস্কৃতি জুড়ে, আঠারো শতকের শেষ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত।

এ ছাড়া, মুসলিম ও আরব বিশ্বের সাথে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনার নীতি গ্রহণ করেছিল অনেক ইউরোপীয় সরকার। তার ফলাফল অনেক সেমিনার, সম্মেলন, বিভিন্ন বইয়ের ভাষান্তর। এরকম কিছুই হয়নি যুক্তরাষ্ট্রে। ওখানে ইসলাম মূলত পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কাউন্সিলে নীতি-নির্ধারণী জিজ্ঞাসা, একটা "হুমকি" বা সামরিক ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ; যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত অসংখ্য জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যার জুরি মেলা ভার।

কাজেই ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার নিরেট বৈশিষ্ট্যের কোনোকিছুই মার্কিন ইসলামী অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। ইসলামের সাথে উনিশ শতকের আমেরিকার সংযোগ ছিল খুবই সীমিত। এখানে হয়তো মনে পড়তে পারে মার্ক টুয়েন ও হারমেন মেলভিলের মত ভ্রমণকারী, এদিক-সেদিক মিশনারীদের তৎপরতা এবং উত্তর আফ্রিকায় সীমিত মাত্রার যুদ্ধাভিযানের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামের বিশেষ কোনো জায়গা ছিল না আমেরিকায়। বিদ্যায়তনিক পণ্ডিতরা গবেষণা করেছেন এক কোনার আধ্যাত্মিক অঙ্গনে। প্রাচ্যতত্ত্বের বর্ণবহুল জগত বা বিখ্যাত জার্নালগুলোর পাতায় তাদের লেখালেখি ছিল না। প্রায় এক শতাব্দী ধরে খুবই চিত্তাকর্ষক মিথোজীবীতার সম্পর্ক ছিল মুসলিম দেশগুলোয় বসবাসকারী মার্কিন মিশনারী পরিবার, পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ আর তেল কোম্পানীগুলো মধ্যে। মাঝে মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তর ও তেল কোম্পানীর "আরববিদদের"

সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের আকারে তা প্রকাশ পেতো। প্রচণ্ড বিষময় ও এন্টি-সেমিটিক প্রবণতার ইসলাম চর্চায় মদদদাতা মনে করা হতো এইসব "আরববিদদেরকে"। অন্যদিকে, বিশ বছর আগ পর্যন্ত আমেরিকায় বিদ্যায়তনিক ইসলাম বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ প্রতিষ্ঠাতা সব বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিদেশী: যেমন প্রিন্সটনে লেবানিজ ফিলিপ হিট্টী, শিকাগো ও ইউসিএল-এ অষ্ট্রিয়ার গুস্তাভ ভন গ্রোনেভম, হার্ভার্ডে বৃটিশ এইচ. এ. আর. গিব, কলাম্বিয়ায় জার্মান জোসেফ সোচেট। কিন্তু বৃটেনের আলবার্ট হোরানি অথবা ফ্রান্সের জ্যাক বার্কের মত সাংস্কৃতিক মর্যাদা ছিল না এদের কারোরই।

আমেরিকান দৃশ্য থেকে মুছে গেছেন হিট্টী, গিব, ভন গ্রেনেভম ও সোচেটের মত ব্যক্তিত্বও। কিন্তু, ১৯৯৩ সালে বার্ক ও হোরাইনির মৃত্যুর পর, নিসন্দেহে তাদের উত্তরাধিকার জন্মাবে ফ্রান্সে ও বৃটেনে। তাদের সাংস্কৃতিক ঔদার্য ও পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি আর কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। এখন পশ্চিমের ইসলাম বিশেষজ্ঞরা দশ শতকের বাগদাদ বা উনিশ শতকের মরোক্কো শহুরে সমাজের বিধি-বিধান সম্পর্কিত মতবাদগুলো জানতে আগ্রহী; কিন্তু কখনো (প্রায় কখনোই) গোটা ইসলাম সম্পর্কে—তার সাহিত্য, আইন-কানুন, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয় না। এই না-জানা সত্ত্বেও প্রায়ই "ইসলামী মনোভাব" বা "শহীদ হওয়ার জন্য শিয়াদের আবেগ" বিষয়ে সাধারণীকরণে তারা থেমে থাকেনি। এইসব ঘোষণার প্রচার মূলত প্রচারমাধ্যম ও জনপ্রিয় জার্নালেই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এর ফলেই এগুলো স্থান করে নেয় সামনের দিকে। এখানে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করার মতো ব্যাপার হল, বিশেষজ্ঞ/ অবিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইসলাম সম্পর্কে গনপর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় কেবল বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক সংকটকালেই। *নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস্* বা *হারপার*-এ ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যহুল প্রবন্ধের প্রকাশ রীতিমত দুর্লভ ঘটনা। কেবল সৌদী আরবে বোমা ফাটলে বা ইরানে আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের হুমকি দেখা দিলে ইসলাম সার্বিক মন্তব্যের যোগ্যতা অর্জন করে বলে মনে হয়। তারপর, বিশেষত ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ও একটি সিনেমা "ইসলামের জগত" সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে সাধারণ আমেরিকানদেরকে; জ্ঞান দেয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে বিভিন্ন জরীপ, সারণী, মানুষদের সম্পর্কে একক গল্প (যেমন পাকিস্তানী পানি-বিক্রেতা, মিশরীয় কৃষক পরিবার ইত্যাদি)। অথচ জঙ্গীবাদের সপক্ষে রয়েছে হুমকিদায়ক আপাত-আকর্ষণীয় পটভূমি; তার বিপরীতে ঐ সব যৎসামান্য লেখালেখি আকামা জিনিষ বলেই প্রমাণিত।

এখন ভেবে দেখুন, সার্বিক অর্থে অধিকাংশ সাধারণ আমেরিকান, এমনকি ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল বিদ্যায়তনিক পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্যে ইসলাম প্রবেশ করেছে তেল, ইরান ও আফগানিস্তান বা সন্ত্রাসের মত প্রচারযোগ্য সংবাদ-আইটেমের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে। এবং ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এসব কিছুকে একত্রে বলা হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব বা "সঙ্কটে চাঁদ" বা "অস্থিরতার বাঁকাচাঁদ" বা "ইসলামের প্রত্যাবর্তন" ইত্যাদি। অর্থবোধক

একটা দৃষ্টান্ত হল আটলান্টিক কাউন্সিলের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ কর্ম-কমিটি (এতে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ব্রেন্ট স্কোক্রফ্‌ট, জর্জ বল, রিচার্ড হেলম, লাইম্যান লেম্‌নিৎজার, ওয়াল্টার লেভি, ইউজিন রোস্টাউ, কারমিন রোজভেল্ট ও জোসেফ সিস্কোর মত মানুষ)। ১৯৭৯ সালে কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের শিরোনাম হয় "তেল ও বিক্ষোভ: মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের করণীয় বিকল্পসমূহ"। সে বছর এপ্রিলের ১৬ তারিখে *টাইম ম্যাগাজিন*-এর মূল প্রতিবেদনটি ছিল ইসলাম সম্পর্কে। পত্রিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয় মিনারাত-এ দাড়িয়ে আজানরত এক মুয়াজ্জিনের একটি পেইন্টিঙ: একেবারে উনিশ শতকীয় প্রাচ্যতাত্ত্বিক চিত্রকলার একটা নমুনা—যতটা কল্পনা করা যায় ততটাই অলংকারময় ও অতিরঞ্জিত। যুগের সাথে বেমানান এই সুবোধ চিত্রটির সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক এই শিরোনাম: "জঙ্গী পুনরুজ্জীবন (দি মিলিট্যান্ট রিভাইভাল)"। ইসলাম বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর হতে পারে না। ইউরোপে এমন ধরনের একটি পেইন্টিঙ প্রায়ই আঁকা হতে পানে, সার্বিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট হিসেবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে এটিই তিনটি মাত্র শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে সামগ্রিক আমেরিকান মোহাবেশে।

আমি নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলছি? ইসলাম সম্পর্কে *টাইমসের* প্রচ্ছদ কাহিনী কি রুচিবিনষ্টির নমুনা নয়? স্পর্শকাতর রুচির অনুকূল পরিবেশন নয়? তা কি এরচেয়ে গুরুতর কিছু প্রকাশ করে? সারবত্তা, নীতি ও সংস্কৃতির প্রশ্নে কখন থেকে প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? এবং এর অর্থ কি এই নয় যে, ইসলাম নিজেই বিশ্বের মনযোগের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? আর ইসলাম বিশেষজ্ঞদেরই বা কি হল? কেন তাদের অবদান এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা গলিয়ে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে প্রচার মাধ্যমের আলোচিত ও নির্বীজকৃত ইসলামে?

প্রথম আসে কিছু সহজ ব্যাখ্যার কথা। আগে যেমন বলেছি, আমেরিকায় কখনো এমন কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞ ছিল না যার রয়েছে ব্যাপক সংখ্যক পাঠক। মার্শাল হডসনের তিন খণ্ডের *দি ভেঞ্চার অব ইসলাম* (১৯৭৫, মৃত্যুর পর প্রকাশিত) বাদ দিলে, আমেরিকায় সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সামনে ইসলাম সম্পর্কে কোনো সার্বিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ হয়তো এমন মাপের বিশেষজ্ঞ যে, তারা কেবল আরেকদল বিশেষজ্ঞের সামনেই কথা বলেন। অথবা এমন হতো পারে যে জাপান বা পশ্চিম ইউরোপ বা ভারত সম্পর্কিত বইয়ের সংস্পর্শে আসেন যে-সব সাধারণ মানুষ তাদেরকে প্রভাবিত করার মতো অতটা বুদ্ধিবৃত্তিক গুরুত্ব অর্জন করেননি এরা। এর ফলাফল দুদিকেই কাজ করেছে। একদিকে, আমেরিকার কোনো "প্রাচ্যতাত্ত্বিক" প্রাচ্যতত্ত্বের বাইরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, যেমন পেরেছেন ফ্রান্সে বার্ক ও রডিনসন। আবার অন্যদিকে এও সত্যি যে, যারা নিজেদের খ্যাতি ও সহজাত মেধার বদৌলতে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ইসলামের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তুলেছেন তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলাম চর্চা বা গণ পর্যায়ের সংস্কৃতিতে ইসলামকে ধরে রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেননি। রেবেকা ওয়েস্ট, ফ্রেইয়া স্টার্ক, টি. ই. লরেন্স, উইলফ্রিড থেসিগার, গার্ট্রুড বেল, পি. এইচ. নিউবি কিংবা আরেকটু সাম্প্রতিক জোনাথন র‍্যাবানের মত আমেরিকান কই? ওখানে

বড়জোর আছে মাইলস কোপল্যান্ড বা কারমিট রোজভেল্টের মত প্রাক্তন সিআইএ কর্মকর্তা, বিশেষ সাংস্কৃতিক গুরুত্বের লেখক বা চিন্তাবিদ বিরল। পিটার থেরক্সের মত মেধাবী তরুণ লেখক-অনুবাদকরা এখনো বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেননি।

ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মতামতের অভাবের দ্বিতীয় কারণ হল সত্তর দশকের মাঝামাঝি ইসলামী বিশ্ব হঠাৎ "খবর" হয়ে উঠার সময় ঐসব বিশেষজ্ঞদের অস্থান ছিল প্রান্তিক। প্রভাবশালী, রূঢ় ও বাস্তব কিছু ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যায়: উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলি হঠাৎ করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে; লেবাননে চলমান হিংস্র এবং প্রায়-অনি:শেষ গৃহযুদ্ধ; দীর্ঘ যুদ্ধে লড়ছে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া; কুর্দিদের সমস্যা হঠাৎ করেই অচিন্তনীয়ভাবে গুরুতর হয়ে দেখা দেয়, আবার ১৯৭৫ সালের পর হঠাৎ অচিন্তনীয়ভাবেই মিইয়ে যায়; ব্যাপক, বিস্ময়কর "ইসলামী" বিপ্লবের সূচনায় ক্ষমতাচ্যুত হয় ইরানের শাসকগোষ্ঠী; ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে সংগঠিত হয় কমিউনিস্ট ক্যু, অতপর ১৯৭৯ সালে প্রবেশ করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী; দক্ষিণ সাহারা নিয়ে মরোক্কো ও আলজিরিয়ার লম্বা যুদ্ধের শুরু ; পাকিস্তানে এক প্রেসিডেন্টকে হত্যা এবং নতুন মিলিটারী শাসকের ক্ষমতা গ্রহন। এরপর আরো ঘটনা আছে: ইরান ইরাক যুদ্ধ, হিজবুল্লাহ ও হামাসের উত্থান, ইসরাইল ও অন্যত্র ক্রমাগত বোমা-বিস্ফোরণের ক্ষোভ, আলজিরিয়ায় ইসলামপন্থী ও বিকল সরকারের মধ্যে রক্ষক্ষয়ী সংঘাত... এই তালিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা যাক। মোটের ওপর নিরপেক্ষভাবে এটুকু বলা যায় যে, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের লেখায় যথাযথ পটভূমিতে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই সব ঘটনার কিছু কিছু পরিষ্কার করা সম্ভব ছিল। এ অবস্থা সম্পর্কে তারা কোনো ভবিষ্যতবাণীও করেননি, তেমনি মানসিকভাবে প্রস্তুতও করেননি পাঠকদেরকেও। বরং এ সকল বিষয়ে এমন সব সাহিত্যিক লেখা লিখেছেন, চলমান বাস্তবতার সাথে তুলনা করে এগুলো পড়লে মনে হবে এ যেন পৃথিবীর দূরবর্তী এক জগতের ব্যাপার, প্রচার মাধ্যমে চোখের সামনে যে বিক্ষোভ ও হুমকি বলকে উঠছে তার সাথে যেন ঐ জগতের কোনো অর্থবোধক সম্পর্ক নেই।

এটা মুল ব্যাপারগুলির একটা। এ নিয়ে এখনো তেমন যুক্তিনির্ভর আলোচনা শুরু হয়নি। কাজেই সতর্কতার সাথে এগুতে হবে আমাদেরকে। ইসলাম যে-সকল বিদ্যায়তনিক বিশেষজ্ঞের প্রদেশ তারা সেই সতর শতকেরও পূর্বের রীতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক স্তরে কাজ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের গবেষকদের মতোই এদের কাজ সীমানা-দেয়াল দ্বারা খুবই চাপানো। ইসলামের ইতিহাসের আধুনিক কালের ঘটনাবলী নিয়ে দায়িত্বশীল উপায়ে ভাবেননি বা ভাবতে চাননি ওরা। সীমিত অর্থে ওদের কাজ স্থির বলে ধরে নেয়া ইসলামী বিন্যাসে অথবা পুরনো ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্নে আটকা-পড়ে, কিংবা "ধ্রুপদ" ইসলামের ধারণায় বাঁধা। এদের কাজ কোনো অবস্থাতেই আধুনিক ইসলামের জগত বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। অথচ এই ইসলাম এর আকর্ষণীয় উপাদানগুলোর ওপর নির্ভর করে প্রথমযুগের শতকগুলোয় (সমপ্ত-নবম শতকে) আভাসিত পথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বিকশিত হচ্ছিলো, সকল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সমেত।

আধুনিক ইসলাম বিষয়ে—কিংবা বলা যায় আঠারো শতক থেকে পরবর্তী সময়ের ইসলামী বিশ্বের সমাজ, জনগোষ্ঠী, ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে—বিশেষজ্ঞগণ এমন এক

স্থিরিকৃত পরি-কাঠামোর সীমানার ভেতরে কাজ করেছেন যা ইসলামী বিশ্বের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। বৈচিত্র ও জটিলতা থাকা সত্ত্বে এ বাস্তবতাকে আবার অতিরক্তি গুরুত্ব দেয়া যাবে না। অস্বীকার করার নেই, অক্সফোর্ড বা বোস্টনে বসে গবেষণারত পণ্ডিত সচরাচর গবেষণা করেন ও লিখেন তার গুরুর দ্বারা চিহ্নিত মানদণ্ড, প্রথা-রীতি ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী; যাদের নিয়ে গবেষণা সেই মুসলমানরা এতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এ হয়তো অনিবার্য সত্য, তবু এর গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিক ইসলাম চর্চা মূলত আঞ্চল বিদ্যার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত: যেমন পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইত্যাদি। কাজেই এগুলো জাতীয় নীতি নির্ধারণ কৌশলের সাথে সমন্ধযুক্ত, ব্যক্তি পণ্ডিতের একক পছন্দের সুযোগের মধ্যে নেই। হয়তো প্রিন্সটনের কেউ ঘটনাক্রমে আফগানদের ধর্মীয় মতামত সম্পর্কে গবেষণা করবেন। এ ধরনের অধ্যয়নের অবশ্যই (বিশেষত এই সময়) "রাজনৈতিক নিহিতার্থ" থাকতেও পারে। তাই সংশ্লিষ্ট পণ্ডিত না চাইলে সরকারী নেটওয়ার্ক, করপোরেট ও পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণী চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়বেন; প্রভাব পড়বে গবেষণার তহবিলে, যে-সব লোকের সাথে দেখা হবে তারাও প্রভাবিত হবেন এবং হয়তো নির্দিষ্ট কিছু আদান-প্রদান ও পুরস্কারের প্রস্তাব আসবে। অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক, ঐ গবেষক বেচারা রূপান্তরিত হবেন "অঞ্চল বিশেষজ্ঞে"। কিংবা ইসরাইল বিষয়ে জুডিথ মিলার ও প্রচারণাকারী মার্টিন পেরেজের মত সাধারণ ও অযোগ্য হলে লোকে তার কথা শুনবে ধর্মসভার নিরবতা নিয়ে।

যাদের কাজ সরাসরি নীতি বিষয়ক ইস্যুর সাথে জড়িত (যেমন মূখ্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীও) তাদের সামনে থাকে স্পর্শকাতর— যদি বিপদজনক না-ও বলি— নানা ইস্যু যা আলোচনায় আনতেই হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পণ্ডিত হিসেবে কারো অবস্থান কিভাবে সরকারের দাবির সাথে তাল মেলাবে? ইরান একটি নিখুঁত উদাহরণ। শাহ্‌র শাসনামলে ইরানবিদদের জন্য পাহ্‌লভি ফাউন্ডেশন ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সহুজে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ ছিল। এ অর্থ দেয়া হতো সেই সব গবেষণার কাজে যা শুরু হতো বর্তমান অবস্থা থেকে (অর্থাৎ সামরিক ও অর্থনৈতিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাঁধা পাহলভি শাসনামল থেকে); ব্যাপারটা এক অর্থে ঐ সময়ের ইরানে 'গবেষণা-নমুনায়' পরিণত হয়। সঙ্কটের শেষের দিকে পার্লামেন্টে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বিষয়ে পার্মানেন্ট সিলেক্ট কমিটির অধ্যয়নে প্রকাশ পায় যে, শাহর শাসন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব বর্তমান নীতিমালা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, "বিরূপ সংবাদ গোপন করার মতো সরাসরি প্রক্রিয়ায় নয়, পরোক্ষ উপায়ে... নীতিনির্ধারকরা কখনো প্রশ্ন করেননি শাহ্‌র স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য টিকবে কি না; কারণ চলমান নীতি বিশ্বাস করতো তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য টিকবে।" এর ফলে শাহ্‌র শাসনামল সম্পর্কে সিরিয়াস গবেষণা হয়েছে হাতেগোণা কয়েকটি মাত্র, যাতে শাহ-বিরোধিতার জনপ্রিয় উৎসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার জানামতে বার্কলের হামিদ আলগারই একমাত্র গবেষক যিনি সমকালীন ইরানের ধর্মীয় আবেগপ্রসূত রাজনৈতিক শক্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হন; তিনি এমনকি অতদূর নির্ভুল ভবিষ্যত বানী করেন যে, হয়তো আয়াতুল্লাহ

খোমেনির দ্বারাই ঐ শাসকগোষ্ঠীর পতন হবে। অন্যান্যদের মধ্যে রিচার্ড কোটাম ও এরভান্ড আব্রাহামিয়ানও তাদের লেখায় পূর্বোক্ত সূচনা বিন্দু (শাহ শাসনামল) ত্যাগ করেন; এদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য। (নিরপেক্ষতার প্রয়োজনে বলে নেয়া দরকার ইউরোপীয় বামপন্থী পণ্ডিতরা শাহ্‌র স্থায়িত্বের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন; তবে এরাও শাহ-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ধর্মীয় উৎস চিহ্নিত করার ব্যাপারে সুবিধা করতে পারেননি)।

ইরানের কথা বাদ দিলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতার আরো বহু উদাহরণ আছে। ব্যর্থতার কারণ সরকারী নীতি ও জীর্ণ উক্তিগুলোর সমন্বয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। এখানে লেবানন ও ফিলিস্তিনের ঘটনা খুবই অর্থবহ দৃষ্টান্ত। বহুপাক্ষিক বা মিশ্র সংস্কৃতি কেমন হতে পারে তার একটা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল লেবানন, বহু বছর ধরেই। কিন্তু সেই আদর্শ এমন স্থির ও অপরিবর্তনীয় রূপ লাভ করে যে, এর আলোকে লেবাননের ওপর গবেষণা করার ফলে (১৯৭৫ সাল থেকে অন্তত ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত) গৃহযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ত্রাসের বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়নি। গৃহযুদ্ধের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের চোখ যেন লেবাননের "সুস্থিরতার" ওপর বিশেষভাবে আটকে যায়: গবেষণায় পাঠ করা হয় প্রথানুসারী নেতৃত্ব, এলিট শ্রেণী, দল, জাতীয় চরিত্র ও চমৎকার সফল আধুনিকায়ন, ইত্যাদি।

এমনকি যখন লেবাননের রাজনীতিকে মনে হয়েছে বিপজ্জনক এবং "ভব্যতা" অপর্যাপ্ত, তখনো সার্বিক ধারণা ছিল দেশটির সমস্যা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, বিপর্যয় দেখা দেয়ার মতো নয়। ষাটের দশকে এক বিশেষজ্ঞ আমাদেরকে জানালেন লেবানন "সুস্থির", কারণ "আন্ত :আরব" পরিস্থিতি সুস্থির; যতদিন এই সূত্র মেনে নেয়া হয়েছে ততদিন তিনি যুক্তি দিয়েছেন লেবানন নিরাপদ। একবারও ভেবে দেখা হয়নি যে, আন্ত:আরব সুস্থিরতা অক্ষুন্ন থাকলেও লেবানীজ অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তার প্রধান কারণ প্রথাগত জ্ঞান — প্রচলিত মত-শাসিত এ ক্ষেত্রটির অন্যান্য বিষয়ের মত—এর ভেতরের ফাটল এবং আরব প্রতিবেশীদের অ-প্রাসঙ্গিকতা এড়িয়ে লেবাননের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে আকাঙ্ক্ষিত "বহুত্ববাদ" ও সুসমন্বিত ধারাবাহিকতা। কাজেই কোনো বিপদ যদি আসে তা আসবে চারপাশের আরব দেশগুলোর তরফ থেকে, ইসরাইল বা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কখনো নয়; যদিও এই দুই দেশই নিজস্ব পরিকল্পনা চাপিয়ে রেখেছে লেবাননের ওপর। এই পরিকল্পনা কখনো বিশ্লেষিত হয়নি। এরপর আছে স্বয়ং লেবানন—আধুনিকায়ন অতিকথার মূর্ত রূপদানকারী। এ জাতীয় জোলার-জ্ঞানের ধ্রুপদ উদাহরণগুলোর কোনো একটি এখন পড়তে গেলে বিস্মিত হতে হয় যে, এইসব উপকথা কি প্রশান্তি নিয়েই না ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চলে টিকে থাকতে পারে, যখন প্রকৃত অর্থে গৃহযুদ্ধ শুরু হচ্ছে! ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের জানানো হয় লেবাননে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে, তবে সম্ভাবনা খুবই "ক্ষীণ"; যা ঘটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হচ্ছে "ভবিষ্যত আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান রাজনৈতিক বিন্যাসের আওতায় জনগনের অংশগ্রহণ" (এ যেন সাম্প্রতিক আরব ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে দুঃখজনক কোমল কথার শ্লেষাত্মক ভবিষ্যতবাণী)। কিংবা একজন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী যেমন বলেন, "লেবাননের 'বহুবর্ণের চমৎকার মিশ্রণ' অক্ষুন্ন থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে, লেবানন তার আদিম গভীর ফাটলগুলোকে কেমন কার্যকরভাবে চমৎকার

গলাধকরণ করে আছে।" এর ফলে লেবানন ও অন্যান্য দেশের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, উত্তর-উপনিবেশী রাষ্ট্রগুলোয় যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাকে সহজে "সুস্থিরতা" শব্দটির মনোহারিত্বে একপালভুক্ত করা সম্ভব নয়। লেবাননে ওগুলো ঠিক সেই সব ঘুর্ণায়মান শক্তি যা কখনো বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিহ্নিত হয়নি, অথবা অব্যাহতভাবে উপেক্ষিত হয়েছে: যেমন সামাজিক স্থানচ্যুতি, শিয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের মত জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তন, স্বীকারোক্তিমূলক আনুগত্য, নানা মতবাদের প্রবাহ; এইসব মিলে প্রবল বর্বরতার মতো ছিঁড়ে ফেলেছে দেশটিকে। তেমনি প্রচলিত ধারার জ্ঞান নিকটপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যৌক্তিক বিশ্লেষণে উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনীদেরকে বিবেচনাযোগ্য ও প্রভাবক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখেনি, দেখেছে শুধুই উদ্বাস্তু হিসেবে যাদেরকে পুনরায় জায়গা করে দেয়া সম্ভব। তবুও সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রধানতম স্বীকৃত সমস্যায় পরিণত হয় ফিলিস্তিনীরা। এ সত্ত্বেও, ফিলিস্তিনীদের গুরুত্ব যেমনটা দাবি করে তেমন পণ্ডিতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোযোগ দেয়া হয়নি তাদের ব্যাপারে। বরং ওদেরকে মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের মিশর ও ইসরাইল সম্পর্কিত নীতিতে সামান্য অনুষঙ্গ মাত্র, আর লেবাননের আগুনে সমস্যা বিবেচনায় একেবারেই উপেক্ষনীয়। ১৯৮৭ সালে ইন্তিফাদা শুরু হওয়ার পর সমান বিস্মিত হয়ে যান কর্মকর্তা ও ভাষ্যকাররা। এইরকম নীতির অন্ধত্বের বিপরীতে কোনো বিশেষজ্ঞ মতামত দাড়ায়নি। মার্কিন স্বার্থের প্রশ্নে তার ফলাফলও বিপর্যয়কর হবে বলেই মনে হচ্ছে; কারণ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ গোয়েন্দা সমাজকে বেকুব বানিয়েছে; দুই দেশের সামরিক শক্তি জরীপেও মারাত্মক ভুল ছিল তাদের। এ ছাড়া, মূল কথা হল যুক্তরাষ্ট্র ও তার 'এক পায়ে খাড়া' বিশেষজ্ঞরা আশা করতে পারেন না যে, যে-সব মুসলমান তাদের জাতভাইকে বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিনে খুন হতে দেখেছে, তাদের জনসমর্থনহীন শাসকদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হিসেবে প্রশংসিত হতে দেখেছে, যারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে "ক্রুদ্ধ" ও 'হিংস্র" আখ্যায় সীমাহীন কলঙ্কিত হতে দেখেছে, তারা হাত বাড়িয়ে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করবে যুক্তরাষ্ট্রকে।

এর সাথে যোগ করা যায় একই ধারার আরেকটি দু:খজন সত্য: আড়ালে-থাকা সরকারী স্বার্থ ও ঘরে-পালা গোদা পাণ্ডিত্যের মাঝখানে ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক লেখক সংশিষ্ট ভাষাটাও জানে না, ফলে তাদেরকে তথ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় অন্যান্য পশ্চিমা লেখকদের ওপর। এই বর্ধিত নির্ভরশীলতা হচ্ছে বিষয়টির অফিসিয়াল বা প্রচলিত চেহারার ওপর একটা ফাঁদ। প্রাক-বিপ্লব ইরানে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় এ ফাঁদেই ধরা পড়েছে প্রচার মাধ্যম। তারা একই কাজ করেছে *ইন্তি ফাদার* পূর্বে এবং "মৌলবাদ" ও "সন্ত্রাস"-এর ব্যাপারে হিস্টিরিয়া চলাকালে। বার বার ফোকাস করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ ও পুনর্পর্যবেক্ষণ হয়েছে একই উপাদানগুচ্ছের ওপর: এলিট, আধুনিকীকরণ কর্মসূচী, সেনাবাহিনীর ভূমিকা. প্রথমসারির নেতৃবৃন্দ, স্পর্শকাতর সঙ্কট, জিহাদ নেটওয়ার্ক, (মার্কিন দৃষ্টিকোণ থেকে) ভূ-রাজনৈতিক কৌশল, "ইসলামী" প্রবেশপথ, ইত্যাদি সম্পর্কে। হয়তো তখন এই বিষয়গুলো উপভোগ্য মনে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। কিন্তু বাস্তব এই যে, ইরানী বিপ্লবের মাত্র কয়েকদিনে আক্ষরিক অর্থেই ভেসে যায় এর সবকিছুই। দুমড়ে পড়ে গোটা রাজকীয় পরিষদ; বহু বিলিয়ন ডলারে পোষা আর্মি বিভক্ত হয়ে পড়ে; তথাকথিত

এলিটরা হয় পালিয়ে বাঁচে, নয় তো খুঁজে নেয় নতুন পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার উপায়— যদিও কোনো ক্ষেত্রেই বোঝা সম্ভব হয় না যে এদের ভূমিকা ইরানী রাজনীতির গতিধারাকে প্রভাবিত করেছে কি না। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যত বানী করতে সক্ষম হওয়ার কৃতিত্ব দেয়া হয় একমাত্র-যে "বিশেষজ্ঞ"কে তিনি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জেম্‌স বিল। বিল প্রায় শেষদিকে, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ দেন যাতে "নতুন প্রক্রিয়া সূচিত করার জন্য. . .শাহ্‌কে" উৎসাহ দেয়া হয়। লক্ষ্যনীয় যে, আপাতভাবে ভিন্নমতাবলম্বী মনে হয়, এমন একজন বিশেষজ্ঞও সেই শাসকগোষ্ঠীকেই ক্ষমতায় রাখার জন্য সচেষ্ট যার বিরুদ্ধে ইতিহাসের প্রধানতম এক গণ-অভ্যুত্থানে জেগে উঠেছে লক্ষ লক্ষ স্বদেশী মানুষ।

অবশ্য বিল অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলেছেন: সামগ্রিক বিচারে যুক্তরাষ্ট্র ইরান সম্পর্কে অজ্ঞ। তেমনি তার এসব কথাও যথার্থ যে, প্রচার মাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো ছিল কৃত্রিম, অফিসিয়াল রিপোর্টগুলো ছিল পাহলভির ইচ্ছার অনুকূলে সাজানো; যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করেনি, আবার বিরোধী দলের সাথে যোগাযোগও করেনি। বিল অবশ্য অতদূর বলতে যাননি যে, এই ব্যর্থতা হচ্ছে ইসলামী বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের প্রতি, স্বল্পমাত্রায় ইউরোপের, সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা, আবার তার লক্ষণও। আসলে, বিল যে তার ইরান সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে যুক্ত করেননি তাও ঐ দৃষ্টিভঙ্গিরও একটা দিক। প্রথম কথা হচ্ছে, মূল পদ্ধতিগত প্রশ্নটিকে সযত্নে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা হয়নি। যেমন- "ইসলাম" ও ইসলামী পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে কথা বলার মূল্য কী (যদি আদৌ থেকে থাকে)? দুই নম্বর কথা হচ্ছে, সরকারী নীতি ও পণ্ডিতি গবেষণার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? বিশেষজ্ঞরা কি রাজনীতির উর্ধ্বে থাকবেন, নাকি সরকারের রাজনৈতিক অংশে পরিণত হবেন? ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল ও উইলিয়াম বীম্যান আলাদা আলাদা আলোচনায় লিখেছেন যে, ১৯৭৯ সালের ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সঙ্কটের মূল একটা কারণ হল এই যে, ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য যেসব বিশেষজ্ঞ বহুমূল্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু বিল ও বীম্যান একটা বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি যে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ না করার কারণটা হল ঐসব বিশেষজ্ঞরা একইসঙ্গে এমন এক ভূমিকা বেছে নিয়েছেন আবার নিজেদেরকে পণ্ডিতও দাবি করেছেন যাতে তাদেরকে রহস্যময় মনে হয়েছে। ফলে তারা বিশ্বাসযোগ্য গণ্য হননি, না সরকার না বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের নিকট।

তা ছাড়া এমন কোনো কায়দা আছে কি যার বলে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী (বিদ্যায়তনিক পণ্ডিত বলতে তা-ই বুঝানো হয়) সরাসরি সরকারের জন্য কাজ করবেন, আবার তার স্বাধীনতাও বজায় রাখবেন। খোলামেলা রাজনতৈক অংশীদারিত্ব এবং চমৎকার অন্ত র্দৃষ্টির মধ্যে কি সম্পর্ক? এর একটা কি আরেকটা বর্জন করে চলে, কিংবা কেবল কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা করে? দেশে ইসলাম-বিশেষজ্ঞের বিশাল দলটির পাঠক সংখ্যা এত কম কেন? বিশেষত এখন, এমন এক সময়ে, যখন মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্দেশনা? বাস্তব ও প্রধানত রাজনৈতিক যে-পরিকাঠামো ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক ঐতিহাকিভাবে শাসন করে এসেছে কেবল তার আওতায় এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব। তাহলে সেই পরিকাঠামোটি দেখা যাক

এবং খুঁজে দেখা যাক ওতে কি ভূমিকা রয়েছে বিশেষজ্ঞদের।

ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাসে এমন কোনো যুগ পাইনি আমি যেখানে আবেগ, আত্ম-অহমিকা ও রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বারা সৃষ্ট ঐ পরিকাঠামোর বাইরে ইসলাম আলোচিত হয়েছে। একে অবশ্য বিরাট কোনো আবিষ্কার নাও মনে হতে পারে। তবে এর মধ্যেই আছে একটি পণ্ডিতি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যাবতীয় কিছু; উনিশ শতকের শুরু থেকে এ বিষয়টি নিজেই নিজেকে প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানশাখা হিসেবে পরিচিত করেছে অথবা, অন্তত প্রাচ্যকে নিয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিভিত্তিক কাজের চেষ্টা করেছে। কেউ ভিন্নমত পোষণ করার কথা নয় যদি বলি ইসলাম বিষয়ে প্রথম যুগের ভাষ্যকার মহান পিটার ও বার্থলেমি ডি হারবেলট তাদের কাজে চরমভাবে খ্রিস্টান তার্কিক। কিন্তু ইউরোপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে প্রবেশ করে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠার সময় প্রাচ্যতত্ত্বকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছে—এমন সিদ্ধান্ত আসলে অপরিক্ষীত অনুমান মাত্র।

এ কথা কি সত্যি নয় যে, সিলভেস্ত্রা ডি সেসি, এডওয়ার্ড লেইন, আর্নেস্ত রেনান, হ্যামিল্টন গিব ও লুই ম্যাসিগনন প্রমুখ জ্ঞানী, বিষয়মুখি পণ্ডিত ছিলেন? এও কি সত্য নয় যে, প্রিন্সটন, হার্ভার্ড ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে ইসলাম বিষয়ক শিক্ষকেরা সমাজতত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়নে সকল অগ্রগতি আত্মস্থ করেছিলেন, তাই হয়ে উঠেছিলেন পরিপূর্ণ নিরপেক্ষ ও সকল আবেদনমুক্ত? উত্তরটা হল 'না'। প্রাচ্যতত্ত্ব যে অন্যান্য মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের চেয়ে বেশি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে, এমন নয়। এ বিষয়টিও মতবাদশাসিত এবং অন্যান্য বিষয়ের মতই বাস্তব পৃথিবীর দ্বারা আক্রান্ত। দুয়ের পার্থক্য হল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বিশেষজ্ঞ অবস্থানের শক্তিতে ইসলামের প্রতি তাদের গভীর আবেগ অস্বীকার করতে—এমনকি কখনো কখনো লুকাতে—চেয়েছেন, এমন এক কর্তৃত্বময় ভাষায় যার উদ্দেশ্য "বিষয়মুখিতা" ও "বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা"র সনদ প্রদান।

এই গেলো একদিক। অন্য বিষয়টি তুলে ধরে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট অর্জনের ধরনটিকে; না হলে তা থেকে যেত বোধের আড়ালে। আধুনিক কালে যখনই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (বা ইসলাম ও পশ্চিমের) মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, পশ্চিম তখন প্রথমেই ত্রাসের আশ্রয় নেয়নি, বরং প্রতিনিধিত্বের শীতল, বিচ্ছিন্ন, আধা বিষয়মুখি ও বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারগুলোকে আশ্রয় করার প্রবণতা দেখিয়েছে। এভাবে "ইসলাম" পরিষ্কার বোধগম্য হয়, এর হুমকির "যথার্থ চেহারা" বেরিয়ে পড়ে, এর বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক পরোক্ষ তৎপরতা গ্রহণের প্রস্তাব আসে। এই পটভূমিতে, বিচিত্র পরিস্থিতির বাসিন্দা মুসলমানরা বিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস উভয়কেই মনে করে ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসন।

একই চেহারার দুটো দৃষ্টান্ত আমার কথাকে সমর্থন করে। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখব ফ্রান্স ও বৃটেন উভয়েই ইসলামী বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চল দখল করে নেয়ার আগের যুগটায় প্রাচ্যকে উপলব্ধি ও চিত্রিত করার বিভিন্ন পণ্ডিতি কৌশল উল্লেখযোগ্যরকম আধুনিক ও উন্নত হয়েছে। ১৮৩০ সালে আলজিরিয়া দখলের পরবর্তী দুই যুগে ফ্রান্সে প্রাচ্য বিষয়ক পড়ালেখা প্রাচীন নিদর্শনাদির আলোচনা থেকে পরিণত হয় একটি যুক্তিশীল বিষয়ে। অবশ্য, এর আগেই ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান

মিশর দখল করেন; তার কর্মসূচী আরো কার্যকর করা জন্য তিনি পূর্বেই বিরাট একদল প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিত প্রস্তুত করেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে মিশরে নেপোলিয়ানের স্বল্পায়ুর দখল একটি অধ্যায়ের ইতি টানে। আরেকটি নতুন দীর্ঘায়ু অধ্যায়ের শুরু হয়, যখন ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজের সিলভেস্ত্রা ডি সেসির তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স হয়ে ওঠে প্রাচ্যতত্ত্বের বিশ্বগুরু। এই অধ্যায়টি চরম পরিণতি পায় আর কিছুদিন পর, ১৮৩০ সালে ফরাসি সেনাবাহিনী কর্তৃক আজিরিয়া দখলের ঘটনায়।

একটা ঘটনা বা বিষয়ের সাথে আরেকটা সম্পর্ক দেখানো আমার লক্ষ্য নয়। কিংবা আমি এমন অবুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা গ্রহণ করছি না যে, সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদেরকে সন্ত্রাস ও দুর্ভোগের দিকেই নিয়ে যায়। আমি বলছি কোনো এক মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে সাম্রাজ্যের জন্ম হয়নি, তেমনি আধুনিক কালে কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া সেগুলো পরিচালিতও হয়নি। যদি একথা সত্যি হয় যে, জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দরকার মানবীয় অভিজ্ঞতা পুনর্নির্ধারণ ও পুনর্গঠন এবং তা করবেন সেই সব বৈজ্ঞানিকেরা যারা তাদের অধ্যয়নের বিষয়ের চেয়েও উঁচু হয়ে দাড়িয়ে আছেন, তাহলে প্রসঙ্গেক্রমে আরেকটি ব্যাপার সত্য বলে ধরে নেয়া যায় যে, রাজনীতিবিদদের মধ্যেও একইরকম উন্নয়ন ঘটে যাদের কর্তৃত্ব পুনর্নির্ধারিত হয় পৃথিবীর বহু "নিকৃষ্ট" অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে; কেননা, সেই সব অঞ্চলে নতুন "জাতীয়" স্বার্থ আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখা দেয়; আবার কিছুদিন পর মনে হয় ঐ অঞ্চলগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারী প্রয়োজন। মিশর দখল করার পর ইংল্যাণ্ড সুকৌশলে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন করে। প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চায় দীর্ঘদিনের লগ্নি ছাড়া তা সম্ভব হতো কি না সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ। সে লগ্নির সূচনা এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইন ও উইলিয়াম জোনসের মাধ্যমে: ঘনিষ্ঠ-পরিচয়, প্রবেশযোগ্যতা, প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা— এগুলো দেখিয়েছে প্রাচ্যতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা: অর্থাৎ প্রাচ্যকে দেখা সম্ভব, প্রাচ্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করা সম্ভব, একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সমৃদ্ধ প্রাচ্যকে অসাধারণ, দুবোর্ধ্য, দূরবর্তী হিসেবে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। একে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা যায়, কিংবা ইউরোপই ওই জায়গাটাকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নিতে পারে। যাথরীতি তা-ই করেছে ইউরোপ।

আমার দুই নম্বর দৃষ্টান্তটি এ কালের। সম্পদ ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ইসলামী প্রাচ্য এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর কোনোটাকেই স্থানীয় প্রাচ্যজনের স্বার্থ, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সাথে অদলবদল করা যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইসলামী প্রাচ্যে কর্তৃত্ব ও আধিপত্যশীল অবস্থান গুছিয়ে নিচ্ছে, আগে যা ছিল ফ্রান্স ও বৃটেনের আয়ত্বে। যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য ১৯৯১ সালে যুদ্ধ করেছে উপসাগরীয় এলাকায়; একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াকু আফগান জঙ্গীদেরকে অস্ত্র দিয়েছে, গাজা ও পশ্চিম তীরে জেগে ওঠা জঙ্গী প্রবণতার বিরুদ্ধে গবেষণা ও গোয়েন্দা কাজ চালিয়েছে ইসরাইলের সাথে মিলে। এই যে এক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির দ্বারা আরেক সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির জায়গা দখল, তার সাথে ঢুকে গেছে আরো দুটো জিনিষ: একটা হল ইসলাম সম্পর্কে সঙ্কট-প্রসূত বিদ্যায়তনিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরিমিত আগ্রহ; আরেকটা হল প্রাইভেট সেক্টর প্রচার মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা শিল্পে আয়ত্বাধীন কৌশলে অসামান্য বিপ্লব। এর আগে

প্রচার মাধ্যম এমন তাৎক্ষণিকতার সাথে ও নিয়মিতভাবে ইরান ও বসনিয়ার মত কোনো আন্তর্জাতিক সঙ্কট-কেন্দ্র কাভার করেনি। এজন্য মনে হয় যেন মার্কিন জীবনের সাথে মিশে গেছে ইরান, অথচ কত অচেনা, কেমন প্রগাঢ় দূর!

ঠিক যেমন হয়েছে ১৯৯০ দশকের বসনিয়ার বেলায়। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে প্রবণতাগুলো আরো তীব্র হয়। এই দুই ঘটনার সাথে যুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও বানিজ্য বিশেষজ্ঞদের ইসলাম অধ্যয়নের উল্লেখযোগ্য কলাকৌশল। এইসব ব্যাপার একত্রে পশ্চিমের প্রতিটি সংবাদ-ভোক্তার নিকট ইসলামকে পরিণত করে জানা একটা বিষয়ে; ইসলামী বিশ্ব অথবা অন্তত এর প্রচারযোগ্য (তাদের মতে) বৈশিষ্টের প্রায় সবগুলোকেই একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার বানিয়ে ফেলে। এই জগতের ওপরই পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ও আর্থ রঙ-রসের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে; ইতিহাসে তার সম পর্যায়ের উদারহরণ আর নেই। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, বর্তমান আরব-ইসলামী অঞ্চলের মত আর কোনো অপশ্চিমা জগত যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা অত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি। আর পশ্চিমের রঙ-রস ছড়ানোতেই শেষ নয়, ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যে—এ ক্ষেত্রে, ইসলাম ও যুক্তরাষ্ট্রের— পারস্পরিক আদান-প্রদানও ছিল একপাক্ষিক; তেমনি প্রচার-অযোগ্য বলে বিবেচিত অন্যান্য ইসলামী বিষয়গুলো হয়েছে উপেক্ষিত, টেরা-চাওনির শিকার।

মুসলিম ও আরবরা অনিবার্যভাবেই আলোচিত ও প্রচারিত হয়েছে এবং মনোযোগ লাভ করেছে হয় তেল-সরবরাহকারী নয়তো সন্ত্রাসী হিসেবে: এ বক্তব্যে অতিরঞ্জন একেবারেই সামান্য। এমনকি যাদের পেশা ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে রিপোর্ট করা তাদের ভাবনাতেও খুঁটিনাটি বিষয়, যেমন- মানুষের নিবিড়তা, আরব-মুসলিম জীবনের আবেগ ইত্যাদি কখনো জায়গা পায়নি। বরং আমরা পাই ইসলামী বিশ্বের একরাশ কাঁচা, মূলবাদী ক্যারিকেচার; এগুলো অন্যান্য বিষয়ের সাথে মিলিয়ে এমন কায়দায় পরিবেশিত হয়, যা সামরিক হামলার ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয় ইসলামকে।

১৯৭০-এর দশকে আরব উপসাগরীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সেনা অভিযান, কার্টার মতবাদ, র‍্যাপিড ডিপ্লয়মেন্ট ফোর্স নিয়োগ এবং "ইসলাম"কে "আর্থ-সামরিক" উপায়ে মোকাবিলার আলোচনা হচ্ছিলো খুব। কিন্তু এ কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, এর আগে আগে একটা সময় গেছে যখন প্রায়ই "ইসলাম"কে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হতো শীতল টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এবং "বিষয়মুখি" প্রাচ্যতাত্ত্বিক অধ্যয়নে (আপাত-স্ববিরোধীভাবে, হয় আধুনিক বাস্তবতার সাথে এর "অপ্রসাঙ্গিকতার" আলোকে অথবা প্রচারনাপ্রবণ বিষয়মুখি বৈচিত্রের মধ্যে, যার পরিণাম হল আরো বিচ্ছিন্নতা): এর সাথে ভয়াবহ সাদৃশ্য আছে উনিশ শতকের ফ্রান্স ও বৃটেনের বিভিন্ন দৃষ্টান্তের, একটু আগেই যেগুলো আলোচনা করেছি।

আরো কিছু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনর ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার পর বাইরের পৃথিবীকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে এমন এক নীতিমালা তৈরি হয় যা ঐসব অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সমস্যাদির সাথে খাপ-খাওয়ানোর যোগ্য, যেখানে মার্কিন স্বার্থ প্রশ্নের সম্মুখীন (এবং ওগুলোর স্বার্থও মার্কিন প্রভাবে ক্ষতিগস্ত)। যুদ্ধের ক্ষয়-

ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য চিহ্নিত হয় ইউরোপ। বিভিন্ন মার্কিন নীতির মধ্যে মার্শাল প্ল্যান এ লক্ষ্যের সাথে খাপ-খাইয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, স্নায়ুযুদ্ধ যেসব নীতিমালা, গবেষণা ও এমনকি মনোভাব জন্ম দিয়েছে সেগুলো এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে বড় শক্তিগুলোর পরস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ওদের সম্পর্ক। স্নায়ুযুদ্ধের শেষে তা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে ত্যাগ করে। এই তৃতীয় বিশ্ব হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও বিভিন্ন স্থানীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র, যেগুলো কিছুদিন আগেই উপনিবেশী শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে।

প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া, সর্বপ্রথম মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের বিবেচনাতেই তৃতীয় বিশ্বকে "অনুন্নত" মনে হয়। মনে হয় তা অর্থহীনভাবে সেকেলে ও স্থিরতর ঐতিহ্যিক জীবনযাত্রায় আটকে-পড়া, কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র ও আভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার বিপদজনক ঝুঁকির সম্মুখীন। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কায়দায় যুগের হালচাল হয়ে দাড়ায় তৃতীয় বিশ্বের "আধুনিকায়ন"। এবং, যেমন বলেছেন জেমস পেক, "আধুনিকায়ন তত্ত্ব ছিল ক্রমেই বর্ধিষ্ণু বৈপ্লবিক আলোড়ন এবং স্থানীয় ঐতিহ্যিক রাজনৈতিক এলিটদের মধ্যে চলমান সংঘাতের রিবুদ্ধে মতবাদগত জবাব।" বিশাল পরিমাণ অর্থ ঢেলে দেয়া হয় আফ্রিকা ও এশিয়ায়: উদ্দেশ্য কমিউনিজম ঠেকানো, মার্কিন বানিজ্য বাড়ানো এবং স্থানীয় একদল সঙ্গী তৈরি করা; সঙ্গীদের উপস্থিতির সমর্থক যুক্তি ছিল যে এরা পশ্চাদপদ দেশগুলোকে রূপান্তরিত করবে একেকটি মিনি-আমেরিকায়। পরে কর্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার জন্য সূচনালগ্নের বিনিয়োগে আরো অর্থ ঢালা এবং সামরিক সমর্থন যোগানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। এর থেকেই গোটা এশিয়া ও আফ্রিকায় মার্কিন হস্তক্ষেপের সূচনা হয়, যা প্রায়-প্রত্যেক প্রকৃতির স্বানীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয় যুক্তারাষ্ট্রকে।

তৃতীয় বিশ্ব আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আরো কিছু ব্যাপার উপলব্ধি করতে হবে আমাদেরকে। যেমন এ নীতি নিজেই সৃষ্টি করে চিন্তার বিশেষ একটি ধরন, জন্ম দেয় ততীয় বিশ্বকে বিবেচনা করার বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গির; একসময় এগুলোই আবার আধুনিকায়নের ধারণার পেছনে ঢেলে দেয় আরো রাজনৈতিক, আবেগগত ও কৌশলগত বিনিয়োগ। ভিয়েতনাম এর নিখুঁত দৃষ্টান্ত। একবার যখন সিদ্ধান্ত হয় যে দেশটিকে এর নিজের ও কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচাতে হবে, তখন জন্ম নেয় আধুনিকায়নের গোটা একটা বিজ্ঞান (যার সর্বশেষ বহুমূল্য পর্যায়টি পরিচিত হয় "ভিয়েতনামীকরণ" হিসেবে)। কেবল সরকারী বিশেষজ্ঞ নয়, জড়িত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেজ্ঞরাও।

এক সময় দেখা গেলো কমিউনিজম-বিরোধী ও মার্কিনপন্থী দলের টিকে যাওয়া অংশটি সায়গনে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে; অথচ তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মনে করছে ঐসব শাসকরা বিদেশী ও নিপীড়ক। এদেরই সমর্থনে পরিচালিত অসফল যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে গোটা দেশ, আর তার পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির পদ হারিয়েছেন লিন্ডন জনসন। আমেরিকায় এখনো আধুনিকায়নের গুণকীর্তন বিষয়ক লেখালেখি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বে আসীন; সেই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বে জনমনে "আধুনিকায়নের" সাথে জড়িয়েছে বোকার মত অর্থ-অপচয়, অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-

কলকব্জা ও অস্ত্রশস্ত্র, দুর্নীতিবাজ শাসক এবং ছোটো ছোটো দুর্বল দেশগুলোর কাজকর্মে যুক্তরাষ্ট্রের অমানবিক হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ।

আধুনিকায়ন তত্ত্বে টিকে যাওয়া অনেক বিভ্রমের একটি ইসলামী বিশ্বের সাথে বিশেষভাবেই সম্পর্কযুক্ত। তা হল: যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসার আগে ইসলাম ছিল এক রকম সুদীর্ঘ শৈশবে স্থির, প্রাচীন একরাশ কুসংস্কারের বেড়ায় আবদ্ধ থাকার কারণে উন্নয়ন থেকে বিযুক্ত; মোল্লা-মৌলানাদের বাধার কারণে তা মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিকতায় ঢুকতে অক্ষম। এই জায়গায় এসে প্রাচ্যতত্ত্ব ও আধুনিকতার তত্ত্ব সুন্দর জোড়া লেগে যায়। প্রাচ্যতত্ত্ব প্রচলিত কায়দায় শিখিয়েছে যে, মুসলমানরা তাদের মনের বিশেষ ধরন, উলেমাদল এবং অগ্রগতি ও পশ্চিম-বিরোধী শাসকদের প্রভাবে পরিণত হয়েছে নিয়তিবাদী নিপীড়ক শিশুতে। আদতে যদি তাই হতো তাহলেন কি বিশ্বাসযোগ্য সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী সুযোগ পেলে বুঝিয়ে দিতে পারতো না যে, ইসলামে ভোগ্যদ্রব্য ও "ভালো" শাসক মারফত আমেরিকান জীবনযাত্রার ধরন পরিচিত করে তোলা যায়? আসল সমস্যা হচ্ছে, চীন ও ভারতের মত নয় ইসলামী বিশ্ব; একে কখনো সম্পূর্ণ বশীভূত বা পরাজিত করা যায়নি। পণ্ডিতদের উপলব্ধির সাথে সংঘাতমুখি কতিপয় কারণে ইসলাম (বা এর কতক অংশ) তার অনুগামীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রেখে চলেছে। এইসব অনুগামীদের সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়ে থাকে এরা বাস্তবকে মানতে চায়না, নিদেনপক্ষে সেই বাস্তবকে মানতে অস্বীকার করে যেখানে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের সুযোগ রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক ধরে আধুনিকায়নের চেষ্টা চলতে থাকে। ইরান হয়ে উঠে আধুনিকায়নের সফলতার একটি কাহিনী, আর তার শাসক "আধুনিকায়িত", উৎকর্ষের উপমা। ইসলামী বিশ্বের বাকী অংশের বিরোধিতা করে পশ্চিমা পণ্ডিতরা, নয়তো ওদেরকে আলোচনাতেই আনে না। তারা হতে পারেন আরব জাতীয়বাদী নেতৃবৃন্দ, মিশরের জামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্নো, ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদী, ইরানের বিরোধী নেতৃবন্দ অথবা হাজার হাজার অপরিচিত ইসলামী শিক্ষক, ভ্রাতৃত্ব সংঘ। এই সব পণ্ডিতরা প্রধানত বিনিয়োগ করেন আধুনিকায়ন তত্ত্বের ওপর এবং ইসলামী বিশ্বে আমেরিকার কৌশলগত ও আর্থ স্বার্থে।

সত্তর দশকের বিস্ফোরণোন্মুখ সময়ে আবার তার মৌলবাদী আপসহীনতার প্রমাণ দেয় ইসলাম। যেমন ইরানের বিপ্লব: না আধুনিকতাপন্থী না কমিউনিস্ট। যারা শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা আধুনিকায়ন তত্ত্বের পূর্ব-নির্ধারিত আচরণ বিধিমালায় ব্যাখ্যেয় নয়। তারা আধুনিকায়নের দৈনন্দিন লাভের জন্য (গাড়ি, বিশাল সামরিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সুস্থির শাসন) কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না এবং "পশ্চিমা" মতবাদসমূহের চাটুকারিতার মুখেও নির্বিকার। এদের—বিশেষ করে খোমেনির যে ব্যাপারটা সবচেয়ে সমস্যাজনক মনে হয় তা হচ্ছে, এমন যে-কোনো শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে মারমুখি অনিহা যা তাদের নিজস্ব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এরা এমন এক ইসলামে বিশ্বস্ত যা বিশেষভাবে ইরানী প্রকৃতির, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়, এবং নিজস্ব ধরনে সমর্থিত; এ সমর্থনও যেন মারমুখি। অথচ ইরানের কয়েক মাইল পশ্চিমে বেনিনের ইসরাইলে ক্ষমতাসীন শাসকদল এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে

তাদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য, যার ভিত্তি অত্যন্ত পশ্চাদপত এক ধর্মীয় মতবাদে। অথচ, অবাক হওয়ার মত ব্যাপার যে, পশ্চিমের যে-সব পণ্ডিত ইসলামের অতীতমুখিনতা নিয়ে কথা বলেন তাদের দুএকজন মাত্র ইসরাইলের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তারচেয়েও কম সংখ্যক ভাষ্যকার এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভশন ধর্মে অনুগামির সংখ্যা বহু মিলিয়ন, কিংবা ১৯৮০ সালের নির্বাচনে প্রতি তিনজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর দুই জনই আরেক জন্মে খ্রিস্টান হয়ে জন্ম নিতে আগ্রহী। এইসব ভাষ্যকাররাই ইসলামী উত্থানের নিন্দা করেন। কিন্তু তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের উপরোক্ত পরিস্থিতির কোনো মিল দেখেন না।

দু'একটা প্রাচ্যতাত্ত্বিক সাধারণীকৃত মন্তব্য উল্লেখ করা এখন একরম রীতিতে পরিণত হয়েছে (এগুলোর অধিকাংশই প্রচারিত হয়েছে বার্নার্ড লুইসের মত প্রবীন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের দ্বারা)। এগুলো উল্লেখের উদ্দেশ্যে হল গোটা ইসলামী বিশ্বের মুখে একটা চড় মারা। এইসব মামুলী কথা প্রত্যেক মুসলমানের আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে কি না সেই খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন দেখেন না। এই প্রবণতার সবচেয়ে তীব্র প্রকাশ দেখা যায় ইসলাম ও সন্ত্রাসকে একই ব্যাপার প্রমাণ করার আলোচনায়। এক কালের বামপন্থী, পরে ১৯৮০-র দশকে প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থীতে রূপান্তরিত কনর ক্রুজ ও ব্রায়ানের কথা বিবেচনা করা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে সংগঠিত সাংস্কৃতি বয়কট ভেঙ্গে ছিলেন এই কনর; ডানপন্থী ইসরাইলী ইহুদিবাদকে যথার্থ প্রমানের জন্য তার যুক্তির শেষ নাই। এ সত্ত্বেও তিনি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। এখানে একটি প্যারা তুলে দেয়া হল, যাতে আছে অলস ঐতিহাসিক-বিচার ও অতিমাত্রার সাধারণীকরণ এবং এমন অবিশ্বাস্য সব ছাঁচ নির্মান। ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বসহকারে চিন্তা করে এমন যে কোনো মানুষ এই সব ছাঁচ গ্রহণ করবে না, কেবল প্রায়-মূর্খ ছাড়া:

> কিছু সংস্কৃতি ও উপ-সংস্কৃতি এবং হতাশাব্যঞ্জক হেতু সন্ত্রাসের বংশবৃদ্ধির পূর্ব-নির্ধারিত উর্বর ক্ষেত্র। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ইসলামী সংস্কৃতি (ও ব্রায়ান কিন্তু আমাদেরকে বলেননি কিভাবে তিনি ধর্ম থেকে একলাফে সংস্কৃতিতে চলে গেলেন, এর প্রত্যেকটির সীমানাই বা কোনখানে শেষ)। নিজের সম্পর্কে এ সংস্কৃতির মত হল পৃথিবীতে তার অবস্থান সঠিক (এমন সুবিধাজনক তথ্য কোথায় পেলেন ব্রায়ান?); অথচ সমকালীন বিশ্ব-বিন্যাসের সাথে তার ফারাক অনেক (এ কথা বলা যায় প্রায় যে-কোনো সংস্কৃতির "আত্ম-ধারণা" সম্পর্কে)। খোদার ইচ্ছা যুদ্ধের বংশধরদের (অমুসলিম বিশ্ব) ওপর ইসলামীদের বিজয়, তবে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিতে তা অসম্ভব। উপসাগরীয় এলাকায় ইরানী মৌলবাদীদের শ্লোগান ছিল "ইসলাম অর্থ বিজয়" (ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ১৯৮০-৮৮)। যুদ্ধের বংশধরদের ওপর আঘাত হানার কথাটা বেশ মেধাদীপ্ত; তেমনি পশ্চিমে নিন্দিত এইসব তৎপরতার পেছনে যথেষ্ট জনসর্থনও ছিল। (লক্ষ্যনীয় যে, আলোচনায় ব্রায়ান বিশেষ কোনো ঘটনা, তথ্যের উৎস, উদ্ধৃতি বা পটভূমি জানাননি পাঠকদেরকে; তিনি আলোচনার এমন উদ্ভট পদ্ধতি বা যুক্তিবিন্যাস সম্পর্কে নিরুদ্বেগ)। তৎপরতার আসল লক্ষ্য ইসরাইল

(ইসরাইল কি করেছে, এখনো করছে সে প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে না; এ হচ্ছে নিখুঁত ইসলামী ত্রাস)। কিন্তু ইসরাইল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এইসব তৎপরতা থেমে যাবে বলে মনে হয় না। ("থিংকিং এ্যাবাউট ইসলাম", *দি আটলান্টিক*, জুন ১৯৮৬, পৃ-৬৫)।

এভাবে, নির্দিষ্ট একরকম ধর্মীয় আবেগের মারমুখি তীব্রতাকে কেবল ইসলামের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়; যদিও এখন সর্বত্র ধর্মীয় আবেগের বিস্তার ঘটছে। সোলঝেনেৎসিন বা পোপ দ্বিতীয় পলের মত মার্কামারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে তথাকথিত উদারনৈতিক প্রচার মাধ্যমের প্রচারণা এবং বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ঘটনাকে খ্রিস্টান ধর্মের সাথে সম্পর্কিত না করার প্রবণতায় বোঝা যায় ইসলামের প্রতি কেমন পক্ষপাতদুষ্ট ও হিংসাত্মক মনোভাব পোষণ করা হয়। উদ্ভট ধর্মীয় যুক্তির কারণে যে দেশটি ক্যাম্প-ডেভিড চুক্তি গ্রহণ করেনি সেই সৌদী আরব থেকে শুরু করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, আলজিরিয়া প্রভৃতি বহু মুসলিম দেশের আলোচনায় ধর্মীয় আবেগের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ তোলা এখন চলতি রীতি। সৌদী আরব ও কুয়েতকে "মুক্ত পৃথিবীর" অংশ বলার উপায় নেই; এমনকি শাহ্‌র আমলের ইরান প্রচণ্ড সোভিয়েত-বিরোধী অবস্থান নেয়া সত্ত্বেও দেশটিকে কখনো "আমাদের" বলে মনে হয়নি, যেমন মনে হয় ফ্রান্স বা বৃটেনকে। এ সত্ত্বেও নীতি-নির্ধারকরা ইরানকে "হারিয়ে" ফেলার কথা বলতে থাকেন, যেমন এর আগে চীন, ভিয়েতনাম ও এঙ্গোলা "হারিয়ে ফেলার" কথা বলতেন , প্রায় প্রথম তিন যুগ ধরে। তাছাড়া আমেরিকার সঙ্কট-ম্যানেজারদের বিবেচনায় পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় সামরিক দখলের জন্য উন্মুক্ত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ইরানই একটি অশান্তিদায়ক সমস্যা। ১৯৭০ সালের জুন ২৮ তারিখের *নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে* জর্জ বল লিখেন "ভিয়েত নাম শোকগাঁথা" দেশে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ও বিচ্ছিন্নতার নীতির প্রতি সমর্থন জাগাতে পারে। কিন্তু মধ্যপ্রাচে মার্কিন স্বার্থ এত বিরাট যে প্রেসিডেন্টের উচিত ওখানে সম্ভাব্য সামরিক আক্রমনের জন্য এদেশের মানুষদেরকে আগাম শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অন্যতম মূলভাব ছিল ভিয়েতনাম-জ্বিনের কবর দেয়া।

আরেকটা বিষয় আলোচনায় আসা দরকার: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইসলামের প্রতি মার্কিন মনোভাব গঠনে ইসরাইলের ভূমিকা। প্রথম কথা, ইসলাইলের স্বীকৃত ধর্মীয় চরিত্র কদাচ আলোচিত হয়েছে মার্কিন প্রচার মাধ্যমে। এই কিছুদিন থেকে ইসরাইলীদের ধর্মীয় উন্মাদনার কথা প্রকাশ্যে বলা হয়, যার বেশিরভাগই গাশ ইমুনিমের ইহুদি ধর্মান্ধতা সম্পর্কে। ইমুনিমের মূল তৎপরতা হল পশ্চিম তীরে জোরপূর্ব্বক বসতি স্থাপন। কিন্তু আসলে সম্প্রতি তৎপর ধর্মান্ধ ইহুদিরা নয়, ইসরাইলের "অসাম্প্রদায়িক" সরকারই যে দখলকৃত আরব এলাকায় বসতি স্থাপনের কর্মসূচীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে, সে সত্য অনেক আলোচনাতেই বাদ দেয়া হয়। আমি মনে করি, এ ধরনের এক-পাক্ষিক প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় কিভাবে ইসরাইলকে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধক বল্লম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; এ ইসরাইল হল মধ্যপ্রাচ্যের "একমাত্র গণতন্ত্র", এবং "আমাদের" একনিষ্ঠ মিত্র। এভাবে ইসরাইল পরিণত হয় বন্য ইসলামের মধ্য থেকে কেটে তোলা বুরুজ (প্রচুর

আত্ম-প্রশংসা ও স্বীকৃতিসহ)—যার কাজ পশ্চিমা সভ্যতাকে রক্ষা করা। দ্বিতীয়ত, আমেরিকানদের দৃষ্টিতে ইসরাইলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের সময় ইসলামী বিশ্বকে প্রাচীরাবদ্ধ করার কাজেও ব্যবহারযোগ্য; পশ্চিমের আধিপত্য স্থায়ী করা ও আধুনিকায়নের গুণাবলী প্রদর্শনেরও কাজে লাগে। এভাবে, প্রাচ্যে পশ্চিমের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য তিন ধরনের বিভ্রম অর্থনৈতিকভাবে একে অপরকে উৎসাহিত ও পুনঃসৃজন করেছে: ইসলাম সম্পর্কিত মনোভাব, আধুনিকায়ন মতবাদ এবং ইসরাইলের সামগ্রিক মূল্যবোধে পশ্চিমের প্রতি ইতিবাচকতা।

উপরন্তু, ইসলাম সম্পর্কে "আমাদের" মনোভাব পরিষ্কার বোধগম্য করার প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে তথ্য-সংশ্লিষ্ট ও নীতি-নির্ধারণী ক্ষেত্রে সক্রিয় গোটা এক গুচ্ছ যন্ত্র-সমবায় নির্ভর করেছে ঐ তিন বিভ্রমের ওপর; এগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপক পরিসরে। ভূ-রাজনৈতিক কৌশলবিদদের সাথে জোটে বাঁধা বড়সড়ো একদল বুদ্ধিজীবীও ইসলাম, তেল, পশ্চিমা সভ্যতার ভবিষ্যত এবং আন্দোলন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ বিস্তারের ধারণা—প্রদান করেছেন। পূর্বালোচিত কারণে এ ধারায় আরো জ্বালানী যুগিয়েছে ইসলাম বিশেষজ্ঞরা; যদিও স্বীকার করা দরকার যে, প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম চর্চার একটা অংশ মাত্র ভূ-রাজনৈতিক কৌশল ও স্নায়ুযুদ্ধের মতবাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সরাসরি কলুষিত হয়েছে। এর নিচেই আছে গণমাধ্যগুলো; এরা গ্রহণ করে উপরোক্ত দুই স্তর থেকে; অতপর গৃহীত জিনিষগুলো চাপ দিয়ে রূপান্তরিত করে নেয় ক্যারিকেচার, ভয়ংকর জনতা বা ইসলামী শক্তির ভাবমূর্তি, ইত্যাদিতে। ওদের আত্ম-অহমিকা ও অজ্ঞতার সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখা গেছে ওকলোহামা সিটিতে বোমা বিস্ফোরণের সময় (এপ্রিল, ১৯৯৫)। স্টিভেন এমারসনের মত "বিশেষজ্ঞদের" নেতৃত্বে ওরা একযোগে লাফ দিয়ে সাদামাটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, বোমা-বিস্ফোরণের পেছনে আছে ইসলামী সন্ত্রাসীরা। ১৯৯৬ সালের জুলাইয়ে টিডব্লিউএ ফ্লাইট নম্বর-৮০০ দুর্ঘটনায় পড়লে এই দলটি আবার একই দোষারূপ শুরু করে, অবশ্য এবার একটু নিচু গলায়। এর সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে পরাশক্তির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান: তেল কোম্পানী, বিশাল করপোরেশন ও বহুজাতিক কোম্পানী, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সম্প্রদায়, সরকারের নির্বাহী বিভাগ।

১৯৭৮ সালে প্রেসিডেন্ট কার্টার প্রথমবারের মত নতুন বছরের সূচনালগ্নটি কাটালেন তার অফিসে ইরানের শাহ্‌র সঙ্গে এবং বললেন ইরান হচ্ছে "সুস্থিরতার একটি দ্বীপ"। সেই মুহূর্তে কার্টার কথা বলছিলেন ঐ দুর্ধর্ষ যন্ত্রগুচ্ছের ঘুর্ণায়মান শক্তি নিয়ে; তিনি মার্কিন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, আবার তুলে ধরছিলেন ইসলামের ভাবমূর্তিও। আঠারো বছর পর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব সৌদী আরব সফরে এসে আগষ্টের দুই তারিখে যখন বললেন খোবার বোমা-বিস্ফোরণের জন্য দায়ী অপরাধীর তালিকায় ইরানের নাম এক নম্বরে এবং দেশটির বিরুদ্ধে "কঠোর পদক্ষেপ" নেয়া হবে, তখন তিনিও কথা বলছিলেন ঐ যন্ত্রটির বলে বলীয়ান হয়ে; এমনকি কিছুদিন পর যখন তিনি তার বক্তব্য সম্পূর্ণ উল্টে দেন, তখনো তা করেন সেই শক্তির প্রভাবেই।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

জ্ঞান ও তাফসীর

প্রাকৃতিক জগত বিষয়ক জ্ঞান বাদে, মানব-সমাজ সম্পর্কিত সকল জ্ঞানই ঐতিহাসিক। কাজেই এ জ্ঞান বিচার-বিবেচনা ও তাফসীরের ওপরের নির্ভরশীল। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তব ঘটনা বা উপাত্ত বলে কিছু নাই; বরং তাফসীরে ঘটনারাজির কি তাৎপর্য দাঁড় করানো হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে ঘটনার গুরুত্ব। নেপোলিয়ন বাস্তবে বেঁচেছিলেন এবং ফরাসি সম্রাট ছিলেন, এ নিয়ে কেউ তর্ক তুলে না। কিন্তু তিনি একজন মহান শাসক ছিলেন, না কি, কোনো কোনো দিক থেকে সর্বনাশা শাসক ছিলেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট তাফসীরি মতানৈক্য রয়েছে। এ ধরনের মতানৈক্য থেকেই ঐতিহাসিক রচনার সৃষ্টি, তা থেকেই আসে ঐতিহাসিক জ্ঞান। কারণ তাফসীরকারী কে, কাকে লক্ষ্য করে তাফসীর করা হচ্ছে, তাফসীরের উদ্দেশ্য কি, কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে তাফসীরটি করা হচ্ছে—এইসব বিষয়ের ওপর তাফসীর নির্ভর করে। এই অর্থে সকল তাফসীরই—বলা যায়—পরিস্থিতিজনিত এগুলো সবসময় একটি পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, তাফসীরের ওপর যার প্রভাব বরাবরই আত্মীকরণমুখি। অন্য তাফসীকারীরা যা বলেছেন তা সমর্থন করা বা তাতে অনাস্থা জ্ঞাপন অথবা সেগুলোর পনুরাবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে এটি সেই সব তাফসীরকারীর বক্তব্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হয়। পূর্ব-দৃষ্টান্ত বা অন্য তাফসীরের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা ছাড়া তাফসীর হয় না। যেমন কেউ ইসলাম, বা চীন কিংবা মার্কসবাদ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে অবশ্যই এ বিষয়ে অন্যান্য বক্তব্য সম্পর্কে জেনে নেবেন কোনো না কোনোভাবে, যাতে তিনি অপ্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয়ে পড়েন। কোনো লেখাই সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার মতো নতুন না (বা হতে পারে না)। কারণ মানব সমাজ সম্পর্কে লেখার সময় কেউ অংক কষতে বসে না, তাই এতে আমূল মৌলিকতাও আশা করা যায় না।

কাজেই, ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বিশেষ করে "অবৈজ্ঞানিক" অযাথার্থ্য ও তাফসীরের পরিস্থিতির অধীন। তবু আমরা সাময়িকভাবে বলতে পারি অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব; এর সাথে আরেকটা গুরুত্বপুর্ণ কথা বলা দরকার যে, এ জ্ঞান কাম্যও, তবে দুটো শর্তপূরণ সাপেক্ষে; ঘটনাক্রমে, সাম্প্রতিক ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন মোটের ওপর এ দুটো শর্তই পূরণ করে না। প্রথমত, শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন বোধ থাকতে হবে যে তিনি যে সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীকে অধ্যয়ন করবেন তাদের প্রতি তার জবাবদিহিতা আছে এবং ঐ সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক দমনমুখি নয়। আগে আমি বলেছি অপশ্চিমা জগত সম্পর্কে পশ্চিম যা জানে তার বেশিরভাগটাই জেনেছে উপনিবেশী পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে; তাই ইউরোপীয় পণ্ডিত তার বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছেন সামগ্রিক আধিপত্যের অবস্থান থেকে। এই

বিষয় সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা বলতে গিয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়'র বক্তব্য ছাড়া আর কারো মতামতের উল্লেখ করেননি বললেই চলে। ইসলাম ও ইসলামী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত জ্ঞান সামগ্রিক ভাবে কেবল আধিপত্য ও সংঘাত থেকেই নয়, সাংস্কৃতিক বিদ্বেষ থেকেও অগ্রসর হয়েছে; তার কারণগুলো আমি উল্লেখ করেছে এ বইয়ের শুরুতে এবং অরিয়েন্টালিজমে। পশ্চিমের সাথে যা কিছুর মৌলিক বিরোধ, আজকাল তার সাথে মিলিয়ে নেতিবাচকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইসলামকে। এবং এ টানাপোড়েন এমন এক পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠিত করেছে যা ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানকে আমূল সংকুচিত করে। যতদিন এই পরিকাঠামো কার্যকর থাকবে ততদিন মুসলমানদের যাপিত অভিজ্ঞতাস্বরূপ ইসলামকে জানা সম্ভব হবে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিরেট সত্য, ইউরোপের ক্ষেত্রে এর সত্যতা সে তুলনায় সামান্য কম।

দ্বিতীয় শর্তটি প্রথমটির পরিপূরক; এটি প্রথম শর্তকে পূর্ণতা দেয়। প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানের বিপরীতে সামাজিক পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান মূলত তা-ই আমি যাকে বলছি তাফসীর: এটি জ্ঞানের মর্যদা লাভ করে বিভিন্ন উপায়ে, যার কিছু কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক, বেশিরভাগই সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিকও। তাফসীর প্রথমত নির্মাণের একটি ধরন, অর্থাৎ তা নির্ভর করে মানুষের মনের বাসনাযুক্ত-ইচ্ছাকৃত তৎপরতার ওপর, যা সযত্নে ও অধ্যবসায় সহকারে ঢালাই করে ও আকার দেয় তার আগ্রহের জিনিষটাকে। নির্দিষ্ট একটি সময় ও স্থানে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়, যার রয়েছে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট পটভূমি ও একরাশ লক্ষ্য। কাজেই অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রধানত যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ বিভিন্ন রচনার তাফসীর, তা দূষণমুক্ত নিরাপদ পরীক্ষাগারে সম্পন্ন হতে পারে না, তেমনি তা বিষয়মুখি ফলাফল বলে গণ্য হওয়ার ভাণও করতে পারে না। তা একরকম সামাজিক ক্রিয়া এবং এর সৃজক পরিস্থিতির সাথে জট লাগিয়ে বাঁধা, সেই পরিস্থিতি একে হয় জ্ঞানের মর্যাদা দেয় অথবা সেই মর্যাদার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। কোনো তাফসীরই এই পরিস্থিতি অবহেলা করতে পারে না, এবং এই পরিস্থিতির তাফসীর ছাড়া কোনো তাফসীরই পরিপূর্ণ নয়।

দেখা যাবে অনুভুতি, অভ্যাস, প্রথা, সংসর্গ ও মূল্যবোধের মত অবৈজ্ঞানিক ঝঞ্জালও তাফসীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক তাফসীরকারী একজন পাঠক; এবং নিরপেক্ষ বা মূল্য-বিরহিত পাঠকের অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক পাঠকই এক একটি ব্যক্তিক অহং, আবার সমাজেরও সদস্য; সমাজের সাথে সংযোগ স্থাপক সকল সম্পর্ক তাকে যুক্ত করে সেই সমাজের সাথে। দেশপ্রেম বা অন্ধ স্বাদেশিকতা থেকে শুরু করে ভয় বা হতাশার মতো অনুভূতির মধ্যে কাজ করার সময় তাফসীরকারী অবশ্যই তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (যা নিজেই দীর্ঘ এক তাফসীরী প্রক্রিয়া) থেকে পাওয়া যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করবেন সুশৃঙ্খল উপায়ে। এক পরিস্থিতি থেকে আরেক পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ তাফসীরকারীর পরিস্থিতি থেকে রচনার সময় ও স্থানের পরিস্থিতিতে প্রবেশের বাধা দূর করতে হয় প্রবল চেষ্টায়। দূরত্ব ও সাংস্কৃতিক বাধা পেরিয়ে যাওয়ার বাসনাযুক্ত সচেতন প্রয়াসের ফলেই অন্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব, আবার এই বৈশিষ্টই

জ্ঞানকে সীমায়িত করে। এ পর্যায়ে তাফসীরকারী নিজেকে বুঝেন তার মানবীয় পরিস্থিতির আলোকে, আর রচনাকে বুঝেন এর সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। যা কিছু দূর কিন্তু মানবীয় তার সম্পর্কে সচেতনতার ফলস্বরূপ এটি ঘটতে পারে। বলা প্রায়-নিষ্প্রয়োজন যে, গোটা প্রক্রিয়াটির সাথে প্রথাগত প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের নির্দেশিত 'নয়া ও সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞান" অথবা প্রফেসর বাইন্ডারের আত্ম-সংশোধনমুলক "শাস্ত্রগুলোর" তেমন কোনো সংযোগ নেই।

তাফসীরী প্রক্রিয়ার শেষে পৌঁছানো যায় জ্ঞানে—যে জ্ঞান কোনোভাবেই স্থির কোনো কিছু নয়। তাফসীরী প্রক্রিয়ার এই বিমূর্ত বিবরণ সম্পর্কে আরেকটা কথা বলা দরকার। যেখানে স্বার্থ নেই সেখানে তাফসীর, উপলব্ধি ও জ্ঞান কোনোটাই সম্ভব নয়। একে মামুলি সত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই প্রকট সত্যই সচরাচর উপেক্ষিত বা অস্বীকৃত হয়। সমকালের কোনো আরবী বা জাপানী উপন্যাসের পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে একজন মার্কিন সমালোচক যেমন অচেনা জিনিষের সাথে কাজ করতে হয় তা একজন রসায়নবিদ কর্তৃক কোনো রাসায়নিক সূত্রের অর্থ উদ্ধারের কাজের তুলনায় ভিন্ন। রাসায়নিক উপাদানসমূহ অবিচ্ছেদ্যভাবে সক্রিয় নয় এবং কারো অনুভূতিকে জড়ায় না; অবশ্য সম্পূর্ণ বাইরের দিককার কারণে সেগুলো বিজ্ঞানীর মধ্যে আবেগমুলক সংযোগ উস্কে দিতে পারে। যাকে বলা যায় মানবতাবাদী তাফসীর তার ক্ষেত্রে উল্টোটাই সত্যি; বহু তাত্ত্বিকের মতে এ জাতীয় তাফসীরের প্রকৃত সূচনা হয় নিজের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে তাফসীরকারীর সচেতন হয়ে ওঠা, যে রচনাটির তাফসীর হবে তার সাথে তাফসীরকারীর বিচ্ছিন্নতার বোধ, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। হ্যান্স জর্জ গ্যাডামার যেমন বলেছেন :

> যিনি একটি রচনা বুঝতে চাচ্ছেন তিনি সেই রচনা থেকে কোনো একটি বক্তব্য লাভের ব্যাপারে মানসিক ভাবে প্রস্তুত। এ কারণে তাফসীরী কাজে প্রশিক্ষিত মন প্রথম থেকেই রচনাটির নতুনত্বের গুণ সম্পর্কে অবশ্যই স্পর্শকাতর হবে। এ ধরনের স্পর্শকাতরতার জন্য লক্ষ্যীভূত বস্তুটি সম্পর্কে "নিরপেক্ষতা" প্রয়োজন হয় না, বা নিজের আমিত্ব বিলীন করে দেয়ারও দরকার হয় না; বরং এ হচ্ছে নিজের পূবার্থসমূহ (পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফল হিসেবে এরই মধ্যে যে-সব অর্থ বা তাফসীর বর্তমান, সেগুলো) ও পক্ষপাতিত্ব অঙ্গীভুত করে নেয়ার ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিজের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা, যাতে গ্রন্থটি তার তাবত নতুনত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে তুলে ধরে এবং কারো পূর্বাথসমূহের বিপরীতে আপন সত্য জাহিরে সক্ষম হয়।

কাজেই, ভিন্ সংস্কৃতিতে রচিত কোনো বই পাঠের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে এর দূরত্ব সম্পর্ক সচেতন হওয়া; (সময় ও স্থান উভয় দিক থেকে) এই দূরত্বের মূল শর্ত হচ্ছে—যদিও একমাত্র অর্থে নয়, তবে আক্ষরিক অর্থে—নিজের কাল ও স্থানে তাফসীরকারীর উপস্থিতি। আমরা দেখেছি রক্ষণশীল প্রাচ্যতাত্ত্বিক বা "অঞ্চল অধ্যয়নের" কায়দা হচ্ছে দূরত্বের সাথে কর্তৃত্বের সমীভবন, দূরের সংস্কৃতির অচেনা অবস্থাকে পণ্ডিতি জ্ঞানভাষ্যের কর্তৃত্বময় বাকচাতুর্যে অধিভুক্ত করে নেয়া, এতে জ্ঞানের

সামাজিক মর্যাদা নিহিত; কিন্তু সেই অচেনা অবস্থা তাফসীরকারীর নিকট থেকে কি বের করে নিয়ে এসেছে এবং কোন ক্ষমতা-কাঠামোয় তাফসীরকারীর কাজটি সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ থাকে না। আমি সোজাসুজিই বলছি যে, পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত কোনো লেখক আজকাল প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না যে "ইসলাম" গণ্য হয় একটি শত্রু সংস্কৃতি হিসেবে, কিংবা একজন পেশাজীবী পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু বলেন তা বলেন করপোরেশন, প্রচারমাধ্যম ও সরকারের প্রভাব বলয়ের মধ্যে থেকে; ফলে এসব কিছুই তাফসীর সৃষ্টিতে বড়সড় ভূমিকা পালন করে এবং ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানকে পরিণতি করে কাম্য বিষয়ে ও "জাতীয় স্বার্থের" অনুকূল ব্যাপারে। আমার আলোচিত যুক্তিতর্কের একটি আদর্শ নমুনা হলেন লিওনার্দ বাইডিং: এ ব্যাপারগুলো তিনি উল্লেখ করেন, অতপর গায়েব করে ফেলেন পেশাবৃত্তিতা ও "শাস্ত্রসমূহের" প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য লেখা একটিমাত্র বাক্যে; এগুলোর জোটবদ্ধ কাজ হল যৌক্তিক বিষয়মুখিনতার মুখোশের জন্য যা কিছু সমস্যা তৈরি করে তার সবকিছু বাতিল করে দেয়া। এই হল সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞানের নমুনা, যা মুছে ফেলে তার উৎপাদক ধাপগুলোকে।

তাফসীরের একটি দিক হিসেবে "স্বার্থ"কে আরো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও নিরেট করা সম্ভব। কেউ ঘটনাক্রমে ইসলাম, ইসলামী সংস্কৃতি বা সমাজের দেখা পেয়ে যায় না। পশ্চিমের শিল্পায়িত দেশগুলোর মানুষদের সাথে ইসলামের দেখা-শোনা, হয় রাজনৈতিক তেল-সংকটের বদৌলতে, না হয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে, নয়তো প্রচার মাধ্যমের মনোযোগ মারফত, নতুবা বিশেষজ্ঞতার দীর্ঘ এতিহ্য অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে প্রাচ্যাতাত্ত্বিক ভাষ্যের বদৌলতে। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ হতে মনস্থ করেছেন এমন এজন তরুণ বা তরুণী ঐতিহাসিকের ব্যাপারটিকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক। তিনি এ বিষয়টি অধ্যয়ন করতে আসেন তিনটি উপাদানের সক্রিয়তার মধ্যে, যেগুলো পরিস্থিতি ঢালাই করে আকার দেয়; এই পরিস্থিতিতেই "বাস্তব ঘটনাবলী"—তথাকথিত কাঁচা উপাত্তসমূহ—অনুমানে ধরা নেয়া হয়। এর মধ্যে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস, সংবেদনশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীকেও হিসেবে ধরতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে তার আগ্রহের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক গঠিত এইসব নিয়ে। নিখাদ অনুসন্ধিৎসা আবার আরো কিছু ব্যাপার দ্বারা প্রভাবিত হয়: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী বা তেল কোম্পানীর পরামর্শকের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা; কনফারেন্স, টেলিভিশন বা বক্তৃতা মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার বাসনা; বিখ্যাত পণ্ডিত হওয়ার অর্থাৎ ইসলাম যে একটি চমৎকার (এবং সে কারণে ভয়াবহ) সাংস্কৃতিক পদ্ধতি তা "প্রমাণ" করার আকাঙ্ক্ষা; সেই সংস্কৃতি ও তাকে জানার আকাঙ্ক্ষা এ দুয়ের মধ্যে উপলব্ধির সাঁকো হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই ঐতিহাসিক যা অধ্যয়ন করতে যাচ্ছেন তাতে ছাপ ফেলে সংশ্লিষ্ট রচনাসমূহ ও অধ্যাপকবৃন্দ, পণ্ডিতি ঐতিহ্য ও সংশ্লিষ্ট বিশেষ মূহূর্তটিও। শেষে, বিবেচনাযোগ্য আরো কিছু দিক থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেউ যদি উনিশ শতকের সিরিয়ায় প্রচলিত ভূমিস্বত্ব নিয়ে গবেষণা করে থাকেন তা হলে, তার অধ্যয়ন যতই খটখটে ও বিষয়মুখি হয়ে থাকুক না কেন, তা সমকালীন নীতির সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ার সম্ভাবনা চৌদ্দ আনা, বিশেষ

করে এমন কোনো সরকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে যিনি সিরীয় বাথ পার্টির ক্ষমতার বিপরীত-শক্তি হিসেবে ঐতিহ্যক্রমিক কর্তৃত্বের (যা ভূমিস্বত্ত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, তার) গতি-প্রকৃতি বুঝতে খুবই উদগ্রীব।

তবে প্রথমত, দূরবর্তী সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভের জন্য যদি কোনো দমনমুক্ত চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত, তাফসীরকারী যদি তার নিজের তাফসীরী পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকেন (অর্থাৎ তাফসীরকারী যদি বুঝতে পারে অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান পরম জিনিষ নয়, বরং সেই জ্ঞান উৎপাদনকালীন তাফসীরী পরিস্থিতির সাথে আপেক্ষিক সম্পর্কে সম্পর্কিত) তাহলে এমন সম্ভাবনাই বেশি যে, তিনি অনুভব করতে পারবেন ইসলাম ও অন্যান "অচেনা" সংস্কৃতির প্রতি ঐতিহ্যিক মনোভাব খুবই সঙ্কীর্ণ। সে তুলনায়, ঐতিহ্যিক মনোভাবের সঙ্কীর্ণতা উৎরে যাওয়ার লক্ষ্যে বিরোধীজ্ঞান তা থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে অবস্থান নেয়। কারণ বিরোধী পণ্ডিতেরা এই ধারণা প্রত্যখ্যান করেন যে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানকে অব্যবহিত সরকারী নীতিমালার স্বার্থের তাবেদার হতে হবে, কিংবা একে প্রচার মাধ্যমের বানানো ইসলামের ভাবমূর্তিতে মালমশলা সরবরাহ করতে হবে, যে প্রচার মাধ্যম আবার গোটা বিশ্বকে সংহিসতা ও জঙ্গীবাদের যোগান দেবে; ঐসব পণ্ডিতেরা তুলে ধরেন জ্ঞান ও ক্ষমতার জটিল সম্পর্ককে। এর মধ্য দিয়ে তার যা চান তা হল ইসলামের সাথে ক্ষমতার প্রয়োজনে স্থাপিত সম্পর্কের বাইরে অন্য সম্পর্ক স্থাপন। বিকল্প সম্পর্ক খোঁজার অর্থ হল অন্য কোনো তাফসীরি পরিস্থিতির খোঁজ করা; এর ফলে তৈরি হয় অনেক বেশি সতর্ক একটি পদ্ধতিগত বোধ।

সবশেষে, যাকে সমালোচকেরা বলেছেন তাফসীরীকারী চক্র, তার থেকে সহজ মুক্তির কোনো উপায় নেই যদিও। সংক্ষেপে বলা যায়, সামাজিক পৃথিবী সম্পর্কিত জ্ঞান তার ভিত্তিস্বরূপ তাফসীরের চেয়ে কখনো ভালো কিছু নয়। ইসলামের মত একটি জটিল ও বোধ-ফাঁকি দেয়া বিষয়ে আমাদের যাবতীয় জ্ঞান আসে বইপত্র, ভাবমূর্তি ও অভিজ্ঞতা মারফত; কিন্তু এগুলো ইসলামের প্রত্যক্ষ মূর্তি নয় (দৃষ্টান্ত দিলে যা বোঝা যাবে), বরং প্রতিনিধিত্ব বা এর তাফসীর। অন্য কথায়, ভিন্ন সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের নিকট পৌছায় পণ্ডিতের—সময়, স্থান ও অন্তর্গত গুনাবলীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা—ব্যক্তিক পরিস্থিতি, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সংমিশ্রণের মাধ্যমে। যে সমাজে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার চাহিদা সাপেক্ষে নির্ধারত হয় ঐ জ্ঞানের যাথার্থ বা অযাথার্থ, ভালোত্ব বা মন্দত্ব। তবে বাস্তব ঘটনার একটা ব্যাপার তো অবশ্যই আছে, যা না হলে জ্ঞান অসম্ভব: আরবী, বারবার এবং মরক্কো সমাজ ও দেশটি সম্পর্কে কিছুই না জেনে কিভাবে মরক্কোর ইসলামকে জানা যাবে? তবে, এ ছাড়াও, মরক্কোর ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান ওখানকার সাথে এখানকার যোগযোগা—একটি নিষ্ক্রিয় বস্তু ও তার ধারকের সংযোগের জিনিষ নয়, তা হচ্ছে (সচরাচর) উভয়ের মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাপার, যা কোনো উদ্দেশ্যে পরিচালিত যেমন একটি পণ্ডিতি নিবন্ধ, বক্তৃতা বা টেলিভিশন সম্প্রচারে আবির্ভূত হওয়া অথবা নীতি-নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান। উদ্দেশ্য পুরণ হলে ধরে নেয়া হয় জ্ঞান উৎপাদিত হয়েছে। জ্ঞানের অন্য ব্যবহার আছে (এতে এর ব্যবাহরহীনতাও অন্তর্ভুক্ত), তবে প্রধান প্রধানগুলো কার্যকর ও সহায়ক।

কাজেই যা জ্ঞান হিসেবে চলছে তা অত্যন্ত মিশ্রিত জিনিষ; তা নির্ধারণে আভ্যন্তরীণ চাহিদার চেয়ে বাইরের চাহিদার ভূমিকা বেশি। আমেরিকার নামধন্য কোনো পণ্ডিত কর্তৃক পাহলভী শাসনামলের ইরানের এলিটদের সম্পর্কে গবেষণা সেইসব কর্মকর্তার কাছে খুব জরুরী মনেহবে, যারা রাজকীয় শাসনের সাথে লেনদেনে নিয়োজিত। কিন্তু রক্ষণশীলত বৃত্তের বাইরের কোনো ইরান বিশেষজ্ঞের বিচারে ঐ গবেষণাকে মনে হবে ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ভরা। বিচারের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের অর্থ এই নয় যে, আরো ভালো নিয়ামক খুঁজতে হবে, আরো কড়া কষ্টিপাথর দরকার। বরং এতে আমাদের স্মরণ হওয়া দরকার যে, তাফসীরের প্রকৃতিই আমাদেরকে আবার তাফসীরের সৃষ্ট সমস্যার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়; যেন প্রশ্ন করি কার জন্যে, কি উদ্দেশ্যে এবং কেন এই পরিপ্রেক্ষিতে করা তাফসীরটি অন্য আরেক পরিপ্রেক্ষিতের তাফসীরের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য। তাফসীর, জ্ঞান, যেমন ম্যাথুউ আর্নল্ড বলেছেন, এবং সংস্কৃতি হচ্ছে লড়াইয়ের ফসল, এগুলো বেহেশতের উপহার নয়।

এ বইয়ে আমার আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা প্রতিষ্ঠান, সরকার ও প্রচার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে মতাদর্শ-প্রভাবিত, রক্ষণশীল ধারার যে-প্রচার দেখি সেগুলো পরস্পর সম্পর্কিত: এবং পশ্চিমে অন্যান ধারার প্রচারের তুলনায় এটি বেশি বিস্তৃত, প্রভাবশালী, প্ররোচক। এ জাতীয় প্রচারের সাফল্যে কারণ এই নয় যে তা সত্য ও নিখুঁত; বরং এর সাফ্যল্যের আসল কারণ হচ্ছে এর স্রষ্টা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক প্রভাব। আমি এও বলেছি যে, এ প্রচার কাজ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চাহিদার খুব সামান্যই পুরণ করতে পেরেছে। তা ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের বিজয় নয়, মূলত বিশেষ এক ধরনের তাফসীরের জয়। কিন্তু সেই তাফসীর চ্যালেঞ্জবিহীন থাকেনি এবং অনুসন্ধানী ও অ-রক্ষণশীল মনের প্রশ্নের সামনে অভেদ্যও নয়।

এ কারণে উপসাগরীয় যুদ্ধ ব্যাখ্যায় "ইসলাম" কথাটা কাজে আসেনি, যেমন বিশশতকের কালো আমেরিকানদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যায় "নিগ্রো মেন্টালিটি" কথাটাও ব্যর্থ হয়েছে। যে-সব বিশেষজ্ঞ এগুলো ব্যবহার করে এবং এগুলোর ওপর নির্ভর করেই খেয়ে পরে বাঁচে, এগুলো তাদেরকে আত্মকামী তৃপ্তি দেয় বটে, কিন্তু এইসব সর্বাত্মকবাদী ধারণাসমূহ ঘটনার তীব্র গতিবেগ কিংবা ঘটনাসমূহের উৎপাদক জটিল শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এর ফলে সমরূপমুখি ধারণার বিবৃতি ও প্রকৃত ইতিহাসের বহুগুণ শক্তিশালী ধারণা ও ধারাহীনতার বিবৃতির মধ্যে থেকে যায় ক্রমবর্ধমান ফাঁক। মাঝে মধ্যে এই ফাঁকের মধ্যে পা দিয়েছেন এক এক জন মানুষ, সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, আশা করেছেন যুক্তিসঙ্গত উত্তরের।

আমাদের আবাসিত বিশ্বের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম-বিভাজন ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ বিভাজন দরকারী, জ্ঞান নিজেই তা দাবি করে, একে ঘিরেই সংগটিত পশ্চিমের সমাজ। তবু আমার মনে হয় মানব সমাজ সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞানই সাধারণ বোধবুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব—অর্থাৎ সেই বুদ্ধি যা সাধারণ মানবিক অভিজ্ঞতা

থেকে বেড়ে ওঠে; এবং এই জ্ঞান একরকম সমালোচনামূলক মূল্যায়নেরও আওতায়। এই দুইটা জিনিষ, সাধারণ বোধবুদ্ধি আর সমালোচনমুখি মুল্যায়নই সামাজিক ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী যা সবার নাগালের ও চর্চার মধ্যে, কেবল গুটিকয় মার্কা মারা বিশেষজ্ঞের বাড়তি সুবিধা নয়। তবু চীনা আরবী শেখার জন্য কিংবা অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও জনসংখ্যার প্রবণতা বুঝার জন্য প্রশিক্ষণের দরকার আছে। এবং প্রতিষ্ঠানকেরই এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। সমস্যা হল যখন প্রশিক্ষণ চক্র তৈরি করে ও সাংবাদিক স্বভাবের বিশেষজ্ঞ বানায় যারা সম্প্রদায়ের বাস্তবতা, শুভবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দায় থেকে দূরে সরে গিয়ে যেকোনো মূল্যে বিশেষ স্বার্থান্বেষী দলকে সহায়তা করে অথবা স্বেচ্ছায় ও প্রশ্নছাড়া নিয়োজিত হয় ক্ষমতার সেবায়। উভয়ক্ষেত্রেই, ইসলামের মত ভিন্ সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিশদ বিশ্লেষিত ও উপলব্ধ করার বদলে কাভার করা হয়। এর মধ্যে ভয়ও থাকে যে নতুন কল্পকাহিনী সৃষ্টি হতে পারে, এবং অজানা ধরনের সব তথ্য-বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

গত কয়েক বছরের যে-কোনো সময়ের বিবেচনায় দেখা যায়, অনেক প্রমাণও আছে যে, সামগ্রিকভাবে অপশ্চিমা সমাজ ও বিশেষভাবে ইসলামী বিশ্ব মার্কিন বা ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী, প্রাচ্যতাত্ত্বিক ও অঞ্চলবিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত বিন্যাসের সাথে খাপ খায় না। এ ব্যাপারটাকে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখিয়েছেন সরবোনে ইসলামী চিন্তার অধ্যাপক আলিজিরিয়ার পণ্ডিত সমালোচক মোহাম্মদ আরকন :

> "ইসলামী অধ্যয়ন" বিষয়ক বিদ্যায়তনিক জ্ঞানভাষ্য এখনো ব্যাখ্যা দেয়নি যে, কিভাবে এত বিচিত্র ক্ষেত্র, তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক পরিসর, শাস্ত্র ও ধারণাসমূহ একটি মাত্র শব্দ "ইসলাম"-এর সাথে জড়িয়ে গেছে এবং কেন ইসলাম বিষয়ক আলোচনা এমন একমাত্রিক। অন্যদিকে, পশ্চিম সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের বৈশিষ্ট হচ্ছে সযত্ন নিরীক্ষণ, খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ, সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার ও তত্ত্ব রচনা। বস্তুত, পশ্চিমা সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের বিকাশ এখনো এ ধারাতেই অব্যাহত এবং তা সরে যাচ্ছে "ইসলাম" ও "আরব বিশ্বের" অধ্যয়নে গৃহীত দুর্ভাগ্যজনক পন্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে। (১৯৯৬ সালের আগষ্টের ১ তারিখের লন্ডন রিভিউ অব বুকসে ম্যালিস রুথভেনের লেখায় উদ্ধৃত)।

এটি নিশ্চিত সত্য যে গোটা ইসলামী বিশ্ব মার্কিন-বিরোধী ও পশ্চিম-বিরোধী নয়, তেমনি তৎপরতার মধ্যেও সে জগত একীভূত না, এমনকি ভবিষ্যতবাণী করার মতও নয়। এইসব পরিবর্তনের বিরক্তিকর তালিকা না দিয়ে আমি বলছি যে এই অবস্থার অর্থ হল ইসলামী বিশ্বে নয়া ও অনিয়মিত বাস্তবতা দেখা দিচ্ছে; এও সত্য যে, বিগত বছরগুলোয় প্রদত্ত তত্ত্বমালার শান্ত বিবরণে বাধ সেথে উত্তর-উপনিবেশি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এখন একই রকম অনিয়মিতি দৃশ্যমান। "অনুন্নয়ন" বা "আফ্রো-এশীয় মানসিকতা"র পুরানো সূত্র পুনরায় আওড়ানো যথেষ্ট বোকামীর কাজ। কিন্তু এগুলোকে পশ্চিমের দুঃখজনক পতন, উপনিবেশবাদের দুর্ভাগ্যজনক অবসান, এবং আমেরিকার ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত করা—আমি সবোর্চ্চ

দৃঢ়তার সাথে বলবো—খাঁটি নির্বুদ্ধিতা মাত্র। স্থান ও আত্ম-পরিচয়ের বিচারে আটলান্টিক থেকে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী দেশগুলোকে আমার আকঙ্ক্ষামতো পরিবর্তন করার কোনো উপায় নাই। কেউ একে নিরপেক্ষ বাস্তবতা বলে স্বীকার করে নিতে পারেন, সেইসাথে একে ভালো কোনো ব্যাপার বলে ভাবতে নাও পারেন (আমি যেমন মনে করি)। এক নিঃশ্বাসে ইরানকে হারানো তাই ইরানের হুমকি এবং পশ্চিমের পতনের কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পদক্ষেপ-গ্রহণে অধিকাংশ উপায় আগাম বন্ধ করে দিই; কেবল খোলা থাকে পশ্চিমের উত্থান এবং ইরান ও উপসাগরীয় এলাকা পুনর্দখলের পথ, যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে গত দুই যুগ ধরে। ইসলামী বিশ্বে বৃটিশ বা ফরাশি কিংবা মার্কিন আধিপত্যের অবসানের কারণে যেসব "বিশেষজ্ঞরা" তাদের লেখায় বিলাপ করেন (বা আধিপত্য পুনরুদ্ধারের ওকালতি করেন) তাদের সাম্প্রতিক সাফল্য—আমার মতে—আসলে ভয়ংকর এক প্রমাণ যে, নীতি-নির্ধারকদের মনের গভীরে কোন ইচ্ছা ঘাপটি মেরে থাকতে পারে; তেমনি আগ্রাসন ও পুনর্দখলের প্রয়োজনীয়তা কত তীব্র তারও ইঙ্গিত[৩২]। জেনে বা না জেনে এই প্রয়োজনীয়তার পক্ষে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয়দের মধ্যে অনুগত যে-অংশটি একই সুরে গলা মেলাচ্ছে তারাও মোসাহেবীর জীর্ণ ইতিহাসেরই অংশ; এরা কিছুতেই তৃতীয় বিশ্বের নয়া পরিপক্কতার চিহ্ন নয় (যদিও কেউ কেউ তা-ই মনে করেন)।

আজকাল পশ্চিমে দখলের প্রসঙ্গ বাদে, অন্য ক্ষেত্রে যে "ইসলাম" বোঝানো হয়ে থাকে তা আসলে ইসলাম নয়। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি বিকল্প হাজির করতে হবে। যদি "ইসলাম" যতটা বলার কথা তার চেয়েও কম অবহিত করে, এবং যদি এটি যতটা না প্রচার করে তার চেয়েও বেশি আড়াল করে তাহলে কোথায় এবং কিভাবে আমরা সেই তথ্যের খোঁজ করবো যা ক্ষমতার নয়া স্বপ্ন বা পুরনো ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের কোনোটাকেই উৎসাহিত করবে না। কোন ধরনের অনুসন্ধান এ পর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে তা আমি এই বইয়ে উল্লেখ, কোনো কোনোটির বর্ণনাও দিয়েছে; আমি বলেছি এগুলোর শুরু এই ধারণা নিয়ে যে, জ্ঞান হচ্ছে তাফসীর; এও বলেছি সদাসতর্ক ও মানবীয় হতে হলে এবং জ্ঞানে পৌঁছতে হলে তাফসীরকে তার গৃহীত পদ্ধতি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু অন্য সংস্কৃতি, বিশেষত ইসলাম বিষয়ক তাফসীরের ক্ষেত্রে অন্তরালস্থিত পছন্দের বিষয়টির মুখোমুখি হচ্ছেন ব্যক্তি পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা: তিনি ক্ষমতার সেবায় তার বুদ্ধি নিয়োজিত করবেন, নাকি সমালোচনা, সম্প্রদায়, সংলাপ ও নৈতিক বোধের কাজে লাগাবেন। এ যুগে তাফসীরের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পছন্দ ঠিক করা; কিন্তু তা স্থগিত করে রাখলে চলবে না, সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হতে হবে। পশ্চিমে ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের ইতিহাস যদি দখল ও আধিপত্যের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে বাঁধা হয়ে থাকে, তাহলে এখন সেই বাঁধন ছিড়ে ফেলে দেয়ার সময় এসে গেছে। এ ব্যাপারে কোনো মাত্রার জোরপ্রদানই বেশি বলে গণ্য হবে না। কারণ তা না হলে আমরা যে এক দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা—হয়তো যুদ্ধেরও মুখোমুখি হবো কেবল তা-ই নয়, বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রসমেত গোটা মুসলিম বিশ্বের কাছে তুলে ধরবো বহু যুদ্ধ,

অকল্পনীয় দুর্ভোগ ও সর্বনাশা অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও। এ ছাড়াও আছে এমন এক বিজয়ী "ইসলাম"-এর প্রসঙ্গ যা তার ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিক্রিয়া, রক্ষণশীলতা ও বেপরোয়া মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। জোর আশাবাদীতার আলোকেও কিছুতেই সুখকর নয় সে সম্ভাবনা।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল

বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্ব

বুদ্ধিজীবীরা কি অনেক বড় অথবা বেশ ছোট বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত? এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বিংশ শতকে দুটো পরস্পরবিরোধী মতামত লক্ষ্য করা যায়। ইটালিয়ান মার্কসবাদী, একনিষ্ঠ কর্মী, সাংবাদিক ও মেধাবী রাজনৈতিক এবং দার্শনিক এন্টনিও গ্রামসির বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৬-১৯৩৭ সময়কালে গ্রামসি মুসোলিনির কারণে কারাগারে ছিলেন। কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি Prison Notebooks-এ লেখেন, সব মানুষই বুদ্ধিজীবী একথা প্রত্যেকেই বলতে পারে কিন্তু সমাজে সব মানুষ বুদ্ধিজীবীর কাজ করে না[১]। গ্রামসি তার নিজের জীবনে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন একাধারে ইটালিয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সংগঠক এবং সাংবাদিকতা-জীবনে দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষকদের একজন। তাঁর লক্ষ্য শুধু সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই নয়, ঐ আন্দোলনের সাথে যুক্ত পুরো সংস্কৃতি ও সংগঠনও নির্মাণ করা।

সমাজে যারা বুদ্ধিজীবীর কাজ করেন, গ্রামসি তাঁদেরকে দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত ঐতিহ্যগত বুদ্ধিজীবী। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক এবং প্রশাসকরা। তাঁরা বংশ-পরম্পরায় একই ধরনের কাজ করে যান। দ্বিতীয়ত জৈবিক বুদ্ধিজীবী। গ্রামসি তাঁদেরকে সরাসরি শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদেরকে স্বার্থ হাসিল, অধিক শক্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে গ্রামসি জৈবিক বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলেন, তারা পুঁজিবাদী উদ্যোক্তা, শিল্প প্রযুক্তিবিদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, নতুন সংস্কৃতি ও নতুন বৈধ ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগঠক তৈরি করে। গ্রামসির মতে আজকের যে বিজ্ঞাপনী[২] কিংবা জনসংযোগ কুশলী কোনো ডিটারজেন্ট কিংবা এয়ারলাইন কোম্পানীর জন্য বেশী বাজার তৈরি করতে পারবেন তিনিও জৈবিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যে ব্যক্তি সম্ভাব্য ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে সফলকাম হবেন এবং ক্রেতা কিংবা ভোটারদের মতামত তৈরি করতে পারবেন। গ্রামসি মনে করেন, জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয়ভাবে সমাজের সাথে যুক্ত অর্থাৎ তারা অবিরামভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন ও বাজার বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের মতো একস্থানে বসে থেকে বছরের পর বছর একই ধরনের কাজ না করে জৈবিক বুদ্ধিজীবীরা সবসময় চলমান থাকে। সবসময়ই কিছু-না-কিছু তৈরিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।

অন্যদিকে জুলিয়ান বেন্দাও বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি তাদেরকে দার্শনিক রাজাদের ক্ষুদ্র দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যারা মানবজাতির বিবেককে

নিয়ন্ত্রণ করে। এ কথা ঠিক যে বেন্দা তাঁর La trahison des clercs অর্থাৎ 'বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা' নামক বইটিতে বুদ্ধিজীবীদেরকে আক্রমণ করেছেন। যে-সব বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের চেয়ে নীতির সাথে আপোষ করেন, তিনি মূলত তাঁদেরকে আক্রমণ করেছেন। তিনি অল্প কয়েকজন ব্যক্তির নাম এবং তাঁদের কিছু বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যাদেরকে তিনি যথার্থই বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেন। তিনি সক্রেটিস ও যিশুর নাম বার বার উল্লেখ করেছেন এবং সাথে সাথে স্পিনোজা, ভলটেয়ার ও আর্নেস্ট রেনানের নামও এসেছে। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং খুব দুর্লভ ব্যক্তি এরা। তাঁরা যে বিষয়গুলো উন্মোচন করেন সেগুলো চিরন্তন সত্য ও ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সেগুলো এই পৃথিবীর বিষয় নয়। এখানে বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে বেন্দারের ধর্মীয় প্রত্যয়ে এক বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। তিনি সর্বদাই সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বিশেষ করে ঐসব সাধারণ মানব সম্প্রদায় যারা বস্তুগত সুবিধা, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং যদি সম্ভব হয় ইহজাগতিক শক্তির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক করতে আগ্রহী থাকে। তিনি বলেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নয়। তারা আনন্দ খোঁজে শিল্প, বিজ্ঞান, কিংবা দর্শনের মধ্যে। এক কথায় বলতে গেলে অবস্তুগত সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধান করে। এখানে তিনি বিশেষভাবে বলেছেন, আমার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়।[৩]

বেন্দা'র উদাহরণ থেকে এটি পরিষ্কার যে, তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বাস্তবতাবর্জিত চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণা সমর্থন করেন না। এই সব চিন্তাবিদরা অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং গূঢ় বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা কখনোই অধিবিদ্যা ও ন্যায় ও সত্যের অনাকাঙ্ক্ষিত নীতির দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। তারা দুর্নীতির নিন্দা জানায়। দুর্বলকে রক্ষা করে। অন্যায় ও শোষণমূলক শাসনের বিরোধিতা করে। তিনি বলেন, আমার স্মরণ করা প্রয়োজন কিভাবে ফেনলন (Fenelon) ও ম্যাসিলন (Massilon) চতুর্দশ লুইয়ের কতিপয় যুদ্ধের নিন্দা জানিয়েছিল। কিভাবে ভলটেয়ার প্যালাটিনেটের হত্যার সংবাদকে ধিক্কার দিয়েছিল। কিভাবে বাকলে ফরাসি বিপ্লবের প্রতি ইংল্যান্ডের অসহনীয়তাকে নিন্দা জানিয়েছিল? এবং বর্তমানে আমাদের সময়ে ফরাসিদের প্রতি কিভাবে নাৎসি জার্মানিরা নিষ্ঠুর আক্রমণ চালিয়েছিল?[৪] বেন্দা'র মতে, আজকের বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা হচ্ছে—তারা তাদের নিজের কর্তৃত্বকে উপদলীয়তা, গণবোধ ও জাতীয়তাবাদীতার ও শ্রেণীস্বার্থের মতো গোষ্ঠী-উত্তেজক সংগঠনের কাছে সমর্পণ করেছে। বেন্দা এগুলো লিখেছেন ১৯৯৭ সালে। তখন গণযোগাযোগের যুগ শুরু হয়নি। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন, সরকারের পক্ষে কর্মচারী হিসেবে বুদ্ধিজীবী রাখা খুব জরুরি। যে নেতৃত্ব দিতে পারবে না কিন্তু সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে সাহায্য করতে পারবে। সরকারি শত্রুদের সুভাষণ ও ব্যাপক পরিসরে অরওয়েলিয়ান বক্তব্যসমৃদ্ধ সামগ্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকে রোধ করতে পারবে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সুবিধাজনক কিংবা জাতীয় সম্মান রক্ষায় এসব বক্তব্য আসল সত্যকে ঢেকে রাখে।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতারণার বিরুদ্ধে বেন্দা'র এই শোককাহিনীর শক্তি তার বক্তব্যের সূক্ষ্মতা নয়। এমনকি অসম্ভব কোনো স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীর আপোষহীন

থাকার সময়েও নয়। বেন্দা'র সংজ্ঞা অনুসারে, প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঝুঁকি নেবে। ব্যবহারিক বিষয় থেকে দূরে থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী বিষয়কে চিহ্নিত করবে। আর সেই কারণে তারা সংখ্যায় অনেক হতে পারে না, কিংবা নিয়মিতভাবে তাদের বিকাশও ঘটে না। তাদেরকে আপোষহীন ব্যক্তি হতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্ব হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বোপরি তারা বর্তমান সামাজিক মর্যাদার বিরোধী হবে। এসব কারণে বেন্দা'র বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তিনি কখনোই এদের মধ্যে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাদের নিনাদময় কণ্ঠস্বর ও অভিসম্পাত মানবজাতির প্রতি হুমকিস্বরূপ। বেন্দা কখনোই বলেননি, লোকগুলো কিভাবে সত্য জানবে কিংবা ডেন কুইক্সোট (Den Queixote)-এর মতো ব্যক্তিগত অলীক কল্পনার চেয়ে চিরন্তন নীতির প্রতি তাদের স্বল্প অন্তর্দৃষ্টি কখনোই খুব বেশি কিছু নয়।

কিন্তু আমি অন্ততঃপক্ষে নিশ্চিত, বেন্দা সাধারণভাবে একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর যে প্রতিকৃতি কল্পনা করেছেন তা বেশ আকর্ষণীয়। ইতিবাচক নেতিবাচক কিংবা ঋণাত্মক উদাহরণে তার অনেকগুলোই প্ররোচণামূলক : ক্যালাস পরিবার সম্পর্কে ভলতেয়ারের সরকারি প্রতিরক্ষা কথাটি মরিস বারেসের মতো ফরাসি লেখকদের আতঙ্কজনক জাতীয়তাবাদকে নির্দেশ করে। এদের ওপর আস্থা রেখে বেন্দা ফরাসি জাতীয় সম্মানের নামে নিষ্ঠুরতা ও ঘৃণার রোমান্টিকতাকে স্বীকৃতি দেন।[৫] বেন্দা আত্মিকভাবে দ্রেইফুজ ঘটনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হন। এ দুটো ঘটনাই ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের পরীক্ষা করেছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা হয় সাহসিকতার সাথে সেমিটিক সামরিক অন্যায়মূলক কাজ ও জাতীয় উত্তাপের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। নয়তো কাপুরুষের মতো দলের সাথে সমমত পোষণ করেছেন। হয়তো তারা অবৈধভাবে অভিযুক্ত ইহুদি কর্মকর্তা আলফ্রেড দ্রেইফুজকে রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জার্মানির সবকিছুর বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেন্দা তাঁর বইটি পুনরায় প্রকাশ করলেন। এইবার বইটিতে বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কিছু বিষয় সংযোজন করেন। বিশেষ করে ঐসব বুদ্ধিজীবী যারা নাৎসিদের সহযোগিতা করেছিল এবং যারা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে উৎসাহী ছিল।[৬] বেন্দা'র রক্ষণশীল লেখনীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীকে আলাদা সত্তা হিসেবে দেখা যায়। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সত্য কথা বলতে পারেন। তিনি মূলত খিটখিটে, সাহসী এবং রাগী ব্যক্তি, যার কাছে পার্থিব কোনো শক্তি এত বড় ও জোরালো বিষয় নয়, যা সমালোচনা করা এবং যাতে অভ্যস্ত হওয়া যায় না।

ব্যক্তি হিসেবে গ্রামসি বুদ্ধিজীবীর যে সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সে সমাজে বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদন করে থাকে। বেন্দা বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তার চেয়ে গ্রামসি বেশি বাস্তবমুখী। বিশেষ করে বিংশ শতকের শেষের দিকে যখন সংবাদ প্রচারক, সরকারি পেশাজীবী, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ক্রীড়া ও গণমাধ্যমের আইনজীবী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নীতিনির্ধারক, সরকারের উপদেষ্টা, বাজার প্রতিবেদক এবং আধুনিক সাংবাদিকতার মতো সবক্ষেত্রের এত নতুন নতুন পেশা গ্রামসির মতামতের সত্যতা যাচাই করেছে।

গ্রামসির মতে আজকের দিনে জ্ঞানচর্চার কাজে জড়িত যেকোনো ব্যক্তিমাত্রই বুদ্ধিজীবী। অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিল্পায়িত সমাজে তথাকথিত জ্ঞানশিল্প ও শারীরিক উৎপাদনে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানশিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অনুপাত অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী আলভিন গোল্ডনার (Alvin Gouldner) কয়েক বছর আগে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তারা হবে নতুন শ্রেণী, আর তাই বুদ্ধিজীবী ব্যবস্থাপকরা এখন পুরাতন মহাজন ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। তবুও গোল্ডনার বলেন তাদের প্রভুত্বের অংশ হিসেবে বুদ্ধিজীবীরা আর সেসব লোক নয় যারা গণসমাবেশে বক্তৃতা দেয়। তার পরিবর্তে তারা সঙ্কটপূর্ণ ডিসকোর্স সংস্কৃতির সদস্য হয়েছেন।[৭] প্রত্যেক বুদ্ধিজীবীই বইয়ের সম্পাদক, লেখক, সামরিক কৌশলবিদ এবং আন্তর্জাতিক আইনজীবী এমন একটা ভাষায় কথা বলে, যা একই ক্ষেত্রের অন্যান্য সদস্যদের জন্য বিশেষায়িত ও বোধগম্য হয়ে উঠেছে। বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞরা সাধারণ ভাষায় অন্যান্য বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞদের সম্বোধন করে যেগুলো সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য নয়।

একইভাবে ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো বলেছেন, তথাকথিত সর্বজনীন বুদ্ধিজীবীদের (হয়তো তখন তাঁর জ্যাঁ পল সার্ত্রের কথা মনে ছিল) স্থানটি কোনো বিশেষ বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।[৮] যে একটি বিষয় নিয়ে কাজ করে ও তার দক্ষতা যেকোনোভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এখানে ফুকো সুনির্দিষ্টভাবে পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহেইমারের কথা ভেবেছিলেন। ১৯৪২-৪৫ সালে লস অ্যালমোস পারমাণবিক বোমা কর্মসূচীর সংগঠক থাকাকালীন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে পদার্পণ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলীর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধিজীবীদের বিস্তৃতি এতদূর পর্যন্ত হয়েছে যে তারা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গ্রামসি তাঁর The prison notebooks-এ প্রথমবারের মতো বুদ্ধিজীবীদেরকে আধুনিক সমাজের কার্যাবলীর কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে দেখেছেন কিন্তু সামাজিক শ্রেণীকে সেভাবে দেখেননি। ইংরেজী 'ইন্টেলেকচুয়াল' শব্দটির সাথে 'অফ' ও 'এন্ড' শব্দ দুটি বসালে দেখা যাবে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে হাজার হাজার ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান আছে এবং এসবের সাথে বুদ্ধি, জাতীয়তাবাদ, ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও বিপ্লবসহ আরও কিছু সম্পর্কিত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে অনেক বুদ্ধিজীবীর উত্থান ঘটেছে এবং তাদের প্রত্যেককে নিয়েই বিতর্ক আছে। আধুনিক ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী ছাড়া কোনো বড় ধরনের বিপ্লব সংগঠিত হয়নি। উপরন্তু বুদ্ধিজীবী ছাড়া বড় ধরনের কোনো বিপ্লববিরোধী আন্দোলনও সংঘটিত হয় নি। বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন বিপ্লবের পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, এমনকি ভাতিজি-ভাতিজা। তারা এককথায় বিপ্লবের প্রাণ।

অতিকথনে বুদ্ধিজীবীর ভাবমূর্তি খর্ব হবার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে বুদ্ধিজীবী সামাজিক ধারায় অন্য একজন পেশাজীবী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন। এইসব আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি যা বলতে চাই, তা গ্রামসির আলোচনা বিংশ শতকের শেষের দিকটায় বাস্তবতাকে স্বতঃসিদ্ধ করে তোলে। কিন্তু আমি আরও বলতে চাই, বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন

এমন একজন ব্যক্তি যিনি সমাজে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন, তার কাজকে মোটেও অবয়বহীন পেশাজীবী একটি দক্ষ শ্রেণীর সদস্য হিসেবে খাট করা যাবে না।

আমার মনে হয় মোদ্দা কথাটি হল, বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি জনগণের প্রতি ও জনগণের জন্য সোচ্চার এবং মতামত, মনোভাব, দর্শন উপস্থাপন ও গ্রন্থিবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। আর সেই ব্যক্তি ছাড়া এই ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়, যে ব্যক্তি লজ্জাজনক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম, যিনি সরকারি কিংবা কর্পোরেশনের সুবিধা পান না, যার *raison detre* অন্য সব লোকের সামনে তুলে ধরতে হয় এবং ইস্যুগুলো রুটিনমাফিক ভুলে যেতে হয়। বুদ্ধিজীবী সর্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করে এই কাজটি করেন। এই সব মানুষই বিশ্বশক্তি ও জাতির কাছ থেকে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে সম্মানজনক ব্যবস্থার আশা করেন। এই মানদণ্ডগুলোর কোনোরকম ব্যতিক্রম হলে তা পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয় এবং সাহসের সাথে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

এখন আমি এই বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অর্থে আলোচনা করতে চাই। বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমি আমার আলোচ্য বিষয়গুলো দর্শকদের সামনে তুলে ধরব। কিভাবে আমি সেগুলোকে গ্রন্থিবদ্ধ করব ব্যাপারটি শুধু তা নয়, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের বিষয়টি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তির মতো আমি নিজেই নিজেকে উপস্থাপন করব। আমার এই কথাগুলো বলার ও লেখার কারণ হল—অনেক ফলাফলের পর যা আছে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আর সেই কারণে আমি অন্যদেরকেও এই মতামত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করি। অতএব ব্যক্তিগত ও সরকারি, আমার নিজের ইতিহাস, মূল্যবোধ, লেখনী ও অবস্থান (যা আমার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত) একদিকে তার জটিল মিশ্রণ এবং অন্যদিকে কিভাবে এইগুলো সামাজিক জগতে প্রবেশ করে যেখানে জনগণ, যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় থাকে। এখানে একজন ব্যক্তিগত বুদ্ধিজীবীর কথা বলা হচ্ছেনা। কারণ যে মুহূর্তে আপনি লিখেছেন এবং তারপরে সেগুলো প্রকাশ করছেন তখন আপনি সরকারি কিংবা জনগণের বিশ্বে প্রবেশ করে যাচ্ছেন। যেখানে কোনো সরকারি বুদ্ধিজীবী থাকে না। বরং আন্দোলন বা অবস্থানের ক্ষেত্রে মুখপাত্র হিসেবে কোনো ব্যক্তিরও অস্তিত্ব সেখানে নেই। ব্যক্তিগত অনমনীয়তা এবং সরকারি বোধগম্যতা এখানে বিদ্যমান। যা বলা কিংবা লেখা হচ্ছে, সেগুলো তার অর্থ ব্যাখ্যা করে। অন্ততঃপক্ষে একজন বুদ্ধিজীবীর তার দর্শকদেরকে ভালো বোধ করার চেষ্টা করা উচিত, না হলে সমগ্র বিষয়টিই এখানে লজ্জাদায়ক, বৈপরীত্যে ভরা ও নিরানন্দময় হয়ে যেতে পারে।

তাই অবশেষে প্রতিনিধি হিসেবে বুদ্ধিজীবী এমন একজন চরিত্র, যিনি মতবাদকে তুলে ধরেন এবং সব ধরনের বাধা সত্ত্বেও তা জনগণের কাছে গ্রন্থিবদ্ধ করে উপস্থাপন করেন। আমার বক্তব্য হল বুদ্ধিজীবীরা হলেন সেইসব ব্যক্তি যাদের উপস্থাপনা শিল্পের প্রতি ঝোঁক থাকে। তা সে কথা, লেখা, শিক্ষা কিংবা টেলিভিশনে অংশ নেয়া– যাই হোক না কেন। এই প্রবণতাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং এর সাথে অঙ্গীকার, ঝুঁকি, কঠোর অবস্থান, সাহসিকতা ও দুর্দশা জড়িত। যখন আমি জাঁ পল সার্ত্রে কিংবা বার্ট্রান্ড রাসেল পড়ি, তাঁদের সুনির্দিষ্ট আলাদা কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য ও

উপস্থিতি আমার উপর প্রভাব ফেলে। সর্বোপরি তাঁদের বক্তব্যগুলো শুনে মনে হয়, তাঁরা তাঁদের গভীর বিশ্বাস থেকে কথাগুলো বলছেন। ক্রিয়াবাদি কিংবা সর্তক আমলাতন্ত্রের কারণে তাঁদের কোনো বিষয়ে কখনো ভুল হতে পারে না।

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা করার সময় তাদেরকে যথেষ্ট সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এবং এসব আলোচনায় তাদের ভাবমূর্তি, স্বাক্ষর, প্রকৃত হস্তক্ষেপ ও অবদান—এসব কোনো কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এসব একত্র করলে প্রত্যেক প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর জীবনের নির্যাস নির্মিত হয়। ইসাইহা বার্লিন উনিশ শতকের রাশিয়ান লেখকদের সম্পর্কে বলেন, আংশিকভাবে জার্মান রোমান্টিকতার প্রভাবাধীন তাদের দর্শকদের সতর্ক করা হল এই বলে যে, তিনি গণমঞ্চে পরীক্ষাধীন রয়েছেন।[৯] ঐসব গুণের কিছু কিছু এখনও আধুনিক বুদ্ধিজীবীর সরকারি ভূমিকার ক্ষেত্রে আমি কার্যকর থাকতে দেখি। এই কারণে সার্ত্রের মতো কোনো বুদ্ধিজীবীর কথা মনে পড়লে আমরা ব্যক্তিগত আচরণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সংকল্প, প্রচেষ্টা, ঝুঁকি, উপনিবেশিকতাবাদ সম্পর্কে কথা বলার ইচ্ছা, কথা দেয়া সম্পর্কে কিংবা সামাজিক দ্বন্দ্ব (যা তার প্রতিপক্ষকে প্ররোচিত করেছে এবং তার বন্ধুদেরকে উদ্দীপিত করেছে এবং তাকে হয়তো লজ্জিত করেছে)– এইসব বিষয়গুলো মনে আসে।

যখন আমরা সিমন দ্যা বোঁভেয়ারের সাথে সার্ত্রের সংশ্লিষ্টতার কথা, কামুসের সাথে তাঁর বিতর্ক এবং জ্যাঁ জেনেটের সাথে লক্ষ্যণীয় সংশ্লিষ্টতার কথা জানি, তখন আমরা তাঁকে (শব্দটি সার্ত্রের) তাঁর নিজস্ব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থাপন করি। এই পরিস্থিতিগুলোতেও সার্ত্রে ছিলেন সার্ত্রে এবং তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আলজেরিয়া ও ভিয়েতনাম ইস্যুতে ফ্রান্সের বিরোধিতা করেছিলেন। একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁকে বাতিল না করে তিনি যা বলেছেন তার প্রতি এই জটিলতাগুলো একটি আবহ ও দুশ্চিন্তা নির্মাণ করে এবং তাঁকে বিষণ্ন নৈতিক ধর্মপ্রচারকের বদলে তাঁকে পতনপ্রবণ মানুষ হিসেবে প্রকাশ করে।

আধুনিক জনজীবনে এটাকে উপন্যাস কিংবা নাটক হিসেবে দেখা হলেও সমাজবিজ্ঞানের অভিসন্দর্ভে কেবলমাত্র প্রাথমিক তথ্য কিংবা বাণিজ্য হিসেবে দেখা যায় না। কিভাবে বুদ্ধিজীবীরা কোনো অন্তর্ভূমি কিংবা বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনের শুধু প্রতিনিধিই নয়, বরং তাদের সম্পূর্ণ বিশেষ ধরনের জীবনব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ আছে, যা অন্যান্যরূপে তাদের নিজেদেরই তা আমরা সরাসরিভাবে দেখতে ও বুঝতে পারি না। উনিশ-বিশ শতকের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোতে এ বিষয়সমূহ ভালোভাবে পাওয়া যাবে : তুর্গেনেভ Fathers and Sons, ফ্লবার্টের Sentimental Education এবং জয়েসের A Portrait of the Artist as a young man এসব উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতার প্রকাশ ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছে, এমনকি নতুন অভিনেতা হিসেবে আধুনিক তরুণ বুদ্ধিজীবীর হঠাৎ আগমনের ফলে সুস্পষ্টভাবে তা পরিবর্তিতও হয়েছে।

তুর্গেনেভ ১৮৬০ সালে প্রাদেশিক রাশিয়ায় যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা শান্ত ও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সম্পদশালী তরুণরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে জীবনাভ্যাস পেয়ে থাকে। তারা বিয়ে করে, সন্তান জন্ম দেয় এবং এইভাবে জীবন কোনোরকমে চলতে থাকে। তাদের জীবনে বাজারভ'র মতো কোনো

নৈরাজ্যবাদীর আগমন না ঘটা পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকে। বাজারভ'র বিষয়ে প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল সে তার পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে এবং তাকে একধরনের স্বনির্মিত চরিত্র ছাড়া সন্তান বলে মনেই হয় না। তিনি রুটিনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, মাঝামাঝি অবস্থা ও সস্তা গতানুগতিক কথাবার্তার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক ও অনুভূতিহীন মূল্যবোধ ঘোষণা করেছেন যেগুলো যুক্তিসঙ্গত ও প্রগতিশীল বলে মনে হয়।

টার্জেনেভ বলেন, তিনি বাজারভকে সিরাপে ডোবাতে নারাজ। সে হৃদয়হীন শোষক ও রূঢ়। বাজারভ কৃসানভ পরিবার নিয়ে রসিকতা করেছে। যখন মধ্যবয়সী পিতা Schubert খেলে, তখন বাজারভ উচ্চস্বরে তাকে উপহাস করে। বাজারভ জার্মান বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা তুলে ধরেছে। তার কাছে প্রকৃতিটা কোনো উপাসনালয় নয়। এটি একটি কর্মশালা। যখন সে আন্না সার্জেইভনার প্রেমে পড়ে, সার্জেইভনা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু সেই সাথে ভয়ও পায়। তার কাছে তার বাধাবিপত্তিহীন এবং প্রায়ই নৈরাজ্যজনক বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিকে অসংলগ্নতা বলে মনে হয়। একজায়গায় তিনি বলেন, তার সাথে থাকা মানে নরকের এক প্রান্তে টলমল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার।

তুর্গেনেভ উপন্যাসটিতে যে সৌন্দর্য এবং করুণচিত্র যুগপৎভাবে অঙ্কন করেছেন তা হচ্ছে—পরিবার নিয়ন্ত্রিত রাশিয়ার প্রেম ও সন্তানোচিত স্নেহের চলমানতা, কোনো কিছু করার প্রাচীন পদ্ধতি এবং একই সময়ে বাজারভের নাস্তিবাদি ধ্বংসশক্তির মধ্যে অসঙ্গতির চিত্র। তাঁর ইতিহাস উপন্যাসের অন্য সব চরিত্রের মতোই বর্ণনাতীত বলেই মনে হয়। তিনি আসেন, চ্যালেঞ্জ করেন এবং নিপীড়িত কৃষকের আক্রমণে মারা যান। বাজারভের সম্পর্কে আমাদের যা মনে পড়ে, তা হল অবিশ্রান্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং গভীর মুখোমুখি বুদ্ধিবৃত্তি। বাজারভকে তাঁর সবচেয়ে সহানুভূতি চরিত্র বলে তুর্গেনেভ দাবি করলেও তাকে রহস্যময় করে তোলা হয়েছে। কিছুটা বাজারভের শ্রবণহীন বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির মাধ্যমে এবং সেই সাথে তার পাঠকদেরকে উত্তাল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে থামিয়ে দেয়া গেছে।

কিছু কিছু পাঠক মনে করেন বাজারভ তরুণদের উপর আক্রমণাত্মক। অন্যরা চরিত্রটিকে সত্যিকারের নায়ক হিসেবে প্রশংসা করেছে। আবার কেউ কেউ তাকে বিপদজ্জনক হিসেবেই মনে করে। ব্যক্তি হিসেবে তার সম্পর্কে আমরা যাই ভাবি না কেন, Fathers and sons উপন্যাসে বাজারভকে বর্ণনামূলক চরিত্র হিসেবে আনা যায়নি। অন্যদিকে তার বন্ধুরা অর্থাৎ কৃসানভ পরিবার ও তার বৃদ্ধ পিতামাতা তাদের জীবন চালিয়ে যায়। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার চরম কর্তৃত্ব ও রক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গল্প থেকে তাকে বের করে আনে। যা বেমানান এবং একই সাথে বর্ণনার সাথে যায় না। যা তাকে গল্প বহির্ভূত করে এবং পারিবারিক জীবনে অবাঞ্ছিত করে তোলে।

এ বিষয়-সম্পর্কিত আরও বর্ণনা জয়েসের তরুণ স্টিফেন দেদালুসের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তার ক্যারিয়ারের প্রথমদিক গির্জা, শিক্ষকতা, আইরিশ জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর তোষামোদকারী এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে ধীরে ধীরে একঘেয়ে ব্যক্তিবাদ তৈরি করে ও লক্ষ্য বিবেচনা করা এবং এ দুয়ের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করা ছিল তার কাজ। সিমুস ডিনে (Seamus Deane) জয়েসের Portrait of the Artist বইটি

সম্পর্কে সুন্দর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ইংরেজি ভাষায় এটিই প্রথম উপন্যাস, যেখানে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রেম, ঘৃণা ও ক্রোধের তীব্র অনুভূতিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।[১০] ডিকেন্স, থ্যাকারে, অস্টিন হার্ডি এমনকি জর্জ ইলিয়টের মুখ্য চরিত্রগুলোও বয়সে তরুণ এবং নারী নয়। যাদের জীবনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজে হৃদয়পূর্ণ জীবন যাপন।

অন্যদিকে তরুণ দেদালুসের কাছে "চিন্তা হচ্ছে বিশ্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি উপায়।" ডিনে পুরোপুরি সঠিক কথা বলেছেন। তার কথায় দেদালুসের মতে ইংরেজি উপন্যাসগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রেরণা শুধুমাত্র সামঞ্জস্যহীন মূর্ত প্রকাশ। তবুও আংশিকভাবে যেহেতু স্টিফেন প্রাদেশিক এবং উপনিবেশিক জমানার ফসল তাই সে শিল্প-অনুরাগী হওয়ার আগে অবশ্যই তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক সচেতনতার বিকাশ ঘটবে।

উপন্যাসের শেষে তিনি আদর্শগত পরিকল্পনার চেয়ে পরিবার ও আইরিশ বিপ্লবী বাহিনীর সদস্যদেরকে কোনো অংশে কম প্রত্যাহারপ্রবণ ও জটিল নন বলে উল্লেখ করেছেন। এই আদর্শের প্রভাব তার নিরানন্দকর ব্যক্তিত্বকে হ্রাস করে। তুর্গেনেভের মতো জয়েস তরুণ বুদ্ধিজীবী ও মানবজীবনের পারস্পরিক দৃশ্যকল্পের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। একটি পরিবারে বেড়ে-ওঠা, তারপরে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যে গল্পের শুরু সেটি স্টিফেনের খেরোখাতায় সংক্ষিপ্ত সিরিজে রূপ নিয়েছে। বুদ্ধিজীবী পারিবারিক জীবনে কিংবা একঘেয়ে রুটিনে অভ্যস্ত হবে না। উপন্যাসটির প্রধান বক্তব্যে স্টিফেন কার্যকরভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তা হল বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতার মতবাদ যদিও স্টিফেনের ঘোষণায় নাটকীয় অতিরঞ্জন এবং যা জয়েসের তরুণ মনের দাম্ভিকতার অপরিবর্তিত প্রকাশের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। "কী করব এবং কী করব না তা কি আমি তোমাকে বলব। যা আমি বিশ্বাস করি না– তা আমি করব না, তা সে আমার ঘর, আমার পিতৃভূমি কিংবা গির্জা যাই হোক না কেন। আমি যতটা সম্ভব স্বাধীনভাবে বিশেষ কোনো জীবনব্যবস্থা কিংবা শিল্পে নিজেকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করব। আমাকে রক্ষার জন্য আমি শুধুমাত্র যেসব অস্ত্র ব্যবহার করব : নীরবতা, নির্বাসন ও ধূর্ততা।"

তবুও ইউলিসিসে স্টিফেনকে একগুঁয়ে বৈপরীত্যসম্পন্ন তরুণের চেয়ে বেশি কিছু হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তার মতবিশ্বাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল, সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা যা তাদের কর্মকাণ্ডে একটা বড় বিষয়। বদরাগী কিংবা পুরোপুরি ভেজাবেড়াল হওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট নয়। বুদ্ধিজীবীর কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য– মানুষের স্বাধীনতা ও জ্ঞানের অগ্রগতি সংগঠন করা। পুনঃ পুনঃ অভিযোগ সত্ত্বেও সমসাময়িক ফরাসি দার্শনিক হিসেবে লিওটার্ডের 'মুক্তি ও নবজাগরণের ব্যাপক বর্ণনাকে' আগের আধুনিক যুগের বিচারে বীরত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই মতানুসারে, মহৎ বর্ণনাগুলো স্থানীয় পরিস্থিতি ও বাকচাতুর্যে পর্যবসিত হয়েছে। উত্তর–আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা এখন সত্য ও স্বাধীনতার মতো মূল্যবোধের চেয়ে দক্ষতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি সবসময় চিন্তা করেছি, লিওটার্ড ও তার অনুসারীরা তাদের অলস অক্ষমতা স্বীকার করছে। এমনকি উত্তর-আধুনিকতার মূল্যবোধ সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীর জন্য সত্যিকারভাবে যে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র আছে, তার

সঠিক মূল্যায়ন করার চেয়েও অলস অক্ষমতা এবং উদাসীনতাকে বেশি করে তুলে ধরেছে। তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সরকারগুলো এখনও জনগণকে শোষণ করে, সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে আদালত ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতাবলে বুদ্ধিজীবী নিয়োগ তাদের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং বৃত্তি থেকে বুদ্ধিজীবীর পদত্যাগ করার বিষয়টিও এখন ঘটতে দেখা যায়।

The Sentimental Education গ্রন্থে ফ্লুবার্ট বেশি হতাশা ব্যক্ত করেছেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের নির্মম সমালোচনা করেছেন। ইংরেজ ইতিহাসবিদ লুইস নেমিয়ার ১৮৪৮ থেকে ১৮৫১ এর মধ্যে পারস্যদেশীয় উত্থানের সময়কালকে বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্লুবার্টের উপন্যাসটিতে উনিশ শতকের রাজধানীতে যাযাবর ও রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। রাজধানীর কেন্দ্র নির্মিত হয় Frederic Moreau ও Charles Deslauriers নামক দুজন প্রাদেশিক ব্যক্তিকে ভিত্তি করে। 'শহর সম্পর্কে তারুণ্য' এই শ্লোগানের অন্তরালে শোষণ, বুদ্ধিজীবী হিসেবে একটি স্থিতিশীল অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতার প্রতি ফ্লুবার্টের ক্রোধ প্রকাশ করেছে। ফ্লুবার্টের ক্রোধের বড় কারণ হল— তাদের যা হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত আশা করা। ফলাফল দাঁড়াল বুদ্ধিজীবীর সর্বোচ্চ প্রকাশ। দুজন তরুণ লোক সম্ভাবনাময় জ্ঞানতাপস সমালোচক, ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে জনকল্যাণমূলক কাজকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। মোরিও সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে 'তার বুদ্ধিবৃত্তিক আকাঙ্ক্ষা দমিত কর।' কয়েক বছর পরে মনের আলস্য ও হৃদয়ের জড়তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। Deslauriers ক্রমান্বয়ে আলজেরিয়ার উপনিবেশিক প্রক্রিয়ার পরিচালক, পাশার সম্পাদক, সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপক, বিজ্ঞাপনী দালাল হয়ে ওঠে। বর্তমানে সে এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের আইন-বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে কর্মরত।

১৮০৮ সালের ব্যর্থতাগুলোকে ফ্লুবার্টের কাছে তার প্রজন্মের ব্যর্থতা বলে মনে হয়। মহামানব হিসেবে মোরিও ও দেসলারিয়ারের ভাগ্য চিত্রায়িত হয়েছে তাদের ইচ্ছার অভাবের ফলাফল হিসেবে। আধুনিক সমাজের দ্বারা আদায়কৃত মাশুল হিসেবে যেখানে সীমাহীন বিরক্তি, আনন্দ ঘূর্ণি এবং সর্বোপরি সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন, তাৎক্ষণিক খ্যাতি এবং অবিরাম নিয়োগের ক্ষেত্র (যার মধ্যে সব ধ্যানধারণাগুলো বাজারযোগ্য, সব মূল্যবোধ রূপান্তরযোগ্য, সব পেশায় সহজে অর্থ আসে ও দ্রুত সাফল্যে পর্যবসিত হয়)-কে তারা সহজাত বলে ধরে নিয়েছিলেন। উপন্যাসের বড় বড় দৃশ্যগুলো প্রতীকীভাবে রূপায়িত হয়েছে। ঘোড়ার দৌড়, ক্যাফে ও বলরুম নাচ, দাঙ্গা, শোভাযাত্রা, প্যারেড এবং গণসমাবেশকে ঘিরে সেগুলো আবর্তিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মোরিও অবিরামভাবে ভালোবাসা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করে কিন্তু তা থেকে বিচ্যুত হয়। বাজারভ, দেদালুস ও মোরিও চরমপন্থী হলেও প্রতিনিয়ত তারা উদ্দেশ্য সফলভাবে শেষ করেছেন। উনিশ শতকের বাস্তববাদী উপন্যাসগুলোতে এই সব চলমান বিষয় অনিন্দ্যসুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বুদ্ধিজীবীদের কর্মরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা ও প্রলোভনে তারা আকর্ষিত হয়। তারা তাদের নিয়তিকে মেনে চলছেন নয়তো তারা প্রতারণা

করছেন। শেষবারের মতো ম্যানুয়াল থেকে শিখে নেওয়া নির্ধারিত কোনো কাজ হিসেবে নয় বরং আধুনিক জীবনের ক্রমাগত হুমকির মধ্যেও বাস্তব অভিজ্ঞতা হিসেবে সমাজের প্রতি তার ধ্যানধারণার রূপান্তর চরম সত্তাকে সুরক্ষিত করে কিংবা মন্ত্রণাকে মূল্য দেয় এসবের উপর বুদ্ধিজীবীর উপস্থাপনা কেমন হবে তা নির্ভর করে। তারা ক্ষমতাসীন আমলাতন্ত্রের মধ্যে এমনকি উদার কর্মীদের মধ্যেও কাজ করতে চায় না। বুদ্ধিজীবীর প্রকাশ ঘটে সরাসরি কাজের মধ্য দিয়ে। এটা একধরনের সচেতনতার উপর নির্ভর করে। যা সন্দেহজনক, যৌক্তিক তদন্ত এবং নৈতিক বিচারের সাথে জড়িত। এটি ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করে কিংবা একটি ধারণার নির্মিতিকে অপেক্ষায় রেখে দেয়। বুদ্ধিজীবীর দুটো প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। ভাষা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা জানা এবং কখন ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে হবে সেটাও জানা।

কিন্তু আজকের দিনে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কী? আমার মনে হয় এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছেন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সি. রাইট মিল্‌স। তিনি ছিলেন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী। তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তা তিনি সরাসরিভাবে সুললিত গদ্যে ব্যক্ত করেছেন। তিনি ১৯৪৪ সালে লিখলেন, স্বাধীন বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রান্তিকতায় একধরনের ক্ষমতাহীন হতাশায় ভোগে কিংবা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা সরকারি বিভিন্ন কাজে যোগ দেওয়ায় ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে পছন্দের সমস্যায় পড়ে। এই সদস্যরাই দায়িত্বহীনভাবে এবং নিজেদের ইচ্ছায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তথ্যশিল্পের ভাড়া করা এজেন্ট হওয়াটাই তাদের জন্য কোনো সমাধান নয়। কেননা দর্শকদের সাথে টম পাইনের সম্পর্কের মতো দর্শকদের সাথে সম্পর্ক অর্জনও সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে এর উপর নির্ভর করছে কার্যকরি যোগাযোগের উপায়। স্বাধীন চিন্তাবিদের কাছে একটা বড় কাজের মাধ্যম এসব দখল হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মিলসের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ; স্বাধীন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সেই অল্প কয়েকজন, যারা গৎবাঁধা ও জীবন্ত বিষয়সমূহের আসন্ন মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে। এখন গৎবাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্মোচন ও ধ্বংস করতে ক্ষমতার সাথে নতুন ধ্যানধারণা যুক্ত হয়েছে। যার ফলে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়ন গঠিত হয়েছে। আজকের এই গণশিল্প ও গণচিন্তা বৃহৎ অর্থে রাজনীতির চাহিদা পূরণ করছে। এই কারণে রাজনীতির মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তিক সংহতি ও প্রচেষ্টা অবশ্যই কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যদি চিন্তাবিদ নিজেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের সত্যিকার মূল্যবোধের সাথে যুক্ত না করে, তবে সে জীবনের সঠিক অভিজ্ঞতার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না।"[১১]

এই অনুচ্ছেদ পাঠ ও পুনঃপাঠের যোগ্য। কেননা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও অতিরিক্ত জোরালো বিষয় আছে। রাজনীতির সর্বত্র এক্ষেত্রে শিল্পের মধ্যে, কিংবা নিরানন্দকর ও অলৌকিক তত্ত্বের মধ্যে অবগাহনের কোনো সুযোগ নেই। বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন, তাদের সময়ের তথ্য কিংবা প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত এবং গণরাজনীতির সাথে যুক্ত একটি চরিত্র। চরিত্র অঙ্কন, অফিসিয়াল বর্ণনা, শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত ক্ষমতার বিচার এই বিষয়গুলোকে বিতর্কিত বা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। আর শুধু প্রচারমাধ্যম নয় বরং বর্তমান সামাজিক মর্যাদা নিয়ন্ত্রণকারী এবং

যথাযথ গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যখন তার মুখোশ খোলার কথা বলা হয় তখনও সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে বুদ্ধিজীবী সত্য কথা বলার চেষ্টা করে।

তবে এটা মোটেও সহজ কাজ নয়। বুদ্ধিজীবী সবসময় নিঃসঙ্গতা ও একই অবস্থানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে না। সাম্প্রতিক সময়ে ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধে নাগরিকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকা নিষ্পাপ ও অনাগ্রহী শক্তি নয়। এমনকি বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ তাকে নিয়োগও করেনি। ভিয়েতনাম ও পানামা আক্রমণের কথা নীতিনির্ধারকরা ভুলে গিয়েছিলেন। আমি মনে করি, এই সময়ে বুদ্ধিজীবীদের কাজ ভুলে-যাওয়া বিষয়টি মনে করিয়ে দেওয়া। যে সংযোগ অস্বীকার করা হয়েছে তা পুনরায় স্থাপন করা। যা বিকল্প বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন এবং মানবজাতির ধ্বংসকে প্রতিহত করতে পারে।

সি. রাইট মিল্‌সের বক্তব্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে ব্যক্তি ও জনতার মধ্যে বিরোধ। সরকার থেকে কর্পোরেশন পর্যন্ত বড় বড় সংগঠনের শক্তির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। শুধু ব্যক্তির দুর্বলতাই নয়, মানব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যায়। নিম্নবর্গের মর্যাদা, সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, নিম্ন সংস্কৃতি ও বর্ণের মধ্যেও এ সমস্যা প্রকট। বুদ্ধিজীবীরা দুর্বলদের সাথে একই অবস্থানে থাকে—সে বিষয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ কেউ এখানে রবিনহুডের নাম উল্লেখ করতে চায়। তবুও এটি সহজ কাজ নয়, আর তাই এত সহজে ভাববাদী আদর্শবাদ হিসেবেও বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না। আমার মতে, বুদ্ধিজীবী প্রশমণকারীও নয়। আবার কোনো ঐক্য নির্মাতাও নয়। বরং এমন একজন যার সামগ্রিক সত্তাকে জটিল বিবেচনা করা হয়। এটি এমন একটি ধারণা যা কোনো সহজ সূত্রও মেনে নিতে আপত্তি করে, গতানুগতিক এবং মসৃণ কথাবার্তাকে পাত্তা দেয় না এবং ক্ষমতাসীনদের কার্যক্রম মেনে নিতে অনিচ্ছুক থাকে। বুদ্ধিজীবীরা এ বিষয়টি প্রকাশ্যে বলতেও দ্বিধা করে না।

এটি শুধুমাত্র সবসময় সরকারের নীতির সমালোচনাই করে, এমনটি নয়। বরং সবসময় চিরন্তন সতর্কতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যানধারণা পোষণ করে। অর্ধসত্য কিংবা গৃহীত বিষয়কে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করে না। এই ধারণার সাথে স্থির বাস্তবতা, এক ধরনের অসীম প্রাণপ্রাচুর্যসম্পন্ন যৌক্তিক শক্তিসত্তা এবং জনসমুখে কিছু প্রকাশ করার বিপরীতে তার ব্যক্তিত্বের জটিল সমস্যার ভারসাম্য রাখতে অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হয়। এ কারণে চিরস্থায়ী পরিশ্রম দরকার পড়ে। আর এসব কারণে অসমাপ্ত ও প্রয়োজনীয়ভাবে বেঠিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব সাহসিকতা এবং জটিলতার মধ্যেও একজন সবসময় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। যদিও এসব বিষয় একজনকে নির্দিষ্ট করে, জনপ্রিয় করে তোলে না।

ভাষান্তর : দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু

তথ্যসূত্র :

1. Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections*, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York: International Publishers, 1971), p.9.
2. ibid., p.4.
3. Julien Benda, *The Treason of the Intellectuals*, trans. Richard Aldington (1928:rprt. New York: Norton, 1969), p.43.

4. ibid., p.52
5. ১৭৬২ সালে টওলুসের একজন প্রোটেস্টান্ট ব্যবসায়ী জ্যাঁ ক্যালাসকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার অপরাধ ছিল, তিনি তার পুত্রসন্তানকে হত্যা করেছিলেন, যে ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিক হয়েছিল। এইসব তথ্যপ্রমাণগুলো অজুহাত হিসেবে বেশ ঠুনকো ছিল। তবু রায় খুব দ্রুতই কার্যকর হয়। আরেকটি কথা সর্বজনবিদিত হয়—প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যারা ধর্মান্তরিত হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্টরা খুবই গোঁড়া ধর্মান্ধ হয়। পরবর্তীতে ভলতেয়ার ক্যালাস পরিবারের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ সাফল্যজনক একটা গণপ্রচারণা চালান (আমরা এখন জেনেছি তিনিও তাঁর তথ্য-প্রমাণকে গ্রহণযোগ্য করতে গল্প বানিয়েছেন)। মোরিস ব্যারেজ ছিলেন আলফ্রেড দ্রেইফুজের একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিপক্ষ। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত একজন প্রায় ফ্যাসিবাদী এবং প্রতি-বুদ্ধিজীবী ফরাসি উপন্যাসিক হিসেবে তিনি একধরনের রাজনৈতিক অসচেতনতার তত্ত্ব দেন। তিনি বলেছেন, এর ফলেই বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিসমূহ যৌথভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধারণা ও প্রবণতা পোষণ করে।
6. *La Trahison* was republished by Bernard Grasset in 1946.
7. Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (New York: Seabury Press, 1979), pp 28-43.
8. Michel Foucault, *Power/knowledge: Selected Interviews and other Writing 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon), pp. 127-28.
9. Isaiah Berlin, *Russian Thinkers*, ed. Henry Hardy and Alieen Kelly (New York Press), 1978, pp. 129.
10. Seamus Deane, *Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature 1880-1980* (London: Faber & Faber, 1985), pp. 75-76.
11. C. Wright Mills, *Power, Politics, and People: The Collected Essays of C. Wright Mills*, ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, 1963), p. 299.

ক্ষমতার প্রতি সত্যভাষণ

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের বিশেষায়ণ ও পেশাদারিত্ব বিশেষত কিভাবে বুদ্ধিজীবীরা এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যা করেন, তার উপর আমি অধিকতর মনোযোগ দিতে চাই। বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং ব্যাপকতা লাভ করে তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-স্নাতক পর্যায়ের একজন ছাত্র (আসনসংখ্যা সীমিত এমন একটি) সেমিনারে ভর্তির ব্যাপারে আমার কাছে আসে। কথা-প্রসঙ্গে সে জানায়, সে বিমান বাহিনীতে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। আমাদের কথোপকথন চলাকালে সে আমাকে পেশাজীবীদের মানসিকতা সম্পর্কে অদ্ভুত আকর্ষণীয় ধারণা দেয়। পেশাজীবী বলতে এখানে অভিজ্ঞ বিমানচালককে বোঝানো হয়েছে এবং তার নিজের বর্ণনায়, সে বিমানের ভিতরে কাজ করে বলে জানায়। "আসলে তুমি বিমান বাহিনীতে কী কর" আমার অব্যাহতভাবে জিজ্ঞাসা করা এ প্রশ্নের জবাবে যখন সে উত্তর দিল, 'লক্ষ্য অর্জন' করি তখন আমি যে কষ্ট পেয়েছিলাম তা কখনও ভুলব না। আমার বুঝতে আরো কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল, সে ছিল একজন বোমাবর্ষণকারী—যার কাজ বোমা বর্ষণ করা। কিন্তু সে পেশাগত ভাষায় এমনভাবে কথাটি বলেছে, যা একজন পদস্থ বহিরাগতের সরাসরি অনুসন্ধানকে মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব এবং রহস্যাবৃত করে তোলে। তারপর আমি তাকে সেমিনারে নিয়ে গেলাম। বিশেষ করে এই কারণে যে, আমি তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারব এবং কিছুটা উৎসাহের সাথে তাকে তার 'লক্ষ্য অর্জন' নামক দুর্বোধ্য ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে রাজি করাতে সক্ষম হব।

আমি যথেষ্ট সংহত এবং গভীরভাবে মনে করি, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা নীতি নির্ধারণ এবং নিয়োগাধিকার নিয়ন্ত্রণের (যেমন চাকুরি দেয়া বা না-দেওয়া, ভাতা এবং পদোন্নতিদান) কাছাকাছি অবস্থান করেন, তারা এমন ব্যক্তিদের বাছাই করার কাজে সচেষ্ট থাকেন। তারা পেশাগত ধারাকে উপেক্ষা করেন এবং উর্ধ্বতনদের দৃষ্টিতে, যারা ধীরে ধীরে বিতর্ক এবং অসহযোগিতার প্রবণতাকে ত্যাগ করতে পারে। ব্যাপারটা সহজেই অনুমেয়—কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে হলে অনুগত, একই পরিকল্পনার ধারণাযুক্ত এবং একই ভাষায় কথা বলে—এমন লোকবল থাকতে হবে। যেমন—আমরা বলি, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমাকে বা আমার দলকে স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র বিভাগে বসনিয়া বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। আমার সার্বিক অনুভূতি এই যে, আমার এসব বক্তৃতায় উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করে

একজন চিন্তাবিদ পেশাগত অবস্থানে থেকে ক্ষমতার ব্যবহার এবং পুরস্কার লাভের সুযোগ পায়। সেখানে আমার মতে, বুদ্ধিজীবীদের যে জটিল এবং পারস্পরিকভাবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এবং বিচার করার স্পৃহা থাকা উচিত, সেটা অনুশীলন করার জন্য এ বিষয়মালাগুলো সহায়ক নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বুদ্ধিজীবীরা কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত না, বা তারা সরকারের পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পূর্ণভাবে চাকুরীরত নন, অথবা যৌথ সংস্থা ও সমচিন্তার সংঘেও কর্তব্যরত না। এ রকম অবস্থায় নৈতিকতা বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ হওয়া কিংবা সম্পূর্ণভাবে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তা করা অথবা কোনো কাঠামোর পক্ষ নেওয়ার কারণে সংশয়বাদ ত্যাগ করা এতই ব্যাপক যে—বিশ্বাসযোগ্য নয়। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী এসব প্রলুব্ধকারী বিষয়গুলো দ্বারা সম্পূর্ণভাবে এবং আমরা সবাই কিছু মাত্রায় বশীভূত হই। কেউই এমনকি সর্বতোভাবে স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল নয়।

ইতোমধ্যে আমি বলেছি, পারস্পরিক বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য পেশাদারিত্বের পরিবর্তে অপেশাদারি মানসিকতা শ্রেয়। কিন্তু কিছু মুহূর্তের জন্য আমাকে বাস্তববাদী একজন মানুষ হতে হবে। প্রথমত অপেশাদারিত্ব বলতে জনসমাজের সুবিধাগ্রহণকারী অংশ, যা দক্ষ এবং পেশাদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন: ব্যাপক এবং মুক্তভাবে ছড়িয়ে-পড়া কোনো বক্তৃতা, একটি বই অথবা প্রবন্ধের ঝুঁকি এবং অনিশ্চিত ফলাফল সেখানে মেনে নিতে হয়। গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার আমাকে গণমাধ্যমের বেতনভুক্ত পেশাদার উপদেষ্টা হবার আহবান জানানো হয়। এটা আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ স্বাভাবিকভাবেই এটা কোনো-একটি টেলিভিশন অথবা সংবাদপত্রের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকা বোঝায় এবং ঐ মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক ভাষা এবং ধারণার কাঠামো দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। একইভাবে আমার কখনও সরকারি শ্রেণীভুক্ত এবং সরকারের পক্ষে বেতনভোগী উপদেষ্টা হবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কারণ সেখানে নিজের জ্ঞান পরবর্তীতে কোনো কাজে ব্যবহার করতে হবে, যে ব্যাপারে আগাম কোনো ধারণা থাকে না। দ্বিতীয়ত, সরাসরি অর্থের জন্য জ্ঞান বিতরণ করা, যেমন : একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে উন্মুক্ত বক্তৃতা দেওয়া অথবা অন্যদিকে যদি একটি ক্ষুদ্র এবং সীমিত কর্মকর্তাদের সংঘের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে বলা হয়—তবে এ দুইয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট, কারণে আমি সব সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকে স্বাগত জানিয়ে এবং অন্যটি প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। তৃতীয়ত, অধিক রাজনৈতিক বিবেচনায় যখন আমার কাছে কোনো ফিলিস্তিনি দল সাহায্য প্রার্থনা করেছে অথবা কোনো দক্ষিণ আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতিবিদ্বেষের বিপক্ষে এবং শিক্ষার স্বাধীনতার পক্ষে বলতে বলা হয়েছে—সেগুলো আমি নিয়মিতভাবেই গ্রহণ করেছি। পরিশেষে সেসব কারণসমূহ এবং তত্ত্ব দ্বারা আমি আন্দোলিত হই, যেগুলো আমি প্রকৃতপক্ষে সমর্থন করতে পছন্দ করি। কারণ আমি যেসব মূল্যবোধ এবং নীতিতে বিশ্বাস করি সেগুলো তার সাথে মিলে যায়। সে জন্য

আমি নিজেকে সাহিত্যে পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করি না। আর তাই আমি নিজেকে জননীতি-বিষয়ক ব্যাপারগুলো থেকে সরিয়ে এনেছি। কারণ আমি শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান সাহিত্য শিক্ষা দেবার স্বীকৃতি পেয়েছি। আমি বিস্তৃত বিষয় নিয়ে বলি এবং লিখি, কারণ একজন স্বীকৃত অপেশাদার হিসেবে আমি সেসব প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। যেগুলো আমার সংকীর্ণ পেশাদারী বৃত্তিকে অতিক্রম করবে। অবশ্যই আমি এসব দৃষ্টিভঙ্গি যা কখনো শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করিনি বরং একশ্রেণীর নতুন ও পরিব্যাপ্ত শ্রোতা তৈরীর জন্য আমি সচেতনভাবে চেষ্টা করেছি।

কিন্তু জনসমাজে হানা দেওয়া এসব অপেশাদার বিষয়গুলো আসলে কী? বুদ্ধিজীবীরা কি নিজেদের দেশ, জাতি, জনগণ, ধর্ম, আদিমতা, সহজাত আনুগত্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে অগ্রসর হন নাকি কিছু চিরায়ত এবং যৌক্তিক নিয়মের কাঠামো—যা একজন ব্যক্তির বক্তব্য ও লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করে তার দ্বারা? ফলাফল হিসেবে আমি বুদ্ধিজীবীদের কিছু মৌলিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিভাবে একজন সত্য বলে? সত্য কী? কার জন্য এবং কোথায়? দুঃখজনক হলেও আমাদের উত্তর শুরু হবে এভাবেই : এসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তরদানের জন্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে কোনো বিস্তৃত এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া নেই। ইহজাগতিক পৃথিবী, আমাদের পৃথিবী, যে পৃথিবী মানুষের প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে গড়ে উঠেছে, এখানে বুদ্ধিজীবীদের শুধু নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। যেখানে ব্যক্তিগত জীবনকে বোঝার মাধ্যম হিসেবে উদ্‌ঘাটন এবং উৎসাহ, খুবই উপযোগী উপায়। কিন্তু সেগুলো যখন পরে মানব-মানবীর ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক, এমনকি নিষ্ঠুর। প্রকৃতপক্ষে আমি আরও বলতে চাই, বুদ্ধিজীবীদেরকে জীবনব্যাপী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে হয়। ঐ সমস্ত পবিত্র দর্শন বা পুস্তকের রক্ষাকর্তাদের সাথে, যাদের শক্তিশালী ক্ষমতা কোনো মতানৈক্যতা এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো বিভিন্নতা সহ্য করতে পারে না। মতামত এবং প্রকাশভঙ্গির অদম্য স্বাধীনতাই বুদ্ধিজীবীদের প্রধান রক্ষাকবচ। এই রক্ষাব্যূহ পরিত্যাগ করলে অথবা এর ভিত্তির উপর কোনো বিকৃতি সহ্য করার পরিণামে বুদ্ধিজীবীর পরিচয় কলঙ্কিত হয়। সে জন্য সালমান রুশদির Satanic Verses-এর পক্ষ সমর্থন একদিকে যেমন গ্রন্থটির নিজের জন্য, তেমনি অন্যদিকে সাংবাদিক, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি এবং ঐতিহাসিকের জন্য হুমকির মুখে মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় একান্ত ভাবেই কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

শুধু মুসলিম বিশ্বে নয়, ইহুদি এবং খ্রিষ্টান বিশ্বেও এটা তাদের জন্য একটি বির্তকের বিষয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এক এলাকায় একভাবে এবং অন্য এলাকাকে অগ্রাহ্য করে অর্জন করা যায়না। সেসব কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যাপারে কোনো বির্তকের অবকাশ থাকে না, যারা পবিত্র দৈব নির্দেশ রক্ষার অধিকার দাবি করে। কিন্তু বিপরীতভাবে বুদ্ধিজীবীদের জন্য কাজের মূলমন্ত্র হচ্ছে, অনুসন্ধান-প্রসূত তীব্র বিতর্ক উদ্‌ঘাটন ছাড়া বুদ্ধিজীবীগণ বাস্তবিকভাবে যা করে, প্রকৃতভাবে তারই পদক্ষেপ এবং

ভিত্তি। কিন্তু আমাদের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাকে সমর্থন করতে হবে। একজনকে কোন ধরনের সত্য এবং নীতি রক্ষা বা ধরে রাখা এবং প্রকাশ করা উচিত, এটা একটা কঠিন ব্যাপার, শেষ করার উপায়ের মতো লেবাসধারী কোনো প্রশ্ন নয়। বরং বর্তমান বুদ্ধিজীবীগণ যেখানে অবস্থান করছেন এবং যার চারদিকে বিপদজনক, অনির্দেশিত মাইন পোতা আছে, কোনো গবেষণা কাজ শুরু করার জন্য এ ধরনের স্থানই অত্যাবশ্যক।
শুরু করার জন্য সার্বিকভাবে এখন থেকেই চরম বিতর্কিত ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা, সঠিক অথবা বাস্তব বিষয়কে মূল এজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ১৯৮৮ সালে আমেরিকান ঐতিহাসিক পিটার নোভিক একটি বড় বই প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম সার্থকভাবে সমস্যাকে নাটকীয় করে তুলেছে। যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'The Noble Dream' এবং যার উপশিরোনাম ছিল—বিষয়-বিমুখতার প্রশ্ন এবং আমেরিকান ইতিহাসের অধ্যাপক। আমেরিকার শতবর্ষের ঐতিহাসিক চিত্রকল্পের প্রচেষ্টা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নোভিক দেখিয়েছেন, কিভাবে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মূল বিষয়টি—আদর্শ, বিষয়-বিমুখতা, যা দ্বারা ইতিহাস-রচয়িতাগণ বাস্তবিকভাবে এবং সঠিক উপায়ে ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন। ধীরে ধীরে দাবি এবং বিরুদ্ধদাবির প্রতিযোগিতার পঙ্কিলতায় আবর্তিত হয়। যার সবগুলোই ইতিহাসবেত্তাগণের মতামতের সমতার নামে খুবই নগণ্য মাত্রায় বিষয়বিমুখ হয়ে থাকে। যুদ্ধকালীন সময়ে 'আমাদের' কাজ করতে হয়েছিল, আমেরিকার পক্ষ হয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানদের বিপক্ষে। শান্তির সময়ে আলাদা শ্রেণীর নিরপেক্ষ—যেমন নারী, আফ্রিকান-আমেরিকান, এশিয়ান-আমেরিকান, সমকামী, শ্বেতাঙ্গ এবং এরকম আরও (মার্কসবাদী, প্রতিষ্ঠাস্থাপনকারী, বিনির্মাণবাদী এবং সাংস্কৃতিক কর্মী নামক প্রত্যেক) মতের সবাই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। নোভিক জিজ্ঞাসা করেন, এরকম অসম্পূর্ণ জ্ঞানের পর কোনো ধরনের সমকেন্দ্রিকতা সম্ভব কিনা। দুঃখজনকভাবে তিনি শেষে বলেছেন, ইতিহাস শাখাটি জ্ঞানের বৃহৎ সম্প্রদায় হিসেবে সাধারণ লক্ষ্য, মর্যাদা এবং উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া পণ্ডিতদের সংঘ হিসেবে তার অস্তিত্ব হারিয়েছে। অধ্যাপককে (ইতিহাসের) বিচারের বইয়ের শেষ পঙ্‌ক্তিতে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, সেই দিনগুলোতে ইসরাইলে কোনো রাজা ছিল না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দৃষ্টিতে যেটা সঠিক মনে করত, তাই তারা করত।[১]
যে কারণে আমি আমার শেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি, আমাদের শতাব্দীতে অন্যতম প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিজনিত কাজ হচ্ছে—প্রশ্ন করা, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করা নয়। সেজন্য নোভিক থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে কিছু যোগ করতে হলে আমাদের বলতে হবে, নিরপেক্ষ বাস্তবতার ধারণা থেকে শুধু ঐক্য নয় বরং অনেক প্রচলিত কর্তৃত্ব (যেমন ঈশ্বর) প্রধানত গুরুত্ব হারিয়েছে। প্রভাব বিস্তারকারী ধারার দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, যাদের মধ্যে মিশেল ফুকোর অবস্থান, তিনি বলেন কোনো লেখকের সম্পর্কে কথা বলা (যেমন মিল্টনের কবিতার ক্ষেত্রে) আদর্শগত নয় বরং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অতিরঞ্জিত করাকে বোঝায়।

এই অদম্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হলে বিশ্ব নবীন রক্ষণশীল আন্দোলনকারীদের মতো করে অক্ষমভাবে হাত কচলানো বা প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর পক্ষে পেশীশক্তির বহিঃপ্রকাশ কোনো ফল বয়ে আনবে না। আমি এটা বলা সত্য বলে মনে করি, ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা এবং কর্তৃপক্ষের সমালোচকরা কিভাবে এই নিরপেক্ষ পৃথিবীতে তাদের নিজেদের সত্য নির্মাণ করে। এ বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে তারা সমাজে নিশ্চিত ভূমিকা রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথাকথিত শ্বেতাঙ্গদের বিষয়বিমুখতার শ্রেষ্ঠত্ব, যা ধ্রুপদী ইউরোপিয় উপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এবং টিকেছিল—তা সত্যিকার অর্থে আফ্রিকার এবং এশিয়ার মানুষের উপর নগ্ন দখলদারিত্বের কারণে প্রতিষ্ঠিত। তাদের ক্ষেত্রে এটাও সমানভাবে সঠিক, তারা তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে চাপিয়ে দেওয়া সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এ কারণেই প্রত্যেকেই নতুন এবং প্রায়ই চরম বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসে। প্রত্যেকে ইহুদি খিস্টান মূল্যবোধ, আফ্রিকাকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, ইসলামি সত্য, প্রাচ্যের সত্য, পাশ্চাত্যের সত্য—যাদের প্রত্যেকটি অন্যসবগুলোকে বাদ দিয়ে দেবার জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা করে এবং সে সম্পর্কে অন্তহীন কথার মাধ্যমে কঠোর দাবির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই বিষয়গুলো একটি মাত্র প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

যদিও প্রায়ই বাগাড়ম্বরভাবে দাবি করা হয়, আমাদের মূল্যবোধই (সেটা যাই হোক না কেন) বস্তুতভাবে চিরসত্য। ফল হিসেবে চিরসত্যের প্রায় পূর্ণ অনুপস্থিতি তৈরি হয়। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ঝুঁকি ও জুয়াখেলার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে অন্য সমাজের বিভিন্ন অপব্যবহারকে নিন্দা করলেও নিজ সমাজে তা স্বীকার করে নেওয়া। আমার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান ফরাসি বুদ্ধিজীবী এলেক্সিস ডি টকুয়েসভিল (Alexis de Tocquesville) এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করেছেন। যিনি আমাদের মতো অনেক শিক্ষিতের ধ্রুপদী উদারতা ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন এবং এসব বোধগুলো লেখার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। আমেরিকান গণতন্ত্র ও তার মূল্যায়ন লিখে এবং রেড ইন্ডিয়ান ও কালো দাসদের উপর আমেরিকার বর্বরোচিত আচরণের সমালোচনা করার পর টকুয়েসভিল পরবর্তীতে ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে মার্শাল বুগোতের অধীনে ফ্রান্সের দখলদার সেনাবাহিনী আলজেরিয়ার মুসলমানদের উপর শান্তির নামে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল। টকুয়েসভিল'র আলজেরিয়া-সংক্রান্ত লেখা পড়ার সময় হঠাৎ করে যে স্বাভাবিক উপায়ে তিনি আমেরিকানদের কুকর্মের ব্যাপারে মানবিকভাবে আপত্তি তুলেছেন, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সেটা আর দেখতে পাওয়া যায়নি। তার মানে এই নয়, তিনি কারণ উল্লেখ করেন নি। তিনি তা করেছেন কিন্তু সেগুলো গুরুত্ব হ্রাস করার অজুহাত মাত্র। যার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশবাদকে ছাড়পত্র দেওয়া। যাকে তিনি জাতীয় গৌরব বলেছেন। ব্যাপক নির্দয় হত্যাকাণ্ড তাকে বিচলিত করেনি। তিনি বলেন, মুসলমানরা একটি নিকৃষ্ট ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের অবশ্যই সুশৃঙ্খল হতে

হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, আমেরিকানদের জন্য তার ভাষার বাহ্যিক চিরসত্যকে তিনি অস্বীকার করেছেন এবং নিজের দেশের জন্য স্বেচ্ছায় তার প্রয়োগকে অস্বীকার করেছেন। তার নিজের দেশ ফ্রান্সের জন্য তিনি একই রকম অমানবিক নীতিকে অনুসরণ করেন।[২]

যদিও আরও বলা আবশ্যক, টকুয়েসভিল এবং একই ব্যাপারে জন স্টুয়ার্ট মিল ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সম্পর্কে যাদের ধারণা প্রশংসনীয় এবং এই ধারণা ভারতে প্রয়োগ করা হয়নি। তিনি এমন সময়ে বাস করতেন, যখন আন্তর্জাতিক আচরণের চিরায়ত রূপ বলতে কার্যত অন্য লোকদের উপর ইউরোপিয় শক্তির প্রতিনিধিত্ব করার প্রভাবশালী অধিকারকে বোঝানো হতো। যা পৃথিবীর অশ্বেতাঙ্গদের বড়ই তুচ্ছ এবং নগণ্য বলে চিহ্নিত করে। এছাড়া ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যবাদীদের মতে, কৃষ্ণ বা বাদামী চামড়ার লোকজনের উপর একতরফাভাবে উপনিবেশিক সেনাবাহিনী যে নির্মম পাশবিক আইন প্রয়োগ করে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো স্বাধীন এশিয়া বা আফ্রিকাতে কোনো মানুষ নেই। শোষিত হওয়ার অনিবার্য বাস্তবতা তাদের জন্য নির্ধারিত। ফ্রান্টজ ফ্যানন, এমি সিসারি এবং সিএলআর জেমস—তিনজন বিখ্যাত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবী বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচেননি এবং লেখেননি। সেজন্য তারা মুক্তি আন্দোলনগুলোর অংশ হয়ে গেছেন এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ঔপনিবেশিক জনগণের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা ও তা রক্ষায় অনেকটা সফল হয়েছেন। যা টকুয়েসভিল কিংবা মিল (Mill)-এর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের কাছে সহজলভ্য ছিল না। যারা প্রায় কখনোই চূড়ান্ত সমাপ্তি টানতেন না। যারা ভাবতেন যদি তোমরা মৌলিক মানবিক ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে চাও, তোমাকে তা সবার জন্য করতে হবে, শুধু তোমার পক্ষের, তোমার সংস্কৃতি, তোমার জাতি—যা সঠিক বলে নির্দেশনা দেয়—তা অন্য সব জনগণের জন্য আলাদা নয়।

কিভাবে নিজের আত্মপরিচিতি এবং নিজের সংস্কৃতি, সমাজ এবং ইতিহাসের বাস্তবতার সাথে অন্যের পরিচিতি, সংস্কৃতি এবং জনগণের বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করা হবে সেটাই মূলত মৌলিক সমস্যা। যা ইতোমধ্যে একজনের নিজস্বতায় পরিণত হয়েছে তার প্রতি অগ্রাধিকারভাবে সমর্থন জানানোর মাধ্যমে কখনও এটা করা যাবে না। 'আমাদের' সংস্কৃতির গৌরব অথবা 'আমাদের' ইতিহাসের বিজয় সম্পর্কে গণবক্তৃতা দেওয়াও বুদ্ধিজীবী শক্তির যথাযথ প্রকাশ করে না। বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন বিভিন্ন জাতি এবং পটভূমি থেকে আগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহু সমাজ গঠিত হয়েছে, যারা যেকোনো ক্ষয়িষ্ণু তত্ত্বকে প্রতিরোধে তৎপর। যেহেতু আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, গণসমাজের যেখানে বুদ্ধিজীবীদেরকে তাদের কার্যাবলীর প্রকাশ ঘটাতে হয় তা তাদের জন্য খুবই জটিল এবং বিব্রতকর। কিন্তু সেখানে একটি কার্যকরী হস্তক্ষেপের অর্থ নির্ভর করে ন্যায়বিচার এবং সঠিক ধারণার উপর বুদ্ধিজীবীদের কতটা দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তার উপর। যা জাতি এবং ব্যক্তির পার্থক্যকে

স্বীকার করে নেয় এবং একই সময়ে তাদের মধ্যে কোনো গোপন কাঠামো-বিন্যাস ও পছন্দ, মূল্যায়নকে স্বীকার করে না। আজকাল সবাই সমতা এবং সম্প্রীতি সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে উদার ভাষায় মত প্রকাশ করে। বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা হচ্ছে, এসব ধারণাগুলোকে প্রকৃত অবস্থার সাথে তুলনা করে, যেখানে একদিকে সমতা ও ন্যায়বিচারের পেশা এবং অন্যদিকে বরং সামান্য উপদেশমূলক বাস্তবতার পার্থক্য খুবই ব্যাপক।

তবে একটা বিষয় এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা খুব সহজে দৃশ্যমান এবং সে কারণেই আমি এসব বক্তৃতায় ওসব বিষয়ের প্রতি এত জোর দিয়েছি। আমার চিন্তায় কী ছিল—তা দুটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার হবে। ইরাকের অবৈধ উপায়ে কুয়েত দখলের অব্যবহিত পরে পশ্চিমা জনগণের আলোচনায় শুধু আক্রমণের অগ্রহণযোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল চরম নিষ্ঠুরভাবে। যার উদ্দেশ্য ছিল : এটা শুধু কুয়েতের অস্তিত্ব বিলোপ করবে ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার এবং এটা পরিষ্কার যে, বস্তুত এটা আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল। জনগণের বক্তব্য শুধু জাতিসংঘের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকে অনুপ্রাণিত করেছিল যা জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করবে এবং ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র অনুমোদনের দাবিও সমর্থন করবে। যে গুটিকতক বুদ্ধিজীবী ইরাকের দখলদারিত্ব এবং পরবর্তীতে অপারেশন 'ডেজার্ট স্টর্ম' নামে ব্যাপক আমেরিকান শক্তি প্রয়োগ—উভয়েরই বিরোধিতা করেছিলেন। আমার জানামতে, তাদের কেউই ইরাকের দখলদায়িত্বের পক্ষে কোনো উদাহরণ টানেন নি বা ক্ষমা করার প্রকৃত কোনো চেষ্টাও করেননি।

যখন বুশ প্রশাসন দখলদারিত্বের আলোচনামূলক বিকল্প সম্ভাবনা অবজ্ঞা করে ১৫ জানুয়ারির পূর্বে প্রতি-আক্রমণ শুরু হওয়ার সময়ে জাতিসংঘকে বিশাল শক্তি দিয়ে যুদ্ধের দিকে চালিত করেছিল এবং অন্য ভূখণ্ডের অবৈধ দখল এবং আক্রমণ-সংক্রান্ত জাতিসংঘের অন্য প্রস্তাব আলোচনা করতে অস্বীকার করেছিল তখন সেসব ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা তার ঘনিষ্ঠ মিত্ররা জড়িত ছিল। অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত উপসাগরীয় ঘটনা মূলত তেল এবং পরিকল্পিত শক্তির সাথে জড়িত। তা কখনও বুশ প্রশাসনের ঘোষিত নীতি নয়, বরং দেশ জুড়ে বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত বক্তব্য যে শক্তি প্রয়োগ করে, একতরফাভাবে ভূমি দখল করার ঘটনা অবৈধ—এই চিরায়ত ধারণার পরিপন্থী। আমেরিকান বুদ্ধিজীবীদের, যারা এই যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন তাদের কাছে আমেরিকা ঠিক সেই সময় সার্বভৌম রাষ্ট্র পানামা আক্রমণ এবং কিছু সময়ের জন্য যে দখল করেছিল, সে ঘটনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি। তাহলে নিশ্চিতভাবে ইরাকের সমালোচনা করলে আমেরিকাও কি স্বাভাবিকভাবে একই রকম সমালোচনার যোগ্য হয়ে ওঠে না? কিন্তু না, আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, সাদ্দাম ছিল একজন হিটলার। অপর দিকে 'আমরা' পরহিতকারী এবং নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং এটা ছিল একটি ন্যায়ের যুদ্ধ।

অথবা আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণের কথা বিবেচনা করলে সেটাও সমানভাবে

ভুল এবং নিন্দনীয় বিবেচিত। কিন্তু রাশিয়া আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগেই মার্কিন মিত্র যেমন ইসরাইল এবং তুরস্ক ভূমি অবৈধভাবে দখল করেছিল। একইভাবে আমেরিকার আরেক মিত্র ইন্দোনেশিয়া ১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে অবৈধ আক্রমণে আক্ষরিক অর্থে শত শত হাজার পূর্ব-তিমুরবাসীকে হত্যা করেছিল। পূর্ব-তিমুরের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে আমেরিকানরা যে জানত এবং সহযোগিতা করেছিল, তা দেখানোর মতো যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু আমেরিকার খুব কম বুদ্ধিজীবী, যারা সবসময়ের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের কুকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তারাও এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছিল।[২] এবং এটা ভীষণভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল ইন্দো-চায়নাতে আমেরিকার ব্যাপক আক্রমণ, যা সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় (ক্ষুদ্র বিশেষ করে কৃষক সমাজ সেখানে দুর্বলভাবে টিকে ছিল)। মনে হয় নীতি এমন ছিল, আমেরিকার বিদেশ এবং সেনানীতি-বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবীদের অন্য বিশ্বশক্তি এবং ভিয়েতনাম ও আফগানিস্তানে এদের প্রতিনিধিত্বকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে মনোনিবেশ করা উচিত, আর আমাদের অপকর্মগুলো নিতান্তই মূল্যহীন। এটাই সবচেয়ে উপযোগী রাষ্ট্রনীতি, একে চাণক্যনীতিও বলা যায়।

সেগুলো অবশ্যই এ রকম। কিন্তু আমার লক্ষ্য হবে—সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীরা, যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাস করেন, যারা দৃশ্যমানভাবে নিরপেক্ষ নৈতিক স্বাভাবিকতা এবং যুক্তিসিদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতি দ্বারা ইতোমধ্যে বিব্রতকারী হিসেবে প্রমাণিত, সেখানে একজনের নিজ দেশের আচরণকে অন্ধভাবে সমর্থন করা এবং পাপগুলোকে অবজ্ঞা করা অথবা অলসভাবে কিছু বলা ঠিক নয়। আমি বিশ্বাস করি, তারা সবাই এটা করে। এবং এটাই পৃথিবীর নিয়ম—এ কথা বলা কি গ্রহণযোগ্য? এর পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই বলতে হবে, বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত ভ্রান্তশক্তির তোষামোদকারী হিসেবে বিকৃত হওয়া পেশাজীবী নয়। বরং আবারো বলতে গেলে—বুদ্ধিজীবীরা বিকল্প এবং নৈতিক স্থিতিসম্পন্ন, যা তাদের শক্তি সম্পর্কে সত্য বলতে দক্ষ করে তোলে।

এটা বলতে আমি এখানে ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো কোনো বজ্রকণ্ঠকে বোঝাইনি। ঘোষণা করিনি যে, প্রত্যেকে পাপী ও দুষ্কৃতকারী। আমি এখানে বুঝিয়েছি, অধিকতর ভদ্র ও বহুলাংশে কার্যকর কিছুকে। আন্তর্জাতিক ব্যবহারের মানদণ্ড ও মানবাধিকারের সমর্থনকে উন্মুক্ত করতে চলমানতা সম্পর্কে বলাটা উৎসাহব্যঞ্জক। কিংবা ভবিষ্যৎবাচক অন্তঃদীক্ষার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে দিকনির্দেশক আলোর জন্য তার নিজের অভ্যন্তরে দৃষ্টি দেওয়াকে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বের সব দেশ না হলেও অধিকাংশ দেশই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী। ১৯৪৮ সালে এ সনদ গৃহীত এবং ঘোষিত হল। জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে এটা পুনরায় সমর্থিত হল। যুদ্ধের আইনকানুন, বন্দিদের সাথে আচরণ, শ্রমিক, নারী, শিশু, অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের মানবাধিকারের জন্য সমানভাবে পবিত্র অঙ্গীকার এই সমঝোতায় রয়েছে। এই সব মহান ঘোষণার কোনোটিই অদক্ষ, সমবর্ণ কিংবা সাধারণ জনগণের সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না। যদিও সব কিছুই একই স্বাধীনতার সাথে সংযুক্ত।[৪] অবশ্য

এই অধিকারসমূহ দৈনন্দিন ভিত্তিতে অমান্য করা হয়। আজ বসনিয়ায় গণহত্যা তারই সাক্ষ্য বহন করে। আমেরিকান, মিশরিয় কিংবা চাইনিজ সরকারের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলোর দিকে ব্যবহারিকভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়। অবিরামভাবে নয়, কিন্তু এগুলো ক্ষমতার লোকনীতি, যেগুলো যথাযথভাবে বুদ্ধিজীবীদের জন্য নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত সবার জন্য একই ধরনের মানদণ্ড ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নে যাদের ভূমিকা সামান্যই।

অবশ্য যেকোনো দেশের জনগণের কাছে দেশপ্রেম ও আনুগত্যের একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আর তাই বুদ্ধিজীবীরা জটিল কোনো যন্ত্র নয়। সে সমগ্র বোর্ডে গাণিতিকভাবে গৃহীত আইনকানুনগুলোকে সজোরে নিক্ষেপ করে। অবশ্য কোনো সময়ের ভয় ও স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে এবং ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হিসেবে ক্ষমতা ও মনোযোগের ভয়ঙ্কর দক্ষতা নিয়ে সে কাজ করে। কিন্তু যে বিষয়গুলো নিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, তার উপর ঐক্যমত্য না থাকলে শোকের মাধ্যমে আমরা ঠিক কাজটাই করি। আমরা স্বপ্রশ্রয়পূর্ণ বস্তুকেন্দ্রিকতায় পুরোপুরি ভাসমান নই। কোনো পেশা কিংবা জাতীয়তার ভেতরে উদ্বাস্তু গ্রহণ করলেই শুধু উদ্বাস্তু গ্রহণ করা হয়, সকালের খবর পড়ে আমরা যে তাড়না পাই তার উত্তর এটি নয়।

কোনো ব্যক্তিই সবসময় জোর দিয়ে সব বিষয়ের উপর বলতে পারেন না। কিন্তু আমি মনে করি, কারো নিজস্ব সমাজের বিশেষ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃত ক্ষমতা থাকা উচিত। যা তার নাগরিকদের নিকট কৈফিয়তযোগ্য, বিশেষ করে যখন ঐ ক্ষমতাগুলো অসম ও অনৈতিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় কিংবা বৈষম্য, দমন ও গোষ্ঠী-নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচীতে প্রয়োগ করা হয়। আমি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেছি, আমরা সবাই জাতীয় গণ্ডির মধ্যে বসবাস করি, আমরা জাতীয় ভাষা ব্যবহার করি এবং জাতীয় সম্প্রদায়ের ভেতরে বসবাসকারী একজন বুদ্ধিজীবীকে একটা বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। প্রথমত, তাদের দেশ হচ্ছে চরমভাবে বিচিত্র অভিবাসী সমাজ এবং আকর্ষণীয় সব সম্পদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এর মধ্যে যে দুর্দান্ত অবিচার ও বাহ্যিক হস্তক্ষেপ রয়েছে—তা অস্বীকার করা যায় না। যখন আমরা বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অন্য কথা বলছি না, তখন নিশ্চিত মৌলিক বিষয়টি প্রাসঙ্গিক থাকবে। ভিন্নতা থাকার কারণে সন্দেহজনক দেশগুলো কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশ্বশক্তি নয়।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে কোনো পরিস্থিতির বুদ্ধিবৃত্তিক অর্থ বলতে বিদ্যমান ও প্রাপ্য লোকাচারের সাথে অন্যান্য বিদ্যমান ও প্রাপ্য ঘটনাগুলোর তুলনা করা বোঝায়। এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কারণ এতে দলিল দস্তাবেজ, গবেষণা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে টুকরো টুকরো নিখুঁত উপায় দরকার, পরে যার মধ্যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় কিনা কিংবা আনুষ্ঠানিক আচ্ছাদন তৈরি করা যায় কিনা তা নিশ্চিত করা সম্ভব করতে হয়। প্রথম যে বিষয়টা জরুরি তা হচ্ছে—কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা এবং তারপর সেগুলোকে আলাদা ঘটনা হিসেবে নয় বরং অবিচ্ছেদ্য ঘটনার অংশ হিসেবে (এখানে কোনো বাইরের

দেশ ও জাতি জড়িত কিনা) তা খুঁজে দেখতে হবে। আত্মপক্ষসমর্থনকারী, দক্ষ ব্যক্তি এবং পরিকল্পনাকারী কর্তৃক সম্পাদিত মানসম্মত বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণের অসংলগ্নতা হচ্ছে, পরিস্থিতির বিষয় হিসেবে অন্যদের দিকে মনোযোগ দেওয়া (সেখানে আমাদের অন্তর্ভুক্তি থাকে না বললেই চলে)। নৈতিক লোকাচারের সাথেও এর তুলনা করা হয় না। সত্য কথা বলার উদ্দেশ্য হল, আমাদের মতো প্রশাসনিকভাবে চালিত গণসমাজে কাজকর্মের ভালো পরিবেশ তৈরি করা এবং সে ধরনের নৈতিক নীতিমালা পালন করা। এই নীতিগুলোর মধ্যে শান্তি, বিরোধ মীমাংসা, কষ্ট লাঘব ইত্যাদি রয়েছে। আমেরিকান বাস্তববাদী দার্শনিক এবং সিএস পিয়ার্স এটাকে 'হরণ করা' বলেছেন। সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি এ বিষয়কে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন।[৫]

লেখায় ও বক্তৃতায় নিশ্চিতভাবে একজনের লক্ষ্য প্রত্যেককে দেখানো নয়, কতটা সত্য সে পালন করছে। বরং তার উচিৎ নৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করা, যার মাধ্যমে আগ্রাসনকে দেখা হয় এমনভাবে যে, জনগণ কিংবা ব্যক্তির অন্যায় সাজা প্রতিরোধ কিংবা ত্যাগ করা হবে। যার মাধ্যমে অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বীকৃত চর্চা প্রত্যেকের লোকাচার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য এটা ঈর্ষণীয় নয়। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এগুলো প্রায়ই ভাবগত এবং অবোধগম্য লক্ষ্য। আর এক অর্থে, সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে আমার বিষয়ের সাথে বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত কার্য সম্পাদন হিসেবে প্রাসঙ্গিক নয়। যেমনটি আমি বলে এসেছি, যখন প্রবণতা হচ্ছে ফিরে যাওয়া অথবা হুকুম তামিল করা।

যা আপনি সঠিক বলে জানেন, কিন্তু গ্রহণ করতে চান না এমনই এক জটিল ও নীতিগত অবস্থান থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে সরে যাওয়া, পরিহারকে উৎসাহিতকারী বুদ্ধিজীবীর মনের ঐ অভ্যাসগুলোর থেকে অধিকতর তিরস্কারযোগ্য আর কিছু হয় বলে আমার জানা নেই। আপনি অতিমাত্রায় রাজনীতিবিদ হতে চান না। আপনি বিতর্কিত হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন। আপনার শিক্ষকের সমর্থন আপনি চান। ভারসাম্য, বস্তুনিষ্ঠ মধ্যবর্তী ভদ্র হওয়ার জন্য আপনি খ্যাতি ধরে রাখতে চান। আপনার আশা থাকে, আপনার কাছে প্রশ্ন আর আলাপ-আলোচনা যাই করা হোক একটা সম্মানিত কমিটিতে এবং দায়িত্বপূর্ণ প্রধান ধারায় থাকার ইচ্ছাও আপনি পোষণ করেন। একদিন আপনি একটি সম্মানসূচক ডিগ্রি, বড় পুরস্কার পাওয়ার ও রাষ্ট্রদূত হওয়ার আশা করেন।

বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্রে মনের এই অভ্যাসগুলোই তার শ্রেষ্ঠত্বকে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে। যদি কিছু অস্বাভাবিক নিরপেক্ষ এবং চূড়ান্তভাবে প্রেমাত্ম বোধ বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনকে হত্যা করে, তবে সেটা হবে এই অভ্যাসের আন্তর্জাতিকায়ন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেগুলোকে সব সমসাময়িক বিষয়গুলোর সবচেয়ে কঠিন একটির মধ্যে রেখেছি। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংঘটিত অন্যায়মূলক কর্মকাণ্ডের উদাহরণ ফিলিস্তিন। এটা অনেকের পা বেঁধে রেখেছে। তারা সত্যটা জানে এবং সাধ্যমতো করতেও জানে। কারণ কোনো একজন ফিলিস্তিনির অধিকার ও স্বশাসন প্রতিষ্ঠার

(যেকোনো একজন তার সমর্থক) জন্য প্রতারণা ও কলঙ্ক অর্জন করা সত্ত্বেও সত্য কথা বলা উচিত। এটি নির্ভীক ও মমতাপূর্ণ করুণাময় বুদ্ধিজীবীর তুলে ধরা উচিত। পিএলও এবং ইসরায়েলের মধ্যে ১৯৯৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তির ফলাফল হিসেবে এটি অধিকতর সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই চরম সীমাবদ্ধ সাফল্যের মাধ্যমে উদ্‌গত রমরমা অবস্থা এই বিষয়টিকে শৃঙ্খলিত করে তোলে। যা ফিলিস্তিনিদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিবর্তে, চুক্তিটি কার্যকরভাবে দখলকৃত এলাকাগুলোর উপর ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘসূত্রিতাকে নিশ্চিত করে। এটা সমালোচনা করার অর্থ, আশা ও শান্তির বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে একটি অবস্থা গ্রহণ বোঝায়।

চূড়ান্তভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আমি একটি কথা বলব। বুদ্ধিজীবী পর্বতের চূড়ায় ওঠে না এবং চূড়া থেকে বিষোদগার করে না। স্পষ্টত আপনি সেই জায়গায় বক্তৃতা দিতে চাইবেন, যেখানে আপনার কথা সবচেয়ে ভালোভাবে শোনা হবে এবং আপনি এটিকে এমনভাবে তুলে ধরতে চাইবেন, যাতে চলমান প্রক্রিয়া কিংবা প্রকৃত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে শান্তি ও ন্যায়বিচারের কারণকে উল্লেখ করা যায়। হ্যাঁ, বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর নিঃসঙ্গ, কিন্তু এটি জোরালো হতে পারে, যদি এটি কোনো আন্দোলনের বাস্তবতা, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সবার দ্বারা অংশগ্রহণকৃত সাধারণ আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। সুবিধাবাদ এই নির্দেশ দেয়, পাশ্চাত্যে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস কিংবা অনাধুনিকায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রার সমালোচনায় আপনি তাদেরকে তিরস্কার করতে পারেন এবং ইসরায়েলের গণতন্ত্রকে প্রশংসা করে যেতে পারেন। তখন আপনি শান্তি সম্পর্কে ভালো কিছু বলতে পারবেন। বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব হিসেবে আপনি অবশ্য ভাবতে পারেন যে, এসব বিষয়ে ফিলিস্তিনিদেরকে আপনার অবশ্যই বলা উচিত। কিন্তু আপনার প্রধান উদ্দেশ্য হবে—নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লন্ডনকে এসব বিষয়ে অবগত করা। কারণ এই দেশগুলোতে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারলে তা ফিলিস্তিনিদের মুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সন্ত্রাস ও চরমপন্থীদের থেকে মুক্তির ধারণাকে বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে। শুধুমাত্র দুর্বল বা খুব সহজে পরাজিত করা যায়, এমন দেশকে এসব বিষয়ে অবগত করালে তা তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না।

ক্ষমতায় থেকে সত্য কথা বলাটা পাগলামিজনিত কোনো আদর্শবাদ নয়। এটি সতর্কভাবে সম্পূরক বিষয়কে জটিল করছে, সঠিক জিনিসটা তুলে নিচ্ছে এবং তারপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপস্থাপন করছে, যেখানে এটি সর্বোচ্চ মঙ্গল এবং সঠিক পরিবর্তন ঘটাতে পারবে।

ভাষান্তর : দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু

তথ্যসূত্র :

১. Peter Novick, *That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 628.

২. I have discussed the imperial context of this in detail in *Culture and Imperialism* (New York: Alfred A. Knopf, 1993) pp. 169-90.

৩. For an account of these dudious intellectual procedures, see Noam Chomsky, *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989).

৪. A fuller version of this argument is to be found in my "Nationalism, Human Rights, and Interpretation" in *Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures, 1992*, ed. Barbara Johnson (New York: Basic Books, 1993), pp. 175-205.

৫. Noam Chomsky, *Language and Mind* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), pp. 90-99.

৬. See my article "The Morning After," *London Review of Book*, 21 October 1993, Volume 15, no. 20, 3-5.

কালচার এন্ড ইমপেরিয়ালিজম

ভূমিকা

অরিয়েন্টালিজম লেখার সময় সাম্রাজ্যের সাথে সংস্কৃতির সাধারণ সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু ধারণা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। *অরিয়েন্টালিজম* প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এর বছর পাঁচেক পর এই ধারণাগুলো একসাথে সাজিয়ে নিতে শুরু করি আমি। এর প্রথম ফলাফল স্বরূপ ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কয়েকটা বক্তৃতা দিই। আমার এই বইয়ের মূল যুক্তিতর্ক খাড়া করা হয়েছে ঐসব বক্তৃতার ভিত্তিতে। আসলে বক্তৃতাগুলো দেয়ার সময় থেকে বিষয়টা ধীরে ধীরে আমার চিন্তাকে পুরাপুরি দখল করে। কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপার নিয়ে সীমিত আকারে লেখা *অরিয়েন্টালিজম*-এ আমি যেসব যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছি সেগুলো গড়ে ওঠার পেছনে নৃ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অঞ্চলবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্যের অবদান আছে। এ কারণে এ বইয়ে আমি নিজেই চেষ্টা করেছি *অরিয়েন্টালিজম-এর* যুক্তিতর্কগুলো আরো বিস্তৃত করার। উদ্দেশ্য, আধুনিক মেট্রোপলিটান পশ্চিম এবং সমুদ্রের ওপারে তার উপনিবেশের সাথে সম্পর্কের সচরাচর ধরনটা বর্ণনা করা।

এখানে অমধ্যপ্রাচ্যীয় ব্যাপার কোনগুলো? আফ্রিকা, ইন্ডিয়া, দূরপ্রাচ্যের অংশবিশেষ, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যারেবীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে ইউরোপীয়দের লেখাজোখা; যার কিছু কিছু আফ্রিকানিস্ট ও ইন্ডিয়ানিস্ট ডিসকোর্স বলে উল্লেখিত হয়। আমার কাছে এগুলো হল দূরের দেশ ও তার মানুষদের শাসন করার সার্বিক ইউরোপীয় চেষ্টারই অংশ। কাজেই এইসব রচনাও ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্যতাত্ত্বিক বর্ণনার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ইউরোপ কর্তৃক ক্যারেবীয় দ্বীপপুঞ্জ, দূরপ্রাচ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার একটা বিশেষ কায়দা মাত্র। মনে দাগ কাটার মতো কিছু ব্যাপার আছে এইসব ডিসকোর্সে। যেমন, পাঠক 'রহস্যময় পুব'-এর বিবরণ পড়তে গিয়ে প্রায়ই আলঙ্কারিক ভাষার মুখোমুখি হবেন। তেমনি পাবেন 'আফ্রিকার (বা ইন্ডিয়ার বা আয়ারল্যান্ডের বা জ্যামাইকার বা ক্যারেবীয়) মন'-এর ছাঁচ, আদিম বা অসভ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার আলো জ্বেলে দেয়ার কাহিনী, ওরা যখন দুর্ব্যবহার করে বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তখন চাবুকানো বা খুন করা কিংবা দীর্ঘ কোনো সাজা দেয়ার বুদ্ধি, যা বিরক্তিকরভাবে আগে থেকেই জানা। কারণ, ওরা গায়ের জোর বা মারধোরের ব্যাপারটাকে সবচেয়ে ভালো করে বুঝতে পারে; ওরা আমাদের মতো নয়, এবং এ কারণেই ওদের থাকতে হবে শাসিত হিসেবে।

কিন্তু এও সত্য যে, ইউরোপের বাইরে পৃথিবীর যেখানেই শাদা মানুষেরা গেছে সেইখানেই তাদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া বি-উপনিবেশায়নের মহান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের আধিপত্যের জবাব দেয়ার ব্যাপারটা আমি *অরিয়েন্টালিজম*-এ আলোচনা করতে পারিনি। উনিশ

শতকের আয়ারল্যান্ড, আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষেরা পশ্চিমের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়তে শুরু করে। এর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক লড়াই, জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয় দাবী এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ব-শাসন ও জাতির স্বাধীনতা অর্জনের একই রকম লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কিসিমের সংগঠন ও দল গড়ে তোলার কাজও চলেছে। মোট কথা, সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ে পশ্চিমা অনুপ্রবেশকারীরা কোথাও নরম স্বভাবের, নিষ্ক্রিয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দেখা পায়নি যে আরামে তাদের ঘাড়ের ওপর বসে পড়বে। সবখানে সব সময় লড়াই চলেছে, আর দেখা গেছে প্রায় প্রতিটা লড়াইয়ে চূড়ান্ত জয় হয়েছে স্থানীয়দের।

আমার এই বইটায় এই দুইটা দিক আলোচিত হয়েছে: এক—পৃথিবী জুড়ে একই কিসিমের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিস্তার, আরেক—সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। এই কারণেই এই বই *অরিয়েন্টালিজম*-এর দ্বিতীয় খণ্ড জাতীয় কিছু না, বরং অন্য কিছু করার চেষ্টা। যেটাকে আমি সাধারণভাবে 'সংস্কৃতি' নামে উল্লেখ করেছি সেই বিষয়টার ওপর খুব জোর দিয়েছি দুই বইয়েই।

এইখানে সংস্কৃতি কথাটার দুইটা অর্থ আছে। প্রথম কথা, সংস্কৃতি হচ্ছে বর্ণনা, যোগাযোগ ও প্রতিনিধিত্ব করার শিল্প। এইগুলো থাকে নন্দনশিল্পের বেশে, আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারস্যাপার থেকে এইগুলো আপাতত স্বাধীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় লোককলা এবং নৃ-জাতিবিদ্যা, ইতিহাস, ভাষাবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মতো জ্ঞানগর্ভ বিষয়ও তার মধ্যে পড়ে। কিন্তু এইখানে আমার আসল লক্ষ্য ছিল উনিশ ও কুড়ি শতকের আধুনিক পশ্চিমা সাম্রাজ্যের দিকে। সেই জন্য সাংস্কৃতিক জিনিষ হিসেবে উপন্যাসের ওপর নজর দিয়েছি। কারণ আমি মনে করি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও অভিজ্ঞতা গঠনে উপন্যাসসাহিত্য ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল উপন্যাসই যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা না। তবে আমার বিবেচনায় বাড়ন্ত বৃটিশ ও ফরাসি সমাজের সাথে শিল্পের এ শাখাটির সংযোগ নিয়ে গবেষণা আগ্রহব্যঞ্জক। আধুনিক বাস্তববাদী উপন্যাসের প্রত্ন-নমুনার মতো উপন্যাস হল *রবিনসন ক্রুশো*। এবং এওো কোনো দুর্ঘটনা নয় যে, উপন্যাসটি একজন ইউরোপীয় সম্পর্কে, যে নিজের একটি জায়গীর তৈরি করে নেয় দূরের অ-ইউরোপীয় কোনো-এক দ্বীপে।

উপন্যাস নিয়ে এখন খুব আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সেইসব আলোচনায় ইতিহাস ও সাম্রাজ্যের জগতে ঔপন্যাসের অবস্থানের ব্যাপারে নজর দেয়া হয় না। পাঠকেরা বুঝতে পারবেন এখানে আমার বক্তব্যে উপন্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার মূল কথা হল উপন্যাসিক বা অভিযানকারীরা বিশ্বের অচেনা অঞ্চলগুলো সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রাণ হচ্ছে কাহিনী। আবার আত্মপরিচয় ও আপন ইতিহাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপন্যাসসাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীও। সাম্রাজ্যবাদে মূল লড়াই ছিল মাটি নিয়ে। কিন্তু যখনই কথা উঠেছে যে, মাটির মালিক কে, এতে বসত করার ও চাষ করার অধিকার কার, কারা একে চালাবে, কারা মাটি ফিরে পাবে এবং এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবে, তখন এই বিষয়গুলো উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো কখনো উপন্যাসে এগুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে, এমনকি উপন্যাসেই সে দ্বন্দ্বের ফলাফলও

নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন এক সমালোচক মন্তব্য করেছেন জাতি নিজেই আসলে একরকম বিবরণ মাত্র। বিবরণ রচনার ক্ষমতা কিংবা অন্যান্য বিবরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; এবং তাতে এই দুয়ের সম্পর্কটাও ফুটে ওঠে। শৃঙ্খল-মুক্তি ও বোধোদয়ের কথাসাহিত্য উপনিবেশের মানুষদেরকে উপনিবেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এইসব কাহিনী পড়ে বহু ইউরোপীয় ও মার্কিন মানুষও নাড়া খেয়েছেন । ওরাও সামিল হয়েছেন মানবসমাজ ও সাম্যে'র নয়া কাহিনী সৃষ্টির লড়াইয়ে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি হল একটা ধারণা যাতে পরিশোধন ও উন্নয়নকর বৈশিষ্ট্য যুক্ত রয়েছে; ১৮৬০-এর দশকে ম্যাথু আর্নল্ড যেমন বলেছিলেন, এ হচ্ছে কোনো জাতির জ্ঞান ও চিন্তায় সবচেয়ে ভালো ব্যাপারগুলোর এককরা সঞ্চয়। এ ধারণা ঠিক নির্ণয় বা নির্দিষ্ট করার মতো নয়। আর্নল্ড বিশ্বাস করতেন সংস্কৃতি আমাদের আধুনিক, আগ্রাসী, পণ্যমুখি, কারবারী, দিন দিন আরো বর্বর হয়ে-ওঠা নাগরিক অস্তিত্বের ধ্বংসাত্মক দিকটা লাঘব করে, যদিও পুরোপুরি দূর করতে পারে না। যে-সব ভালো ভালো ব্যাপার জানা গিয়েছিল এবং চিন্তা করা হয়েছিল সেগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা দান্তে বা শেক্সপীয়ার পড়ি। সেই আলোকে নিজেকে এবং চারপাশের মানুষ, সমাজ ও ঐতিহ্যকে বুঝে নেয়ার জন্যও তাদের লেখা পড়া হয়। সময়ে সংস্কৃতি এসে মেশে জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে; সচরাচর তা মিশেছে আগ্রাসী চেহারায়। এই মিশ্রণ 'আমাদেরকে' 'ওদের' থেকে আলাদা করে, যাতে ভিনদেশী মানুষদের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষ সবসময়ই ছিল। এ অর্থে সংস্কৃতি হল আত্মপরিচয়ের উৎস। এ উৎস কিছুটা মারুক স্বভাবের। কিছুকাল থেকে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে 'ফেরার' যে-ব্যাপার ঘটছে তার মধ্যে সেই প্রমাণই পাচ্ছি আমরা। এই 'ফেরার' সাথে জড়িয়ে থাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক আচরণের কঠিন রীতিনীতি যা মিশ্রসংস্কৃতিবাদ ও সংকরত্বের মতো তুলনামূলকভাবে উদার দর্শনের সহনশীলতা ধর্মের বিরোধিতা করে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলোয় এই 'ফেরা' থেকে জন্ম নিচ্ছে নানা জাতের ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ।

এই অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একরকম মঞ্চের মতো, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক নিমিত্ত একটা আরেকটার সাথে যুঝতে থাকে। এই মঞ্চ অ্যাপোলীয় গোষ্ঠীবাদীতার শান্ত সুবোধ জায়গা না। বরং তা এক রণস্থলও হয়ে উঠতে পারে যেখানে নিমিত্তগুলো দিনের আলোয় পরিষ্কার ধরা পড়ে আর একে অপরের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে যায়। এর ফলে কিছু কিছু ব্যাপার স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে দেখা দেয়। যেমন, যে-সব মার্কিন, ফরাসি বা ইন্ডিয়ান ছাত্রকে সর্বপ্রথম নিজ নিজ ক্লাসিকগুলো পড়ার শিক্ষা দেয়া হয় তাদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে, তারা কোনোরকম তর্ক ছাড়াই নিজ জাতি ও ঐতিহ্য মানবে, আবার অন্য জাতি ও ঐতিহ্যের নিন্দা করবে বা ঐগুলোর বিরুদ্ধে লড়বে।

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণার সমস্যা হল এতে নিজ সংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা থাকে। কেবল এইটাই নয়, নিজ সংস্কৃতিকে নিত্যদিনের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন বলেও মনে করা হয়, যেহেতু ধরে নেয়া হয় তা সবচেয়ে ভালো। এর ফলে বহু পেশাদার

মানবতাবাদীও একটা ব্যাপার ধরতে পারেন না যে, যে-সমাজ সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতা, দাসত্ব প্রথা, উপনিবেশী ও বর্ণবাদী দমনপীড়ন প্রভৃতি দীর্ঘমেয়াদী ও ইতর নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি অন্যদের ওপর কায়েম করে সেই সমাজের কবিতা, উপন্যাস ও দর্শনের সাথে ঐ দমনপীড়নের সম্পর্ক কী। এই বইটা লিখতে গিয়ে কঠিন এক সত্য আবিষ্কার করেছি আমি: যারা উপনিবেশ ইন্ডিয়া বা আলজেরিয়ার শাসক ছিলেন তাদের একটা প্রিয় ধারণা হল স্থানীয়রা 'প্রজার জাত' বা নিচু 'শ্রেণী'র মানুষ। যে-সব বৃটিশ ও ফরাসি শিল্পীদের আমি পছন্দ করি তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষেরা এইসব ধারণা মেনে নিয়েছে। তা আবার উনিশ শতকে আফ্রিকার বহু অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী দখল কায়েমের পেছনে মদদ যুগিয়েছে। আমি মনে করি কার্লাইল, রাসকিন বা ডিকেন্স এমনকি থ্যাকারে সম্পর্কে ভাবার সময় সমালোচকরা প্রায়ই যেটা করেন তা হল উপনিবেশী সম্প্রসারণ, নিচু জাতের মানুষ বা 'নিগার' প্রভৃতি বিষয়ে ঐসব লেখকদের ধারণাকে সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করেন না। যেহেতু (ওরা ভাবেন) সংস্কৃতি হচ্ছে উন্নত স্তরের মানবীয় তৎপরতার জায়গা, এইসব লেখকরা যেখানে বিচরণ করতেন। এবং ঐ স্তরেই ওরা তাদের 'সত্যিকার' জরুরি কাজগুলো করে গেছেন।

এ অর্থে সংস্কৃতি হতে পারে আত্মরক্ষামূলক বেড়ার মতো: দরজার ভেতরে পা দেয়ার আগে সেই দরজার রাজনীতিটুকু বুঝে নিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের এক উপনিবেশে বেড়ে উঠে, অতপর সারা জীবন সাহিত্যের শিক্ষকতা করা একজন মানুষ আমি। আমার পক্ষে সংস্কৃতিকে অন্য কোনোভাবে দেখা দুরূহ: অর্থাৎ তা যেন জাগতিক সম্পর্কের সূত্রে সম্ভাব্য সংক্রমণের বিরুদ্ধে যথাযথ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্বলিত কোনো ব্যাপার, কিন্তু একই সাথে মানবীয় প্রয়াসের অসাধারণ ও বিচিত্র এক ক্ষেত্রও। এখানে আমি কিছু উপন্যাস ও অন্য ধরনের রচনা বিশ্লেষণ করেছি। তার প্রথম কারণ আমার বিবেচনায় এইগুলো শিল্প ও জ্ঞানদায়ক রচনা হিসেবেও পছন্দ করার ও গুরুত্ব দেয়ার মতো কাজ। আমার মতো আরো অনেক পাঠক এগুলো থেকে আনন্দ ও উপকারিতা পেয়ে আসছেন। দ্বিতীয়ত, এই রচনাগুলোকেই আবার আনন্দ ও উপকারিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কাজটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো। এইসব রচনা পরিষ্কারভাবে ও প্রকাশ্যে যে-সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার অঙ্গ সেই প্রক্রিয়ার সাথে এগুলোর সম্পর্ক নির্ধারণ তার চেয়ে কঠিন। সংশ্লিষ্ট সমাজে যা সন্দেহহীন বাস্তবতা বলে গৃহীত হয়েছিল সেই বাস্তবতা সৃষ্টিতে এগুলোও অংশ নিয়েছে। কাজেই সেই অংশগ্রহণের বদনাম না করে আমি বরং এই কথা বলি যে, এইসব রচনার উপেক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি তা ঐগুলোকে আরো বেশি বেশি পড়তে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করে।

এইখানে দুইটি মহৎ উপন্যাস ব্যবহার করে আমি বলে নিই আসলে আমার চিন্তাটা কী। ডিকেন্সের *গ্রেট এক্সপেক্টেশন* (১৮৬১) প্রাথমিকভাবে আত্ম-প্রবঞ্চনামূলক একটা উপন্যাস। এতে পিপ ভদ্রলোক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। কিন্তু এ জন্য দরকারী ধনসম্পদের কোনো উৎস নেই তার। আবার কঠোর পরিশ্রমও সে করে না। পয়লা জীবনে সে আবেল মেগউইচ্ নামে এক দণ্ডিত আসামীকে সাহায্য করেছিল। অস্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর মেগউইচ বড় অংকের অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে তরুণ

উপকারীর উপকারের শোধ দেয়। টাকাটা যে উকিলের মাধ্যমে পিপের কাছে পৌঁছায় সে কিছু ভেঙ্গে না বলায় পিপ মনে করে জনৈক বয়স্ক ভদ্রমহিলা মিস হাবিশাম তার পৃষ্ঠপোষক। এরপর অবৈধভাবে লন্ডনে হাজির হয় মেগউইচ। কিন্তু পিপ তাকে পোছে না। কারণ লোকটার সবকিছুতেই নিরানন্দ আর অপরাধের গন্ধ। পরে অবশ্য পিপ মেগউইচ ও তার বাস্তবতার সাথে মিশে যায়; সবশেষে গ্রেফতারকৃত, চরম অসুস্থ মেগউইচকে নিজের ধর্ম-পিতা বলে মানে। তখণ তাকে আর বাতিল করে দেয়ার মতো কেউ মনে হয় না, যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরত-আসা মেগউইচ আসলেই গ্রহণঅযোগ্য; দণ্ডিত অপরাধীদের জায়গা দেয়ার জন্য সৃষ্ট উপনিবেশ হল অস্ট্রেলিয়া, ঐখান থেকে ইংরেজ অপরাধী ফেরত আসার জন্য নয়।

এই বইটি সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে তার সবগুলোই একে মেট্রোপলিটান বৃটিশ উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসের সাথে চিহ্নিত করেছে। অথচ আমি মনে করি এরচেয়ে আরো ব্যাপক ও বিচিত্রভাবে গতিশীল ইতিহাসের অংশ এই বই। ডিকেন্সের তুলনায় আরো সাম্প্রতিককালের দুটি উপন্যাস রবার্ট হিউজেসের *দি ফ্যাটাল শোর* এবং পল কার্টারের *দি রোড টু বোটানি বে'র জন্য* সে কাজ বাকী পড়ে ছিল। ওগুলোয় অস্ট্রেলিয়া-সম্পর্কিত বিরাট অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতবাণী আছে। অস্ট্রেলিয়া সাদাদের উপনিবেশ, আয়ারল্যান্ডের মতো। ওখানে মেগউইচ ও ডিকেন্স ঘটনাক্রমে ইতিহাসের সূত্র হয়ে ওঠা ব্যাপার মাত্র নয়, বরং এ দুজন নিজেরাই ইতিহাসে অংশগ্রহণকারী, যে-অংশগ্রহণ ঘটে উপন্যাসের মাধ্যমে এবং ইংল্যান্ড ও সমুদ্রের ওপারের উপনিবেশের মধ্যে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

আঠারো শতকের শেষদিকে দণ্ডিত অপরাধীদের পুনর্বাসনের জন্য অস্ট্রেলিয়া উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাড়তি, অবাঞ্ছিত, ফেরতঅযোগ্য দণ্ডিত অপরাধীদেরকে ওখানে চালান করে দেয়া। আদতে ক্যাপটেন কুক দেশটি আবিষ্কার করেন। পরে তা আমেরিকার নিকট হারানো উপনিবেশের বদলে কাজে লাগে। মুনাফার ধান্ধা, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, এবং হিউজেসের ভাষায় জাতিবিদ্বেষ—এইগুলো মিলিয়ে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার জন্ম। ১৮৪০-এর দশকে ডিকেন্স যখন দেশটির ব্যাপারে আগ্রহী হন (*ডেভিড কপারফিল্ড*-এ উইলকিন্স মিকাওভার ওখানে পাড়ি জমায়) তখন অস্ট্রেলিয়া মুনাফাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। ওখানে তখন এমন উন্মুক্ত প্রক্রিয়া চলতে শুরু করেছে যেখানে কাজ করার অনুমতি পেলে কঠোর পরিশ্রমী মানুষ নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারত। তবে মেগউইচে :

> ডিকেন্স (মেগউইচের) দেশান্তর প্রক্রিয়ার শেষদিকে অস্ট্রেলিয়ায় সাজাপ্রাপ্তি সম্পর্কিত ইংলিশ ধারণায় অনেকগুলো গেরো পাকিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ওরা সফল হতে পারত, কিন্তু ফিরতে পারত কদাচিৎ। কৌশলগতভাবে, আইনের দিক থেকে ওদের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেত বটে, কিন্তু ওখানে ওরা যে দুর্ভোগ পোহাত তা ওদেরকে প্যাঁচ দিয়ে নিয়ে ফেলত স্থায়ী বহিরাগতের দলে। এ সত্ত্বেও ওরা দায়মুক্ত হতে সক্ষম ছিল—যতদিন অস্ট্রেলিয়ায় থাকত ততদিন পর্যন্ত ।

কার্টার যে দিকটা উন্মোচন করেছেন তা তার ভাষায় অস্ট্রেলিয়ার পরিসরগত ইতিহাস।

তা আবার ঐ একই অভিজ্ঞতার আরেকরকম বিবরণ। ওতে আবিষ্কারক, দণ্ডিত মানুষ, জাতিবিৎ, মুনাফাখোর, সৈনিক সবাই প্রায়-জনহীন, বিশাল অঞ্চল চষে বেড়ায়। এদের প্রত্যেকেই কাজটা এমনভাবে করে যে এতে অন্যরা হয় গুঁতা খেয়ে সরে যায় বা স্থানচ্যুত হয়, কিংবা অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কাজেই *বোটানি বে* প্রথমত ভ্রমণ ও আবিষ্কারের সম্পর্কে আলোকায়ন ডিসকোর্স, দ্বিতীয়ত ভ্রমণরত কথকদের একটা গুচ্ছ বা দল (এর মধ্যে কুকও আছেন)। এই কথকদের বিভিন্ন চার্ট, কথা ও উদ্দেশ্য মিলে অচেনা দেশটিকে তিল তিল করে একসাথে জমিয়ে এনে শেষে 'নিজ বাড়ি' বানিয়ে ফেলে। পরিসর বিষয়ে বেহ্যামীয়দের সংগঠন (যা মেলবোর্ন শহর সৃষ্টি করে) এবং অস্ট্রেলীয় বুশের মধ্যে একরকম সংলগ্নতা ছিল। কার্টার দেখিয়েছেন এই লগ্নতাই হয়ে ওঠে সামাজিক পরিসরের ইতিবাচক রূপান্তর, এবং এর ফলেই সৃষ্টি হয় ভদ্রলোকদের জন্য একটা ইলিজিঅ্যাম কিংবা ১৮৪০-এর দশকে শ্রমজীবীদের জন্য একটা এডেনের। পিপের জন্য ডিকেন্স যা কল্পনা করেছেন—মেগউইচের ভাষায় 'ইংলিশ ভদ্রলোক' হয়ে ওঠা, অস্ট্রেলিয়ার প্রতি ইংলিশদের দয়া বা বদান্যতার কল্পনা অনেকটা সে রকমই, এক সামাজিক পরিসর কর্তৃক আরেকটা সামাজিক পরিসরকে অনুমোদন করা।

কিন্তু স্থানীয় অস্ট্রেলীয়দের কথা মাথায় রেখে *গ্রেট এক্সপেক্টেশন* লেখা হয়নি, যদিও কার্টার ও হিউজেস এ দিকটা মনে রেখেছিলেন। তেমনি এ বই অনুমানে অস্ট্রেলীয় সাহিত্যের কোনো রীতি বা ঐতিহ্য ধরে নেয়নি বা এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণীও করেনি। অথচ পরে এ ধারাই টেনে নেয় ম্যালোফ, পিটার কেরি ও প্যাট্রিক হোয়াইটের মতো লেখকদেরকে। মেগউইচের ফিরে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা কেবল আইনী ব্যাপার নয়, সাম্রাজ্যিক বিষয়ও। প্রজাদেরকে অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তাদেরকে মেট্রোপলিটান এলাকায় ফেরত আসতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারটা ডিকেন্সের প্রায় প্রতিটি রচনাতেই আছে। এইটি মেট্রোপলিটান ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতি সতর্কভাবে পরিকল্পিত, সমর্থিত ও চর্চিত। কাজেই একদিকে হিউজেস ও কার্টারের মতো লেখকরা উনিশ শতকের বৃটিশ বইপত্রে উপস্থিত শান্ত-সুবোধ অস্ট্রেলিয়ার চিত্র আরো বিস্তৃত করে। বিশ শতকে বৃটেন থেকে স্বাধীন হওয়া অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের পূর্ণতা ও অর্জিত সততা তাতে ফুটে উঠে।

অন্যদিকে, সঠিকভাবে *গ্রেট এক্সপেক্টেশন* পড়লে একটা ব্যাপার লক্ষ্য না-করে পারা যায় না। তা হল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী মেগউইচের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে পিপ তার কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করে। কিন্তু তখন পিপ নিজে ভেঙ্গে পড়ে। আবার তার পুনর্জন্ম ঘটে দুটো ইতিবাচক উপায়ে। এক : আমরা দেখি শিশুরূপে এক নতুন পিপ তাকিয়ে আছে, অতীতের ইতিহাস তাকে অতটা ভারাক্রান্ত করে না। দুই : পুরনো পিপ তার বাল্যবন্ধু হার্বার্ট পকেটের সাথে মিলে নতুন পেশা আরম্ভ করে। কিন্তু সে এবার আর অলস ভদ্রলোক নয়। পুর্বাঞ্চলে পরিশ্রমী এক ব্যবসায়ী। ওখানে বৃটেনের অন্যান্য উপনিবেশে যতটা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করত অস্ট্রেলিয়ায় কোনোদিনও তা ছিল না।

এইভাবে ডিকেন্স অস্ট্রেলিয়া-বিষয়ক জটিলতা মিটিয়ে ফেললেও মনোভাব ও জানাশোনার আরেকটা ধরন সৃষ্টি হতে থাকে, যার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল প্রাচ্যের সাথে

ব্যবসা ও ভ্রমণের মাধ্যমে বৃটেনের সাম্রাজ্যিক লেনাদেনা শুরু হয়ে গেছে। উপনিবেশি ব্যবসায়ীর নয়া পেশায় পিপ ব্যতিক্রমধর্মী কোনো চরিত্র নয়। কারণ ডিকেন্সের সকল ব্যবসায়ী, পাজী আত্মীয়-স্বজন, ভয়ংকর বহিরাগত চরিত্রগুলো সাম্রাজ্যের সাথে কদাচ স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল সম্পর্ক রাখে। তবে কেবল এই কিছু কাল থেকে এ জাতীয় সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হওয়ার মতো গুরুত্ব লাভ করেছে। নতুন প্রজন্মের একদল পণ্ডিত এইসব মহত পশ্চিমা সাহিত্যে চিরায়ত আকর্ষণ খুঁজে পায়। আকর্ষণের উৎস তুচ্ছ আরেক পৃথিবী, কালো রঙের তুচ্ছ মানুষদের আবাস স্থল। তারা এমনভাবে চিত্রিত যে বহু রবিনসন ক্রুশো চাইলেই তাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইসব পণ্ডিতদের কেউ কেউ বি-উপনিবেশায়নের সন্তান, অথবা স্বদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উন্নয়ন ঘটার ফলে (যৌন, বর্ণ ও ধর্মীয় ব্যাপারে) সুবিধা পাওয়া সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। উনিশ শতকের শেষে সাম্রাজ্য আর আলাজালা কোনো ব্যাপার নয়, কিংবা পলাতক আসামীর অবাঞ্ছিত উপস্থিতির মধ্যেই তার প্রতিফলন সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং কনরাড, জিদ, লটি, কিপলিঙ প্রমুখের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয় সাম্রাজ্য। আমার দ্বিতীয় উদাহরণ কনরাডের *নস্ট্রামো* (১৯০৪) মধ্য আমেরিকার একটি প্রজাতন্ত্রের কাহিনী নিয়ে লেখা। স্বাধীন হওয়ার পরও রুপোর খনির জন্য দেশটির ওপর বাইরের স্বার্থান্বেষী আধিপত্য চলছে (কিন্তু কনরাডের প্রথমদিকের উপন্যাসে আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলো পরাধীন)। সমকালীন আমেরিকানদের জন্য এ রচনাটির বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কনরাডের নির্ভুল আগামচিন্তা। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় অপ্রতিরোধ্য দুঃশাসন ও ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতে থাকবে (বলিভার প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, ওদের শাসন করার অর্থ সমুদ্রে লাঙল চালানো)। সেইসঙ্গে এককভাবে উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়-নাদেখা প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটাও খুব পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন। সানটম খনির মালিক চার্লস গোল্ডকে খনির মূলধন সরবরাহ করেছিলেন সানফ্রানসিসকোর মহাজন হলরয়েড। এই হলরয়েডই সতর্ক করে দেন যে, বিনিয়োগকারী হিসেবে তারা বড় কোনো গোলযোগে জড়াবেন না। এ সত্ত্বেও,

> আমরা বসে বসে দেখব। একদিন অবশ্য আমরা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হব। কিন্তু এ জন্য কোনো তাড়া নেই। ঈশ্বরের জগতে সবচেয়ে বড় দেশটিতে সময় নিজেই অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। আমরা সবকিছুর কথা দেব; শিল্পকারখানা, বাণিজ্য, আইন, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, রাজনীতি, ধর্ম; কেপ হর্ন থেকে সুরিথের আওয়াজ পর্যন্ত; এ ছাড়া, এমনকি, যদি উত্তর মেরুর পাগলা রদবদল জাপটে ধরার মতো ব্যাপার হয় তবে তা-ও। তখন আমরা বিস্তৃত দ্বীপপুঞ্জ আর মহাদেশগুলো নিজেদের হাতে নিয়ে আসার মতো বিলাসী-অলস সময় পাব। পৃথিবী চায় বা না চায় কিচ্ছু যায় আসে না, তখন আমরাই গোটা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাব। আমার আন্দাজ, এ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো উপায় থাকবে না, এবং আমাদেরও না।

স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক প্রচারমুখি আত্ম-অভিনন্দন, প্রকাশ্য বিজয়মুখিনতা এবং ভয়ংকর দায়িত্ববোধ নিয়ে যে 'নয়া বিশ্বনীতি' (নিউ ওয়ার্ল্ড

অর্ডার) রচনা করেছে তার পাণ্ডুলিপিটি হয়তো লিখে গেছেন কনরাডের হলরয়েড। যেমন: আমরা এক নম্বর, আমরা নেতৃত্ব দিতে বাধ্য, আমরা স্বাধীনতা ও আইনের পক্ষে আছি, ইত্যাদি। এই চিন্তাকাঠামো থেকে কোনো আমেরিকানই রেহাই পায়নি। তবে হলরয়েড ও গোল্ডকে নির্মাণ করতে গিয়ে পরিষ্কার সতর্কবাণী জুড়ে দিয়েছিলেন কনরাড। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিন্যাসে কাজে লাগার পর ক্ষমতা সহজেই সৃষ্টি করে নেয় কল্যাণের বিভ্রম। এ সত্ত্বেও এগুলো বাগাড়ম্বর, যার সবচেয়ে ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য হলো তা আগেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাও কেবল (পর্তুগাল ও স্পেন কর্তৃক) একবার নয়, বৃটিশ, ফরাসি, বেলজিয়ান, জাপানী, রুশ এবং সাম্প্রতিককালের আমেরিকানরা আধুনিককালে বারবার ব্যবহার করছে এই একই বাগাড়ম্বর।

তবু যৌথ ফল ব্যবসায়ী কোম্পানী, কর্নেলবৃন্দ, মুক্তিফৌজ আর মার্কিন টাকায় ভাড়া-করা যোদ্ধাদের নিয়ে কুড়ি শতকের লাতিন আমেরিকায় যা ঘটছে কনরাডের মহত্ত রচনাগুলো তার পূর্বাভাস হিসেবে পাঠ করলে তা হবে একপার্শ্বিক পাঠ। তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে পশ্চিমা মনোভাবের আদিসূত্র কনরাড। আমরা তারই প্রকাশ দেখি গ্রাহাম গ্রীন, ভি এস নাইপল বা রবার্ট স্টোনের মতো নানামুখি উপন্যাসিকের কাজে; কিংবা সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক হানাহ আরেন্দতের লেখায়, ভ্রমণকাহিনীকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সৃষ্টিতে। অজানার প্রতি ইউরোপ-আমেরিকার ভোক্তাদের কৌতূহল মিটাতে কিংবা বিচার বিশ্লেষণের জন্য অ-ইয়োরোপীয় দুনিয়াটাকে ওদের কাছে সরবরাহ করার কাজেই এরা দক্ষ। এই কথা ঠিক যে, সানটম রুপোর খনির বৃটিশ ও আমেরিকান মালিকদের সাম্রাজ্যবাদী বাসনা যে শেষ পর্যন্ত তাদের অসম্ভব আর ভাব-ধরা উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে চুপসে যাবে তা দেখতে পেয়েছিলেন কনরাড, কিছুটা দ্ব্যর্থকভাবে। আর এও সত্য যে, অ-পশ্চিমা জগৎ সম্পর্কে তার লেখকসত্তার দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই রঙ-লাগানো যে তা অন্য ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে তাকে কানা করে দেয়। কনরাড কেবল এমন একটা জগত দেখেছিলেন যা আটলান্টিক পশ্চিমের হাতের মুঠায়। সেখানে পশ্চিমের বিরুদ্ধে যে-কোনো তৎপরতা পশ্চিমের শয়তানী ক্ষমতাকেই জাহির করে কেবল। কিন্তু এই নিরর্থক পুনরাবৃত্তির বিকল্পটা তার চোখে ধরা পড়ে নি। তিনি বুঝতে পারেন নি ইন্ডিয়া, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকারও জীবন ও সংস্কৃতি আছে; সেই জীবন আর সংস্কৃতির এমন সততা আছে যা গ্রিঙো সাম্রাজ্যবাদী আর পৃথিবীর সংস্কারকারীদের হাতের মুঠোর জিনিষ না। তিনি বিশ্বাস করতে চান নাই সম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল লড়াই নষ্ট না, তেমনি লন্ডন আর ওয়াশিংটনের পতুল নাচানিয়া হুজুরদের কেনা ব্যাপারও না।

দৃষ্টির এই মারাত্মক সঙ্কীর্ণতা আছে *নস্ট্রামো*-তে, তেমনি এর কাহিনী আর চরিত্রগুলোর মধ্যেও। গোল্ড আর হলরয়েডের মতো চরিত্রগুলোয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যক্তিক বেডাগিরিকে ব্যঙ্গ করেছেন কনরাড। কিন্তু বিভিন্ন উপন্যাসে আবার এই বৈশিষ্ট্যটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। কনরাড যেন বলতে চান, "স্থানীয় মানুষদের মধ্যে কে ভালো কে খারাপ সেটা ঠিক করব আমরা পশ্চিমারা। কারণ আমরা ওদের অস্তিত্ব স্বীকার করি বলেই ওরা আছে। আমরা ওদের বানিয়েছি, চিন্তা করতে ও কথা বলতে শিখিয়েছি। ওরা যখন বিদ্রোহ করে তখন বোঝা যায় ওদের সম্পর্কে আমাদের চিন্ত

াই ঠিক: অর্থাৎ ওরা বেবুঝ ছোটো মানুষ, কোনো কোনো পশ্চিমা প্রভুর প্রতারণার শিকার মাত্র।" দক্ষিণের প্রতিবেশীদের ব্যাপারে আমেরিকানদের মনের ভাব এমনই ছিল : ওরা সেই ধরনের স্বাধীনতা চাইবে যা আমরা ওদের জন্য ঠিক মনে করি। যতক্ষণ ওরা সেইরকম স্বাধীনতা চায় ততক্ষণ ঠিক আছে। এ ছাড়া আর যে-কোনো কিছুই গ্রহণ-অযোগ্য, জঘন্য, চিন্তাও করা যায় না।

কাজেই কনরাড ছিলেন একইসাথে সাম্রাজ্যবাদী আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীও; এটা কোনো ধন্ধের কথা না। বিদেশে আধিপত্যের আত্ম-প্রতারক দুর্নীতির দিকটা সাহস ও হতাশার সাথে ফুটিয়ে তোলার বেলায় তিনি প্রগতিশীল। কিন্তু আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকারও তো নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি থাকতে পারে; সাম্রাজ্যবাদীরা সেই ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে গায়ের জোরে তছনছ করেছে আবার তার হাতে মারও খেয়েছে।—এই সব কথা মেনে নেয়ার ব্যাপারে তিনি চরম প্রতিক্রিয়াশীল। আমরা যদি কনরাডকে তার সময়ের সৃষ্টি হিসাবে দেখি তাহলে বুঝতে পারব এখনকার ওয়াশিংটনের লোকদের এবং পশ্চিমের বেশিরভাগ নীতি-নির্ধারক ও বুদ্ধিজীবীর মনোভাব কনরাড থেকে খুব একটা আগায় নাই। "পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা" জাতীয় শ্লোগানধর্মী ধারণা সাম্রাজ্যবাদী কল্যাণচিন্তারই অংশ। কনরাড এই সাম্রাজ্যবাদী কল্যাণে লুকিয়ে থাকা যে-ব্যাপারটাকে ব্যর্থতা হিসাবে দেখতে পেয়েছিলেন মার্কিন সরকার এখনো তা বুঝতে অক্ষম। অথচ এই সরকার সারা দুনিয়ায় তার ইচ্ছা ফলিয়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। কনরাডের অন্তত এইটুকু সৎসাহস ছিল যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই ধরনের পরিকল্পনা কখনো সফল হয়না। কারণ তা পরিকল্পনাকারীদেরকে অসীম শক্তিমত্তার বিভ্রম ও প্রতারক আত্মতৃপ্তির ফাঁদে ফেলে (যেমন ভিয়েতনামে); তেমনি এই সব পরিকল্পনার ধরনটাই এমন যে সেগুলো মিথ্যা প্রমাণ খাড়া করে।

নস্ট্রামো পড়ার সময় এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে, যদি বইটার বিশাল সামর্থ্য আর ভেতরের সীমাবদ্ধতার দিকে নজর রেখে পড়তে চাই। উপন্যাসের শেষে বড় একটি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হওয়া ছোট্ট রাষ্ট্র সুলাকোও মূল বড় রাষ্ট্রটার মতোই কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রিত, সহনশক্তিহীন। এখন তা গুরুত্ব ও ধন-সম্পদ থেকেও বিচ্ছিন্ন। কনরাড এখানে পাঠকদের দেখাতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ হল একটা পদ্ধতি। অভিজ্ঞতার বড় এক জগতের আধিপত্যের ভেতরে যদি ছোটো আরেকটা জগতে তৈরি হয় তাহলে সেখানে বহমান জীবনে বড় জগতটার কল্পনা ও নির্বুদ্ধিতার ছাপই পড়বে। কিন্তু এর উল্টোটাও সত্য। যদিও ধরে নেয়া হয় স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতা ও ভূমির দরকার *লা মিশন সিভিলাজেত্রিস* (সভ্যকরণ মিশন), কিন্তু তার ওপরই প্রশ্নহীন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে আধিপত্যশীল সমাজের অভিজ্ঞতা।

যাইহোক, *নস্ট্রামো* পাঠে মনে করা হয় বইটি কঠোর ক্ষমাহীন মতামত তুলে ধরেছে এবং এর অনুপ্রেরণাতেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী বিভ্রান্তি সম্পর্কে সমান তীব্র মতো অভিব্যক্ত হয়েছে গ্রাহাম গ্রীনের *ক্যোয়ায়েট আমেরিকান* বা ভি. এস. নাইপলের *এ বেন্ড ইন দি রিভার*-এ। এই দুই বইয়ের আলোচ্য বিষয় অবশ্য দুই রকম। ভিয়েতনাম, ইরান, ফিলিপাইন, আলজেরিয়া, কিউবা, নিকারাগুয়া, ইরাকের পর এখন

কোনো পাঠকই অস্বীকার করবেন না যে গ্রীনের পাইল বা নাইপলের হুইজমান নামের যে লোকগুলোর জন্য স্থানীয়রা 'আমাদের' সভ্যতায় শিক্ষিত হতে পেরেছিল তাদের তীব্র আবেগঘণ সারল্যই 'আদিবাসী' সমাজে খুন, অন্তর্ঘাত, প্রচণ্ড অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কাজে লেগে যায়। এই রকম রাগই ছড়িয়ে আছে অলিভার স্টোনের *সালভাদর*, ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলা'র *এপোক্যালিপস* বা কনস্টানটিন কোস্তাগ্রাভরাজের *মিসিং*-এর মতো চলচ্চিত্রে। ছবিগুলোতে দেখা যায় নীতিধর্মহীন সিআইএ গোয়েন্দাদল আর ক্ষমতাপাগল কর্মকর্তারা স্থানীয় লোকজনদের সাথে সাথে ভালো মনের আমেরিকানদেরকেও সমানে বিভ্রান্ত করে।

এ সত্ত্বেও কনরাডের *নস্ট্রামো*'র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লেষের কাছে ঋণী ঐসব বই এই বক্তব্যই তুলে ধরে যে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব তৎপরতা ও জীবনের উৎস হল পশ্চিম। সেই পশ্চিমের প্রতিনিধিরা যখন খুশি তখন মন-ভাঙানিয়া তৃতীয় বিশ্বে তাদের উদ্ভট কল্পনা আর কল্যাণকর্মের জগৎ পরিদর্শন করতে পারে। এই মত অনুসারে পৃথিবীতে (পশ্চিমের) বাইরে বিস্তৃত অঞ্চলগুলোয় বলার মতো কোনো জীবন, ইতিহাস বা সংস্কৃতি নেই; তেমনি পশ্চিমকে বাদ দিয়ে তুলে ধরার মতো স্বাধীনতা বা সততাও নাই। সেখানে কখনো যদি বলার মতো কিছু থাকেও তবে তা, কনরাডের মতানুযায়ী, অকথ্য দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষয়ধরা, পুনর্গঠনের অযোগ্য। কনরাড *নস্ট্রামো* লিখেন ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী জোশের সময়। কিন্তু কনরাডের দ্ব্যর্থতা চমৎকার রপ্ত করে নিয়ে একালের ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার কাজ করছেন বি-উপনিবেশায়নের পরে। তার আগেই পশ্চিম কর্তৃক অ-পশ্চিমা জগতের প্রতিনিধিত্বের কাজটায় ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও কাল্পনিক মেরামত ও পুনর্গঠন হয়ে গেছে; ফ্রাঞ্জ ফানো, এমিলকার কাবরেল, সিএলআর জেমস্, ওয়াল্টার রোডনির লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে; বেরিয়েছে চিনুয়া আচেবি, নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গা, ওলে সেয়েঙ্কা, সালমান রুশদি, গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজসহ বহু লেখকের নাটক-উপন্যাস।

এভাবেই কনরাড তার সাম্রাজ্যবাদী পক্ষপাতিত্বের শেষটুকু হস্তান্তর করে যান। কিন্তু তার উত্তরাধিকারীদের হাতে এমন কোনো অজুহাত নেই যে তারা তাদের রচনার সূক্ষ্ম পক্ষপাতিত্বকে সঠিক বলে দাবী করবেন। ব্যাপারটা কিন্তু এইরকম না যে, বিদেশী সংস্কৃতির ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান ও সহানুভূতির অভাবে কিছু পশ্চিমা মানুষের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। কারণ জাঁ জেনে, বাসিল ডেভিডসন, আলবার্ট মেমি, জোয়ান গোয়েতিসোলোর মতো অনেকে তো ওদিকেই পাড়ি জমিয়েছিলেন। বরং এখানে সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প—যেমন অন্য সমাজ ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব —মেনে নেয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছার ব্যাপারটাই আসল কথা। কোনো পাঠক ধরে নিতে পারেন কনরাডের অসাধারণ উপন্যাস লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতি পশ্চিমের স্বভাবগত সন্দেহই নিশ্চিত করে। আবার তার এমনও মনে হতে পারে যে, *নস্ট্রামো ও গ্রেট এক্সপেক্টেশনস*-এর মতো উপন্যাসে খুবই টেকসই এমন এক সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকাশ রয়েছে যা পাঠক-লেখক উভয়ের পরিপ্রেক্ষিত সমানভাবে নষ্ট করে ফেলতে পারে। প্রকৃত বিকল্প সন্ধানের ক্ষেত্রে পাঠের এই দুই রকম পদ্ধতির দুইটাই আকামা। এই সময়ের পৃথিবী এমন কোনো দৃশ্য হয়ে সামনে

দাঁড়িয়ে নেই যে আমরা তার সম্পর্কে হয় হতাশ না হয় আশাবাদী হয়ে উঠব, অথবা এ নিয়ে লেখা বইপত্রগুলোকে এককথায় হয় বুদ্ধিদীপ্ত না হয় একঘেঁয়ে বলে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেব। এ ধরনের যেকোনো মনোভাবে ক্ষমতা ও স্বার্থের যোগ থাকে। কনরাড যতখানি তার কালের সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের সমালোচনা করছেন আবার এর পুনঃসৃজন করছেন, আমরা ঠিক ততদূর নিজেদের বর্তমান মনোভাবের এরকম গড়ন দিতে পারি: আধিপত্যের বাসনা সাজানো অথবা প্রত্যাখ্যান; আর সব সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করে ওসবের সাথে সুষম মিলমিশের শক্তি কিংবা ওগুলো নষ্ট করার ক্ষমতা অর্জন।

কনরাড ও ডিকেন্সের পর দুনিয়া অনেক বদলে গেছে। সেই বদলে মহানাগরিক ইউরোপীয় আর আমেরিকানরা অবাক, এমনকি উদ্বিগ্ন। এখন ওদের মাঝখানে অ-শ্বেতাঙ্গ পরবাসীর বিরাট এক জনগোষ্ঠী। আর নয়া অধিকার-পাওয়া কণ্ঠ তাদের নিজেদের বয়ান শোনার দাবী তুলছে পালাক্রমে। আমার এই বইয়ের কথা হল এই সব অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষ আর কণ্ঠস্বর বেশ আগে থেকেই ওখানে আছে। তা সম্ভব হয়েছে বিশ্বায়নের ফলে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে ধন্যবাদ, বিশ্বায়ন শুরুর জন্য!

পশ্চিম ও প্রাচ্যের মানুষদের অভিজ্ঞতার অদল-বদল হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থান করেছে উপনিবেশক ও উপনিবেশিত। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূগোল, বয়ান ও ইতিহাস নিয়ে একে অপরের সাথে যে লড়াই হয়েছে সেই লড়াইয়ে দাড়ানোর সাংস্কৃতিক জমিটাও ছিল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।—এই ব্যাপারগুলো আমলে না নেয়া বা ইচ্ছা করে না-দেখে চলার অর্থ হল গত শতকের পৃথিবীর অতি জরুরী দিকটা বাদ পড়ে যাওয়া।

এই প্রথম আমরা সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে এমনভাবে বিচার করতে পারছি যে, এইগুলো আদিম কোনো ব্যাপার না, তেমনি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন বাক্সবন্দী, একেবারের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ও নয়। স্বীকার করি ইন্ডিয়া, লেবানন কি যুগোশ্লাভিয়া সবখানে যেমন, তেমনি আফ্রোকেন্দ্রিক, ইউরোকেন্দ্রিক বা ইসলামকেন্দ্রিক ঘোষণার মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরম-স্বদেশী ডিসকোর্সের উদ্বেগজনক বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু এইগুলো সাম্রাজ্য থেকে মুক্তির লড়াইকে অবৈধ প্রমাণ করে না। বরং সাংস্কৃতিক ডিসকোর্সগুলোর এইরকম ছোট হয়ে আসার ব্যাপারটি এই কথাই প্রমাণ করে যে, ঐ মূল মুক্তিকামী শক্তি প্রকৃতই বৈধ যা উস্কে দেয় স্বাধীনতার বাসনা, অবৈধ আধিপত্যের ভার থেকে মুক্ত হয়ে বিনা বাধায় কথা বলার ইচ্ছা। এই শক্তিকে কেবল ঐতিহাসিকভাবেই বোঝা সম্ভব। সে জন্যই এই বইয়ে টেনে আনা হয়েছে ভূগোল আর ইতিহাসের বিরাট বিস্তার।

নিজেদের কথা শোনাতে গিয়ে আমরা ভুলে যাই যে দুনিয়াটা একটা পাড়াপাড়ি করা ভিড়ের জায়গা। সবাই যদি তার কথাটাকেই ঠিক আর পয়লা বলার মতো কথা বলে দাবী করত তা হলে কী ঘটতো?—আমরা জঘণ্য গোলমালের এক অনিঃশেষ হাউকাউয়ের মধ্যে পড়তাম, কেবল পেতাম রক্ত ঝরানিয়া রাজনৈতিক গোলযোগ। ঐ ভয়ংকর ব্যাপারের শুরুটা কিন্তু কোথাও কোথাও আঁচ করা যাচ্ছে। যেমন ইউরোপের এইখানে-সেইখানে বর্ণবাদী রাজনীতির উত্থানে, যুক্তরাষ্ট্রে শুদ্ধ/অশুদ্ধ

রাজনীতি ও আত্ম-পরিচয়ের রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে চলমান বেসুরো বিতর্কে। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের অঞ্চলের কথাও বলি; ওখানে এখন চরম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং বিসমার্কীয় স্বৈরতন্ত্রের অলীক সব প্রতিশ্রুতি, সাদ্দাম হোসেন আর তার অসংখ্য অনুসারী এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর দল।

অতএব, কী চমৎকার সংযমী এবং উৎসাহদায়ক ব্যাপারই-না হয় যদি আমরা কেবল নিজের দিকটা পাঠ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকি, বরং বোঝার চেষ্টা করি যে কিপলিঙের মতো (তারচে' আরো সাম্রাজ্যবাদী, আরো প্রতিক্রিয়াশীল) শিল্পীরা কী করে এমন দক্ষতার সাথে ইন্ডিয়াকে ফুটিয়ে তুলেছেন! আর তা করতে গিয়ে তার উপন্যাস *কিম* কী করে ইঙ্গ-ইন্ডিয়ান পরিপ্রেক্ষিতের দীর্ঘ ইতিহাসের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আবার উপন্যাসটিতে এই বিশ্বাসের ওপর জোর দেয়া হয়েছে যে, ইন্ডিয়ান বাস্তবতার দরকার বৃটিশের শিক্ষা—চিরকাল ধরে, এমনকি তা বৃটিশ শিক্ষা দাবীই করে। এমত বিশ্বাসে জোর দেয়ার মধ্যেই ভবিষ্যতবাণী রয়ে গেছে যে, *কিম*-এর ইঙ্গ-ইন্ডিয়ান পরিপ্রেক্ষিত বেশিদিন টিকবে না। আমি বলি মহৎ সাংস্কৃতিক সঞ্চয় হল সেই জায়গাটা, যেখানে বিদেশে আধিপত্যের কাজে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পতাত্ত্বিক বিনিয়োগটা করা হয়।

১৮৬০-এর দশকে আপনি যদি একজন বৃটিশ বা ফরাসি হতেন তাহলে আপনি উত্তর আফ্রিকা ও ইন্ডিয়াকে দেখতেন, বুঝতেন এক রকম ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব-মেশানো বোধ থেকে। কিন্তু এই দুই অঞ্চলের আলাদা আলাদা সার্বভৌমত্বের বোধ থেকে বোঝার চেষ্টা করতেন না। আপনার বয়ানে, ইতিহাসে, ভ্রমণকাহিনীতে, অভিযানে সবখানে আপনার চৈতন্য মূল কর্তৃপক্ষরূপে উপস্থিত; এইটাই সেই শক্তির সক্রিয় কেন্দ্র যা উপনিবেশক তৎপরতারও একটা অর্থ দেয়, তেমনি অজানা ভূগোল ও জনগোষ্ঠীকেও বৌদ্ধিক বাখানে বাঁধে। সবচেয়ে বড় কথা আপনার ক্ষমতাবোধ ভুলেও এই কথা ভাবে নি যে, আপনার চোখে যে সব স্থানীয় মানুষ হয় দাস্যভাবাপন্ন না হয় ক্রুদ্ধ অসহযোগী শেষে এরাই একদিন আপনাকে ইন্ডিয়া বা আলজেরিয়া ছাড়তে বাধ্য করবে। কিংবা এরা এমনসব কথা বলবে যা আগের ডিসকোর্সগুলোর সাথে গলা মিলাবে না, বরং চ্যালেঞ্জ করবে, এমনকি সেইগুলোকে তছনছ করে দেবে।

সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতি গায়েবী কোনো জিনিষ ছিল না, সে তার দুনিয়াদারী সম্পর্ক ও স্বার্থ লুকিয়েও রাখে নি। সংস্কৃতির প্রধান প্রধান স্রোতগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা সহজেই বলতে পারব ওগুলোয় কি সাবধানী বক্তব্য লেখা হয়ে আছে এবং কেনই-বা অতদিন তাতে সঠিক মনোযোগ দেয়া হয় নাই। আর এখন কেনই-বা তা আমার এ বইটির ন্যায় আরো সব বই লেখার মতো মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

এইসব বই কিন্তু প্রতিহিংসা থেকে রচিত হয়নি, বরং যোগসূত্র ও সংযোগের প্রয়োজনীয়তা থেকেই লেখা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের একটা বড় কাজ হল তা গোটা দুনিয়াকে খুব কাছাকাছি করে দিয়েছে। অবশ্য সেই প্রক্রিয়ায় ইউরোপের মানুষ আর স্থানীয়দের মধ্যে যে বিরাট ফারাক করা হয়েছে তা গোপন ছোঁয়াচে অসুখের মতো, একটা মৌলিক অন্যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যে সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এখন

আমাদের অধিকাংশেরই এজমালি অভিজ্ঞতা মাত্র। তাতে আতংক, রক্তপাত ও তিক্ত প্রতিহিংসাপরায়ণতা আছে সত্যি। তবু আমাদের কাজ হল ইন্ডিয়ান ও বৃটিশ, আলজেরীয় ও ফরাসি, পশ্চিমা ও আফ্রিকান, লাতিন আমেরিকান ও অস্ট্রেলীয়—সকলের ব্যাপার হিসেবে সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা।

আমি প্রথমে যতদূর সম্ভব একেকটা বইয়ের ওপর নজর দেব, সৃজনশীল বা তাফসিরী কল্পনাশক্তির মহৎ কাজ হিসেবে সেগুলো পাঠ করব। এরপর দেখাব কিভাবে সেইগুলো সাম্রাজ্য আর সংস্কৃতির সম্পর্কেরই একেকটা অংশ হয়ে উঠেছে। ভাবাদর্শ, শ্রেণী বা অর্থনীতি কোনো একটা যান্ত্রিক কায়দায় লেখককে নির্ধারিত করে দেয় এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি মনে করি লেখক তার সমাজের ইতিহাসের মধ্যেই বাঁচে। বিভিন্ন মাত্রায় সেই ইতিহাস ও সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রভাব পড়ে তার ওপর, আবার সে নিজেও এগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। সংস্কৃতি আর তার নন্দনতাত্ত্বিক রূপের উদ্ভব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে; এটিই বর্তমান বইয়ের একটা বড় আলোচ্য বিষয়। *অরিয়েন্টালিজম* লিখতে গিয়ে একটা ব্যাপার আমি আবিষ্কার করেছি: আপনি তালিকা বা ক্যাটালগ তৈরি করে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আপনার নজর যতই বাড়ান, কিছু বই বা প্রবন্ধ, কিছু লেখক বা মতাদর্শ বাদ পড়ে যাবেই। তাই আগাম ধরে নিয়েছি যে, আমি যা করছি তাতে বাছাই ও সচেতন পছন্দের লাগাম থাকতেই হবে। এবং এটা ধরে নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক কিছু ব্যাপারে নজর দেয়ার চেষ্টা করেছি আমি। সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারে অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্কের বওনি হয়েছে এই বইয়ে। আশা করি পাঠক ও আলোচকরা তার সীমা আরো বাড়ানোর জন্য আমার কায়দাটা ব্যবহার করবেন। বইটির আলোচ্য বিষয় আসলে দুনিয়াজোড়া একটা ব্যাপার। কিন্তু তা আলোচনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে গড়পড়তা ও সারাংশের আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। এ সত্ত্বেও ধারণা করি, কেউ বলবেন না যে এই বই যতটা হয়েছে তার চেয়ে আরো বড় হওয়ার দরকার ছিল।

তাছাড়া, অনেকগুলো সাম্রাজ্য আমার আলোচনায় আসে নি। যেমন: অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়, রুশ, অটোমান, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সাম্রাজ্য। এইগুলো বাদ রাখার অর্থ এই নয় যে মধ্য এশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপে রুশ আধিপত্য, আরব বিশ্বে ইস্তাম্বুলের শাসন, আজকের এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে পর্তুগালের মাতব্বরি, প্যাসিফিক অঞ্চল ও লাতিন আমেরিকায় স্পেনের আধিপত্য সুফলদায়ক (তাই অনুমোদিত) কিংবা কম সাম্রাজ্যবাদী। আমি যা বলছি তা হচ্ছে যে মার্কিন, বৃটিশ আর ফরাসি দেশের সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতার একটা চমৎকার সংসক্তি আছে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রমুখিনতা আছে। ইংল্যান্ড তো নিজে একটা সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীরই আওতায় ছিল: বিরাট, জমকালো, অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি আধিপত্যশীল। এর সাথে ফরাসি দেশের প্রকাশ্য রেষারেষি চলেছে প্রায় দুইশ বছর ধরে। সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে বয়ান খুব জরুরি ভূমিকা পালন করে। এই কারণে ফরাসি (বিশেষ করে) ইংল্যান্ডের রয়েছে উপন্যাস রচনার এক ছেদহীন ঐতিহ্য। আর কোথাও এর তুলনা মিলবে না। আমেরিকা সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছে উনিশ শতকে। তবে সে তার দুই বিরাট পূর্বসূরীকে সরাসরি অনুসরণ করতে আরম্ভ করে কুড়ি শতকের দ্বিতীয় ভাগে, বৃটিশ ও ফরাসি রাজত্বের শেষে।

এই তিন রাজত্বের ওপর আমার নজর দেয়ার দুইটি বাড়তি কারণ আছে। একটা কারণ হচ্ছে, আশপাশের অঞ্চল ছেড়ে দূর দেশে উড়ে গিয়ে বসা অর্থাৎ সমুদ্রের অন্য পারের দেশ শাসনের চিন্তা ঐ তিন দেশের সংস্কৃতিতে বেশ সম্মানজনক ব্যাপার। এ-জাতীয় চিন্তা বা ভাববিলাসের দরকার (মানুষকে) বোঝানো ও আগাম সুফল দেখানো, উপন্যাস বা ভূগোল বা শিল্পকলা যেখানেই হোক। আবার শাসন, বিনিয়োগ, প্রতিশ্রুতি বা দেশ দখলের মধ্য দিয়েও ঐ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা সার্বক্ষণিক জীবন্ত ব্যাপার হয়ে ওঠে। কাজেই বৃটিশ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির মধ্যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিভিত্তিক একটা দিক আছে, একটু অন্যরকমভাবে আছে মার্কিন সাম্রাজ্যেও; কিন্তু আর কোথায় তা নেই। এই দিকটা মনে রেখেই আমি 'মনোভাব ও তথ্যসূত্রের একটা গড়ন' কথাটা বলে থাকি। দুই নম্বর কারণ হচ্ছে, আমার জন্ম, বেড়ে-ওঠা আর এখন বেঁচে থাকাও এই তিন রাজত্বের আওতায়। এইসব দেশে আমি অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। তবু, আরব ও মুসলিম বিশ্ব থেকে আসা স্থানীয় লোক হিসেবে আমার মনে হয় আমি এখনো ঐ দেশেরও মানুষ। এর ফলে আমার সুযোগ হয়েছে দুই দিকেই বাস করার, আর দুই দিকের মধ্যস্থতা করার।

মোট কথা এই বই অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে লেখা, 'আমাদের' ও 'ওদের' ব্যাপারে' রচিত; বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী যেভাবে এ বিষয়গুলো দেখেছে, সেইরকম ভাবে। আর এ বইয়ের দিনক্ষণ বলতে ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরের সময়টার কথা বলা যায়, যখন যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ পরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। আরব বিশ্ব থেকে যাওয়া কোনো শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীর জন্য ঐ সময়টায় আমেরিকায় বাস করা বলতে বোঝায় সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু উদ্বেগকর ব্যাপার। এর প্রত্যেকটাই বইটির ওপর প্রভাব ফেলেছে। আসলে বলতে গেলে, *অরিয়েন্টালিজম*-এর পর যা কিছু লিখেছি তাতেই এই ব্যাপারগুলোর প্রভাব আছে।

তার প্রথমটা হল আমেরিকার সমকালীন নীতিমালা রচনার ব্যাপারটা চোখে দেখা ও পাঠ করা, যা এক রকম মন-মরা মানসিক অবস্থা। যেসব মহানগর কেন্দ্র দুনিয়াজোড়া আধিপত্য বিছাতে চেয়েছে তার প্রত্যেকটিই প্রায় একই কথা বলেছে, একই কাজ করেছে ; এটা কষ্টের কথা হলেও সত্য। গুরুত্বহীন জনগোষ্ঠীর ব্যাপারগুলো পরিচালনার সময় সর্বদা ক্ষমতা ও জাতীয় স্বার্থের দোহাই দেয়া হয়ে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ক্ষমতার বৃত্তে আটকানো এবং তাদেরই সাহায্যে টিকে-থাকা কোনো জনসমর্থনহীন শাসকের বিরুদ্ধে যদি স্থানীয় জনগোষ্ঠী রুখে দাড়ায় তখনো দেখা যায় একই ধ্বংসাত্মক উন্মাদনা। আর আছে এই ভয়ঙ্কর রক্ষাকবচ-ঘোষণা যে: 'আমরা অন্যরকম, সাম্রাজ্যবাদী নই, আগের রাষ্ট্রশক্তিগুলো যে-ভুল করেছে আমরা সেই ভুল করতে যাচ্ছি না।' এই রক্ষাকবচ-ঘোষণা এমনই এক কথা যে, বার বার ভুল করা হয়, আর প্রতিবার এ কথাই আওড়ানো হয়; যেমন দেখা গেছে ভিয়েতনাম-যুদ্ধ ও উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়। এরচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল এই সব কর্মকাণ্ডে বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাংবাদিকদের সহযোগিতা; যদিও সাধারণত নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। এরা নিজদেশে খুব প্রগতিশীল, প্রশংসনীয় আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু অন্যদেশে ওদের নামে কিছু করে ফেলার পর সেই প্রশ্নে তারা ঠিক উল্টো মতের মানুষ।

আমার আশা (হয়তো বিভ্রম মাত্র) যে, সাংস্কৃতিক উপায়ে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ইতিহাস রচিত হলে তা হয়তো বিস্তারিত বিবরণ হাজির করতে পারে, এমনকি তা প্রতিরোধাত্মক ভূমিকাও রাখতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও কুড়ি শতকে সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছে, একই সাথে শক্ত ও বিস্তৃত হয়েছে প্রতিরোধও। পদ্ধতিগতভাবে আমি এই দুই শক্তিকে এক সাথে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাই বলে উপনিবেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে সমালোচনার বাইরে রাখার কথা উঠছে না। উপনিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া দেশগুলোর ওপর জরিপ করলে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদের ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, যাকে বলা যায় বিচ্ছিন্নতাবাদ ও স্বাদেশিকতা, সবসময় সুখকর কাহিনীর জন্ম দিতে পারে নি। সে দিকটাও বলতে হবে; আর কিছু না হোক, ইদি আমিন ও সাদ্দাম হোসেনের বিকল্প যে সবসময় মজুদ থাকে অন্তত এইটুকু দেখানোর জন্য হলেও। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদ একটা আরেকটা থেকে পুষ্টি পেয়েছে। কিন্তু এগুলোর সবচেয়ে খারাপ চোহারাটাও আদিম নয়, নয় নিমিত্তবাদী। অন্যদিকে সংস্কৃতিও আদিম কিছু নয়, তা পূর্ব বা পশ্চিম, কিংবা একদল মানুষের নিজস্ব সম্পত্তি মাত্র নয়।

তবু সার্বিক পরিস্থিতি দুঃখজনক, মন-ভাঙানিয়া। আজকাল আবার পরিস্থিতিটাকে সহনীয় করে রাখতে চাইছে এখানে সেখানে গজিয়ে-ওঠা নয়া রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা। এইটা হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাপার যা এই বই রচনায় সক্রিয় ছিল। যাইহোক, এখন কত না হায়হুতাশ যে, আগের মানবতাবাদী অধ্যয়ন রাজনীতি-ঘেঁষা চাপের মুখে পড়েছে। একেই বলা হচ্ছে অভিযোগের সংস্কৃতি, অর্থাৎ 'পশ্চিমা', 'নারীবাদী', 'আফ্রোকেন্দ্রিক', 'ইসলামকেন্দ্রিক' মূল্যবোধের পক্ষে যে-সব ব্যতিক্রমধর্মী বাড়াবাড়ি দাবী তোলা হচ্ছে। কিন্তু এগুলোই শেষ কথা নয়। মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক অধ্যয়নে যে অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে তার কথা তোলা যায় উদাহরণ হিসেবে। যে সময় আমি *অরিয়েন্টালিজম* লিখছি, তখনো এই বিষয়টিতে আগ্রাসী পুরুষতান্ত্রিক ও মানহানিকর মূল্যবোধের মাতব্বরি। গত তিন-চার বছরে লেখা বইগুলোর কথাই উল্লেখ করি, যেমন- লিলা আবু লুঘদের *ভেইলড সেন্টিমেন্টস্*, লেইলা আহমেদের *উইম্যান এন্ড জেন্ডার ইন ইসলাম*, ফেদওয়া মালতি ডগলাসের *উয়োম্যান'স বডি, উয়োম্যান'স ওয়ার্ল্ড*। এইসব লেখায় ইসলাম, আরব ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে একেবারে ভিন্ন রকমের ধারণা আগের নৈরাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছে, এমনকি বেশ খানিকটা নড়িয়েও দিয়েছে। এইগুলো নারীবাদী লেখা, কিন্তু 'একেবারেই বিশেষ' হওয়ার দাবী করে না। এইসব বই দেখায় যে (পুরুষময়) মধ্যপ্রাচ্য জাতীয়তাবাদ ও অরিয়েন্টালিজমের স্বৈরাচারী ডিসকোর্সের মূলে কলকাঠি নাড়ে যে চিন্তা তা আদতে বিচিত্র ও জটিল। এই রচনাগুলি রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চৌকস, উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু জনপ্রিয় বক্তৃতাসুলভ নয়, নারীর অভিজ্ঞতার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কিন্তু বাড়াবাড়ি রকম আবেগপ্রবণ নয়। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য ও শিক্ষাগত পটভূমি থেকে আসা পণ্ডিতদের হাতে লিখিত এই রচনাগুলো মধ্যপ্রাচ্যে নারীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে ভাববিনিময় চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি ওতে সক্রিয় ভূমিকাও রাখছে।

আগে ইন্ডিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যকে দেখা হতো সাদৃশ্যময় জগত হিসেবে; দুই অঞ্চলকে এক

মনে করে চিনে নেয়ার কাজে আসলে দুই অঞ্চলের অনেক দিকই বাদ পড়ে যায়। সারা সুলেরির *দি রেটরিক অব ইংলিশ ইন্ডিয়া* আর লিজা লাওয়ের *ক্রিটিক্যাল টেরেইনস*-এর মতো পুনর্মূল্যায়নধর্মী পণ্ডিতি কাজ সাদৃশ্যময়তার এই ভূগোল একেবারে ভেঙে দিতে না পারলেও, তাতে অন্তত রদবদল এনেছে। জাতীয়তাবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতায় অতি প্রিয় যুগ্ম-বৈপরীত্যের দিন শেষ। তার বদলে আমরা বুঝতে শুরু করেছি নয়া কর্তৃত্ব দিয়ে পুরনো কর্তৃত্ব বদল করা অসম্ভব। বুঝতে পারছি জাতি, সত্তা, বর্গ-সীমান্ত পার হয়ে গড়ে-ওঠা জোট ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং তা চ্যালেঞ্জ করছে (ব্যক্তির) *পরিচয়*-এর মৌলিক, পরিবর্তনহীন ধারণাকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এ ধারণাই ছিল সাংস্কৃতিক চিন্তার ভিত্তি। প্রায় ৫০০ বছর আগে ইউরোপের মানুষ আর তার 'আন'দের (others) মধ্যে পদ্ধতিভিত্তিক যে লেনাদেনা শুরু হয় তাতে একটা ব্যাপারে কখনো দ্বিমত দেখা দেয় নাই যে, এখানে যেমন 'আমরা' আছি, তেমনি 'ওরা'ও আছে। এই দুই দলের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় আসীন, পরিষ্কার, এমনভাবে স্বয়ং-প্রকাশিত যে তাকে প্রশ্নবানে আক্রমণ করার সুযোগ নাই। আমি *অরিয়েন্টালিজমে* আলোচনা করেছি যে, 'বর্বরদের' সম্পর্কে গ্রীকদের চিন্তাভাবনা থেকেই এ জাতীয় আত্মপরিচয়ের উদ্ভব। তবে এর সৃষ্টি যাদের দ্বারাই হয়ে থাকুক, এই ব্যক্তি-পরিচয়ই ছিল উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি আর তার বিরুদ্ধে লড়াকু সংস্কৃতিগুলোর ভালত্ব নির্দেশক সিলমোহর।

আমরা এখনো এ ধারার উত্তরাধিকারী যাতে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হয় জাতির দ্বারা; অন্যদিকে জাতি তার মাতব্বরি পায় একটি নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের কল্পনা থেকে। যুক্তরাষ্ট্রে এ-জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বোধ পরিণত হয়েছে এইরকম যাচাই বাছাইয়ে যে, কোন কোন বই বা কর্তৃত্ব আমাদের ঐতিহ্য প্রকাশ করে। সবচেয়ে দুর্বলকর চর্চা হচ্ছে এই রকম চিন্তা যে, এই বইটা বা ওই বইটা ঐতিহ্যের অংশ। এ-জাতীয় চিন্তা ঐতিহাসিকভাবে নিখুঁত হওয়ার কাজে যতটা না সাহায্য করে, এর অতিরঞ্জন তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর। পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলছি, যা 'আমাদের' 'আমরা' প্রধানত তা নিয়েই ভাবব—এমন বিশ্বাসের প্রতি আমার সহনশীলতা নেই; আরবরা কেবল আরবি কায়দায় আরবি বই পড়বে—এমন মতের প্রতি প্রতিক্রিয়া চেপে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সহনশীলতাও নেই। যেমন সি. এল. আর. জেমস বলতেন, বিটোভন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের , তেমনি জার্মানদেরও। কারণ তাঁর সংগীত এখন গোটা মানবজাতির ঐতিহ্যগত সম্পদ।

তবু ব্যক্তির পরিচয়ের ব্যাপারে মতাদর্শগত চিন্তাভাবনা খুব বোধগম্যভাবেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা বিষয় ও স্বার্থের সাথে জট পাকিয়ে গেছে। এই সব গোষ্ঠীর সবগুলো কিন্তু বঞ্চিত সংখ্যালঘু নয় যারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বিষয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেহেতু সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনটা কোনটা আমরা পড়ব, কিভাবে পড়ব সেই নিয়ে এই বইয়ের বেশিরভাগটা লেখা তাই এখানে আমি আমার ধারণার মোদ্দা কথাটা তুলে ধরছি।

কিসের ভিত্তিতে আমেরিকান পরিচয় সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে একমত হওয়ার আগেই আমাদেরকে একটা কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, মার্কিন সমাজটা হল অন্যদেশ থেকে আসা একদল আবাদীর (বসতকারের) সমাজ। অসংখ্য স্থানীয় মানুষের ধ্বংসস্তূপের ওপর

তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই আমেরিকান পরিচয় এত বিচিত্র যে, তা কোনোমতেই একটা অভিন্ন ও একক রূপ পেতে পারে না। এই ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে যে দুই দল যুঝছে তাদের একদল ওকালতি করে অভিন্ন ও একক পরিচয়ের পক্ষে; অন্যরা মনে করে এই পরিচয় জটিল, কিন্তু একীভূত কিছু নয়। এই বৈপরীত্য দুই রকম প্রেক্ষিত ও ইতিহাসচর্চার ইঙ্গিত দেয়: এক, সিধা দাগের যা সব কিছু টেনে নিজের করে নিতে চায়, আরেক বিরোধাত্মক, সচরাচর পথুয়া মনের।

আমার যুক্তি, কেবল দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিতটাই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতার ব্যাপারে পুরাপুরি সংবেদনশীল। কিছুটা সাম্রাজ্যেও কারণেই হয়তো-বা, সকল সংস্কৃতিই একটা আরেকটার সাথে জড়ানো; কোনোটাই একলা ও খাঁটি না, প্রত্যেকটিই দোঁআশলা, নানা জিনিষের মিশাল, অসাধারণভাবে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যে বিভাজিত, এবং কোনোটাই আদি নয়। এইকালের যুক্তরাষ্ট্র বা আরব অঞ্চল—দুই দেশের জন্যই এ কথা সমান সত্য। দুই দেশের একটায় 'অ-আমেরিকানবাদের বিপদ', আরেকটায় 'আরবদের প্রতি হুমকি' কথাগুলোর অনেক অর্থ করা হয়েছে। শিক্ষার পরতে পরতে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক, প্রতিক্রিয়াশীল এমনকি বাতিক ধরনের জাতীয়তাবাদ। ওখানে কমবয়সী ও বয়স্ক উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের শিখানো হচ্ছে যেন ওরা 'ওদের' ঐতিহ্য উদযাপন করে, তার প্রতি সম্মান দেখায় (সচরাচর ঈর্ষাকাতর হয়ে অন্যদেরটার ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে)। এই অভাবনীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও চিন্তা লক্ষ্য করেই আমার এ বই, যা আসলে সংশোধনমুখি, সহনশীল বিকল্প, খোলামনে খোঁজ করার সম্ভাবনা। বইটা লেখার কাজে আমি খানিকটা ইউটোপিয়ান পরিসর কাজে লাগাতে পেরেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো যা পাওয়া যায়। আমি বিশ্বাস করি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমনই থাকবে যেখানে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিরীক্ষা, আলোচনা ও মতামত আদানপ্রদান চলবে। ওগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি চাপিয়ে দেয়ার বা মিশিয়ে দেয়ার জায়গায় পরিণত হলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ঝেঁটিয়ে বিদায় করে ওগুলোকে ক্ষমতাসীন দলের সম্প্রসারিত দপ্তরে পরিণত করবে মাত্র।

আমি চাই না আমাকে ভুল বোঝা হোক। যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য খুব বেশি; তবু সেই সমাজ একসাথে আঁটাআঁটি করে আছে, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও সেরকমই থাকবে। (বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি) অন্যান্য ইংরেজি-ভাষী দেশগুলোর বেলায়ও এ কথা সত্য; এমনকি ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও, যদিও ওখানে এখন বিপুলসংখ্যক অভিবাসীর অবস্থান। *দি ডিসইউনিটিং আমেরিকা* গ্রন্থে আর্থার শ্লেসিংগার বলেছেন যুক্তিতর্কে যে-বিভাজন দেখা যায় এবং নানা মেরুতে অবস্থান নিয়ে যে সব তর্ক তোলা হয় তা ইতিহাসচর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে: এইগুলো আছে, আমি মানি। কিন্তু তা প্রজাতন্ত্রটি ভেঙে যাওয়ার ভবিষ্যতবাণী করে না। মোট কথা ইতিহাস চাপা দেয়া বা বাতিল করার চেয়ে ইতিহাস ঘেঁটেঘুটে দেখা ভালো। যুক্তরাষ্ট্র তার বুকে ধরে আছে বহু ইতিহাস, যার অনেকগুলো চিৎকার করে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সেজন্য হঠাৎ ভয় পাওয়ার দরকার নাই। কারণ ওইগুলো আগে থেকে ওখানে ছিল এবং এর মাঝখান থেকেই একটা মার্কিন সমাজ ও রাজনীতি (এমনকি

ইতিহাস লেখার একটা ধরন) তৈরি হয়ে গেছে। অন্যকথায়, মিশ্রসংস্কৃতিবাদ নিয়ে সাম্প্রতিক তর্কবিতর্কের পরিণতি কোনো মতেই 'লেবাননাইজেশন' হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর এইসব বিতর্ক যদি রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনো একটা উপায় দেখিয়ে দেয় এবং নারী, সংখ্যালঘু ও সাম্প্রতিক অভিবাসীদের আত্ম-ভাবনায় পরিবর্তনও ঘটায় তবু এতে ডর লাগার কারণ নেই, এতে বাধা দেয়ারও দরকার নেই। মনে রাখা দরকার যে-সব বয়ান সবচেয়ে তীব্রভাবে মুক্তিকামী ও চেতন-পাওয়া, সেইগুলোর মধ্যেই আবার এক হওয়ার বাসনা, বিচ্ছিন্নতার নয়। এইগুলো হল সেইসব মানুষের বয়ান যারা মূল দল থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল, এখন সেখানে জায়গা পাওয়ার জন্য যুঝছে। যদি মূল দলের পুরনো অভ্যাসগত ধারণারাজি নতুনদের কাছে টেনে নেয়ার মতো নরম বা বড় মনের হতে না পারে তাহলে দরকার সেগুলোর রদবদল; নতুনদের বাদ রাখার চেয়ে সেইটা হবে অনেক ভালো কাজ।

শেষে যে কথাটা বলতে চাই। এই বইটা এক পরবাসীর রচনা। বিশেষ কিছু কারণে আমি পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আরব হয়ে বেড়ে উঠি। অথচ এইসব কারণের পেছনে আমার কোনো হাত ছিল না। এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় আমি দুই দুনিয়ারই মানুষ, কিন্তু কোনো-একটাতেও পুরোপুরি নেই। আরব দুনিয়ার যে অংশটার সাথে আমি খুব নিবিড় জড়িয়ে ছিলাম তা আমার জীবদ্দশাতেই গণঅভ্যুত্থান বা যুদ্ধের কারণে অনেক বদলে গেছে, অথবা সোজাকথায় নাই হয়ে গেছে। আর যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে আমি থেকেছি বাইরের একটা মানুষের মতো; বিশেষ করে এই দেশ যখন (ভুলভাবে) আরব সমাজ ও সংস্কৃতির বিপক্ষে চলে যায়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। তবু আমি যখন বলি 'পরবাস', তখন তার মধ্য দিয়ে দুঃখ আর বঞ্চনার কোনো ব্যাপার বোঝাতে চাই না। বরং বলতে চাই সাম্রাজ্যবাদী বেড়ার দুই দিকেই আমি আছি; যার ফলে অনেক কিছু বোঝা সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া এই বইটা যে শহরে লেখা, সেই নিউইয়র্ক প্রধানত পরবাসীদের শহর। ফানোর বর্ণনার মতো মেনেশিয়ান গড়নে গড়ে উঠেছে এই শহর। হয়তো এ সব কিছুই এ কাজটায় সংশ্লিষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করেছে, এমন তাৎপর্য-বাখানে উদ্দীপ্ত করেছে যা আমি লিখেছি। তবে এই পরিস্থিতির কারণেই অনুভব করতে পেরেছি আমি একাধিক ইতিহাস ও একাধিক দলের মানুষ। নির্দিষ্ট একটি জাতির প্রতি আনুগত্য এবং একক কোনো সংস্কৃতির অঙ্গীভূত থাকার স্বাভাবিক উপলব্ধির চেয়ে আমার উপলব্ধি আরো গ্রহণযোগ্য কোনো বিকল্প কি না তা পাঠকই ঠিক করবেন।

ভাষান্তর : ফয়েজ আলম

প্রতিরোধ সংস্কৃতির মর্মকথা

উপনিবেশিকতার বেড়াজাল থেকে একটি দেশকে মুক্ত করতে ভৌগোলিক সীমানা পুনরুদ্ধারের দরকার হয়। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সবসময় এই প্রক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র রসদ জোগান দেয়। প্রাথমিক প্রতিরোধের সময় অতিক্রান্ত হবার পর আক্ষরিক অর্থে বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে দ্বিতীয়বার প্রতিরোধের সময় আসে। তখন আদর্শগত প্রতিরোধ ভঙ্গুর সম্প্রদায়কে পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। এমনকি সম্প্রদায়বোধ ও ঘটনাপ্রবাহকে নিরাপদ রাখতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সব ধরনের চাপের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে যেতে হয়।[৪৪] বাজিল ডেভিডসন এমনটিই উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনাই নতুন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে পর্যায়ক্রমে সম্ভব করে তোলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আমরা এসব প্রসঙ্গে প্রধানত কাল্পনিক এলাকা বা শান্ত সমাহিত তৃণভূমি নিয়ে আলোচনা করি না। এই এলাকাগুলো মূলত কবি, বুদ্ধিজীবী, মহাপুরুষ, নেতা এবং প্রতিরোধের ইতিবাচক ইতিহাসবেত্তাদের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়। ডেভিডসন বস্তুত খ্রিস্ট ধর্ম বর্জনকারী ও পাশ্চাত্য পোশাক পরিহিত কিছু মানুষের প্রাথমিক দিককার 'অন্য পৃথিবীর' প্রস্তাবসমূহের প্রতি আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাদের সবাই ঔপনিবেশিকতার হাতছানিতে সাড়া দিয়েছেন। তাঁরা প্রায়শ আগেই জানা কোন বিষয়ের চেয়ে সম্মিলিত একতার আদর্শগত ভিত্তিকে খুঁজে দেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।[৪৫]

সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় দমন করা স্থানীয়দের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপাদানগুলোর পুনরুদ্ধার ও প্রত্যাবর্তনের মধ্যে এই ভিত্তিটা পাওয়া সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। এভাবে আমরা ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির বাস্তবতায় হেগেল-এর প্রভু-দাস দ্বন্দ্বের পাঠ ও পূর্ণ বিবেচনার উপর ফ্যাননের গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি। এই পরিস্থিতিতে ফ্যানন মন্তব্য করেছেন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভু হেগেল বর্ণিত প্রভু থেকে আলাদা? হেগেলের মতে এ বিষয়টির একটি বিনিময় ব্যাখ্যা আছে। এখানে প্রভু দাসদের সচেতনতাকে নির্মমভাবে উপহাস করে। এক্ষেত্রে প্রভু দাসদের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি চান না। শুধু কাজ চান।[৪৬] স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং সাম্রাজ্যবাদী আবহের মধ্যে অধঃস্তনদের স্থান দখল করে নিতে হয়। আত্মসচেতনতার মাধ্যমে একটি এলাকা দখল করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তবে এই অধিকৃত এলাকাটিই এক সময় সচেতনতার মাধ্যমে অন্যান্য অনুন্নতদের শাসিত ছিল। এবং তাদের অধঃস্তন করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই ভাগ্যটা হচ্ছে হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা একান্ত অর্থেই তার ব্যক্তিগত। মোটের উপর হেগেলই প্রথম বিষয়-নিরপেক্ষতা ও বিষয়-কেন্দ্রিকতা সংক্রান্ত মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকতা

নিয়ে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে ফ্যানন উপনিবেশিক শাসক ও উপনিবেশি জনগণের মধ্যকার সংগ্রামকে *Les Damen* এর প্রত্যয়ের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছেন।

প্রতিরোধচর্চায় এটাই আংশিক বেদনা। এটি অবশ্যই সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রভাবিত কিংবা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রূপগুলো পুনরুদ্ধার করতে নির্দিষ্ট মাত্রায় কাজ করবে। অতিক্রান্ত এলাকা (overlapping territories) বলতে আমি যা বুঝিয়েছি তা বিংশ শতকের পুরোটা আফ্রিকা জুড়ে সংগ্রামের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইউরোপিয়রা শূন্যস্থান হিসেবে বিবেচিত আফ্রিকায় আসতে থাকে এবং এই অঞ্চলটির রাজনৈতিক ভূগোল বারবার পাল্টে যেতে থাকে। এরকমই একটা প্রক্রিয়ার চিত্র উঠে এসেছে দিলিপ কার্টিন এর The Image of Africa বইতে।[৪৭] ঠিক যখন ইউরোপিয়রা আফ্রিকাকে শূন্যস্থান হিসাবে দেখেছিল এবং যখন তারা এটা গ্রহণ করল কিংবা এই স্থানকে বেওয়ারিশ বিবেচনা করে প্রাপ্যতাকে আত্মস্থ করল, তখন তারা বার্লিন কংগ্রেসের বিভাজনের (এটি ১৮৮৪-৮৫ সালের কথা) পরিকল্পনা করেছিল। এই সময়টিতে আফ্রিকানদেরকে উপনিবেশ থেকে মুক্ত হতে দেখা গেল।

তথাকথিত অভিযান বা সমুদ্রযাত্রার মূল বক্তব্যের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসাবে প্রতিচ্ছবি ও আদর্শগত ছায়ার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা উল্লেখ করা যায়, যা ইউরোপিয় সাহিত্যে বিশেষ করে অ-ইউরোপিয়দের নিয়ে রচিত সাহিত্যে দেখা যায়।[৪৮] রেনেসাঁ-পরবর্তী অভিযান কাহিনীতে এবং উনিশ শতকের অভিযাত্রী ও এথনোগ্রাফারদের বর্ণনায় Conrad এর কঙ্গো যাত্রার কথা উল্লেখ নেই। Gide ও Camus এর কথা বলতে গিয়ে Mary Louise Pratt দক্ষিণ দিকে সমুদ্র অভিযানের topos এর কথা বলেন,[৪৯] যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের মূল সুর অবিরাম ভাবে বেজে ওঠে। যে 'স্থানীয় খবরের মূলসুরটি বুঝা, শুরু করে তার জন্য সেটি হয় সংকটজনক আর হৃদয় ও ঘর থেকে নির্বাসনের ইংগিতপূর্ণ। এটিই Stephen Dedalus তার Ulysses এর Library পর্বে বর্ণনা করেছেন[৫০], উপনিবেশ-পরবর্তী সময়ে বৃটিশ কর্তৃক উপনিবেশিত আইরিস লেখক Joyce এই অভিযাত্রার লক্ষ্যের মূল বক্তব্য (motif) থেকে পুনঃঅভিজ্ঞতা লাভ করেন। অথচ এই লক্ষ্য থেকেই তাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি থেকে নতুন সংস্কৃতিতে সেই একই পথযাত্রার মাধ্যমে এটি অভিযোজিত, পুনঃব্যবহৃত ও মুক্ত হয়েছিল।

James Ngugi (পরবর্তীতে Ngugi wa Thiongo) তার The River Between শেষ করার পর Heart of Darkness শুরু করেন । যার প্রথম থেকেই তিনি Conrad-এর নদীর মধ্য দিয়ে জীবনকে পরিচিত করাতে থাকেন।। নদীকে Honia নামে ডাকা হতো, যার অর্থ 'আরোগ্য' বা 'জীবনে ফিরে আসা'। Honia নদী কখনও শুকায় না : মনে হয় যেন প্রচণ্ড খরা বা আবহাওয়ার পরিবর্তনেও যেন এর বহমান থাকার ইচ্ছা থাকে। আর এটি সব সময় কোনো ব্যস্ততা ও দ্বিধা ছাড়াই একই পথে চলতে থাকে। লোকজন এটি দেখেও খুশি ছিল।[৫১] নদী সম্বন্ধে Conrad এর চিন্তা, অভিযান বা রহস্যগুলো আমাদের চিন্তা ধারা থেকে খুব একটা আলাদা নয়, যেমনটি আমরা পড়ি। তবুও সেগুলোকে আলাদা করে দেখা হয়। Ngugi-এর লেখায় শ্বেতাঙ্গ মানুষকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে— সে Livingstone নামক একটি মিশনারি চরিত্রের মাঝে আবদ্ধ— যদিও তার প্রভাব বিভাজনের মধ্যে অনুভূত হয়, যা গ্রাম-নদীর তীর ও

জনগণকে একে অপরের থেকে আলাদা করে। Waiyaki-এর জীবন বিপন্নকারী অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে Ngugi চরমভাবে অমীমাংসিত এক সমাধান দিয়েছেন। যা উপন্যাসটি শেষ হওয়ার পরও চলতে থাকে এবং উপন্যাসটি এই বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টা করে না। Heart of Darkness-এ নতুন এক ব্যবস্থার আর্বিভাব ঘটে যার মধ্যে থেকে Ngugi ভঙ্গুর (tenuous) অবস্থান ও চূড়ান্ত অস্পষ্টতা থেকে আফ্রিকানদের মূল আফ্রিকায় ফিরে আসার পরামর্শ দেয়—এমন এক নতুন পদ্ধতি (method) আমাদের সামনে হাজির করেন।

আর Tayb Salih-র Season of Migration to the North-এ বর্তমান নীল নদই Conrad-এর নদী, যার জলধারা তার জনগণকে নবযৌবন দান করে। Conrad-এর উত্তম-পুরুষে ব্রিটিশ বলার ধরন এবং ইউরোপিয় প্রথাবিরোধী ধারণা পুরোপুরি উল্টে গেছে। প্রথমত আরব ব্যবহারের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত Salih's উপন্যাসে উত্তরদিকে সুদান থেকে ইউরোপে ভ্রমণ এবং তৃতীয়ত বর্ণনাকারী সুদানের একটি গ্রাম থেকে বলছিল। Heart of darkness-এর মধ্যে ভ্রমণ এভাবে সুদানীয় গ্রামীণ এলাকা থেকে পবিত্র হিজরতে রূপান্তরিত হয়। এখনও ঔপনিবেশিকতা-জর্জরিত ইউরোপের প্রাণ কেন্দ্রে Kurtz-এর সমরূপ প্রতিকৃতি (mirror image) হিসেবে Mostapha Said কে উপস্থাপন করা হয়। তিনি কুক্ষিগত নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় ইউরোপিয় নারী ও বর্ণনাকারীর উপলব্ধির ধারাবাহিকতায় নির্যাতনকে উপস্থাপন করেন। এই হিজরত সাঈদের প্রত্যাবর্তন ও স্থানীয় গ্রামে তার আত্মহননের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর—এর উপর হস্তক্ষেপের অতিক্রম কনরাডের আঁকা মানচিত্রের আপাদমস্তক ঔপনিবেশিক ক্ষেপণাস্ত্রের জটিল পথকে আরো বাড়িয়ে দেয় ও জটিল করে। ফলাফল হিসেবে এলাকার সহজ কোনো পুনরুদ্ধার নয় বরং কনরাডের রাজকীয় গদ্যে অনূদিত অনৈক্য ও কল্পিত ফলাফলের কতিপয় জটিলতা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। সেটি হুবহু এখনকার মতো, এর চেয়ে ভালোও না, খারাপও না। ঠিক যেমন আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছটি আমাদের বাড়ির মধ্যেই বড় হয়েছে, অন্য কারো বাড়ির মধ্যে নয়। বিষয়টি হল আমি জানি না— তারা কেন আমাদের দেশে এসেছে। তার অর্থ কি এই —আমাদের নিজেদের বর্তমান বা ভবিষ্যতকে বিষিয়ে তোলা উচিত? তারা আগে বা পরে আমাদের দেশ ত্যাগ করবে, যেমন ইতিহাসে অন্যান্যরা দেশ ত্যাগ করেছে। রেলওয়ে, জাহাজ, হাসপাতাল, কারখানা আমাদের হবে এবং আমরা তাদের ভাষা হয় অপরাধ না হয় কৃতজ্ঞতার খাতিরে ব্যবহার করব। আরো একবার আমরা যা ছিলাম সেই সাধারণ মানুষই থাকব। আর আমাদের কথা যদি মিথ্যা হয় তবে আমাদের নিজস্ব সত্তা মিথ্যা হয়ে যাবে।[৫২]

অতএব তৃতীয় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-পরবর্তী লেখকেরা নিজেদের মধ্যে তাদের অতীতকে লালন করেন। লজ্জাজনক সত্য হচ্ছে বিভিন্ন কাজের অনুসন্ধান, ঔপনিবেশ দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি, পুনঃব্যাখ্যা ও ক্ষতিপূরণের অভিজ্ঞতার মধ্যে পূর্বের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সাধারণ আন্দোলন ও প্রতিরোধের পুনঃদাবি তুলে ধরে। প্রতিরোধ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরেকটি মূল ধরন তুলে ধরা যায়। শেক্সপিয়ারের The Tempest নাটকের অনেক আধুনিক ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণে কোনো একটি

এলাকার উপর পুনর্গঠিত কর্তৃত্বের দাবি-সম্বলিত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করুন। এই কথাটি নতুন বিশ্বের কল্পনার পাহারাদার হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য গল্পে কলম্বাস, রবিনসন ক্রুসো, জন স্মিথ, ও পোকোহনতাসের দুঃসাহসিক অভিযান ও আবিষ্কারের বিষয় এবং ইনক্লে ও ইয়ারিকোর অভিযাত্রার উল্লেখ করা যায়। Peter Hulme-এর Colonial Encounters-এর ঝলমলে বর্ণনায় কিছুটা বিস্তারিতভাবে সেগুলোকে বিবৃত করা হয়েছে।[৫৩] কিভাবে উদ্ভাবক ব্যক্তিদের এই বিষয়টি আত্মরক্ষামূলক হয়ে উঠেছে তার একটি পরিমাপ এখানে দেয়া হয়েছে। সেগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা এখন প্রায় অসম্ভব। আমার মনে হয় এই পুনঃব্যাখ্যামূলক সতেজতা বলতে সরল মন, প্রতিহিংসাপরায়ণতা কিংবা রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা বলে উল্লেখ করা হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ নতুনভাবে অ-ইউরোপিয় শিল্পী বা পণ্ডিতদের হস্ত ক্ষেপ বাতিল করা বা কিংবা তাদেরকে থামিয়ে দেয়া যায় না। আর এই হস্তক্ষেপগুলো কেবল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা নয়, বরং অনেকভাবেই আন্দোলনের সাফল্যজনক নিয়ন্ত্রণকারী কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মেটাফরিক্যাল শক্তি, শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে অবিমিশ্র ভূখণ্ডের পুনঃভাবনাকে উপস্থাপন করে। ঐ ভূখণ্ডে পশ্চিমাদের কাছে স্থানীয়দের আচরণ ঔদ্ধত্যমূলক। অথচ তাদের কাছে এটিই অচিন্ত্যনীয় পুনরাধিকার।

Aime cesaine'র *Carribean Une Tempete* এর মূল বিষয়বস্তু পুনঃআবেগ নয় বরং ক্যারিবিয়দের উপস্থাপন করতে শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে স্নেহমাখা ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। প্রতিবন্ধকতার এ উদ্দীপনা প্রাক্তন নির্ভরশীল অনুকরণীয় বিষয় থেকে আলাদা অবিচ্ছেদ্য আত্মপরিচিতির ভিত্তি আবিষ্কার করার বিশাল প্রচেষ্টার অংশ। জর্জ লেমিং-এর মতে ক্যালিবান চিরন্তন সম্ভাবনা থেকে বর্জিত। তাকে চিত্রকল্প হিসাবে দেখা হয়, যেখানে নিজের বিকাশের জন্য অপরকে শোষণ করা একটি স্বাভাবিক প্রপঞ্চ।[৫৪] যদি তাই হয় তবে ক্যালিবানকে দেখান হবে যে, ক্যালিবানের নিজেস্ব প্রচেষ্টার ফল হিসাবে অনুধাবন করা নিজস্ব ইতিহাস আছে । লেমিং-এর মতে একজন ব্যক্তি ভাষাকে নতুন করার মাধ্যমে পুরাতন গল্পগাঁথা অবশ্যই বর্জন করবে। কিন্তু এটি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটবে না যতক্ষণ-না মানবপ্রচেষ্টার ফল হিসাবে ভাষাকে দেখাই, যতক্ষণ-না আমরা বিশেষ বিশেষ সব ফল প্রাপ্য করে তুলতে পারি। এগুলো সেইসব ব্যক্তির মাধ্যমে গৃহীত হয় যাদেরকে এখনও ভাষাহীন ও বিনির্মিত দাস-বংশধরদের দুর্ভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়।[৫৫]

লেমিং-এর বিষয়টি যখন আত্মপরিচিতির ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিষয় বিবেচিত হয়, ঠিক তখনই একটি ভিন্ন আত্মপরিচিতি ঘোষণা করা কখনোই যথেষ্ট নয়। এখানে বোঝা প্রয়োজন যে, ক্যালিবানের উন্নয়ন সক্ষম এক ইতিহাস আছে । যাতে অতীতে কাজের প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কেবল ইউরোপিয়রা যাতে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিল বলে মনে করা হয়। *The tempest*-এর প্রত্যেকটি নতুন আমেরিকান উৎসর্গ পুরনো মোহনীয় গল্পের স্থানীয় সংস্করণ, যার উন্মোচনও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চাপের মাধ্যমে প্রদীপ্ত ও পরিবর্তিত হয়েছে। কিউবার সমালোচক Roberto Fernandez Retamar আধুনিক ল্যাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ক্যারিবিয়রা নিজেরাই এলিয়েন নয়, সংকরের

প্রধান প্রতীক। এবং বিবিধ গুণের অদ্ভুত মিশ্রণ। এটি নতুন আমেরিকার Creaole কিংবা *mestizo* গঠনের ক্ষেত্রে অধিক সত্য।[৫৬]

Ariel-এর চেয়ে Caliban-কে Retamar-এর অধিক পছন্দ ঔপনিবেশিকতা মোচন করতে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার হৃদয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শিক বির্তককে নির্দেশ করে। এটি এমন একটি প্রচেষ্টা— যা সম্প্রদায়ের উত্তরণ ঘটায় এবং সাংস্কৃতিক পুনরুদ্ধার সম্পন্ন করে যা স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার অনেক পরেও প্রবহমান। আমি এখানে যে প্রতিরোধ ও ঔপনিবেশকতা মোচনের কথা বলছি তা সাফল্যজনক জাতীয়তাবাদ জন্ম হয়ে যাওয়ার পরও চলতে থাকে। এই বিতর্কটি চিরায়িত হয়েছে Ngugi's এর Decolonizing (1986) গ্রন্থে, যা তার বিদায়কে গ্রন্থিত করে এবং আফ্রিকায় ভাষা ও সাহিত্যকে আরো গভীরভাবে শোধন করার মাধ্যমে স্বাধীনতার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরে।[৫৭] একই ধরনের প্রচেষ্টা Barbara Harlow's-র Resistance Lierature গ্রন্থে (১৯৮৭) দেখা গেছে। যার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বের উপকরণগুলো ব্যবহার করে ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহিত্যকে অনন্য হিসেবে নির্মাণ করা, যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যার মধ্যে তত্ত্বগুলো খুঁজে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদান করে।[৫৮]

বিতর্কের মূল ঘটনাটিকে তাৎক্ষণিকভাবে একগুচ্ছ বিকল্পের মধ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা আমার Ariel-Caliban Choice থেকে গ্রহণ করতে পারি। ল্যাতিন আমেরিকায় যার ইতিহাস বিশেষ ও সাধারণ নয় কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন। ল্যাতিন আমেরিকান আলোচনা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন হওয়ার সংস্কৃতি ও এর নিজস্ব অতীতকে কল্পনা করে, এটা সেই উত্তর দেয়। একটা কিছু পছন্দ হলে তা করতে হবে, যেমন Ariel করে অর্থাৎ Prospero-র ইচ্ছার দাস হিসাবে তাকে যা করতে বলা হয়েছে Ariel তাই করেছে। যখন সে তার স্বাধীনতা অর্জন করে তখন সে তার স্থানীয় উপাদানে ফিরে আসে। এক ধরনের স্থানীয় বুর্জোয়া যারা Prospero'র সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপদ থাকে। দ্বিতীয় পছন্দটি ক্যালিবানের নিজের মতো করে করতে হয়। সংকর-অতীত সম্পর্কে সে অবগত এবং তা গ্রহণ করে কিন্তু ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য সে একই সাথে অক্ষম নয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় পছন্দটি হবে তার নিজের ক্যালিবান হওয়া, যা তার চলতি দাসত্ব মোচন করে এবং তার প্রয়োজনীয় প্রাক ঔপনিবেশক অর্থাৎ এর আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় শারীরিক বিকলাঙ্গতাকে অস্বীকার করে। এই ক্যালিবান স্থানীয় ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের পশ্চাতে অবস্থান করে এবং কৃষ্ণাঙ্গ আচরণ, ইসলামি মৌলবাদ ও আরববাদসহ এরকম কিছু প্রত্যয় নির্মাণ করে।

উভয় ক্যালিবানরা একে অপরকে পোষণ করে এবং তাদের একে অপরকে প্রয়োজন রয়েছে। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার প্রত্যেকটা অধঃস্তন সম্প্রদায় চেষ্টারত ও শোষিত ক্যালিবানদের প্রসপারোর মতো বাইরের কোনো প্রভুর নিকট পাঠিয়েছে। বিষয় জনগোষ্ঠীর অধিভুক্ত কোনো ব্যক্তির অহং সম্পর্কে অবগত হতে হলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়বাদের ভিত্তিমূলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। ঐ অন্তর্দৃষ্টি থেকেই নির্মিত হয় সাহিত্য, অসংখ্য রাজনৈতিক দল, সংখ্যা লঘু ও নারীদের

অধিকারের জন্য সংগ্রাম এবং অনেক সময়ই নব্যস্বাধীন দেশে এমনসব সংগ্রাম চলে। তবুও ফেনন পর্যবেক্ষণ করেন যে, জাতীয়তাবাদী সচেতনতাকে অতি সহজভাবেই বয়সের মতো কাঠামো নির্দেশ কওে। বর্ণ সমমানের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা ও আমলাদের জায়গায় বসাটা কোনো নিশ্চিত কিছু নয় যে, জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াশীলরা পুরাতন ক্ষতকে অনুকরণ করবে না। বর্ণবাদী বিপদসমূহ (আফ্রিকানদের জন্য আফ্রিকা) খুব বাস্তব একটা বিষয়। এটা তখনই সর্বোচ্চ হয়ে দাঁড়ায় যখন ক্যালিবান সকল অধীনসহ নারী ও পুরুষের ইতিহাসের একটি দিক হিসাবে তার নিজের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জটিল সত্যকে উপলব্ধি করে।

ঐ প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টির গুরুত্বকে আমরা কমাতে পারব না। জনগণ নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় নিজ ভূমিতে বন্দি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়, কেননা এটি বারবার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের সাহিত্যে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দির অধিকাংশ সময়ে সময় হারানো ভারতীয়, জার্মান, ফরাসি, বেলজিয়ান ব্রিটিশ, আফ্রিকা, হাইতি, মাদাগাস্কার, উত্তর আফ্রিকা, বার্মা, ফিলিপিন্স, মিশর, এবং অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অসংলগ্ন বলে মনে হয়, যদি-না সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিরোধের পক্ষে যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি রচনা হয় তার প্রতি একধরনের ভালোবাসার মাধ্যমে বন্দিত্বের বোধকে কেউ চিহ্নিত করতে পারে। আইমে সিসারে উল্লেখ করেন :

সেই সে যে আমার : শপথের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে
ছোট্ট সে ঘর, যেখানে সাদা বাধার তুষারপাত হয়
প্রবলভাবে
তুষারপাত— এক সাদা কারা প্রহরী, যে
বন্দীর সামনে দাঁড়ায়
সেই সে যে আমার :
সেই সে একমাত্র মানুষ, যে সাদাক্রান্ত
সেই সে মানুষ, যে সাদা মৃত্যুর শ্বেত অশ্রুকে মোকাবেলার
জন্য স্বাগত জানায়।
(সন্তরা, প্রারম্ভের সন্তরা)

প্রায়ই বর্ণের ধারণা বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বন্দিত্ব নির্দেশ করে। প্রতিরোধ সংস্কৃতির মধ্যে সর্বত্রই এটি দৃষ্টিগোচর হয়। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত *Nationalism* নামক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলেছেন। ব্রিটিশ, চৈনিক, ভারতীয়, জাপানীয় যেই হউক না কেন, তিনি বলেন ভারতের উচিৎ হবে নিশ্চিত কোনো প্রতিযোগিতামূলক জাতীয়তাবাদের যোগান দেয়া নয় বরং বর্ণগত সচেতনতার মাধ্যমে উৎপাদিত প্রকরণের সৃজনশীল সমাধান। একই ধরনের অন্তর্দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় W.E.B Du Bois-এর The Soul of Black Folk (1903) গ্রন্থে । কেন এটিকে সমস্যা দায়ক মনে হয়? কেন ঈশ্বর আমাকে বর্ণ বহির্ভূত করে সৃষ্টি করলো এবং আমার বাড়িতে আমাকেই আগন্তুক করল? ঠাকুর ও Du Bois উভয়ই শ্বেতাঙ্গ কিংবা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর পাইকারি কিংবা অবিচারমূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ঠাকুর বলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেই কেবল দায়ী করা যাবে না,

তার সাথে জাতির মননগত অনাগ্রহকে দায়ী করা যায়, যা প্রাচ্যের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ মানুষের বোঝা কাঁধে নিয়েছে।[৬২]

বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত উপনিবেশিকতাহীন সংস্কৃতিক প্রতিরোধের মধ্যে তিনটি বড় বিষয়ের উদ্ভব ঘটে, যার সবগুলোই প্রাসঙ্গিক। অবশ্যই এগুলো একটি সংগতিপূর্ণ ও অপরিহার্যভাবে সম্প্রদায়ের সমগ্র ইতিহাসকে অধ্যয়নের উপর জোর দেয়। বন্দি জাতিকে নিজের মধ্যে নিজেকে পুনর্গঠিত করে (ইউরোপের বেনেডিক্ট এন্ডারসন এটিকে ছাপা পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত করেছেন, যা ভাষার ক্ষেত্রে এক নতুন fixity তৈরি করে এবং ল্যাতিনের নিচে ও কথিত ভাষার উপরে বিনিময় ও যোগাযোগের সংঘবদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করে)। জাতীয় ভাষার প্রত্যয়টি কেন্দ্রীয় কিন্তু স্লোগান থেকে সংবাদপত্র, লোককাহিনী ও নায়ক থেকে মহাকাব্য, উপন্যাস ও নাটক—এ সকল জাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন করে না, সেখানে ভাষা অচেতন থাকে। এটি জাতীয় সাংস্কৃতিক-সাম্প্রদায়িক স্মৃতিকে সংগঠিত ও জিইয়ে রাখে, যখন আফ্রিকার প্রতিরোধমূলক গল্পগুলোতে প্রাথমিক পরাজয়গুলো পুনরায় শুরু হয় (তারা ১৯০৩ সালে আমাদের অস্ত্র নিয়েছিল, আমরা আবার সেগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছি)। নায়ক, নায়িকা ও শোষিতদের পুনর্গঠিত জীবনযাত্রাকে ব্যবহার করে ভূখণ্ডে আবারো মানুষের বসতি গড়ে তোলে। এটি গর্ব এবং রক্ষার অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে পুনঃরূপ দেয়, যা পর্যায়ক্রমে প্রধান জাতীয় স্বাধীনতাকামী দলের মেরুদণ্ড তৈরি করে। স্থানীয় দাস বিবরণ ও ইহজাগতিক আত্মজীবনী, জেলখানার স্মৃতি এসব কিছুই পাশ্চাত্যশক্তির ব্যাপক ইতিহাস, আনুষ্ঠানিক আলোচ্য বিষয় ও নিবর্তনমূলক বিভাজনের মতো দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। উদাহরণসরূপ বলা যায় যে, মিশনে Girgi Zaydan এর ঐতিহাসিক উপাদানগুলো প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্টভাবে আবার বিবরণসমূহকে একত্রিত করে (যা Walter Scott একশ বছর আগে করেছিলেন)। এন্ডারসনের মতে, স্প্যানিস আমেরিকায় *creole* সম্প্রদায়গুলো *creoles*-দের তৈরি করল, যারা সচেতন ভাবে সহযোগী জাতীয়তাবাদী হিসেবে পুনরায় এসব বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে।[৬৪] এন্ডারসন ও হান্নাহ আরেন্ড উভয়ই কাল্পনিক ভিত্তির উপর সংহতি অর্জনে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনকে লক্ষ্য করেন।[৬৫]

দ্বিতীয় ধারণাটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়া থেকে দূরে গিয়ে প্রতিরোধ মানব ইতিহাস অনুধাবনের এক বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বাধা-ভাঙার উপর ভিত্তি করে এই বিকল্প পুনঃধারণা কতটা কাজ করে তা অনুধাবন করা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চিতভাবে fascinating বইয়ে প্রাচ্য ও আফ্রিকা নিয়ে লেখায় ফিরে যাওয়া, প্রাচ্য ও আফ্রিকার ইউরোপিয় বর্ণনাগুলো বাদ দেয়া, খেলনা কিংবা অধিকতর শক্তিশালী নতুন বর্ণনার স্টাইল—এসবই এই প্রক্রিয়ার বড় উপাদান। সালমান রুশদির উপন্যাস Midnight's Children স্বাধীনতার মুক্ত কল্পনার উপর নির্ভরশীল একটি চমৎকার লেখা। ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করার সচেতন প্রচেষ্টাকে এটার সাথে মেশানো, এটিকে রূপান্তর করা, এটিকে প্রান্তিক কিংবা দমিয়ে কিংবা ভুল ইতিহাসে পরিচয় করানো রুশদির লেখার এক বিশেষ ধরন এবং প্রতিরোধমূলক লেখার প্রাথমিক পর্যায়ও বটে। এই ধরনের লেখা

প্রায় ডজনখানেক পণ্ডিত, সমালোচক ও সীমান্তবর্তী বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। আমি এই প্রচেষ্টাকে অভিযাত্রা হিসেবে আখ্যায়িত করি।

তৃতীয় ধারণাটি হচ্ছে পৃথক জাতীয়তাবাদ থেকে সরিয়ে মানব-সম্প্রদায় ও মানব-স্বাধীনতার আরও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোযোগ দেয়া। এ বিষয়টি আমি পরিষ্কার করতে চাই। কাউকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে, উপনিবেশ মোচনের সময় সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরেকটি জাতীয়তাবাদের রসদ সররাহ করেছিল। তৃতীয় বিশ্বে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আজকের বিতর্কগুলো অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই সাথে তার প্রতি আগ্রহও অন্ততপক্ষে এই কারণে নয় যে, পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জাতীয়তাবাদের এই পুনঃআগমন কয়েকটি anachronistic মনোভাবকে বাঁচিয়ে রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এলি কেডোরিও অপাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদকে condemnable, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক হীনতার না-বোধক পাশ্চাত্য-রাজনৈতিক ব্যবহারের অনুকরণ বলে বিবেচনা করেন, যা সামান্য ভালো কিছু বয়ে আনে। আমি মনে করি এরিক হবসন ও আনেস্ট গেলনারের মতো অন্যরা জাতীয়তাবাদকে একধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করেন, যা আধুনিক অর্থনীতি, প্রাযুক্তিক যোগাযোগ ও অতিমাত্রার সামরিক উপস্থাপনার নতুন বহুজাতিক বাস্তবতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হয়েছে।

আমি মনে করি একটি নব্যস্বাধীন জনগোষ্ঠীর সমালোচনা বাম ও ডানপন্থী মতবাদের দ্বন্দ্বের সাথে একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক বিরোধ বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে নতুন প্রস্তাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং প্রাক্তন বিষয়ধর্মী জনগোষ্ঠীগুলো এই ধরনের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অধিক আস্থা রাখে। এখানে জার্মান কিংবা ইতালিয়দের প্রাধান্য দেয়ায় একটি দ্বিধাগ্রস্ত ও সীমাবদ্ধ ধ্যান ধারণা মূল উপাদানগুলোকে কেবল বুঝতে ও প্রয়োজনমাফিক কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। কিন্তু সকল সংস্কৃতির ইতিহাস হচ্ছে সাংস্কৃতিক ঋণের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিসমূহ অভেদ্য নয়। ঠিক যেমন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান আরবের কাছ থেকে ধার করা, তারা ভারত ও গ্রিসের কাছ থেকেও ধার করেছিল। সংস্কৃতি কখনই শুধুমাত্র মালিকানার পরিবর্তনজনিত ধার নেয়া কিংবা দেয়ার বিষয় নয় বরং চৌর্য্যবৃত্তি, সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সব ধরনের আন্ত ঃনির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে। এটিই সার্বজনীন রীতি। ইংলিশ ও ফরাসি রাষ্ট্রের প্রচুর সম্পদের ক্ষেত্রে অন্যদের কর্তৃত্ব কতটুকু—তা এখন পর্যন্ত কে নির্ধারণ করেছে?

অ-পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের আরেকটি কৌতূহল উদ্দীপক সমালোচনা করেছিলেন ভারতীয় পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'নিম্ন বর্গ গোষ্ঠী অধ্যয়ন গোষ্ঠী'র একজন অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন ভারতের অনেক জাতীয়তাবাদী চিন্তা হয় সামগ্রিক ভাবে উপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করে, নয়তো দেশপ্রেমের সচেতনতা নিশ্চিত করে নির্মিত হয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির বিপ্লবাত্মক পুনর্জাগরণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গ্রোথিত বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজাততন্ত্রের সাথে এটি অপরিহার্যভাবে সংগতিপূর্ণ।[৬৮] এরূপ পরিস্থিতিতে জাতিকে পুনর্গঠিত করাটা রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে দুর্বল হওয়া আবেগময়ী কাল্পনিক আদর্শের স্বপ্ন দেখার সমার্থক। চ্যাটার্জির মতে, আধুনিক

সভ্যতার জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক মাইলফলক পুরোপুরিভাবে গান্ধীর বিরোধিতায় প্রকাশ পেয়েছে। রাসকিন ও টলস্টয়ের মতো আধুনিক প্রতি-চিন্তাবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধী আলোকপ্রাপ্ত চিন্তার পরবর্তী বিষয়বস্তুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।[৬৯] নেহেরুর কাজ ছিল গান্ধীর আধুনিকতা থেকে স্বাধীন হওয়া ভারতীয় জাতি গ্রহণ করা এবং এটিকে পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে স্থাপন করা। বাস্তব জগৎ, ভিন্নতার জগৎ, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম এবং ইতিহাস ও রাজনৈতিক জগৎ এখন রাষ্ট্রীয় জীবনের মধ্যে গভীর একতা খুঁজে পায়।

চ্যাটার্জি দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে সাফল্যজনক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদের এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। সেজন্য জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক অবিচার ও জাতীয়তাবাদী অভিজাত কর্তৃক নব্যস্বাধীন রাষ্ট্রের দখল আলোচনা না করার জন্য সর্বাধিক সংকট-নিরসনের উপায় হয়ে উঠে। কিন্তু আমার মনে হয়, স্থির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের পৃথকীকরণ সংস্কৃতির অবদান, এবং এক অর্থে কর্তৃত্বময় ধারণার ফল—এ বিষয়ের উপর তিনি যথেষ্ট জোর দেন নি। জাতীয়তাবাদী ঐক্যের মধ্যে ভীষণভাবে জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা রয়েছে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী ও সমাজের মধ্যে সম্প্রদায়ের বৃহত্তর এবং আরও উদার মানব-বাস্তবতার মধ্যে পৃথক ও বিজয়ী স্লোগানের ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী blandishments প্রত্যাখ্যান করে। এই সম্প্রদায়টি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত প্রকৃত মানব-স্বাধীনতা লালন করে। Davidson তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Africa in Modern History: The Search for a New Society*-তে একই বিষয় উপস্থাপন করেছেন।[৭১]

সহজ জাতীয়তাবাদ-বিরোধী অবস্থানের সমর্থক হিসাবে আমাকে ভুল বোঝা হোক তা আমি চাই না। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যে, সম্প্রদায়ের পুনর্গঠন, আত্মপরিচিতির দাবি এবং নতুন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব এগুলোর সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদ গতিশীল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অ-ইউরোপিয় বিশ্বের সর্বত্র পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তদন্ত করতে আগ্রহী এবং পরিশেষে এগিয়ে নিতে চায়। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারের বিরোধিতা করার চেয়ে এটার বিরোধিতা অধিক প্রয়োজনীয় নয়। ফিলিপিন্স ও আফ্রিকার যেকোনো দেশ কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো দেশ, আরব বিশ্ব কিংবা ক্যারিবিয় ও ল্যাতিন আমেরিকার অনেক দেশ, চীন কিংবা জাপান স্থানীয় স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীতে একত্রে দলবদ্ধ হবে, যা আত্মপরিচিতি বোধের উপর নির্ভরশীল এবং একই সাথে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় কিংবা সম্প্রদায়গত এবং আরো পশ্চিম অমান্যের ক্ষেত্রে বিরোধী। এটা শুরু থেকেই ঘটে। বিংশ শতকে এটি বৈশ্বিক বাস্তবতা হয়ে উঠে। কারণ এটি ব্যাপক পাশ্চাত্য আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠে, যা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অতিমাত্রায় বিস্তৃত।

এখানে নারী আন্দোলন কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। কারণ যেহেতু প্রাথমিক প্রতিরোধ সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলোর দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে তাই concubinage, বহুবিবাহ, footbinding, সতী এবং ভার্চুয়াল দাসদের মতো অন্যায়মূলক পুরুষ অনুশীলন নারীর প্রতিরোধের বিষয় হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের

প্রথমদিকে মিশর, তুর্কী, ইন্দোনেশিয়া, চীন ও সেলনে নারীমুক্তির আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত। Mary Wollstonecraft কর্তৃক প্রভাবিত উনিশ শতকের প্রথম দিককার একজন জাতীয়তাবাদী নেতা রাজা রামমোহন ভারতীয় নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রাথমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা উপনিবেশিক বিশ্বে ঘটেছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের মধ্যে সকল নির্যাতিত শ্রেণীর হারানো অধিকারসমূহ আদায়ে এ আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী নারী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী এবং Basant-এর মতো পাশ্চাত্য ধারণার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারীর অধিকারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করেন। কুমারী জয়াবর্ধনার অন্যতম গ্রন্থ *Feminisn and Nationalism in the Third World*-এ তিনি Tora Dutt, D. K. Karve I, Cornelia Sorabjee প্রমুখ সংস্কারকদের প্রচেষ্টা এবং ভারতীয় নমস্য ব্যক্তিত্ব Pundita Ramabai এর প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করেন।

আলজেরিয়া, গায়ানা, ফিলিস্তিন, মুসলিম ও আরব দুনিয়ার অংশবিশেষ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদী অর্জন নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গেছে এবং বিলম্বিত হয়েছে। এসব দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রমাণ মিলেছে।

আমার মনে হয়, উপনিবেশ-উত্তর রাজনীতির শিক্ষার্থীরা কূপমণ্ডূক চিন্তা, কর্তৃত্ব কিংবা পুরুষতান্ত্রিক ধারণা হ্রাসে যথেষ্ট মনোযোগী হয়নি। ববং পরবর্তীতে পরিচয় প্রদানকারী রাজনীতির দমনমূলক প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছে। এর কারণ সম্ভবত তৃতীয় বিশ্বের ইদি আমিন ও সাদ্দাম হোসেনরা খুবই বিপজ্জনক পন্থায় জাতীয়তাবাদকে অপহরণ করেছে। তবে এটা পরিষ্কার যে, কিছু ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীরা অন্যদের চেয়ে আরো বেশি দমনমূলক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আত্মসমালোচক। তবে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে, জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ সবসময় নিজেই নিজের সমালোচনা করেছে। সি এল আর জেমস, নেরুদা, ঠাকুর, ফ্যানন, ক্যাব্রালসহ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভাসিত খ্যাতনামা লেখকদের পাঠসমূহ অসাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ঘরানার লোকদের মধ্যে সংগ্রামে নিয়োজিত শক্তিসমূহের বঞ্চনাকে তুলে ধরেছে। এই আলোচনায় জেমস প্রায় আদর্শ একটি ঘটনা। কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তার মহান ধারক এই মানুষটি দাবি-দাওয়াহীন লোকদের জন্য তার কণ্ঠ উচ্চকিত করেছেন। জাতিগত ব্যক্তিবাদের ঘোষণা পর্যাপ্ত নয়, এমনকি সমালোচনা ছাড়া সংহতির বিষয়টিও পর্যাপ্ত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। যদি একমাত্র কারণও হয়, এ থেকে তিনি এক মহৎ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের সমাপ্তির সূচনালগ্ন থেকে দূরে থেকেও আমরা এমন এক অবস্থায় আছি, যেখানে মেট্রোপলিটন দুনিয়ার অন্তর-বাহিরে বসবাস করেও আমরা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাসের জন্য কিছু করতে পারি।

সর্বোপরি অ-উপনিবেশীকরণ বিভিন্ন রাজনৈতিক গন্তব্যেও স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ভূগোলের জন্য এক জটিল যুদ্ধক্ষেত্র। এবং এ বিষয়টি কল্পনা, স্কলারশিপ ও প্রতি-স্কলারশিপ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বারবার ঘটে। এই সংগ্রাম ধর্মঘট, পদযাত্রা, নিবর্তনধর্মী আক্রমণ, ন্যায়বিচার এবং প্রতি ন্যায়বিচার আকারে প্রতিভাত হয়। উপন্যাসিক এবং উপনিবেশিক কর্মকর্তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে ভারতীয় মানসিকতার বুনন টের পাওয়া

যায়। উদাহরণ হিসেবে বাংলার ভূমি রাজস্ব প্রথা, ভারতীয় সমাজকাঠামো এবং এর প্রতিক্রিয়ায় শাসন সম্পর্কে ভারতীয়দের উপন্যাস বা লেখায়, বুদ্ধিজীবীদের আলোচনায় এবং বক্তৃতায় প্রায়শ স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের আস্থা অর্জনের আহবান জানানো হয়।

এসব ঘটনাকে সময়রেখা এবং নির্দিষ্ট দিনক্ষণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারত একভাবে, বার্মা অন্যভাবে, পশ্চিম আফ্রিকা অন্য রকমে, আলজেরিয়া ভিন্ন ধরনে, মিশর, সিরিয়া এবং সেনেগালের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই ধারাবাহিকভাবে আরো একটি বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। এর একদিকে চরম জাতীয়তাবাদী ঘরানার পশ্চিম ফ্রান্স, ব্রিটেন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি; অন্যদিকে প্রায় সবগুলো স্বদেশী জাতিসমূহের অবস্থান। সাধারণভাবে বলা যায় অসাম্রাজ্যবাদী প্রতিরোধের নির্মাণ ধারাবাহিকভাবে অনিয়মিত এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে নানান দল, আন্দোলন ও ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা প্রায়শই অসফল বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন দশক পরে এগুলো সামরিক কায়দায় আরো বেশি স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠে এবং এর ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ায় নতুন নতুন দেশের উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা ক্ষমতাবলয়ে স্থায়ী অন্তর্গত পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘটনা পশ্চিমা শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী নীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে দুটি শক্তিশালী মতাদর্শে বিভক্ত করে ফেলে।

ভাষান্তর : দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু

তথ্যসূত্র :

44. Davidson, *Africa in Modern History*, p. 155.
45. *Ibid.*, p. 156.
46. Fanon, Black Skin, *White Masks*, p. 220.
47. Philip D. Curtin, *Image of Africa: British Ideas and Action*, 1780-1850, 2 vols. (Madison: University of Wisconsin Press, 1964).
48. Daniel Defert, 'The Collection of the World: Accounts of Voyages from the Sixteenth to the Eighteenth Centuries,' *Dialectical Anthropology* 7 (1982), 11-20.
49. Pratt, ' Mapping Ideology.' See also her remarkable *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation* (New York and London: Routledge, 1992).
50. James Joyce, *Ulysses*(1922: rprt. New York: Vintage, 1966), p. 212.
51. James Ngugi, *The River Between* (London: Heinemann, 1965),p.1.
52. Tayeb Salih, *Season of Migration to the North*, trans. Denys Johnson-Davies (London: Heinemann, 1970), pp. 49-50.
53. Peter Hulme, *Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean*, 1492-1797 (London: Methuen, 1986).
54. George Lamming, *The Pleasures of Exile* (London: Allison & Busby, 1984), p. 107.
55. Ibid., p. 119.
56. Roberto Fernandez Retamar, *Caliban and Other Essays*, trans. Edward Baker (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989), p. 14. See as a corollary, Thomas Cartelli, 'Prospero in Africa: The Tempest as Colonialist Text and Pretext,' in *Shakespeare Reproduced: The Text in History and Idealogy*, eds. Jean E. Howertd

and Marion F. O'Connor (London: Methuen, 1987), pp. 46.

57. Ngugi wa Thiongo, *Decolonising the Mind: The Politics of Lnaguage in African Literature* (London: James Curry, 1986).
58. Barbara Harlow, *Resistance Literature* (New York: Methuen, 1987), p.xvi. In this regard a pioneering work is Cheinweixu, *The West and the Rest of Us: White Predatore, Black Slaves and the African Elite* (New York, Random House, 1975).
59. Aime Cesaire, *The Collected Poetry, eds. and trans. Clayton Eshleman and Annette Smith* (Berkley: University of California Press, 1983), p. 46.
60. Rabindranath Tagore, *Nationalism* (New York: Macmillan, 1917),p. 19 and *passim*.
61. W.E.B. Du Bois, *The Souls of Black Folk* (1903; rprt. New York: New American Library, 1969), pp. 44-45.
62. Tagore, *Nationalism*, p. 62.
63. Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: New Left, 1983), p. 47.
64. *Ibid.*, p. 52.
65. *Ibid.*, p. 74.
66. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiflin, *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures* (London and New York: Routledge, 1989).
67. Eric Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Ernest Gelner, *Nations and Nationalism* (Ithaca: Cornell University Press, 1983).
68. Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* (London: Zed, 1986), p. 79. See also Rajat K. Ray, 'Three Interpretations of Indian Nationalism,' in *Essays in Modern India*, ed. B.Q. Nanda (Delhi: Oxford University Press, 1980), pp. 1-41.
69. Chatterjee, *Nationalist Thought*, p. 100.
70. *Ibid.*, p. 161.
71. Davidson, *Africa in Modern History, especially p. 204. See also General History of Africa*, ed. A. Abu Boaher, vol. 7, *Africa Under Colonial Domination, 1880-1935* (Berkeley, Paris and London: University of California Press, UNESCO, James Currey, 1990), and *The Colonial Moment in Africa: Essays on the Movements of Minds and Materials, 1900-1940*,ed. Andrew Roberts (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
72. Kumari Jayawardena, *Feminism and Nationalism in the Third World* (London:Zed, 1986), especially pp. 43-56,73-108, 137-54, and *passim*. For emancipatory perspectives on feminism and imperialism, see also Laura Nader, 'Orientalism, Occidentalism and the Control of Women,' *Cultural Dynamics* I, No. 3 (1986) 323-55; Maria Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labour* (London: Zed, 1986), see also Helen Callaway, *Gender, Culture and Empire: European Women in Colonial Nigeria* (Urbana: University of Illinois press, 1987) and eds. Nupur Chandur and Margaret Strobel, *Western Women and Imperialism: Complicity and Resistance* (Bloomington: Indiana University press, 1992).

অন্যান্য রচনা

নির্বাসনে ভাবনাচিন্তা

ভাবতে গেলে নির্বাসন অদ্ভুত রকমের আকর্ষণের একটি বিষয়, যদিও তা সহ্য করে ওঠা দুঃসহ। একজন মানুষ ও তার স্বদেশভূমি, ব্যক্তি ও তার সত্যিকার গৃহের মধ্যে জোর করে তৈরি একটা অনারোগ্য চিড়। এর অপরিহার্য বিষাদকে অতিক্রম করে ওঠাটা কখনোই সম্ভব নয়। একথা সত্যি যে সাহিত্য ও ইতিহাস ভরে রয়েছে নির্বাসিত জীবনের বীরত্বপূর্ণ, রোমান্টিক এমনকি গৌরবজনক বিজয়গাঁথায়। কিন্তু সে সমস্ত কিছুই বিচ্ছেদের পঙ্গুকর দুঃখ-বিষাদকে অতিক্রম প্রচেষ্টার থেকে বেশি কিছু নয়। নির্বাসনের ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায়, স্থায়ীভাবে কোনো-একটা কিছুর বিলুপ্তি, যা হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যই।

একথা কিন্তু সত্যি যে নির্বাসন বঞ্চনার একটি চরম অবস্থা। তা হলে কেন এত সহজেই আধুনিক সংস্কৃতির এমন অখণ্ড, একইসঙ্গে সমৃদ্ধ বিষয়কল্পে তার রূপান্তর ঘটেছে? আধুনিক কালপর্বকে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত আত্মিকভাবে অনাথ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, উদ্বিগ্নতা এবং বিচ্ছেদের যুগ হিসাবে। নীট্‌শে আমাদের শিখিয়েছেন প্রথানুগের প্রতি অস্বাচ্ছন্দ্য। ফ্রয়েড গার্হস্থ্য-অন্তরঙ্গতাকে আপন পিতৃহত্যা ও অজাচারের আবেগের উপর পেলব মুখোশরূপে বিবেচনা করতে বলেছেন। আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতির বৃহদাংশ নির্বাসিত, বাস্তুচ্যুত ও শরণার্থীদের দ্বারা সৃষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্বৎসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং নান্দনিক ভাবনারূপে যা-কিছুই আজ পরিচিত, সে সমস্ত কিছুরই কারক উপাদান হচ্ছে— ফ্যাসিবাদ, কমিউনিজম ও আরো অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভিন্নমত বিশ্বাসীদের উপর নিপীড়ন ও বহিষ্কারের ফলে সৃষ্ট শরণার্থীরা। সমালোচক জর্জ স্টাইনার এমনকি এমন উপলব্ধিজাত প্রস্তাব উত্থাপনের ভাবনা জানিয়েছেন যে বিশ শতকের পশ্চিমের সমগ্র সাহিত্য-রূপগুলোই দেশ-বহির্ভূত। সেই সাহিত্য নির্বাসিতদের দ্বারা সৃষ্ট, নির্বাসন বিষয়ে এবং এই শরণার্থী যুগেরও প্রতীকীব্যঞ্জনা। স্টাইনার এমন কথাই স্মরণ করিয়ে দেন।

আধা-বর্বর যে সভ্যতা বহুসংখ্যক মানুষকে গৃহহীন করেছে, সেখানে যাঁরা শিল্প সৃষ্টি করেন, তাঁদের তো নিজেদেরই হওয়া উচিত কবিকুল অগৃহী, উৎকেন্দ্র, একান্ত, স্বদেশের জন্য ব্যাকুল, স্বেচ্ছাকৃতভাবেই অপরিণত— এমনটাই সঙ্গত বলে মনে হয়। নির্বাসন অন্য যুগগুলোতেও একই-প্রকৃতির আন্তঃসাংস্কৃতিক বহুজাতিক দৃষ্টিচেতনার জন্ম দিয়েছে। নির্বাসিতরাও একই রকম নৈরাশ্য ও দুর্দশার শিকার হয়েছেন। একই ধরনের বিশদতা ও সমালোচনাধর্মী দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছেন— দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে যে বিষয়টি অতি উজ্জ্বলভাবে যথাযথতা পেয়েছে, উনিশ শতকের রুশ বুদ্ধিজীবীসমাজ, হেরজেনের চারপাশে যাঁরা জমা হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে লেখা ই.এইচ. কার-এর 'রোমান্টিক নির্বাসিতজনেরা' বইখানির ধ্রুপদী অন্বেষণে। কিন্তু

আগের যুগগুলির নির্বাসিতজন এবং আমাদের সময়কালের নির্বাসিতদের মধ্যে পার্থক্যটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে– আজকের দিনের নির্বাসন সহ্য করে চলেছে কঠিন এক পীড়ন যেটি আবার আমাদের যুগেরও নিরূপক– অর্থাৎ আধুনিক সমরাস্ত্রে বলীয়ান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বাত্মক শাসককুলের আধা-ঐশ্বরিক আকাঙ্ক্ষার সহযোগে– এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সত্যিকার শরণার্থীদের যুগ, দেশান্তরিত বাস্তুচ্যুত মানুষদের গণ-অভিবাসন।

এমন বিশাল যে নৈর্ব্যক্তিক পরিবেশ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে মানবতার ভাবনার সেবায় নির্বাসনকে কাজে লাগানো যায় না। বিশ শতকীয় পরিমাপে নির্বাসনকে না নান্দনিক চেতনায় না মনুষত্ববোধের নিরিখে উপলব্ধি করে ওঠাটা সম্ভবপর। নির্বাসন-বিষয়ক সাহিত্য বড়জোর কঠিন শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্যকর অবস্থাটুকুকে চিত্রিত করতে পারে– প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ মানুষজন যেটি জেনে নিতে সক্ষম হয়ে ওঠেন না। তবুও নির্বাসন-বিষয়ক সাহিত্য মনুষ্যত্বের হিতার্থে, এমন কথা জানানোর অর্থ কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় যে ক্ষয়ক্ষতি নির্বাসন দুর্ভাগ্য-পীড়িতদের উপর চাপিয়ে দেয়, অঙ্গহানিকর সেই পীড়নটিকে তুচ্ছ করে দেখানো। নির্বাসনকে বুঝে উঠতে যে নীরবতার মধ্যে দিয়ে এ সমস্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়ে থাকে, তার যে কোনো প্রচেষ্টাই যেন এমন যে 'আমাদের পক্ষে মঙ্গল'। সাহিত্য ও ধর্মের মধ্যে নির্বাসন সম্পর্কিত যে ভাবনা প্রকাশিত তাতে করে একথা কি সত্য হয়ে ওঠে না যে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের ভয়ঙ্করতাকে দুর্বোধ্যই করে রাখে। অর্থাৎ নির্বাসন হচ্ছে জাগতিক বিচারে অপূরণীয় প্রকৃতির এবং অসহনীয়ভাবে ঐতিহাসিক। মানুষেরই সৃষ্ট অথচ মানুষেরই উপর চাপিয়ে দেওয়া। মৃত্যুরই মতন অথচ মৃত্যুর যে চূড়ান্ত দাক্ষিণ্য তা বিহীন। আর এই নির্বাসনই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঐতিহ্য, পরিবার এবং ভৌগোলিক আশ্রয় থেকে ছিন্ন করেছে।

নির্বাসন-সম্পর্কিত কোনো কবির কবিতা পাঠের বিপরীতে নির্বাসনে সেই কবির প্রত্যক্ষ মুখোমুখি হবার অর্থটা কী? বাস্তবে নির্বাসনের রসাঞ্জন জৈব সত্তায় অঙ্গীভূত আর তা অদ্ভুত তীব্রতার সঙ্গে টিকে থাকে। বহুবছর আগে, উর্দুভাষার একালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ফৈয়জ আহমেদ ফৈয়জের সাথে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছিলাম। আপন স্বদেশ, পাকিস্তান থেকে তিনি জিয়ার সামরিক শাসনকালে বহিষ্কৃত হন। আর একই ধরনে বিরোধদীর্ণ বৈরুতে তিনি সমাদরও পেয়ে যান। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনেরা স্বভাবতঃই ফিলিস্তিনী। একথা আমি অনুভব করলাম যে যদিও তাঁদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তাঁদের ভাষা, কাব্যরীতি বা জীবন-ইতিবৃত্তে কোনো কিছুই পুরোপুরি মিল খায় না। শুধু ইকবাল আহমেদ নামীয় কোনো একজন সহ-নির্বাসিত যখন বৈরুতে এসে পড়লেন, তখনই মনে হল ফৈয়জ যেন সর্বক্ষণের বিচ্ছেদের ভাবটুকু কাটিয়ে উঠেছেন। একদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমরা তিনজনে বৈরুতের কোনো একটি ভাসমান রেস্তোরাঁয় বসেছিলাম। সেখানে ফৈয়জ কবিতা পাঠ করেন। আমাকে বোঝানোর জন্য যে অনুবাদের পর্ব– কিছুক্ষণ পর থেকেই ফৈয়জ এবং ইকবাল তাতে বিরতি টেনে দেন। রাত বেড়ে চলেছিল অথচ তাতে কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম তাতে কোনো ভাষান্তরের প্রয়োজন ছিল

না। যেন স্বদেশে ফিরে যাবার কোনো মহড়া চলছে আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছিল অদ্ভুত কোনো ব্যঞ্জনা, অবজ্ঞা মেশানো বিরোধিতায় যেন বলে চলেছিল, জিয়া আমরা এখানে রয়েছি। জিয়া যদিও তখনও স্বদেশেই ছিলেন এবং তিনি তাঁদের উল্লসিত কণ্ঠস্বর শুনতেই পাবেন না।

রসিদ হুসেন হলেন ফিলিস্তিনী। তিনি মহান হিব্রু আধুনিক কবি রিয়ালিকের কাব্য আরবিতে অনুবাদ করেন। হুসেনের বাকদক্ষতা ১৯৪৮ পরবর্তীকালে তাঁকে একজন বাগ্মী ও তুলনাবিহীন জাতীয়তাবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠাও এনে দেয়। হিব্রুভাষার সাংবাদিক হিসাবে প্রথমে তিনি তেল-আবিবে কাজ শুরু করেন এবং ইহুদি ও আরব লেখকদের মধ্যে ভাবনার আদান-প্রদানেও সফল হন। নাসেরবাদ এবং আরব-জাতীয়তাবাদের স্বার্থকেও তিনি একই সঙ্গে তুলে ধরেন। কিন্তু দুর্বহ চাপ সহ্য করতে না পেরে একসময়ে তিনি নিউইয়র্কে পাড়ি দেন। একজন ইহুদি মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন আর জাতিপুঞ্জের ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগঠনের কার্যালয়ে কাজকর্ম শুরু করেন। উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের তিনি অহরহ চটিয়ে দিতেন প্রথাবিরোধী ভাবনাচিন্তা ও অসম্ভব সব কথাবার্তা বলে। ১৯৭২ সালে আরব দুনিয়ায় পাড়ি দেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ফিরে আসেন। সিরিয়া এবং লেবাননে নিজেকে তাঁর 'শিকড়বিহীন' বলে মনে হয়, কায়রোতে নিজের অসুখীর উপলব্ধি ঘটে। নিউইয়র্ক তাঁকে আবার নতুন করে আশ্রয় দান করে। কিন্তু একটানা দফায় দফায় মদ্যপান অলসতা তাঁর চলতেই থাকল। যদিও জীবন তাঁর ধ্বংসদশায়, মানুষের জন্য তবুও তিনি অতিথিপরায়ণ। বিপুল মদ্যপানের পরে বিছানায় বসে বসে ধূমপান করতে গিয়ে তিনি মারা গেলেন। সিগারেটের আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশেই রাখা শ্রুতি-ক্যাসেট লাইব্রেরিতে। সে সমস্ত ক্যাসেটগুলোর বেশিরভাগই ছিল কবিদের কবিতাপাঠের প্রতিলিপি। ক্যাসেট টেপের ধোঁয়া তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। ইসরাইলের ছোট একটি গ্রাম, মাসমুসে তাঁর মরদেহ সমাধির জন্য পুনর্বাসিত করা হল। তখনো তাঁর পরিবার সেখানেই বাস করছিলেন।

যে অবস্থা মর্যাদাকে অস্বীকারের বিধান জারি করে, মানুষের আত্ম-পরিচয়কে অস্বীকৃতি জানায় এঁরা এবং অন্যান্য কবি ও লেখকগণ সেখানে মর্যাদা যোগ করেন। তাঁদের থেকে এমন কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নির্বাসনকে সমসাময়িককালে রাজনৈতিক শাস্তি হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। কাজে কাজেই আপনাকে সত্যিকার ভূ-মানচিত্র গড়ে তুলতে হবে নির্বাসনের যে-সাহিত্যচিত্রণ তার সীমানাকে অতিক্রম করেই। প্রথমেই আপনাকে জয়েস ও নবোকভকে সরিয়ে রাখতে হবে। যে সমস্ত অগণিত মানুষদের কথা ভেবেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্থাগুলো তাঁদের জন্য গড়ে উঠেছে– সেই সমস্ত শরণার্থী কৃষকদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে একমাত্র সম্বল যাঁদের রেশনকার্ড আর কোনো সংস্থার দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা। বাড়ি ফিরে যাবার সম্ভাবনা যাঁদের কাছে কোনোদিনই নেই। বিশ্বজনীন নির্বাসনস্থল হিসাবে বিখ্যাত প্যারি হয়ে উঠতে পারে তেমন কোনো রাজধানী। কিন্তু একই সাথে এমন শহরও যেখানে অপরিচিত পুরুষ ও নারী বহু বছর ধরে দুর্দশা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটিয়েছেন। ভিয়েতনামের, আলজিরিয়ার, কম্বোডিয়ার, লেবাননের, সিংহলের অথবা পেরুর মানুষ। আপনাকে

ভাবতে হবে তাহলে মাদাগাস্কার, ব্যাংকক, এবং মেক্সিকো শহরের কথাও। আতলান্তিকের জগত থেকে যতই আপনি দূরে চলে যেতে থাকবেন এবং ভীতিজনক, পরিত্যক্ত, অপচয়ের মাত্রাটিও নৈরাশ্যকর বিপুল সংখ্যায় ততই বেড়ে চলে। এসব অ-নথিকৃত মানুষগুলোর চক্রবৃদ্ধি দুর্ভোগ হঠাৎই হারিয়ে যায় কোনো-একটি প্রকাশযোগ্য ইতিবৃত্তের অভাবে। ভারতে নির্বাসিত মুসলিমদের অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হাইতির মানুষদের, ওশেনিয়ার বিকীনিয়ানদের অথবা আরব ভূখণ্ড-জোড়া ফিলিস্তিনীদের সম্পর্কে ভাবতে যাবার অর্থটা হয়ে দাঁড়ায় গল্পকথনের সেই বিশুদ্ধ আশ্রয়কেন্দ্র আপনাকে পরিহার করতে হবে। আর তার বদলে গণ-রাজনীতির একটি বিমূর্ত ভাবনায় আপনাকে আশ্রয় নিতে হবে। মানুষকে স্বদেশ থেকে ছিটকে দেয় বিদ্ধ করে চুক্তি, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন। বাসে করে অথবা হাঁটিয়ে তাঁদেরকে অন্য কোনো একটি অঞ্চলে ঘেরা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ সমস্ত অভিজ্ঞতা তাহলে প্রকৃতপক্ষে কী অর্থ উপস্থিত করে? সেগুলো কি প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রায়শই অভিসন্ধির দিক থেকেই পুনরুদ্ধারের পক্ষে অসম্ভব নয়?

আমরা পৌঁছে যাই নির্বাসনের সূত্রেই জাতীয়তাবাদ এবং তার অপরিহার্য অনুষঙ্গে। কোনো স্থানে সেখানকার কোনো জনগোষ্ঠীতে এবং কোনো ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির জোরালো ঘোষণাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। আর কোনো ভাষা-সম্প্রদায়ের, সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ দ্বারা সৃষ্ট স্বদেশভূমিকে দৃঢ়ভাবে তা সমর্থন জানায়। এবং এর মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদ নির্বাসনকে প্রতিরোধ করে, উদ্ভূত বিপর্যস্তভাবকে প্রতিহত করে থাকে। জাতীয়তাবাদ এবং নির্বাসনের মধ্যেকার এমন যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া তা হেগেলের প্রভু এবং ভৃত্যের দ্বান্দ্বিকতারই অনুরূপ, পরস্পর দুটি বিপরীতকে জ্ঞাপন ও গঠন করে চলেছে। সমস্ত ধরনের জাতীয়তাবাদই প্রাথমিক পর্বে বিকশিত হয়ে উঠেছে বিচ্ছিন্নতার অবস্থা থেকেই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই, জার্মানি বা ইতালির ঐক্য, আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত যে সমস্ত জাতীয় গোষ্ঠী ছিল, তাঁদের দ্বারাই সংগঠিত হয়ে উঠেছিল নিজেদের ন্যায়সঙ্গত জীবনধারা। জাতীয়তাবাদ যদি বিজয়ী, সফল হয় তবে আপন ন্যায্যতা প্রতিপাদনে দৃষ্টিকে পিছনে প্রসারিত করে। আর একইভাবে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতেও ইতিহাসের একটি নির্বাচিত সূত্রবদ্ধ কাহিনী-রূপ নির্মাণ করে তোলে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে সমস্ত জাতীয়তাবাদেরই প্রবর্তক-জনক রয়েছেন, আধা-ধর্মীয় পুঁথি রয়েছে, তাদের অস্তিত্বের গ্রন্থণ-সূত্র, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যচিহ্ন, স্থিরীকৃত নিজেদের শত্রুদল এবং নায়করাজি। ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ, পিয়ের বোরদ্যু যাকে স্ব-ভাব-প্রকৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন, এমন পুঞ্জীভূত আত্মিক বৈশিষ্ট্য সেটিকে গঠন করে তোলে। রীতি ও প্রথার সুষ্ঠু সামগ্রিক রূপ এবং অভ্যাসের সাথেই বসবাসের স্থায়িত্বের বিষয়টিকেও তা যুক্ত করে তোলে। সফল জাতীয়তাবাদ কালক্রমে সত্যটিকে একমাত্র নিজেদেরই হেফাজতে রাখে, বহির্ভূত সম্প্রদায়গুলির ঘাড়ে (পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদীর অথবা ইউরোপীয় বনাম এশীয়দের ভাষণে) মিথ্যা ও হীনতা ভাবকে চাপিয়ে দেয়। আর ঠিক 'আমরা' এবং 'বহির্ভূত'দের মধ্যবর্তী সীমানার বাইরে বিপজ্জনক সেই সমস্ত অ-অধিবাসীদের ভূখণ্ড। এই হল সেই স্থানটি আদিমযুগে

মানুষকে যেখানে নির্বাসিত করা হত। আর আধুনিক যুগেও মানুষের অপরিমেয় সমষ্টি যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, শরণার্থী ও স্থানচ্যুত মানুষের দল হয়ে।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে গোষ্ঠীবিষয়ক। নির্বাসন হচ্ছে কিন্তু কঠোর অর্থেই গোষ্ঠীর বাইরে থেকে নিঃসঙ্গতার অভিজ্ঞতা। অন্যদের সঙ্গে বাস করে সম্প্রদায়গত জীবনযাত্রায় এই বিয়োগব্যথাটির অনুভব কিন্তু সম্ভব নয়। জাতীয় গৌরবের আচ্ছন্নকারী ও বাগাড়ম্বরের ভাষা, সমষ্টিগত আবেগ, গোষ্ঠীগত সংরাগের কবলে না পড়ে কী করেই বা কোনো মানুষ নির্বাসনের একাকীত্বকে কাটিয়ে উঠতে পারেন? তা হলে একদিকে নির্বাসনের, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের প্রায়শই রক্তলিপ্সু আস্ফালন চূড়ান্ত এমন দুটি বৈপরীত্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সত্যিকার বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য, আঁকড়ে ধরে রাখার মতন কীই-বা টিকে থাকে? জাতীয়তাবাদ ও নির্বাসনের কি কোনো সহজাত ধর্মলক্ষণ আছে? তারা কি কেবলই দুটো বিরোধাত্মক ভ্রান্তি, বিকৃতির প্রকরণ মাত্র?

এ সমস্ত প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর মেলা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই মনে করা হয় যে নির্বাসন ও জাতীয়তাবাদকে একটির সঙ্গে অন্যটিকে যুক্ত না-করে নিরপেক্ষভাবে কোনো আলোচনা করা সম্ভব নয়। সত্যিই তা করে ওঠা যায় না। এর কারণ হল উভয় প্রতিজ্ঞাতেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে সবচাইতে সমষ্টি-আবেগের পুঞ্জ থেকে শুরু করে সবচাইতে ব্যক্তি-আবেগের ব্যক্তিগত পর্যন্ত যা রয়েছে তার সবকিছুই। উপযুক্ত ভাষা মেলা উভয়ের ক্ষেত্রে কদাচিৎই সম্ভব হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের জাতিগত ও সর্বব্যাপক আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কিন্তু সত্যিসত্যিই এমন কিছু নেই যা কিনা নির্বাসনের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মর্মস্থলকে ছুঁতে পারে।

কারণ জাতীয়তাবাদের কাছে নির্বাসন হচ্ছে অসদৃশ আর তা মৌল বিচারে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের একটি অ-ধারাবাহিক অবস্থার মতন। তাঁদের শিকড় থেকে, স্বদেশ থেকে, নিজেদের অতীত থেকে নির্বাসিতরা বিচ্ছিন্ন। সাধারণভাবে কোনো সৈন্যবাহিনী বা রাষ্ট্র নির্বাসিতদের থাকে না, যদিও তাঁরা প্রায়শই সে সমস্ত কিছুর সন্ধান করেন। নির্বাসিতরা সে কারণেই নিজেদের ভগ্ন-জীবনকে পুনঃগঠিত করে তোলার জরুরি তাগিদ নিজেরাই অনুভব করেন। সাধারণভাবে কোনো বিজয়ী 'ভাবাদর্শ' বা পুনর্বাসিত জনসমষ্টির অংশ হয়ে ওঠাটা তাঁরা পছন্দ করেন। নিদারুণ হচ্ছে এটাই যে কোনো বিজয়ী ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত নির্বাসনের পরিবেশের টুকরো টুকরো ইতিবৃত্তকে একটা নতুন-সমগ্রে পুনঃ-একত্রীকরণের ভাবনাটি প্রকৃতপক্ষে দুঃসহ আর একজন নির্বাসিতের পক্ষে সেটি গড়ে তোলাটাও সত্যিসত্যিই আজকের পৃথিবীতে অসম্ভব। পরিণতি দেখুন ইহুদিদের, ফিলিস্তিনি আর আর্মেনিয়ানদেরও।

নোবার হলেন নিঃসঙ্গ একজন আর্মেনিয়ান এবং আমার বন্ধু। তাঁদের পরিবারকে নির্বিচারে হত্যা করার পর তাঁর মা-বাবাকে ১৯১৫ সালে পূর্ব-তুরস্ক ছেড়ে চলে আসতে হয়। তাঁর মাতামহকে জবাই করা হয়। নোবারের মা-বাবা চলে যান আলেপ্পোতে এবং সেখান থেকে কায়রো। ষাট দশকে অ-মিসরীয়দের পক্ষে মিশরে বসবাস অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে চারটি ছেলে-মেয়ে ও মা-বাবাকে একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা বৈরুতে নিয়ে যায়। বৈরুত শহরের বাইরের একটি ছোট বাড়িতে দুটি ঘরে তাঁদেরকে গাদাগাদি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বল্প সময়ের

জন্য সেখানে তাঁরা অনুদানের উপর নির্ভর করে টিকে থাকেন। লেবাননে তাঁদের কাছে কোনো অর্থ ছিল না কাজেই অপেক্ষা করতে থাকেন। আট মাস পরে একটি ত্রাণ সংস্থা গ্লাসগোতে তাঁদের বসবাসের জায়গা স্থির করে দেয় সিয়াটলে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম, সিয়াটল? নোবার হেসে ঘাড় নাড়ালেন। যেন বলতে চাইলেন সিয়াটল তো আর্মেনিয়ার থেকে ভালো, যে জায়গাটি সে কখনোই দেখেননি, অথবা তুর্কীস্থান, যেখানে তাঁদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছিল, অথবা লেবানন যেখানে তিনি এবং তাঁর পরিবারকে সত্যিসত্যিই নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতে হত। পিছনে থেকে যাওয়া, বা না-বেরিয়ে আসার থেকে নির্বাসন কখনো কখনো ভালো। কিন্তু সে তো নিছকই কখনো-কখনো। কেননা কোনো কিছুই নিরাপদ নয়। নির্বাসন হচ্ছে ঈর্ষাতুরতার অবস্থা। যা কিছু আপনি করবেন অন্যের সঙ্গে তাকে ভাগ করে নেবার জন্য কোনো ইচ্ছাই সঠিকার্থে থাকে না। আপনি স্বয়ং আর চারপাশের স্বদেশবাসীদের রেখাচিত্রকে কেন্দ্রে রেখেই নির্বাসিত অস্তিত্বের মধ্য থেকে সামান্যতম আকর্ষণীয় দিকগুলো রূপমূর্তি পরিগ্রহ করে ওঠে। গোষ্ঠীগত সংহতির প্রতি অতিরঞ্জিত একটি বোধ আর যাঁরা আপনারই মতন সত্যিকার দুর্দশাগ্রস্ত, তাঁদের প্রতি, এবং বহিরাগতদের প্রতি তীব্র আবেগভরা শত্রুতাভাব গেড়ে বসে। জায়নভাবনাপন্থী ইহুদি, আরবীয় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে যে বিরোধ তার চাইতে চরম আপোষ-বিরোধী মনোভাব আর কীই-বা হতে পারত? ফিলিস্তিনিরা মনে করেন যে তাঁদেরকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। নির্বাসনেরই কুখ্যাত মানুষজন ইহুদিদের দ্বারা। কিন্তু একথাও ফিলিস্তিনিরা জানেন যে নির্বাসনের পরিবেশই তাঁদের নিজস্ব জাতীয় পরিচয়ের চেতনায় পুষ্টি সঞ্চয় করেছে, বিকশিত হয়ে উঠেছে। রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাই বা বোন না হলেই যেখানে সকলে শত্রু, চর; গোষ্ঠীলাইন কর্তৃক গৃহীত পথ থেকে সামান্যতম সরে যাওয়ার অর্থও সেখানে নিচু ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আনুগত্যহীনতার কাজও।

নির্বাসিতদের ভাগ্যে বোধহয় এটাই সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা নির্বাসিতদের দ্বারা নির্বাসিত হওয়া। নির্বাসিতদের দ্বারা সত্যিকারই উচ্ছেদ হয়ে পুনরায় প্রকৃত উচ্ছেদ-প্রক্রিয়ার মধ্যে বেঁচে থাকা। ১৯৮২ সালে গ্রীষ্মকালে ফিলিস্তিনিরাই ইসরাইলকে প্রশ্ন করেছিল কোন অব্যক্ত তাড়না তাকে চালিত করে চলেছে যে ১৯৪৮-এ ফিলিস্তিনিদের স্বদেশহারা করার পরেও ক্রমাগত শরণার্থী শিবিরগৃহ, লেবাননের শিবির থেকেও তাঁদেরকে বহিষ্কার করে ছেড়েছেন। ইসরাইলী এবং আধুনিক জায়নভাবনাবাদীদের উপস্থিত করা এমন পন্থার মধ্যেই মনে হয় যেন ইহুদিদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার পুনঃনবায়ন ঘটেছে। আর একটি অধিকারহরণ ও ক্ষয়ক্ষতির গল্প পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকুক এমনটি তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। ইসরাইলের জনগণের পক্ষ থেকে ক্রমাগত এমন অসহিষ্ণুতা ফিলিস্তিনিদের জাতীয়তার বোধকে শক্তিশালী করে তুলেছে। আর ছেচল্লিশ বছর ধরে নির্বাসনের মধ্যে থেকে ফিলিস্তিনিরা একটি যন্ত্রণাকর জাতীয় পরিচয়ে যন্ত্রণাকর সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছেন।

নির্বাসিত জীবনের ব্যাহতগতি এবং অ-ধারাবাহিকতার মধ্যে চেতনা-অনুকৃতির যে তাগিদ ব্যক্ত হয় মহম্মদ দারবিশের প্রথমদিকের কবিতায় তা খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁর বেশকিছু সৃষ্টিকর্ম যেন হয়ে উঠেছে ক্ষয়ক্ষতির গীতিকবিতাকে অনন্ত-ভবিষ্যতের জন্য

স্থগিত করে রাখা প্রত্যাবর্তনের নাটকে রূপান্তরকরণের মহতী কোনো-এক প্রচেষ্টা। এভাবেই স্বদেশ-হীনতার চেতনাকে একটা অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ কর্তব্যের তালিকায় তিনি চিত্রিত করে তোলেন—

কিন্তু আমিই সেই নির্বাসিত।
তোমার চোখ দিয়ে আমাকে আবদ্ধ করো।
তুমি যেখানে আমাকে সেখানেই নিয়ে চলো—
তুমি যাই-ই হওনা কেন গ্রহণ করো আমাকেও।
আমার সত্তায়, মুখাবয়বে রঙ ফিরিয়ে আনো,
আর শরীরের উষ্ণতাও,
হৃদয় এবং চোখে আলোক-দ্যুতি।
রুটি আর ছন্দের স্পন্দন,
ধরিত্রীর উপলব্ধি— হে মাতৃভূমি।
তোমার চোখে-চোখে আমাকে রক্ষা করো।
দুঃখের প্রাসাদ থেকে স্মৃতিচিহ্নের মতন আমায় তুলে নাও।
আমার দুঃখযন্ত্রণা থেকে কাব্যের মতন আমাকে গ্রহণ করো।
তাহলেই আমাদের সন্ততিরা ফেরার ভাবনা স্মরণ করবে।

সংযুক্তির অভাবের মধ্যে নিহিত হয়ে আছে নির্বাসনের করুণ বেদনা, ধরিত্রীর সন্তুষ্টি আর সম্পৃক্ত হয়ে ওঠার তাগিদ। স্বদেশে ফিরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যোসেফ কনরাডের 'অ্যামি ফস্টার' সম্ভবত এ-যাবৎ নির্বাসন বিষয়ে লেখাগুলোর মধ্যে সব থেকে আপোষ-বিরোধী উপস্থাপনা। কনরাড নিজেকে ভাবতেন পোল্যান্ড থেকে নির্বাসিত। আর প্রায় সমস্ত লেখাই তাঁর (একইভাবে তাঁর জীবনও) বহন করে চলেছে, অনুভূতিশীল একজন বাস্তুত্যাগীর বদ্ধ আবেশের, নিজের ভাগ্য নিয়ে নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সন্তোষজনক যোগাযোগ গড়ে তুলবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য। 'অ্যামি ফস্টার' একান্তভাবেই নির্বাসনের সমস্যায় নিবিষ্ট। এতখানিই হয়তো নিবিষ্ট যে কনরাডের বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে সেটি পড়ে না। দৃষ্টান্তরূপে বলতে গেলে, গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের এটুকুই দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ। ইয়াংকো গুরাল পূর্ব-ইউরোপের একজন কৃষক। আমেরিকা যাবার পথে ব্রিটিশ উপকূল থেকে একটু দূরে তিনি জাহাজডুবির কবলে পড়ে যান :

> 'একজন নিরুদ্দিষ্ট, অসহায়, অবোধ্য আগন্তুক এবং কোনো-এক রহস্যময় উৎস থেকে উদ্ভূত হিসাবে, পৃথিবীর কোনো অজ্ঞাত কোণে আবিষ্কার করে ওঠাটা সত্যিই কোনো একজন মানুষের পক্ষে দুঃসহ পীড়াদায়ক। পৃথিবীর সমস্ত আদিম অঞ্চলে, সমস্ত দুঃসাহসিক জাহাজডোবা অভিযাত্রীদের পক্ষেও এতসব কিছু থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয় তাঁদের কেউই এমন বিপন্ন ছিলেন না। যার সম্পর্কে আমি বলছি তাঁকে যেমন সহ্য করতে হয়েছে, তেমন ভাগ্য বিড়ম্বনা, এমন ডাহা মর্মন্তুদ অবস্থা কখনোই তাঁদের কাউকেই সহ্য করতে হয়নি। যেমন কিনা, সমুদ্র-কর্তৃক পরিত্যক্ত অভিযাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্পাপ এই মানুষটি সহ্য করে চলেছেন...'

ইয়াংকো বাড়ি ছেড়েছিলেন কারণ জীবনধারণের জন্য সেখানে তাঁর উপরে বড্ড বেশি চাপ পড়ছিল। আমেরিকা বহু প্রতিশ্রুতি হাজির করে তাঁকে প্রলুব্ধ করে, যদিও তিনি ইংল্যান্ডেই যাত্রা শেষ করেন। আর ইংল্যান্ডেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি সে দেশের ভাষা বলতে পারেন না। ভয় পান যে সবাই তাঁকে ঠিক মতন বোঝেন না। শুধু থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটেন যে অনাকর্ষণীয় কৃষকের মেয়েটি, সেই 'অ্যামি ফস্টার' তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁরা পরস্পরকে বিয়ে করেন আর একটি শিশুও জন্ম নেয়। কিন্তু ইয়াংকো অসুস্থ হয়ে পড়েন। সন্ত্রস্ত, বিচ্ছিন্ন অ্যামি তাঁকে পরিচর্যা করতে অস্বীকৃতি জানান। শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনি চলে যান। এই পরিত্যাগের ফল দুর্দশাগ্রস্ত ইয়াংকোর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে তোলে, যেটি কনরাডের বহু নায়কদের মৃত্যুর অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। যে মৃত্যু গুঁড়িয়ে-দেওয়া বিচ্ছিন্নতা এবং পৃথিবীর উদাসীনতার সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠ। ইয়াংকোর পরিণতিটুকু নিঃসঙ্গতা এবং নৈরাশ্যের চরম দুর্বিপাক হিসাবেই বর্ণিত হয়েছে।

ইয়াংকোর দুরবস্থা মর্মন্তুদ। একজন পরদেশী সর্বদাই তাড়িত এবং একটা অনধিগম্য সমাজে তিনি একাকী। কিন্তু কনরাডের নিজস্ব নির্বাসন ইয়াংকো এবং অ্যামির মধ্যেকার পার্থক্যকে বাড়িয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে কারক উপাদান হয়ে উঠেছে। ইয়াংকো স্বচ্ছন্দগতি, সহজ, উজ্জ্বল চোখ। সেখানে অ্যামি গুরুভার, নিষ্প্রভ আর জড়বুদ্ধির। তিনি যখন মারা গেলেন তখন এমনই যেন ঘটেছে যে ইয়াংকোর প্রতি পূর্বের সেই সহৃদয়তা যা আসলে তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্যই দেখানো আর এভাবেই মারাত্মক বিপদের ফাঁদে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ইয়াংকোর মৃত্যু রোমান্টিক। পৃথিবী তো রুক্ষ আর অনুপলব্ধ। কেউই তাঁকে বুঝে উঠতে চান না, এমনকি যে মানুষটি তাঁর একান্ত কাছের সেই অ্যামিও না। এমন স্নায়ুপীড়াদায়ক নির্বাসনের আতঙ্ককে কনরাড গ্রহণ করেন আর তা থেকে একটা নান্দনিক তত্ত্বও সৃষ্টি করেন। কনরাডের জগতে কেউই কিছু বুঝতে, আদান-প্রদান করে উঠতে পারে না। অথচ ভাষার সম্ভাব্যতার এমন আশ্চর্যজনক প্রকৃতির মৌল-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যোগাযোগের বিশদ প্রচেষ্টাকে তিনি নাকচ করে দেন না। তাঁর সমস্ত গল্পই এমন নিঃসঙ্গ মানুষদের নিয়ে, যাঁরা প্রচুর কথা বলে যান (কারণ মহৎ আধুনিকতাবাদীদের মধ্যে কনরাডের থেকে সত্যিকারই আর কে বেশি স্বচ্ছন্দ-বাক্‌ ও বিশেষণিক) আর অন্যকে অভিভূত করে তোলার এমন উদ্যোগ তা কমায় না, বরং বাড়িয়ে তোলে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার প্রারম্ভিক বোধটিকেই। কনরাডের প্রতিটি নির্বাসিত সত্তাই ভয় পান এবং তাঁরা যেন দণ্ডিত এই সীমাহীন কল্পনাবৃত্তির কারণেই। বলতে গেলে অসংবেদ্য দৃষ্টিক্ষেপের সাহায্যে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর একটা প্রদর্শনী আলোকিত হয়ে উঠেছে।

নির্বাসিতরা বিরক্তির দৃষ্টিতে অ-নির্বাসিতদেরকে দেখেন যেহেতু তাঁরা নিজেদের পরিবেষ্টনির মধ্যেই বাস করেন। এটুকু আপনি অনুভব করুন যে একজন নির্বাসিত সর্বদাই স্থানচ্যুত। কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করা, সেখানে থাকা, এবং বসবাস করা আর এমন একটা উপলব্ধি যে কমবেশি যাই হোন-না-কেন আপনি চিরদিনের জন্য স্থানভুক্ত— এমন যে ভাবনা তা হলে কেমন দাঁড়ায়?

একথা যদিও সত্যি যে স্বদেশে ফেরার ক্ষেত্রে কাউকে বাধাদান করা মানেই সে হয়ে দাঁড়ায় নির্বাসিত, তবুও পার্থক্য তো কিছু গড়ে তোলাই যায়– নির্বাসিত, দেশত্যাগী এবং দেশান্তরীর মাঝখানে। বহুযুগব্যাপী বিতাড়নের যে প্রথা তা থেকেই নির্বাসন উদ্ভূত হয়েছে। একবার বিতাড়নের অর্থই হচ্ছে নির্বাসিত দুর্দশাগ্রস্ত, ব্যতিক্রমী জীবন কাটিয়ে যাবেন। বহিরাগতের কলঙ্কচিহ্ন নিয়ে। অন্যদিকে শরণার্থীরা কিন্তু বিশ শতকের রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট। কার্যত শরণার্থী শব্দটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো-একটা রাজনৈতিক প্রত্যয়ে বিশ্বাসী, নির্দোষ এবং হতভম্ব মানুষের দল, যাঁরা জরুরি আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রত্যাশী, আর যেখানে নির্বাসনের সাথে সাথেই তাঁরা সহ্য করে চলেন, আমার বিবেচনায় নিঃসঙ্গতা আর আত্মিক-যন্ত্রণার স্পর্শ।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো কারণে সাধারণত একজন দেশত্যাগী স্বেচ্ছায় কোনো একটি অজানা দেশে বাসের জন্য চলে যান। হেমিংওয়ে ও ফিটজেরাল্ডকে ফ্রান্সে বাস করতে বাধ্য করা হয়নি। নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছেদের ভাগীদার হন নির্বাসনের মধ্যে দেশত্যাগীরাও, তবুও পীড়নের শাস্তি তাঁদেরকে সহ্য করতে হয় না। বাস্তুত্যাগীরা কিন্তু ভোগ করেন একটি দ্ব্যর্থক অভিজ্ঞতার জীবন, পারিভাষিক বিবেচনায় নতুন কোনো একটি দেশে যিনিই বসবাস করতে যান তিনিই হলেন বাস্তুত্যাগী। এ ব্যাপারে পছন্দের বিষয়টি নিতান্তই সম্ভাবনার। উপনিবেশিক আমলা, ধর্ম-প্রচারক, প্রযুক্তিবিদ, ভাড়াটে সৈন্য, বিদেশে সামরিক উপদেষ্টা সকলেই একার্থে পরবাসী যদিও তাঁদেরকে বিতাড়ন করা হয়নি। আফ্রিকা মহাদেশে শ্বেতাঙ্গরা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অংশে শ্বেতাঙ্গরা হয়তো-বা কোনো একসময়ে অভিবাসী ছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতিগঠনকারী বিবেচনা সূত্রে নির্বাসিত তকমাটি তাঁদের ক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নির্বাসিতের জীবনের বেশিরভাগটা জুড়ে থাকে বিপর্যয়কারী ক্ষতিকে পূরণ করার লক্ষ্যে নতুন একটা জগৎ গড়ে তোলা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণের কাজটি। বহু নির্বাসিতই যে দাবাড়ু, ঔপন্যাসিক, রাজনৈতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবী এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নেই। এ সমস্ত পেশার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই বস্তুগত বিনিয়োগের প্রয়োজনটি যৎসামান্য, আর যথেষ্ট মূল্য আরোপ করা হয়ে থাকে গতিময়তা ও দক্ষতার ব্যাপারে। নির্বাসিতের নতুন জগতটি যৌক্তিক বিচারে যথেষ্ট হলেও তার অস্বাভাবিকতা ও অবাস্তবতা উপন্যাসেরই মতন। গিয়র্গ লুকাচ 'উপন্যাসের তত্ত্ব' বইখানিতে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি দিয়েছেন যে, সাহিত্যরূপ হিসেবে উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উদ্ভট কল্পনার অবাস্তবতা থেকে, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় আশ্রয়হীনতারই শিল্পরূপ। লুকাচ লিখেছেন ধ্রুপদী মহাকাব্য কোনো স্থায়ী নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত, মূল্যবোধ সেখানে স্বচ্ছ, পরিচয় সুস্থিত, জীবন অপরিবর্তনীয়। ইউরোপীয় উপন্যাস অভিজ্ঞতার বিচারে সুনির্দিষ্টভাবে বিপরীত মেরুতে অধিষ্ঠিত। পরিবর্তনশীল একটি জগৎ-ভূমি– যেখানে ভ্রমণশীল ও উত্তরাধিকার-বঞ্চিত একটি মধ্যশ্রেণীই হলেন নায়ক কিংবা নায়িকা। চিরদিনের জন্য পেছনে ফেলে-আসা সেই পুরনোরই কতকটা অনুরূপ একটি নতুন জগৎ তাঁরা নির্মাণ করতে চাইছেন মহাকাব্যে কিন্তু এমন অন্য আরেকটি জগৎ নেই, শুধু রয়ে গেছে বিরাজমান যে জগৎ তারই পরিণত রূপটি। অডেসাস ইথাকায় ফিরে আসেন

বহুবছরব্যাপী পরিভ্রমণের পরে, এ্যাকিলা মারা যান কারণ আপন অদৃষ্টকে এড়াতে পারেন না। অন্যদিকে উপন্যাস টিকে থাকে যেহেতু বুর্জোয়া ভবিষ্যবাদীদের, ভ্রামণিকদের, নির্বাসিতদের বিকল্প জগৎ তো থাকতেও পারে।

যতই সাফল্য জুটুক না কেন, নির্বাসিতরা সবসময়েই উৎকেন্দ্রিক, নিজেদের বৈসাদৃশ্যকে (যদিও মাঝেমধ্যেই সেটিকে তাঁরা কাজে লাগান) একরকম এতিমাবস্থা বলে বিবেচনা করেন। আধুনিকতার সমস্ত কিছুর মধ্যেই বিচ্ছেদকে দেখতে পারার অভ্যাসকে সত্যিকার স্বদেশহীন কোনো মানুষ কৃত্রিমতা ও কেতাদুরস্ত মনোভাবের প্রদর্শন হিসাবে বিবেচনা করেন। শক্ত মুঠিতে বৈসাদৃশ্যকে হাতিয়ারের মতন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাথে ব্যবহার করে নির্বাসিতরা ঈর্ষার সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকৃতি জানানোর অধিকার মেনে নেবার জন্য জেদ ধরে থাকেন।

সাধারণত এ বিষয়টি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে আপোষ-বিরোধী মনোভাবে সহজে যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। স্বেচ্ছাচারিতা, অতিরঞ্জন, অতিকঠোর মনোভাব, এ সমস্ত কিছুই নির্বাসিতের বৈশিষ্ট্য-সূচক প্রকরণ পদ্ধতি। সমগ্র পৃথিবী যেন আপনার দৃষ্টিকোণটি গ্রহণ করে, এবং সেটিকেই আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলুন যেহেতু আপনি নিজেও সত্যি সত্যি সেটি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। সর্বোপরি এটি তো আপনার নিজেরই।

নির্বাসনের মধ্যে সৃষ্টির সাথে স্থৈর্য ও প্রশান্তির যোগাযোগ একেবারেই সবার শেষে। নির্বাসনের শিল্পীকুল পরিষ্কারভাবে নিরানন্দ, আর তাঁদের অনমনীয়তা নিজেদের মহৎ রচনাকর্মেও পরোক্ষভাবে ঢুকে পড়ে। 'দি ডিভাইন কমেডি'তে দান্তের দর্শন বিশ্বজনীনতা এবং খুঁটিনাটির বিচারে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হলেও স্বর্গসুখদায়ী যে শান্তি স্বর্গলোকে অর্জিত হয়েছে তার মধ্যেও ইনফারনোতে বিধৃত শাস্তিপরায়ণতা ও দণ্ডদানের কঠোরতার ছাপ রয়ে গেছে।

ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত দান্তের মতন নির্বাসিত ছাড়া আর কেই-বা অমরত্বকে পুরনো হিসাব মীমাংসার ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করবেন?

আপন শৈল্পিকবৃত্তিতে প্রেরণা সঞ্চারে জেমস্ জয়েস নির্বাসনে বসবাসকেই বেছে নেন। ফলপ্রদায়ী অথচ গা-ছমছম করে ওঠে এমনই কৌশলে জয়েস আয়ারল্যান্ডের সাথে একটা বিরোধ গড়ে তোলেন আর তা বাঁচিয়ে রাখেন অন্তরঙ্গ যা কিছু রয়েছে যে সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে কঠোরতম প্রতিবাদকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে— তাঁর জীবনীগ্রন্থে রিচার্ড এলম্যান তো এমনটাই দেখিয়েছেন। এলম্যান বলছেন,— যখনই স্বদেশভূমির সঙ্গে আপন সম্পর্কের উন্নতির বিপদ দেখা দিত, জয়েস একটা নতুন বিষয় খুঁজে নিতেন, সম্পূর্ণ অনাপোষী নিজের মনোভাবকে শক্তিশালী করার জন্য এবং স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির সঠিকতাকে পুনরায় জোর দিয়ে ঘোষণা করার জন্য। একটি চিঠিতে একবার তিনি যা বলেছিলেন— সেই 'একাকীত্ব' ও 'বন্ধুহীনতার' জীবনরূপই জয়েসের উপন্যাসের উপজীব্য। আর যদিও নির্বাসনকে জীবনধারা হিসাবে বেছে নেওয়ার ঘটনা কদাচিৎই ঘটে থাকে, জয়েস কিন্তু নিখুঁতভাবেই সেই ফলশ্রুতিকে বুঝতে পেরেছিলেন।

নির্বাসিত জয়েসের সাফল্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে তোলে বিষয়টির হৃদকেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা প্রশ্নটিতেই— এতটাই গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত কি নির্বাসন, যে তার যে-কোনো

ধরনের যন্ত্রবৎ ব্যবহার মানেই ব্যাপারটাকে গুরুত্বহীনতায় পর্যবসিত করে ফেলা? দুঃসাহসিক অভিযান, শিক্ষা অথবা আবিষ্কারের সাহিত্যধারার পাশাপাশি নির্বাসনের সাহিত্যও কেমন করে স্থান গড়ে নিয়েছে, মানব অভিজ্ঞতায় স্বীকৃত-ক্ষেত্র নির্মাণ করে নিয়েছে? এও কি সেই একইরকম নির্বাসন যা নাকি সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থেই ইয়াংকো গুরালকে হত্যা করে আর বিশ শতকের নির্বাসন ও জাতীয়তাবাদের মধ্যেকার বহুমূল্য প্রায়শই অমানুষোচিত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে? অথবা এটি কি অন্য আরেকটি সদাশয় বৈচিত্র্য মাত্র?

নির্বাসন সম্পর্কিত সমকালের আকর্ষণের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালালে খুঁজে পাওয়া যাবে এক ধরনের বর্ণবিহীন ধারণা– অনির্বাসিতরা যেখানে নির্বাসিতদের উপকারার্থে যার অংশভাগী হতে পারেন আর তা হচ্ছে নিজেদেরই দায়মোচনকারী এমনই বিষয়ের বিবেচনায়। এমন ভাবনার মধ্যে যে কিছুটা ন্যায়সঙ্গতি ও সত্য রয়ে গেছে সে-কথা তো স্বীকার করে নিতেই হয়। মধ্যযুগের ভ্রমণশীল পণ্ডিতবর্গ অথবা রোমান সাম্রাজ্যের শিক্ষিত গ্রীক-ক্রীতদাসদের মতনই, নির্বাসিতরা আর তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী জনেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে তোলেন। স্বভাবতই আমরাও মনঃসংযোগ করব আমাদের মধ্যে উপস্থিত যারা আলোকদায়ী তাঁদের সেই দিকটার উপরেই, তাঁদের দুঃখদুর্দশা, তাঁদের চাহিদার প্রতি নয়। কিন্তু আধুনিক গণ-স্থানচ্যুতির বিবর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিচার করলে, আবশ্যিকভাবে হৃদয়হীন এই জগতে, একক কোনো নির্বাসিতের স্বদেশহীনতার নিদারুণ ভাগ্যকে স্বীকৃতিদানে আমাদের বাধ্য করে তোলে।

সিমোন ভেইল এক-প্রজন্ম আগেই নির্বাসনের এই উভয়মুখী সংকটকে যতখানি সংক্ষেপে প্রকাশ করে ওঠা সম্ভব ঠিক তেমনভাবেই হাজির করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, একটা কোথাও স্থিত হয়ে বাঁচাটা মানব-হৃদয়ের হয়তো-বা সব থেকে জরুরি অথচ সব থেকে কম-স্বীকৃত একটা প্রয়োজন। যদিও ভেইল এটুকুও দেখতে পেরেছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধের এই যুগে উন্মূলন, বিতাড়ন এবং সার্বিক-গণ-নিধনের সর্বোত্তম সমাধানগুলোও প্রায় সমান মাত্রায়ই বিপজ্জনক, সেগুলো যেভাবে নিহিত অর্থে সমাধান। এগুলোর মধ্যে রাষ্ট্র অথবা আরো সঠিকার্থে বলতে গেলে রাষ্ট্রবাদ সব থেকে প্রতারণাকর, যেহেতু রাষ্ট্রের আরতি অন্য সমস্ত রকম মানবীয় সম্পর্কগুলোকে উচ্ছিন্ন করে তুলতে তৎপর।

নির্বাসিতের জীবনের অবস্থার গভীরে যে সার্বিক জটিলতা ও বাধ্যতাগুলো রয়েছে, ভেইল সে সমস্ত চাপকে আমাদের সামনে নতুন করে উন্মোচিত করেছেন। আধুনিক যুগে আমরা ট্রাজেডি সম্পর্কে যে উপলব্ধিতে পৌঁছাই, আমার ভাবনা তারই কাছাকাছি। বিচ্ছিন্নতা ও স্থানচ্যুতির ঘটনা সেখানে রয়ে গেছে যেগুলো আবার একরকম আত্মরতিজ মর্ষকামের জন্ম দেয়। কোনো উন্নতি ঘটানো, অন্য সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে প্রথাদিকে গ্রহণ, সম্প্রদায়-গঠনের সমস্ত প্রচেষ্টায় বাধা দান করে। নির্বাসনের এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্বাসনের প্রতি অন্ধভক্তি গড়ে তোলে, আর এমন সমস্ত অনুশীলন, দায়বদ্ধতার সমস্ত সূত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। বেঁচে থাকাটাই এমনভাবেই ঘটে যেন যা কিছু আপনার চারপাশে রয়েছে সে সমস্তই

ক্ষণস্থায়ী এবং হয়তো-বা মামুলিও। বদমেজাজ ও বিশ্বনিন্দাবৃত্তির শিকার হয়ে পড়তে হয় এবং একই সাথে কলহপ্রিয়তা এবং প্রেমশূন্যতারও। সাধারণভাবে নির্বাসিতদের উপরে চাপ থেকে যায় দল, জাতীয় আন্দোলন ও রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠার। নির্বাসিতদের কাছে উপস্থিত হতে থাকে একগুচ্ছ নতুন সম্পর্ক। এর ফলে নতুন আনুগত্য রূপ নেয়। কিন্তু ক্ষতিও একটি ঘটে যায়। আর তা হচ্ছে, সমালোচনামূলক অবস্থান, বৌদ্ধিক রসদ ও নৈতিক সাহসের।

এমন কথাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে যে নির্বাসিতদের রক্ষণাত্মক জাতীয়তাবাদ প্রায়শই আত্মসচেতনতার জন্ম দেয়। কিন্তু তা সমমাত্রায়ই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় প্রকরণেরও উদ্ভব ঘটায়। নির্বাসনের কালের এমন সব পুনর্গঠনকারী কর্ম-পরিকল্পনাগুলো জাতিকে সমবেত করার (এই শতাব্দীতে ইহুদি ও ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে কথাটা সঠিক) লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে তোলে। জাতীয় ইতিহাসের নির্মাণ, প্রাচীন ভাষার পুনরুজ্জীবন, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার মতন কাজকর্মগুলোকে। এ সমস্ত কাজকর্ম যেমন কখনো কখনো সোচ্চার জাতিকেন্দ্রিকতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে, তেমনি অন্যদিকে একরূপতার অনুসন্ধানেও ব্রতী করে তোলে।

সেজন্য আবশ্যিকভাবেই আমি নির্বাসনকে কোনো সুবিধা বলি না, বরং যে সমস্ত গণসংস্থা আধুনিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের বিকল্প বলে থাকি। কোনোভাবেই নির্বাসন পছন্দের ব্যাপার নয়– নির্বাসনেই আপনাকে জন্ম নিতে হয়, অথবা আপনার কপালে নির্বাসন ঘটে যায়। অনেক কিছু তবুও তো শেখার থেকে যায়, যদি কিনা নির্বাসিত সীমান্তরেখায় বসে থেকে কোনো ক্ষতের শুশ্রূষায় সময় না কাটাতে চান– তাহলে তো নারী বা পুরুষ উভয়েই, অবশ্যই অনুশীলন করতে থাকবেন (ইচ্ছাপূরক বা গোমড়ামুখো নয়) দ্বিধাগ্রস্ত এক প্রকার আত্মবাদিতার।

বিখ্যাত ইহুদি জার্মান দার্শনিক ও সমালোচক থিওডোর অ্যাডোর্নোর রচনায় সম্ভবত এমন আত্মবাদিতার সব থেকে নির্মম উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। অ্যাডোর্নোর মহাসৃষ্টি 'মিনিমা মর‍্যালিয়া' আত্মজীবনীটি নির্বাসনের কালপর্বে লিখেছিলেন। বইটির উপ-শিরোনাম হল, 'অঙ্গহানিকর একটি জীবনের ভাবনা-চিন্তা'। যাকে তিনি শাসিত বলে চিহ্নিত করেছেন, নির্মমভাবে তাকে বিরুদ্ধতা জানিয়েছেন। অ্যাডোর্নো সমগ্র জীবনকে দেখেছিলেন, তৈরি কোনো রূপের মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে থাকা পূর্ব-নির্দিষ্ট ধরনের 'গৃহ' হিসাবে। যুক্তি হাজির করেন তিনি যে কোনো মানুষ যা-কিছু বলেন বা চিন্তা করেন, এমনকি যেসব বস্তু তিনি ভোগ বা অধিকার করে থাকেন সে সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত বিবেচনায় এক একটি পণ্যবিশেষ। ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য ভাষণ, বস্তুনিচয় বিক্রয়ের নিমিত্ত। এমন অবস্থাকে অস্বীকারের ব্রতই হচ্ছে নির্বাসিতের বৌদ্ধিক লক্ষ্য। অ্যাডোর্নোর ভাবনারাজি এমন বিশ্বাস দ্বারা জ্ঞাপিত যে আজকের দিনে একমাত্র স্বদেশ খুঁজে পাওয়া যাবে সত্যিসত্যিই শুধুই রচনাকর্মে, যদিও তাও ভঙ্গুর ও ক্ষতিপ্রবণ। অন্য একটি জায়গায় তিনি বলেছেন– 'গৃহ হচ্ছে অতীতের। গৃহের অদৃষ্ট বহুদিন আগেই প্রযুক্তির পরিব্যাপ্ত বিকাশের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল। আর তা ইউরোপীয় নগরগুলোতে বোমাবর্ষণ, শ্রম ও বন্দিশিবির এবং ঘাতকদেরও পূর্ববর্তী। এগুলো এখন

খাবারের পুরনো পাত্রের মতনই ছুঁড়ে ফেলে দেবার সামগ্রী।' সংক্ষেপে বললে, অ্যাডোর্নো গভীর পরিহাসের সঙ্গে জানাতে চাইছেন– 'বিষয়টি নৈতিকতার অংশবিশেষ, কারোর গৃহই স্বচ্ছন্দে টিকে থাকবে না।'

অ্যাডোর্নোকে অনুসরণ করলে স্বদেশ থেকে দূরত্বে গিয়ে, নির্বাসনের নির্লিপ্তি নিয়েই স্বদেশের প্রতি তাকাতে হবে। নানান প্রকৃতির ধারণা ও ভাবনারাশি, আর সেগুলো সত্যিকার অর্থে যা কিছুকে সৃষ্টি করে তোলে তাদের মধ্যেকার অনৈক্যগুলোকেও অনুশীলনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্বদেশ ও ভাষাকে যদি স্বতঃসিদ্ধ বলে ভেবে নিই তাহলে সেগুলো মৌলবর্গে রূপ পেয়ে যায়, আর তাদের নিহিত অর্থের ভাবনাগুলো অন্ধতা ও গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। এমন কথা নির্বাসিতরা জানেন যে বৈষয়িক এই অনিশ্চিত জগতে স্বদেশ সবসময়েই ক্ষণস্থায়ী। সীমান্ত ও পাঁচিলগুলো পরিচিত ভূখণ্ডের মধ্যে আমাদের আটকে রাখে। জেলখানাও সেগুলো হয়ে উঠতে পারে আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যুক্তি ও প্রয়োজনের বাইরেই সেগুলোকে বলবৎ রাখা হয়। চিন্তায় এবং অভিজ্ঞতায় নির্বাসিতরা সীমান্তরেখা পেরিয়ে যান, প্রতিরোধকে ভেঙে ফেলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্যাকসনীর সন্ন্যাসী সেন্ট ভিকটরের হুগো ভয়ঙ্কর প্রকৃতির অনুপম এ লাইনগুলো লিখেছিলেন :

> "অনুশীলিত মনের শেখার পক্ষে এটি বিপুল উৎকর্ষের একটি সূত্র। তিল তিল করে, অর্থাৎ প্রথমে অদৃশ্য এবং স্বল্পস্থায়ী বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসতে এবং পরের দিকে একই অভ্যাসের মাধ্যমে সেগুলোকে পুরোপুরিভাবে বর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠা যায়। যে মানুষ স্বদেশকে এখনও প্রিয় ভাবেন, তিনি আবেগপ্রবণ শিক্ষার্থী। প্রতিটি ভূখণ্ডই যার কাছে আপন স্বদেশের মতন, তিনি ইতিমধ্যেই সমর্থ জন। কিন্তু তিনিই সম্পূর্ণ যাঁর কাছে সমগ্র পৃথিবীটাই বিদেশ ভূমির মতন। আবেগপ্রবণ মানুষটি পৃথিবীর একটিমাত্র স্থানেই তাঁর ভালোবাসা নিবদ্ধ করেছেন, সমর্থ মানুষটি আপন ভালোবাসাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর পরিপূর্ণ মানুষটি তাঁর ভালোবাসাকে নির্বাপিত করে ফেলেছেন।"

এরিক এ্যাভারবাখ বিশ শতকের সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত, যুদ্ধের বছরগুলো তিনি নির্বাসিত হিসেবে তুরস্কে কাটিয়েছেন। এই অনুচ্ছেদটি তিনি আদর্শ রূপে ব্যবহার করেছেন সেই মানুষের জন্য যিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক সীমানাকে অতিক্রম করে উঠতে আগ্রহী। কেবলমাত্র এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই একজন ঐতিহাসিক মানবিক অভিজ্ঞতা, তার লিখিত বিবরণ, এবং সেগুলোর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করতে পারেন। অন্যথায় তিনি জ্ঞানার্জনের যে স্বাধীনতা তার থেকে বর্জন ও পক্ষপাতের প্রক্রিয়ায় বেশি দায়বদ্ধ হয়ে পড়বেন। লক্ষ্য করুন যে হুগো দু-দফায় এটুকু পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে সমর্থ ও পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নির্লিপ্তি আয়ত্ত করেন, আসক্তির মধ্য দিয়ে চলেই, কিন্তু তাকে অস্বীকার করে নয়। একজন মানুষের ক্ষেত্রে নির্বাসন, স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্কের, ভালোবাসার অস্তিত্ব হিসাবে বর্ণিত হয়। সমস্ত নির্বাসিতের পক্ষেই যে কথা সত্যি তা হল, স্বদেশের জন্য ভালোবাসা হারিয়ে যায় না, বরং উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যেই সেই হারানোটা অন্তর্গত থেকে যায়।

অভিজ্ঞতার বিবেচনা থেকে বললে সেগুলো প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল। তাহলে, কী তাদের নোঙরবদ্ধ করে রাখে? সেগুলোর মধ্য থেকে কী-ই বা আপনি রক্ষা করে

চলবেন? বিসর্জনই বা দেবেন কাকে? স্বাধীনতা ও নির্লিপ্তিকে যিনি আয়ত্ত করে উঠেছেন, স্বদেশ যাঁর কাছে প্রিয় কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা সেই মধুরতাকে আস্বাদন অসম্ভব করে রাখে একমাত্র তেমন ব্যক্তিই এ সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন (তেমন একজন মানুষ এটুকুও দেখতে পারবেন যে মোহ ও অন্ধবিশ্বাসে সজ্জিত যে প্রতিকল্প তা থেকে সন্তোষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব)।

দৃষ্টিভঙ্গির নিষ্কৃতিহীন ভয়ালতার কাছে বিষয়টি মনে হতে পারে কোনো নির্দেশের মতন, আর উদ্যম ও মেজাজকে প্রফুল্ল রাখার পক্ষে চিরতরে অনুমোদন-অযোগ্য। কিন্তু না, বাধ্যতাজনকভাবে তা নয়। নির্বাসনের আনন্দ বিষয়ে বলাটা হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, তবুও কোনো কোনো অবস্থাতে বলার মতন কিছু কিছু বিষয়ও থেকে যায়। সমগ্র পৃথিবীটাকে বিভুঁই দেখার ব্যাপারটা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে একটা মৌলিকতা গড়ে দেয়। প্রধানত বিশেষ একটি সংস্কৃতির বিষয়ে। একটি পরিবেশ, একটি স্বদেশ সম্পর্কেই বেশির ভাগ মানুষ অবহিত থাকেন। অথচ নির্বাসিত অন্তত দুটির বিষয়ে অবহিত। দর্শনের এমন বহুত্বের ফলে সচেতনতার যুগপৎ মাত্রাগুলোকে জন্ম দেয়। সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে একটি বাগ্‌বিধি ধার নিয়ে বলতে হয়, এমন সচেতনতা হচ্ছে সংমিশ্রিত সুর।

একজন নির্বাসিতের ক্ষেত্রে জীবনাভ্যাস, প্রকাশরীতি এবং নতুন পরিবেশে কাজকর্ম সবই আবশ্যিকভাবেই অন্য পারিপার্শ্বিকে তাঁর যে স্মৃতি তার বিপরীত বলে অনুভূত হয়। এদিকের বিবেচনায় নতুন ও পুরনো পরিবেশ উভয়ই চিত্রবৎ জীবন্ত আর একইসাথে সুর মিশ্রণও ঘটিয়ে চলেছে। এমন উপলব্ধির মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ থেকে যায়। বিশেষ করে নির্বাসিত যদি পারস্পরিক মিশ্রিত স্বর বিষয়ে সচেতন থাকেন। এর ফলে তার ক্ষেত্রে প্রথানুগ-বিচার বিবেচনার হ্রাস ঘটে, উপলব্ধিমূলক সহানুভূতিও বিকশিত হয়ে ওঠে। যেখানেই কোনো-একজন মানুষ থাকুন না কেন তিনি যে স্বদেশেই আছেন— এমন ভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ প্রকৃতির সিদ্ধির উপলব্ধি ক্রিয়া করে চলে।

এতদসত্ত্বেও নির্বাসন ব্যাপারটি ঝুঁকিভরাই রয়ে যায়। অনুভূতি চেপে রাখার যে অভ্যাস তার মধ্যেই যতই হোক ক্লান্তিকরতা ও স্নায়ুপীড়াকরভাব উভয়ই থেকে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে নির্বাসন কখনোই সন্তোষজনক, শান্ত ও নিরাপদ অস্তিত্ব নয়। ওয়ালেস্ স্টিভেনসের কথায় নির্বাসন হল, 'শীতের মন' যার মধ্যে গ্রীষ্ম ও শরতের মর্মন্তুদতার মতনই 'বসন্তের' সম্ভাবনাও খুবই সমীপবর্তী, যদিও প্রাপ্তি অসাধ্য। হয়তো অন্য আরেকভাবে বিষয়টিকে বলা চলে যে নির্বাসনের জীবন বয়ে চলে ভিন্ন কোনো পঞ্জিকার অনুসরণে, আর তা স্বদেশের জীবনের থেকে কম ঋতু-অনুগ ও সুস্থিত। নির্বাসনের জীবন বয়ে চলে অভ্যাসগত বিধানের বাইরে। নিরন্তর ভ্রমণরত, বিকেন্দ্রিত, সংমিশ্রিত সুরে বাঁধা, কিন্তু যতক্ষণ-না কোনো-একজন মানুষ এ-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে তার অস্থিতিকারী শক্তি নতুন করে বিস্ফোরিত উত্থিত হয়ে ওঠে।

রিফ্লেকশন অন এক্সাইল থেকে
ভাষান্তর : দিলীপ ঘোষ

প্রতিবাদী আমেরিকা

দিনকতক আগে কাগজে একটা ছোট খবর বেরিয়েছিল যে সৌদি আরবের রাজকুমার আল ওয়ালিদ কায়রোর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আমেরিকা চর্চাকেন্দ্র খুলবার জন্য এক কোটি ডলার দান করেছেন। স্মরণ করা ভালো, ১১ সেপ্টেম্বরের হানার ঠিক পরে এই তরুণ কোটিপতি নিউইয়র্ক শহরের জন্য ১ কোটি ডলার পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে দিয়েছিলেন একটি চিঠি– তাতে ওই টাকার অঙ্ককে নিউইয়র্ক শহরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে বর্ণনা করার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তার নীতি পুনর্বিবেচনা করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মাথায় ছিল ইজরায়েলের প্রতি নিঃশর্ত মার্কিন সমর্থন। তবে ওই বিনীত নিবেদনে ইসলামের প্রতি সাধারণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গির দিকেও সম্ভবত কিছু ইঙ্গিত ছিল।

নিউইয়র্কের (যে-শহরের ইহুদি সংখ্যা পৃথিবীর যে-কোনও শহরের চেয়ে বেশি) তৎকালীন মেয়র রুডল্‌ফ গুইলিয়ানি ছেলেমানুষি রাগ দেখিয়ে ওই চেক আল ওয়ালিদকে ফিরিয়ে দেন। তীব্র জাতিগত ঘৃণাপ্রসূত এই অভদ্রতার উদ্দেশ্য ছিল অন্যকে অপমান করে নিজের বাহাদুরি দেখানো। আসলে তিনি নিউইয়র্কের সেই বেপরোয়া ভাবমূর্তিকে তুলে ধরতে চাইছিলেন– যে বাইরের খবরদারি সহ্য করে না, আর সেই সঙ্গে, অবশ্যই তিনি নিউইয়র্কের সংঘবদ্ধ ইহুদি জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করছিলেন।

গুইলিয়ানির এই একগুঁয়েমি ১৯৯৫ সালে (অস্‌লো চুক্তির অনেক পরে) রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত কনসার্ট শুনতে ফিলহারমোনিক হলে ইয়াসের আরাফাতকে ঢুকতে-না-দেওয়ার সঙ্গে বেশ মানানসই। আর তরুণ ওয়ালিদের উপহারের প্রতিক্রিয়ায় নিউইয়র্কের মেয়র যা করেছেন তা একেবারে আমেরিকার বড় শহরগুলোর নিচুমানের রাজনীতিকদের মার্কামারা সস্তা নাটুকেপনা। অথচ এই দানের উদ্দেশ্য ছিল মানবিক, আর একটা আক্রান্ত শহরের মানুষের জন্য। তার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু আমেরিকার রাজনীতির কুশীলবদের কাছে ইজরায়েল সবার আগে। ইজরায়েলের শাঁসালো ও সংগঠিত লবি সেই কাজটি নিজেরা করুক আর নাই করুক গুইলিয়ানি টাকাটা ফেরৎ না দিলে কী হত কেউ জানে না। কিন্তু দেখা গেল যে ইজরায়েলি লবির পোঁ ধরার কাজটি তিনি স্বয়ং আগে-ভাগেই সেরে বসে আছেন। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার যোয়ান ডিডিয়ন যেমন সম্প্রতি নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুকস্ ক্রোড়পত্রে তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন যে রুজভেল্টের জমানা থেকে সমস্ত যুক্তি বিসর্জন দিয়ে মার্কিননীতি দুটি বিপরীতমুখী সমর্থন জানিয়ে আসছে– একদিকে সৌদি আরবের রাজতন্ত্রের প্রতি, অন্যদিকে ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি। আর সেটা এতটাই, যে যোয়ান লিখছেন, 'ইজরায়েলের বর্তমান সরকারের সঙ্গে

আমেরিকার সম্পর্কে কিছুমাত্র ছায়া ফেলতে পারে এমন কোনও বিষয় আমরা আলোচনায় তুলতেই ব্যর্থ হয়েছি'।

রাজকুমার আল ওয়ালিদকে নিয়ে গল্প দুটো একে অপরের সঙ্গে বেশ ভালো খাপ খেয়ে যায়, এতে আমেরিকার প্রতি আরব দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরল ধারাবাহিকতা চোখে পড়ে। অন্তত বিগত তিনটি প্রজন্ম ধরে আরব দুনিয়ার নেতা, রাজনীতিক আর তাদের উপদেষ্টারা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা আমেরিকাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) আমেরিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও শৌখিন ধারণার উপর ভিত্তি করে তাদের নীতি নির্ধারণ করেছেন। এর মূলে আছে, মার্কিনীরা কীভাবে সমস্ত ব্যবস্থাটা চালায় সে সম্পর্কে অসংলগ্ন ধারণা আর তার শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে যাওয়া নানা অলীক কল্পনা। যেমন কিছু লোকের কাছে আমেরিকা হল ইহুদিদেরই একটা চক্রান্তবিশেষ। তেমনই আর-এক দলের ধারণা আমেরিকা মানে অন্তহীন শান্তি, কল্যাণ, পতিতের সহায়। আবার কেউ কেউ ভাবেন আমেরিকাকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেন হোয়াইট হাউসে আসীন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্বেতকায় পুরুষোত্তম।

বেশ মনে করতে পারি, ভালো করে পরিচয় হওয়ার পর থেকে গত কুড়ি বছর ধরে ইয়াসের আরাফাতকে আমি বহুবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে আমেরিকার সমাজ অত্যন্ত জটিল। এখানে বহু স্বার্থের চোরাস্রোত। চাপ, পাল্টা চাপের টানাপোড়েন আর ইতিহাসের দ্বন্দ্ব নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এখানকার শাসনব্যবস্থা সিরিয়ার মতো নয়। এ হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এক ভিন্ন মডেল যা ভালো করে জানা দরকার, বোঝা দরকার। পণ্ডিত ও রাজনৈতিক কর্মী প্রয়াত বন্ধুবর ইকবাল আহমেদ ছিলেন মার্কিন সমাজের ওপর একজন বিশেষজ্ঞ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্ভবত, সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তিনি ১৯৫৪-৬২ যুদ্ধের সময় আলজেরিয়ার এফ এল এন সংগঠনের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক আর ১৯৭০-এর দশকে কিসিংগারের সঙ্গে উত্তর ভিয়েতনামীদের আলাপ-আলোচনা খুব যত্ন নিয়ে পাঠ করেছিলেন। আমি তাঁকে অন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আরাফাতকে বোঝানোর কাজে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল আশির দশকের শেষদিকে যখন মার্কিন সরকারের সাথে ফিলিস্তিনীয়দের প্রাথমিক যোগাযোগটা গড়ে উঠছে তখন যাতে পি এল ও নেতৃত্ব যথাযথ চিন্তার কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে সেটা করতে পারেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয়নি।

আমেরিকার সম্পর্কে ফিলিস্তিনীয়দের হাস্যকর ধারণা মূলত 'টাইম' ম্যাগাজিন পাঠ আর নানারকম রটনানির্ভর-এর সঙ্গে। তাঁদের প্রতিপক্ষের নিখুঁত ও বিশদ জ্ঞানের বৈপরীত্য সত্যিই চমকপ্রদ। আরাফাতের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ব্যক্তিগতভাবে হোয়াইট হাউসে ঢুকে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও শুভ্রতম যে মানুষটি, সেই বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে কথা বলা। তাঁর চোখে সেই হল মিশরের মুবারক আর সিরিয়ার হাফেজ আল আসাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসার পথ। দেখা গেল যে ক্লিন্টন মার্কিন রাজনীতির এক ধুরন্ধর খেলোয়াড়। ব্যবস্থার কারসাজিতে আর ব্যক্তিত্বের মনোহারিত্বে তিনি ফিলিস্তিনীয়দের সম্পূর্ণ বিহ্বল আর বিভ্রান্ত করলেন যাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন আরাফাত আর তাঁর লোকবল। আমেরিকা সম্পর্কে তাঁদের সরলীকৃত ধারণা আজও

প্রাচীন মিনারের মতো অটল, একমেরু বিশ্বে এমনই সর্বগ্রাসী মহাশক্তিসম্পন্ন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বা রাজনীতির খেলায় নামতে বিশেষ কোনও উদ্যোগ দানা বাধেনি। অধিকাংশ লোক হতাশ প্রেমিকের মতো মাঝে মাঝে হাত পা ছোঁড়ে আর বলে আমেরিকা ভাল্লাগে না, এখানে ফিরব না। আবার তখনই চোখে পড়ে যে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র গ্রিনকার্ড আর ছেলেমেয়েদের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রবল আকুতি।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত

১৮৯৮ সালে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার ফিলিপিন্‌স্ অধিকার— সাম্রাজ্যের পথে আমেরিকা।

সাম্রাজ্য প্রতিহত

১৯৬৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে 'আমেরিকান উইমেন্‌স্ স্ট্রাইক ফর পিস'-এর পেন্টাগন অভিযান।

তবে একটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার বোধ হয় রাজকুমার আল ওয়ালিদের চিন্তার দিক পরিবর্তন। যদিও এ সম্পর্কে আমি শুধু অনুমানই করতে পারি। তবে এটা আমি জানি যে আরব দুনিয়ার বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে আমেরিকার সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে গুটিকতক সেমিনার আর ছোটখাটো পাঠক্রম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আমেরিকা, তার মানুষ, তার সমাজ, তার ইতিহাসের বিধিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করার মতো বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র কখনও গড়ে ওঠেনি। এমনকি কায়রো আর বৈরুতের মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নয়। হয়ত অভাবটা সার্বিকভাবে তৃতীয় বিশ্বে, এমনকি ইউরোপের কিছু দেশেও রয়েছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল : এক অপ্রতিহত, অমিত মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে বাস করতে হলে তার নিজস্ব ক্ষমতার সমীকরণ ও প্রবাহকে যতদূর সম্ভব ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর আমার ধারণা তার ভাষার ওপর কার্যকরী দখল থাকাটাও এই বোঝার অঙ্গ। কিন্তু খুব কম আরব নেতার মধ্যেই সেটা আছে। এটা ঠিকই যে আমেরিকা ম্যাকডোনাল্ডস্, হলিউড, ব্লু জিনস, কোকাকোলা আর সি.এন.এন-এর মুলুক— আর এ সবই আজ বিশ্বায়ন আর বহুজাতিকের দৌলতে মানুষের সহজ সম্ভোগের বাসনা মেটাতে সর্বত্র পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে এইসব পণ্য-পরিসেবার উৎস কোথায়, যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া থেকে তারা উৎসারিত হচ্ছে তারই-বা কী ব্যাখ্যা করব আমরা। কারণ আমেরিকাকে খুব সরল করে, খর্ব করে দেখার বিপদটা বড় স্পষ্ট।

আমি যখন এই কথাগুলো লিখছি তখন আমেরিকা ইরাকে এক প্রবল জনমতবিরোধী যুদ্ধে ব্যস্ত আর গোটা পৃথিবীকে জবরদস্তি তা মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন ইতালি আর স্পেন, ঢুকে পড়েছে সুবিধাবাদী জোটে। এর বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইরাক যুদ্ধ আসলে প্রতিরোধহীন কর্তৃত্বের একটা নির্লজ্জ নিদর্শন। তবু যুক্তরাষ্ট্রে, ইউরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, লাতিন আমেরিকায় এত মানুষের পথে নামা, স্থানীয় কাগজপত্রে লেখালেখি করা— এসব থেকে মনে হয়, মানুষের মধ্যে এই বোধোদয় হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে তার শ্বেতাঙ্গ ইহুদি-খ্রিস্টান শাসকরা এই পৃথিবীর ওপর আধিপত্য

কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। এখন তবে কী কর্তব্য?

এই লেখার পরবর্তী অংশে আমি এমন একজনের চোখ দিয়ে আজকের আমেরিকার দৃশ্যপটের একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করব, যে বহু বছরের সুখাবাসের ফলে দেশটাকে একভাবে ভেতর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে, আবার তার ফিলিস্তিনীয় শিকড় তাকে এক বাইরের পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিও দিয়েছে। আমার একমাত্র আগ্রহ হল এই দেশটাকে জানার বোঝার আর শব্দটা খুব অসমীচীন না হয়ে গেলে, তাকে প্রতিরোধ করার পথ বের করতে সাহায্য করাতেও। দেশটা, বিশেষ করে আরব ও মুসলিম দুনিয়া যেমনটা ভাবে— মোটেই তেমন আগা-পাশ-তলা একরকম নয়। তাহলে দেখার মতন কী আছে?

আমেরিকার সঙ্গে সাবেকি সাম্রাজ্যগুলোর একটা বড় পার্থক্য আছে। প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যই নিজের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি করে, আর বোঝাতে চায় যে পূর্বসূরীদের মতো মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার নেই। কিন্তু আমেরিকা এই সব কাজগুলোই একটা পবিত্র পরার্থপরতা আর মঙ্গলময় সারল্য থেকে করছে, এই ভাবটা বিস্ময়কর দৃঢ়তার সঙ্গে সে করতে পারে। তবে তা কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি এইজন্য আরও বেশি বিপজ্জনক যে একদল প্রাক্তন বাম ও মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী যারা ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করে আসছেন তারাও যেন উচ্চকিত দেশপ্রেম অথবা নৈরাশ্যের চাতুরি, নানা অছিলায় আজ ন্যায়সঙ্গত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করতে প্রস্তুত। এই অবস্থানগত ডিগবাজির পেছনে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার একটা ভূমিকা আছে। সেদিনের বিমান হানা সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ভাবখানা এমন করা হচ্ছে যে বিমানহানা সত্যিই আকাশ থেকে এসে পড়েছিল। তার পেছনে যে পৃথিবী জুড়ে নানা জায়গায় মার্কিন হস্তক্ষেপ আর সর্বব্যাপী আধিপত্যবাদ রয়েছে, যেন তার কোনও ভূমিকা নেই! তার মানে এই নয় যে ইসলামীয় সন্ত্রাস ক্ষমাযোগ্য, সে তো সর্বতোভাবেই ঘৃণ্য। এই মন্তব্য করার উদ্দেশ্য এটাই যে আফগানিস্তানে আর ইরাকে মার্কিন প্রত্যুত্তরের যে তাত্ত্বিক অজুহাতগুলো দেওয়া হচ্ছে তাতে কিন্তু ইতিহাসের সুসামঞ্জস্য বিচারের কোনও স্থান নেই।

এই মুক্ত-চিন্তকরা কিন্তু আজকে আমেরিকার খ্রিষ্টান দক্ষিণপন্থীদের (ভাবাবেগের তীব্রতায় ও অধিকার সচেতনতায় যারা ইসলামি উগ্রবাদীদের মতোই প্রবল), প্রকৃতপক্ষে নির্ণায়ক উপস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ করে উচ্চবাচ্য করেন না। মূলত ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে উৎসারিত এই দৃষ্টিভঙ্গি মিলে যায় সহযোগী ও সাথী গোঁড়া ইহুদিবাদী ধারণার সঙ্গে। ইজরায়েলের মার্কিন-সমর্থক প্রভাবশালী নব্য রক্ষণশীলদের সঙ্গে খ্রিশ্চান চরমপন্থীদের এক অদ্ভুত আঁতাত গড়ে উঠেছে। এরা ইহুদি রাষ্ট্রতন্ত্রকে সমর্থন করে যাতে সমস্ত ইহুদিরা পবিত্র ভূমিতে সমবেত হয়ে অবতারের দ্বিতীয় আবির্ভাবের পথ সুগম করেন। তখন সমস্ত ইহুদিকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে হবে, নচেৎ নিশ্চিহ্ন হতে হবে। কিন্তু সেই রক্তাক্ত ও উন্মত্ত ইহুদি-বিরোধী পরম্পরার কথা কেউই মুখে আনে না— ইজরায়েলবাদী ইহুদি গোষ্ঠী তো নয়ই।

আমেরিকা হল পৃথিবীর সবচেয়ে সোচ্চার ধর্মীয় রাষ্ট্র। ধর্ম এখানে জাতীয় জীবনে সর্বতোগামী। তা জাতীয় মুদ্রা থেকে স্থাপত্যশৈলী কিংবা সাধারণ বাগধারায় সর্বত্রই।

জর্জ বুশের বুলিই হল, আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঈশ্বরের ভূমি, ঈশ্বর আমেরিকার সহায় হন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি হল ৬-৭ কোটি মৌলবাদী খ্রিস্টান। তাঁর মতো যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, আর ঈশ্বরের দেশে ঈশ্বরের কাজ করার জন্যই তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন, কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও সাংবাদিক (ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এবং ডেভিড ব্রুক্‌স্ সহ) বলতে চান যে সমসাময়িক আমেরিকায় ধর্মবোধ মার্কিনদের হারানো স্থায়িত্ব ফিরে পেতে একটি সংহত সম্প্রদায়ের রূপ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি। হয়তো এই তথ্য তাঁদের মাথায় থাকে যে সময়ের যে কোনও বিন্দুতে আমেরিকার জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ লোক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু তাঁদের আমেরিকানত্বের সুরে বাঁধতে চাই নতুন একটি ধর্মবোধ যা দৈব উদ্ভাসে উজ্জ্বল, আত্মবিশ্বাসে অটল, ঐশ্বরিক অভিযানের ব্রতে দৃপ্ত এক অবতারপ্রতিম নেতার পিছনে জড়ো হওয়ার প্রেরণা জোগাবে। দুনিয়ার বাকি দেশগুলোর 'তুচ্ছ ঘটনা'-ও দুর্বোধ্য মানুষজনের প্রতি, অবজ্ঞায় পূর্ণ এই ধর্মবোধ নতুন শতাব্দীতে মার্কিন মৌলবাদের ভিত্তি। পৃথিবীর বিশৃঙ্খল, অশান্ত অংশের বিপুল ভৌগোলিক দূরত্ব আর তেমনই দুই প্রতিবেশী কানাডা ও মেক্সিকোর মার্কিন অত্যুৎসাহ প্রশমনে অপারগতা গোটা পরিস্থিতিকে এই জায়গা নিয়ে গেছে।

এই পুরো ব্যাপারটা আমেরিকান 'ওয়ে অব লাইফ'-এর যথার্থতা, তার সহজাত ভালোত্ব, স্বাধীনতা, আর্থিক সমৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রসরতাকে নিয়ে এক আত্মমুগ্ধতাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এই আত্মমুগ্ধতা এমন ওতপ্রোতভাবে দৈনন্দিন ধারণার সঙ্গে মিশে আছে যে একে কোনও মতাদর্শগত অবস্থান বলে মনে হয় না। এ যেন প্রাকৃতিক সত্যগুলোর মতো ধ্রুব। আমেরিকা = ভালো = পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা। সেই সঙ্গে আছে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষবৃন্দ ও সংবিধানের (যা একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হলেও মানুষেরই তৈরি) প্রতি নিঃশর্ত ভক্তি শ্রদ্ধা। মার্কিন বিশুদ্ধতা আর প্রামাণিকতার নোঙর প্রাচীন আমেরিকাতেই ফেলা আছে। কোনও দেশে তাদের পতাকার এত গুরুত্ব ও প্রতীকী মাহাত্ম্য আমি দেখিনি। সর্বত্র তাকে দেখা যায়— ট্যাক্সিতে, বাড়ির ছাদে, জানালায়, জামার বুকে। শৌর্য আর অশুভ শক্তিনাশের সংকেতবাহী এই পতাকাই হল রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তির প্রধান ধারক। এখনও আমেরিকার প্রধান শক্তি দেশপ্রেম— তার ধর্ম, তার রাষ্ট্রিক অবলম্বনের সঙ্গে যুক্ত দেশপ্রেম যা কিনা শুধু দেশের জন্যই নয় তিন ভুবনের ভার নিতেও উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি দেশপ্রেমের তাগিদ থেকে খুচরো কেনাকাটাও পরিচালিত হয়।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর মার্কিন নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদীদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে তাঁরা যেন খুব বাজার করেন। সেই টাকা বুশ আর রামস্‌ফেল্ড, পাওয়েল, রাইস, অ্যাশক্রফ্‌টসহ তাঁদের কর্মচারীরা ৭০০০ মাইল (সারা পৃথিবীতে যেভাবে বলা হয়ে থাকে) দূরে সাদ্দামের 'নাগাল পেতে' সামরিক প্রস্তুতিতে কাজে লাগিয়েছে। আর এই সবকিছুর পেছনে আছে পুঁজিবাদী ব্যবসাযন্ত্র যা এখন খুব বড় গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং আমার ধারণা, একটা ভারসাম্যহীন অস্থিরতার দিকে এগোচ্ছে। অর্থনীতিবিদ জুলি স্কির দেখিয়েছেন যে তিন

দশক আগের তুলনায় এখন মার্কিনিরা কাজ করেন অনেক বেশি সময়। কিন্তু কাজের বিনিময়ে আয় করেন অনেক কম। কিন্তু মুক্ত বাজার তত্ত্বের কোনও শক্তিশালী পরিকল্পিত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হল না। ব্যাপার দেখে মনে হয়, কর্পোরেট কাঠামোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার মিলে তৈরি যে বর্তমান ব্যবস্থা, যা আজ পর্যন্ত নাগরিকদের সন্তোষজনক সার্বজনীন স্বাস্থ্য আর শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারল না, তা বদলানো দরকার কিনা তা নিয়ে কারুর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করতে বসার চেয়ে শেয়ার বাজারের খবর অনেক জরুরি।

এটাই হল মোটাভাবে আমেরিকার ঐক্যমত্যের সারসংক্ষেপ, এ জিনিসই রাজনীতিকরা ভাঙিয়ে খায় আর ক্রমাগত নতুন নতুন স্লোগান আর বুলি তৈরি করে। অথচ এই ঐকমত্যের চারপাশে কিন্তু বিরুদ্ধ ও বিকল্প মতের পাল্টা স্রোতও খুঁজে পাওয়া যায়। ক্রমবর্ধমান যে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি খাটো করে দেখাচ্ছেন আর অবজ্ঞা করার ভান করছেন, তার মূলে আছে এক অন্য আমেরিকা, যাকে মূলধারার সংবাদমাধ্যম সবসময় চেপে রাখতে চায়। একটা যুদ্ধবাজ সরকারের সঙ্গে দূরদর্শন সংবাদের এমন নির্লজ্জ, বলতে গেলে কলঙ্কজনক আঁতাত অতীতে কখনও দেখা যায়নি। সি.এন.এন বা বড় চ্যানেলগুলোর সংবাদপাঠকরা পর্যন্ত কথা বলার সময় সাদ্দামের কুকর্ম আর বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই কী করে 'আমরা' ওকে ঠাণ্ডা করব তা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এই যেন যথেষ্ট নয়, বায়ুতরঙ্গকে ছেয়ে ফেললেন পূর্বতন সেনানী, সন্ত্রাসবাদ বিশারদ, মধ্যপ্রাচ্যের এমন সব বিশ্লেষক যারা মধ্যপ্রাচ্যের কোনও ভাষাও জানেন না, সম্ভবত জীবনে মধ্যপ্রাচ্যের কোনও অংশ চোখেও দেখেননি। বস্তুত এরা যে-কোনও বিষয়েই বিশেষজ্ঞ হওয়ার পক্ষে বড্ড অল্প-শিক্ষিত, সব মুখস্থ বুলির মতো আউড়ে যাচ্ছেন। সম্ভাব্য বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণের জন্য জানালা আর গাড়ি তৈরি রাখতে রাখতে কেন 'আমাদের' ইরাকের ব্যাপারে কিছু করা উচিত।

যেহেতু এই ঐকমত্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত পথে এসেছে, তাই একে শাশ্বত বলে মনে হয়। ইতিহাস তার কাছে অভিশাপ, কেননা আমেরিকার স্বীকৃত, প্রকাশ্য আলাপচারিতায় ইতিহাস অনস্তিত্ব বা শূন্যতার প্রতিশব্দ মাত্র। ঠিক যেমন চলতি মার্কিন ভাষ্যে অবজ্ঞার্থে বলা হয় 'তুমি তো ইতিহাস' অথবা আমেরিকাবাসী হিসেবে আমাদের কাছে ইতিহাস হল আমেরিকা সম্পর্কে (পৃথিবীর আর কোনও জায়গা সম্পর্কে নয় কারণ তারা 'প্রাচীন' পিছিয়ে পড়া, অতএব অপ্রাসঙ্গিক) প্রশ্নহীন, ভক্তিভারাবনত, অনৈতিহাসিক বিশ্বাস। এখানে অদ্ভুত একটা বৈপরীত্য কাজ করে। একদিকে জনমানসে আমেরিকার স্থান ইতিহাসের ঊর্ধ্বে। অন্যদিকে সারা দেশেই খুব ছোট আঞ্চলিক বিষয়ের ইতিহাস থেকে শুরু করে বিশ্বের সাম্রাজ্যগুলোর বিশাল ইতিহাস সমস্ত বিষয়ে একটা সর্বভুক আগ্রহ বিদ্যমান। এই দুই সমান বিপরীত শক্তির টানে তৈরি হয় নানা রকম 'কাস্ট'— বিদেশি-বিদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে অপার্থিব আধ্যাত্মিকতা আর পুনর্জন্মবাদ পর্যন্ত যার বিস্তার।

যাইহোক, ইতিহাস নিয়ে দ্বন্দ্বের একটি আরও উদাহরণ বরং এখানে বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। বিদ্যালয়ে কী ইতিহাস পড়ানো হবে তা নিয়ে বছর দশেক আগে একটা খোলা

তাত্ত্বিক লড়াই শুরু হয়েছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যে চিন্তার বিনিময় হয়েছিল তা থেকে এটা পরিষ্কার যে আমেরিকার ইতিহাস যাতে শিশুমনে একটা ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে তেমনই এক গৌরবজনকভাবে সংহত, জাতীয় উপাখ্যান হিসেবে হাজির করার প্রবক্তা ছিলেন অনেকে। তাদের কাজে ইতিহাস শুধু সত্যের খাতিরে জরুরি নয়, বরং আমেরিকার নিজস্ব মনোজগত নির্মাণ ও বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতগুলো মৌলিক ধারণাকে ধ্রুব ধরে নিয়ে তাকে আদর্শগত বৈধতাদান, যাতে ছাত্রদের বাধ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উপকরণ মেলে। এই সারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বেরিয়ে আসা মানেই হল যাকে বলে উত্তর-আধুনিকতা আর বিভেদকামী বা খণ্ডিত ইতিহাসের (যেমন সংখ্যালঘু বা নারীদের বা ক্রীতদাসদের ইত্যাদি) ওকালতি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, শেষ পর্যন্ত এইরকম হাস্যকর পাঠক্রম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সফল হয়নি। লিণ্ডা সিমক' ব্যাপারটা সংক্ষেপে লিখেছেন 'সাংস্কৃতিক শিক্ষার ব্যানারে নব্য রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি হল যে ছাত্রদের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে ইতিহাসের একটা তর্কাতীত, সংঘাতহীন চেহারা হাজির করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একদম অন্যদিকে গড়ালো। সামাজিক ও বিশ্ব ইতিহাসবিদদের হাতে পড়ে (যারা কে-১২ শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে পাঠক্রম রচনা করলেন) এই পাঠক্রম সরকার যা আটকাতে চাইছিল সেই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই বাহক হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যের ইতিহাস বা সাংস্কৃতিক পুনরুৎপাদনকে চ্যালেঞ্জ জানালেন সেই ইতিহাসবিদেরাই, যারা মনে করেছিলেন যে সামাজিক ন্যায় আর ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের স্বার্থে অতীতের আরও বহুমাত্রিক বয়ান থাকা দরকার।'

মূল ধারার গণমাধ্যম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনমানসে কতগুলো প্রশ্নহীন স্বতঃসিদ্ধ ধারণাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যা আসলে কল্পকথার উপর দাঁড়িয়ে। যদিও আপাতভাবে মনে হয় যে এইসব আলোচনার মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাদের মধ্যে যে কয়েকটি বর্তমান সময়ে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে, আমি শুধু তাদের নিয়েই আলোচনা করব। একটা কল্পকথা অবশ্যই এই যে যৌথভাবে 'আমরা' বলে কিছু আছে, এক জাতীয় পরিচয় 'আমাদের' রাষ্ট্রপতি আর সচিব রাষ্ট্রসংঘে, সৈন্যদল মরুভূমিতে যার প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের স্বার্থবোধ সবসময়ই আত্মরক্ষামূলক, অভিসন্ধিহীন, সাবেকি নারীর মতো অপাপবিদ্ধ। আরেকটি কল্পকথা হল ইতিহাসের বর্জন, অতীতের বেআইনি 'যোগসূত্র' গুলোকে অস্বীকার— যেমন সাদ্দাম হোসেন ও ওসামা বিন লাদেনকে প্রশ্রয় দেওয়া, অস্ত্র যোগানো হয়েছিল বা ভিয়েতনামে (যখন তার নাম আদৌ নেওয়া হয়) চালানো ধ্বংসলীলা আমেরিকার পক্ষে ক্ষতি হয়েছিল কিংবা জিমি কার্টার যেমন স্মরণীয় ভাষায় বলেছেন, সে ছিল এক ধরনের 'পারস্পরিক' আত্মঘাত। আরও মর্মান্তিক হল বর্তমানে চলতে থাকা আফ্রো-আমেরিকান মানুষদের ক্রীতদাসত্ব আর আমেরিকার ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ ও প্রায় অবলুপ্ত অবস্থা— এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আমেরিকার একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নস্যাৎ করার চেষ্টা। জাতীয় ঐক্যমত্যে এসবের কোনও স্থান নেই (জার্মানিতে ইহুদি নিধনের স্মারক একটি মিউজিয়াম খোদ ওয়াশিংটনে গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু আফ্রো-আমেরিকান বা এখানকার ভূমিপুত্র রেড ইন্ডিয়ানদের জন্য গোটা আমেরিকাতে কোথাও কিছু নেই।)

তৃতীয় প্রশ্নহীন প্রত্যয়টি হল যে 'আমাদের' নীতির বিরোধিতা মানেই 'মার্কিন-বিদ্বেষ', যার মূলে আছে হয় 'আমাদের' গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সম্পদ, বিরাটত্ব নিয়ে ঈর্ষা নয়তো ইরাকযুদ্ধ নিয়ে ফরাসিদের গোঁয়ার্তুমির মতো নির্ভেজাল নোংরামি। এইসব ক্ষেত্রে টিপ্পনিসহ মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ইউরোপীয়দের গত শতকে আমেরিকা দু-দুবার রক্ষা করেছে শুধু তাই নয়, আসল লড়াই যা করার করেছে মার্কিন সেনা। ইউরোপীয়রা ছিল মূলত দর্শক। আর মধ্যপ্রাচ্য বা লাতিন আমেরিকার মতো যেসব জায়গায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছে, সেখানে কল্পকথায় আমেরিকা এক সৎ মধ্যস্থতাকারী, নিরপেক্ষ বিচারক, বিশুদ্ধ কল্যাণকামী চিরকালীন আন্তর্জাতিক শক্তি, যার সমকক্ষ কেউ নেই। অতএব এমন একটা ভাবনার ধারা আমরা দেখতে পাই যেখানে ক্ষমতার প্রশ্ন, আর্থিক মুনাফা, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারি, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত, জবরদস্তি বা অন্তর্ঘাত করে সরকার বদল (যেমন ইরানে বা চিলিতে)– এসবের কোনও স্থান নেই। এই ভাবনার একটা প্রতিফলন দেখা যায় মার্কিন সরকার আর তার পরামর্শদাতাদের কথার ধরনে যারা ক্ষমতাকে, বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গিকেও বেশ মোলায়েম করে পেশ করেন। সবচেয়ে কম উচ্চারিত হয় সেইসব মার্কিন নীতি যেখানে নৃশংসতার জন্য, বা বৈরিতার জন্য তারা সরাসরি দায়ি– যেমন ফিলিস্তিনীয় জনজীবনের ওপর শ্যারনের আগ্রাসন বা ইরাকে আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতার ফলে জনগণের দুর্দশা কিংবা তুরস্ক ও কলম্বিয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার। এমনকি এসব প্রসঙ্গের পরোক্ষ অবতারণা এড়িয়ে যাওয়া হয়, গুরুত্বপূর্ণ 'নীতি' নির্ধারণের প্রশ্নে এসব প্রসঙ্গকে আপাঙ্‌ক্তেয় মনে করা হয়।

সর্বশেষে কল্পকথা হল সরকারি কর্তৃপক্ষকে (যেমন হেনরি কিসিংগার, ডেভিড রকফেলার আর বর্তমান সরকারের যত কর্তাব্যক্তি) তাদের সন্দেহাতীতভাবে এক অনন্য নৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া। যেমন নিক্সন জমানার দুই অপরাধী সাব্যস্ত এলিয়ট অ্যাব্রাম আর জন পইনডেক্সটারকে যখন সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে ফেরানো হল তা নিয়ে প্রতিবাদ তো নয়ই, বড় একটা সমালোচনাও হল না। বর্তমানের বা অতীতের খাঁটি বা ভেজাল যেকোনও রকম কর্তৃপক্ষের প্রতি এইরকম অন্ধ আস্থার পেছনে রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের ও পণ্ডিতদের একটা বড় ভূমিকা আছে। তারা সবসময় কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবনত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শোচনীয়রকম জো-হুজুরি সম্ভাষণ ব্যবহার করেন। তাঁরা কর্তৃপক্ষের ঝকঝকে উপস্থিতির (যেমন কেতাদুরস্ত গাঢ় রঙের স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল টাই পরিহিত) বাইরে আর কিছু দেখতে চান না। এদের গুরুতর অপরাধের অতীতও তাদের বিচলিত করে না। আমার ধারণা, তাঁরা সেই কঠোর বাস্তববাদী মার্কিন দর্শনকেই পুষ্ট করছেন যা কিনা অধিবিদ্যা-বিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী, এমনকি দর্শন-বিরোধী। সবকিছুকে ব্যাক্যের কাঠামো আর ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে নামিয়ে আনে যে উত্তর-আধুনিক অসংজ্ঞাবাদ, এই তার সঙ্গে ভালো খাপ খায়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের পাশাপাশি এটি হল একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী চিন্তাধারা। আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে হেগেল আর হাইডেগারের মতো দার্শনিক ব্যক্তিত্বদের

মতবাদ পড়ানো হয়। সাহিত্য বা শিল্প ইতিহাস বিভাগে, কিন্তু কদাচিৎ দর্শন বিভাগের পাঠক্রমে তাঁরা স্থান পান।

দক্ষ মার্কিন প্রচারমাধ্যম সে দেশ সম্পর্কে কৌশলগতভাবে কিছু বিশেষ বিশেষ গল্প, বিশেষ করে আরব ও ইসলামি দুনিয়ায় ছড়াবার চেষ্টা করে। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে আড়ালে রাখা হয় সমস্ত প্রতিবাদী ঐতিহ্যকে। আমেরিকার এই 'অনুনমোদিত' ধারার একটা বড় উৎস হল তার অভিবাদী সমাজ, যা আমেরিকান শ্রেষ্ঠত্ব তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের সমান্তরালে বা এর মধ্য থেকেই বিকশিত হয়েছে। দুর্ভাগ্য যে বিদেশের খুব কম ভাষ্যকারই এইসব প্রতিবাদী মরুদ্যান দেখতে পায়। এই প্রগতিশীল ও তার বিপরীতমুখী প্রবণতাগুলো থেকেই একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক বিভিন্ন মৌলিক বিশ্বাসগুলোর মধ্যে সচরাচর আড়ালে থাকা যোগসূত্রগুলো আবিষ্কার করতে পারবেন। বুশের ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে, কেউ বিশ্লেষণ করলে আমেরিকার যে সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিময় ছবি ভেসে ওঠে সেখানে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার আলোচনায়, যৌথ কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী বহু আমেরিকান। যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন মানুষের জীবন, সম্পদ আর অর্থনীতির বিপুল বিনষ্টির প্রতিবাদে, তাদের কথা আমি এখানে আনছি না। আমি সেই দক্ষিণপন্থী মতবাদও ধরছি না যারা মনে করে আমেরিকাকে অপবাদ দেয় শুধু বিশ্বাসঘাতক বিদেশি, রাষ্ট্রসংঘ আর নাস্তিক কম্যুনিস্টরাই। আমেরিকার বৈদেশিক নীতি, বিশ্বায়ন নিয়ে সন্দিহান আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ ছাত্রসমাজ— যাঁরা ভিয়েতনাম যুদ্ধ, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বা দেশের নাগরিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরগুলোকে প্রাণবন্ত করে রাখেন তাদেরকেও আমি বাদ দিচ্ছি।

এরপরও মতাদর্শ ও জীবন অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে আমেরিকান সমাজের প্রধান ধারাগুলো পড়ে থাকে, এখানে আমি তাদের একটা দ্রুত সমীক্ষা করব। এদের মধ্যে স্বভাবতই আসবে ইউরোপীয় এবং আফ্রো-এশীয় পরিভাষায় যাদের বাম বলে চিহ্নিত করা হয়। আমেরিকায় দ্বি-দলীয় কাঠামোর এমনই প্রতাপ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সেখানে কোনও সংগঠিত সংসদীয় বাম আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত। মনে হয় না তাদের ঘুরে দাঁড়াবার কোনও আশু সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অ্যাফ্রো-আমেরিকান সম্প্রদায়ের একটি বেশ তৎপর ও জঙ্গি শাখা আছে। যারা পুলিশের অত্যাচার, চাকুরিগত অবিচার, আবাসন-সংক্রান্ত ও শিক্ষাগত বৈষম্য এসব নিয়ে সোচ্চার। এদের নেতৃত্বে আছে রেভারেন্ড আল শার্পটন, কর্নেল ওয়েস্ট, মহম্মদ আলি, জেসি জ্যাকসন (যদিও নেতা হিসেবে তিনি এখন কিছুটা ম্রিয়মান)-এর মতো ক্যারিশ্মা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যারা ঐতিহ্যের দিক থেকে নিজেদের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের উত্তরসূরী মনে করেন। এদের সঙ্গে আছে লাতিন আমেরিকার ভূমিপুত্ররা আর মুসলমানরাসহ কিছু সক্রিয় জনগোষ্ঠী। এরা সকলেই অবশ্য নানাভাবে— স্থানীয় ও জাতীয় সরকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে, টেলিভিশন 'টক শো'-তে মুখ দেখিয়ে, কলেজ, কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার পরিচালন সমিতির সদস্য হয়ে— মূল ধারায় সামিল হতে চেয়েছেন। কিন্তু

মোটের ওপর একটা বৈষম্য আর অবিচারের বোধ তাদের মধ্যে কাজ করছে। শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের শ্বেতাঙ্গ ও মধ্যবিত্ত আমেরিকানের স্বপ্নের শরিক করে তুলতে পারেনি। শার্পটন বা রাল্ফ নাদের এবং প্রতিবাদী গ্রিন পার্টির সমর্থকদের ব্যাপারে কৌতুককর ব্যাপার হল যে জনজীবনে লক্ষ্যণীয় রকমের উপস্থিতি ও গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁরা বহিরাগত, উপেক্ষিত হিসেবেই থেকে গেছেন। মার্কিন সমাজের প্রতিবাদী ধারার আর একটা বড় প্রবাহ হল নারী আন্দোলনের একটি শাখা যারা পেশাগত সাম্য, নিগ্রহ ও হয়রানির বিরুদ্ধে, গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে সক্রিয়। তেমনই সাধারণভাবে শান্ত, নিজেদের স্বার্থ ও কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত। পেশাদার গোষ্ঠীগুলোরও (চিকিৎসক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শ্রমিক সংঘ, পরিবেশ আন্দোলনের একাংশ) এই পাল্টা স্রোতের প্রবাহে বহমান, যদিও গোষ্ঠীগতভাবে একটা সুশৃঙ্খল সামাজিক ক্রিয়াকলাপেই তাদের স্বার্থ নিহিত।

প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের সূতিকাঘর হিসেবে সংগঠিত চার্চের ভূমিকাকেও ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। আগে যে খ্রিস্টান মৌলবাদী আন্দোলনের কথা বলেছি, এরা কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোয়েকার সম্প্রদায় ও প্রেজবিটিঅ্যারীর ধর্মসভাসহ ক্যাথলিক বিশপরা যৌন-কেলেঙ্কারিসহ নানা বিচ্যুতি সত্ত্বেও— যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে যথেষ্ট উদার। তাঁরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে গগনচুম্বী সামরিক বাজেট বা ১৯৮০-র দশকের প্রথমভাগ থেকে যে নতুন মুক্ত আর্থিক নীতি জনজীবনকে তছনছ করছে, তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে প্রস্তুত। ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অংশ ঐতিহাসিকভাবে দেশে-বিদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন করে আসছেন। কিন্তু রেগনের সময় থেকে নব্য রক্ষণশীলদের উত্থান, এদেশে ধর্মীয় দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ইজরায়েলের যোগসাজশ, ইজরায়েলের সমালোচনার সঙ্গে ইহুদি বিরোধিতাকে এক করে দেখার উগ্র ইহুদি তত্ত্ব, এমনকি নতুন মার্কিন 'আউশউইচ' গড়ে ওঠার ভয় এই সদর্থক শক্তিকে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছে।

এগারো সেপ্টেম্বর পরবর্তী দেশপ্রেমের ঝড় কাটিয়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে সামিল হতে পেরেছিলেন। 'টেরোরিস্ট এন্ড পেট্রিয়ট এ্যাক্ট'-এর ফলে খর্বিত নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে এরা একত্রিত হয়েছেন। শারীরিক স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন, গোয়ান্তানামো বে'র বন্দি শিবিরগুলিতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সেনাবাহিনীর প্রতি অসামরিক মহলের সাধারণ অবিশ্বাস, সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বেসরকারিকরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা মানুষের দুর্ভোগ— মাথাপিছু হিসাবে বিশ্বের সর্বাধিক। (এর মধ্যে আবার অশ্বেতাঙ্গ নারীপুরুষের হার বেশি) সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের ভেতরকার একটা অন্তহীন অসন্তোষ ফুটে বের হচ্ছে। সাইবার-বিশ্বে স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত আমেরিকার এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্রমশ নিম্নগামী অর্থনীতি, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, মাত্রাছাড়া অন্যায়, কর্পোরেট দুনিয়ার উচ্চকোটিতে দুর্নীতি আর বল্গাহীন বেসরকারিকরণের ফলে বিপন্ন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা— এইসবটা মিলে বর্তমানের যে রুগ্ন চেহারা তা কিন্তু আমেরিকার বহুচর্চিত নিজস্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর বড় আঘাত হানছে।

আমেরিকা কি সত্যিই তার রাষ্ট্রপ্রধান ও তার যুদ্ধবাজ বিদেশনীতি আর অতিসরলীকৃত আর্থিক চিন্তার পেছনে সংঘবদ্ধ? এটা বলার অর্থ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করা যে আমেরিকা কি স্বীয় সত্তার প্রশ্নে মীমাংসায় পৌঁছতে পেরেছে? বিশ্বজুড়ে মার্কিন সেনার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে (বর্তমানে বারোটি দেশে মার্কিন সেনার উপস্থিতি স্মর্তব্য) এমন কোনও একতাসূত্র বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকে পৃথিবীর বাকি অংশ মেনে নিতে না চাইলেও তার পেছনে সব আমেরিকানদের সমর্থন থাকবে? আমি আর-একভাবে আমেরিকাকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমনটা মনে করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি করে নিজের অস্তিত্বের আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে যে আমেরিকা সংশয়দীর্ণ। আমার মনে হয় সারা বিশ্বে আত্মপরিচয় নিয়ে যতখানি বিতর্ক দেখা যায় আমেরিকাকেও তেমনই অজস্র খণ্ডিত সত্তার সংঘাতে জর্জর দেশ বলে ভেবে নেওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। চলতি ধারণা হল যে আমেরিকা ঠাণ্ডা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। কিন্তু সেই জয়ের প্রকৃত ফল কী হয়েছে তা আদৌ স্পষ্ট নয়। আমেরিকার কেন্দ্রীভূত সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো উপেক্ষিত হয়। কিন্তু আসলে তা মীমাংসা থেকে বহু দূরে। গর্ভপাতের অধিকার আর প্রাকৃতিক বিবর্তনের শিক্ষা নিয়েও এখনও সেখানে বিস্তর বিতর্ক।

ফুকুয়ামার ইতিহাস সমাপনের তত্ত্ব বা *হান্টিংটনের* সভ্যতার সংঘাত তত্ত্বের সবচেয়ে বড় ফাঁক হল যে তারা ধরে নেন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিষ্কার সীমানা টানা আছে। তারও একটা আদি-মধ্য-অন্তিম পর্ব আছে, কিন্তু আসলে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র হল স্বীয় সত্তার প্রশ্নে, নিজেকে সঞ্চারিত করার প্রশ্নে, ভবিষ্যতের আয়নায় নিজেকে প্রতিভাত করার প্রশ্নে লড়াই। ক্রমাগত ক্রিয়াশীল, চলমান সজীব সংস্কৃতিকে বোঝার প্রশ্নে এই তাত্ত্বিকদের মৌলবাদী মনে হয়, যখন তাঁরা অলীক সীমানা আর নিয়মের শৃঙ্খল দিয়ে নিজেদের বাঁধবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে আমেরিকার সংস্কৃতি হল একটি অভিবাসী সংস্কৃতি যা অন্যের সঙ্গে মিশে যায়। আর বিশ্বায়নের একটা অনিচ্ছাকৃত ফল একক জাতীয়তার সীমাহীন বহুজাতিক সম্প্রদায়ের উত্থান যারা বিশ্বের অধিকার নিয়ে ভাবিত। যেমন মানবাধিকার আন্দোলন, নারী আন্দোলন, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। আমেরিকা এর বাইরে থাকতে পারবে না। কিন্তু তার ওপরের কঠিন, শক্ত আবরণ খুঁড়ে ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে নিচে কী আছে। যেসব প্রশ্নে বহু মানুষের স্বার্থ জড়িত, তাতে মানুষে মানুষে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আশাবাদী আর উৎসাহিত হওয়ার কারণ আছে।

ভাষান্তর : শৌভিক বসু

উপনিবেশিত'র পরিবেশন নৃবিজ্ঞানের আলাপচারীগণ

এ জগতের এমন কোন কোণ নেই যেখানে আমার হস্তাঙ্গুলির ছাপ নেই, এমন কোন গগনচুম্বী অট্টালিকা নেই যেটি আমার গোড়ালির ছাপ ধারণ করে না, এমন কোন রত্ন নেই যেটির ঔজ্জ্বল্য আমার ধূলোকণা বহন করে না।
– এইম সেজেয়া, Cahier d'un retour au pays natal

১

এই শিরোনামের চারটি প্রধান শব্দের প্রতিটি একটি উত্তেজিত এবং উত্তালরত পরিসরে অবস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি সময়ের কথা এখন স্মরণ করা প্রায় অসম্ভব যখন মানুষজন পরিবেশনের [representation] সংকটের কথা বলছিলেন না। এবং সংকটটি যত বেশি বিশ্লেষিত এবং আলোচিত হচ্ছে, এটির উৎপত্তি তত বেশি পুরাতন মনে হচ্ছে। মিশেল ফুকো তাঁর যুক্তিতর্কে আরো বেশি জোরাল এবং আকর্ষণীয়ভাবে একটি ধারণা পেশ করেছেন যেটি সাহিত্যের ইতিহাসবিদ আর্ল ওয়াসারম্যান, এরিক অয়েরবাখ এবং এম এইচ এইব্র্যামসের কাজে পাওয়া যায় যথা, ধ্রুপদী ঐক্যের বিলুপ্তির সাথে শব্দসমূহ পূর্বের মত স্বচ্ছ একটি মাধ্যম থাকেনি, যেটি অস্তিত্বকে আলোকোজ্জ্বল করতে পারে। এটির পরিবর্তে, অস্বচ্ছ হলেও অদ্ভুতভাবে বিমূর্ত, নাগালের বাইরের একটি সারবত্তা [essence] হিসেবে ভাষা উদ্ভুত হয় ভাষাবৈজ্ঞানিক আগ্রহের বস্তু হিসেবে, এবং তার পরবর্তী হতে সেটি বাস্তবতাকে অনুকরণের যে কোন প্রচেষ্টাকে নিরপেক্ষ এবং স্তিমিত করে ফেলে। সেহেতু নিটশে, মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের যুগে, পরিবেশনের মুখোমুখি হতে হয়েছে কেবলমাত্র ভাষাবিদ্যাগত ফর্মের চৈতন্য এবং রীতির সাথে নয়, উপরন্তু ব্যক্তি-উত্তীর্ণ, মানব-উত্তীর্ণ এবং সংস্কৃতি-উত্তীর্ণ শক্তিসমূহ যেমন শ্রেণী, অচেতন, লিঙ্গ, বর্ণ, এবং কাঠামোর সাথে। এগুলো লেখক, গ্রন্থ এবং বস্তুর মত জিনিসে, যেগুলো আমাদের পূর্বতন ধারণা মোতাবেক ছিল স্থিতিশীল, কী রূপান্তর সাধন করেছে তা আক্ষরিক অর্থে ছাপার, এবং নিশ্চিতভাবে উচ্চারণের, অযোগ্য। বর্তমানে কাউকে, এমন কি কোন কিছুকে, পরিবেশন করা এমন একটি প্রচেষ্টা হয়ে উঠেছে যেটি সেই রেখাটির মত যা বরাবর বক্ররেখার দিকে এগোয় কিন্তু কখনই ছুঁতে পারে না, এর ফলশ্রুতিতে নিশ্চয়তা এবং মীমাংসাযোগ্যতা কল্পনানুরূপভাবেই কঠিন হয়ে পড়েছে।
উপনিবেশিত'র ধারণা, আমার চারটি প্রত্যয়ের দ্বিতীয়টির* কথা বললে, নিজস্ব ধরনের বিস্ফোরকত্ব হাজির করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অ-পশ্চিমা এবং অ-

ইউরোপীয় বিশ্বের বাসিন্দাগণ ছিলেন উপনিবেশিত, তারা ছিলেন ইউরোপীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে দিয়ে জোর করে বসতি স্থাপন করা হয়েছিল। সেহেতু, সেই অনুসারে, এ্যাল্বার্ট মেম্মির বই উপনিবেশকারী এবং উপনিবেশিত, উভয়কেই একটি বিশেষ জগতে স্থাপন করে, সেটির নিজস্ব নিয়মনীতি এবং পরিস্থিতি সমেত, ঠিক যেমনটি *দ্য রেচেড অফ দি আর্থ*এ ফ্র্যান্টজ্ ফ্যানন দুই ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ঔপনিবেশিক শহরের কথা বলেছেন, পরস্পরের সাথে নৃশংসতা এবং প্রতি-নৃশংসতায় যোগাযোগরত।[১] তিন বিশ্ব সম্বন্ধে এ্যাল্ফ্রেড সভি'র ধারণাসমূহ যতদিনে তত্ত্বে এবং প্রাক্সিসে প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়ে উঠেছিল, ততদিনে তৃতীয় বিশ্ব উপনিবেশিতের সমার্থক হয়ে গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, যেগুলোর বিভিন্ন এলাকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে স্বাধীনতা অর্জন করে, পশ্চিমা শক্তিসমূহের একটি ধারাবাহিক ঔপনিবেশিক উপস্থিতি ছিল। সেহেতু, এমনটি নয় যে "উপনিবেশিত" হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক সমষ্টি যেটি জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জনের পর ভেঙ্গে যায়, বরং এটি হচ্ছে একটি বর্গ যেটি নব্য-স্বাধীন দেশের বাসিন্দা এবং ইউরোপীয়দের দ্বারা বসতি-স্থাপিত পরাধীন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে। কুৎসিত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ, যেটির ফলশ্রুতি ছিল হত্যা, এবং অনড় নিষ্ফলা রাজনৈতিক একক বর্ণবাদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখে। উপনিবেশিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সে কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর নিকট অনেক গুরুত্ব বহন করে যাদের নির্ভরশীল, নিম্নবর্গীয়, এবং পশ্চিমের সাব্জেক্ট হিসেবে অভিজ্ঞতার পরিসমাপ্তি ঘটে নি—ফ্যাননের ভাষা ধার করে বলা যায়—এমনকি শেষ শ্বেতাঙ্গ পুলিশটি চলে যাওয়ার পরও, শেষ ইউরোপীয় পতাকাটি নামিয়ে ফেলার পরও। উপনিবেশিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে এমন ভাগ্য যেটির রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী, প্রকৃত পক্ষে ভয়ঙ্করভাবে অন্যায্য ফলাফল, বিশেষ করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর। দারিদ্র্য, নির্ভরশীলতা, অবোন্নয়ন, ক্ষমতা এবং অবক্ষয়ের নানাবিধ বিকার অধ্যয়ন, এবং অবশ্যই যুদ্ধ, অক্ষরজ্ঞান, ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে লক্ষণীয় অর্জনসমূহ: এই বৈশিষ্টাবলীর সংমিশ্রণ আখ্যায়িত করে উপনিবেশিত মানুষজনকে, যারা একটি পর্যায়ে নিজেদের উন্মুক্ত করেছিল কিন্তু অন্য পর্যায়ে অতীতের শিকার থেকে যায়।

কাকুতি-মিনতি ও স্ব-করুণা'র চিহ্ন বহন করা তো দূরে থাক, "উপনিবেশিত" বর্গটি এযাবৎ বেশ খানিকটা সম্প্রসারিত হয়ে নারী, অবদমিত এবং নিপীড়িত, জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এমনকি প্রান্তিকীকৃত কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্যাজাগতিক উপবিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রাদিও অন্তর্ভুক্ত করেছে। উপনিবেশিতকে ঘিরে বাক্যাবলীর একটি সমগ্র শব্দমালা গড়ে উঠেছে, এবং প্রতিটি নিজ-নিজভাবে সেই মানুষদের, যাদের ভি এস নাইপল উপহাসমূলকভাবে চিত্রিত করেছিলেন কেবলমাত্র টেলিফোন ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু আবিষ্কার করতে পারে না হিসেবে, গৌণত্বে ভয়ঙ্করভাবে পুনর্শক্তি যোগাচ্ছে। সে অনুসারে উপনিবেশিত মানুষজনের মর্যাদাকে নির্ভরশীলতা ও প্রান্তিকতার পরিসরে স্থির করা হয়েছে, অনুন্নত, কম-উন্নত, উন্নতকামী রাষ্ট্রের আখ্যাদানের মাধ্যমে কলঙ্কিত করা হয়েছে, শাসন করা হয়েছে একটি উৎকৃষ্ট, উন্নত

কিংবা মহানগরীয় উপনিবেশকারী দ্বারা, যাকে তাত্ত্বিকভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে একজন বিরুদ্ধ অধিরাজ হিসেবে। অন্য কথায়, এতসবের পরও পৃথিবী বিভক্ত ছিল আরো ভাল এবং আরো খারাপ'এ, এবং নিকৃষ্ট বান্দাদের বর্গটি যদি সম্প্রসারিত হয়ে নতুন যুগে আরো অনেক নতুন মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেও থাকে, এটিকে তাদের দুর্ভোগ হিসেবে দেখা ছাড়া আর কিই বা করার আছে। এ অনুসারে একজন উপনিবেশিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে অনেক ধরনের ভিন্ন, কিন্তু নিকৃষ্ট কিছু হওয়ার সম্ভাবনা, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়কালে।

একটি বর্গ হিসেবে নৃবিজ্ঞান প্রসঙ্গে যদি আসি, এই জ্ঞানকাণ্ডের কিছু মহলে যে তোলপাড় ঘটছে সেটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু বলা এবং লেখা হয়েছে এবং এতে আমার মত একজন বহিরাগতের খুব সামান্য কিছুই যোগ করার আছে। তা সত্ত্বেও, ব্যাপক অর্থে বললে, কিছু প্রবাহের উপর এখানে গুরুত্ব আরোপ করা যায়। বিগত গোটা বিশেক বছর ধরে বিদ্যাজাগতিক তর্কবিতর্কে একটি প্রধান প্রবণতা সৃষ্ট হয়েছে এই চেতনা হতে যে পশ্চিমা পুঁজিবাদ "বর্বর," কিংবা কম-উন্নত অ-পশ্চিমা সমাজসমূহকে অধ্যয়ন এবং পরিবেশন করেছে, নির্ভরশীলত্বকে শোষণ করেছে, কৃষকদের নিপীড়ন করেছে, এবং সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে নেটিভ সমাজকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার কিংবা ব্যবস্থাপনা করেছে। এই সচেতনতা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মার্ক্সবাদী কিংবা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নৃবিজ্ঞানে, উদাহরণস্বরূপ, এরিক উল্ফের প্রথম দিকের কাজ, উইলিয়াম রোজবেরির *কফি এ্যান্ড ক্যাপিটালিজম ইন দ্য ভেনেজুয়েলান এ্যান্ডিজ*, জুন ন্যাশ'এর *উই ইট দ্য মাইনস এ্যান্ড দ্য মাইনস ইট আস*, মাইকেল টসিগ'এর *দ্য ডেভিল এ্যান্ড কমডিটি ফেটিশিজম ইন সাউথ আমেরিকা*, এবং আরো অন্যান্য। এই ধরনের বিরুদ্ধ কাজে চমৎকারভাবে অংশীদারিত্ব করেছেন নারীবাদী নৃবিজ্ঞানীরা (উদাহরণস্বরূপ, এমিলি মার্টিনের *দ্য উমান ইন দ্য বডি*, লিলা আবু লুঘদ'এর *ভেইলড সেন্টিমেন্টস*), ঐতিহাসিক নৃবিজ্ঞান (উদাহরণস্বরূপ, রিচার্ড ফক্সের *লায়ন্স অফ দ্য পাঞ্জাব*), সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত কাজ (জিন কমারফ'এর *বডি অফ পাওয়ার, স্পিরিট অফ রেসিসস্টেন্স*), মার্কিনী নৃবিজ্ঞান (উদাহরণস্বরূপ, মৌলবাদ প্রসঙ্গে সুজান হার্ডিং), এবং নিন্দামূলক নৃবিজ্ঞান (শেল্টন ডেভিসের *ভিক্টিমস অফ দ্য মিরেকেল*)।

অন্য প্রধান ধারা হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতাবাদী নৃবিজ্ঞান যেটি সেই সব পণ্ডিতদের দ্বারা চর্চিত যারা সাধারণভাবে সাহিত্য তত্ত্ব, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে লেখা, ডিসকোর্স, এবং ক্ষমতা পদ্ধতির তাত্ত্বিকগণ যেমন ফুকো, রঁলা বার্থ, ক্লিফর্ড গিয়ার্টজ, জাক ডেরিডা, এবং হেডেন হোয়াইট দ্বারা প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও আমি ইতিবাচকভাবে লক্ষ্য করেছি যে, যে পণ্ডিতরা *রাইটিং কালচার* কিংবা *এ্যান্থ্রোপলজি এ্যাজ কালচারাল ক্রিটিক*'এর মত সংকলনে[৫] – দুটি সাম্প্রতিক অতি দৃশ্যমান বই – লেখা দিয়েছেন তাঁদের খুব কমই প্রত্যক্ষভাবে নৃবিজ্ঞানের অবসান চেয়েছেন যেমন কিনা, উদাহরণস্বরূপ, কিছু সাহিত্য পণ্ডিত সাহিত্যের প্রত্যয়ে প্রস্তাব করেছেন। তথাপি আমি ইতিবাচকভাবে এও লক্ষ্য করেছি যে নৃবিজ্ঞানের বাইরে যে

নৃবিজ্ঞানীদের কাজ পড়া হয় তাঁদের সামান্য ক'জনাই এটি গোপন করেন যে তাঁদের ইচ্ছা হল নৃবিজ্ঞান, এবং নৃবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, আরো বেশী সাহিত্যমনস্ক, কিংবা ধরন ও সচেতনতায় সাহিত্য তাত্ত্বিক হতে পারত, কিংবা নৃবিজ্ঞানীদের আরো বেশি ভাবা উচিৎ গ্রন্থময়তা [textuality] নিয়ে এবং আরো কম মাতৃতান্ত্রিক বংশধারা নিয়ে, কিংবা তাঁদের গবেষণায় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায়, যেমন ধরুন উপজাতীয় সংগঠন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, এবং আদিম শ্রেণীকরণ, সাংস্কৃতিক কাব্যশাস্ত্রের [cultural poetics] আরো বেশী কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ।

কিন্তু এই প্রবণতার নীচে আরো কঠিন সমস্যা নিহিত। যে আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক স্বতন্ত্র নৃবৈজ্ঞানিক উপবিভাগে চলমান যেমন এ্যান্ডিয়ান স্টাডিজ বা ভারতীয় ধর্ম, সেগুলোকে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং নৃবৈজ্ঞানিক মহা-পণ্ডিতদের (গিয়ার্টজ, টসিগ, উল্ফ, মার্শল সাহলিন্স, য়োহাননেস ফেবিয়ান, এবং অন্যান্যরা) কাজ প্রকাশ করে যে সামগ্রিকভাবে নৃবিজ্ঞানের সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদা খাঁটি রোগে রোগাক্রান্ত। সম্ভবত এটি এখন মানব বিজ্ঞানের সকল পরিসরের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য। রিচার্ড ফক্সের ভাষায়:

> নৃবিজ্ঞান দৃশ্যতই আজ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বিপন্ন, ততটুকুই যতটুকু নৃবিজ্ঞানীগণ একটি বিপন্ন বিদ্যাজাগতিক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। চাকুরি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রাম, গবেষণা সহায়তা এবং নৃবিজ্ঞানীদের পেশাজীবী মর্যাদা হ্রাসের সাথে পেশাগত ভয় যুক্ত। নৃবিজ্ঞানের প্রতি হুমকি আসছে জ্ঞানকাণ্ডের অভ্যন্তর হতে: সংস্কৃতির দুটি বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি [যেগুলোকে ফক্স ডাকেন সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ এবং সংস্কৃতিবিজ্ঞান] যেগুলো অনেক বেশি শরিকি, এবং খুব কমই তর্করত।[৬]

এটি আগ্রহ উদ্দীপক এবং লক্ষণীয় যে ফক্সের নিজের চমৎকার বইটি, *লায়ন্স অফ দ্য পাঞ্জাব*, যেখান থেকে এই বাক্যগুলো উদ্ধৃত, অপরাপর প্রভাবশালী রোগবিশারদদের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের শতাব্দীর রোগের [mal du siecle] – এটা যে রোগ তাতে আমিও একমত – ধারণায় শেরি অর্টনার'এর মত শরিক,[৭] যে নন্দিত বিকল্প হচ্ছে একটি অনুশীলন, যেটির ভিত্তি হচ্ছে অনুশীলন, যেটি শক্তিপ্রাপ্ত হবে হেজেমনি, সামাজিক পুনরুৎপাদন, এবং মতাদর্শের ধারণা দ্বারা যেগুলো এ্যান্টনিও গ্রামশি, রেমন্ড উইলিয়ামস, আলা টুর্যেঁই, এবং পিয়েঁর বুর্দোর মত অ-নৃবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ধার করা। তা সত্ত্বেও, আমার ধারণা যে কুহ্ন'এর প্যারাডাইম-ক্রান্তির গভীর অনুভূতি কাজ করছে, যেটির ফলশ্রুতি নৃবিজ্ঞানের জন্য নিশ্চয়ই, আমার বিশ্বাস, উৎকণ্ঠা-উৎপাদনকারী।

আমার মনে হয় কিছু (সংগত) ভয় এ ধরনেরও যে, আজকালের নৃবিজ্ঞানীরা পূর্বের মত স্বচ্ছন্দে উত্তর-ঔপনিবেশিক মাঠে যাতায়াত করতে পারেন না। এটি অবশ্য জাতিতাত্ত্বিক রচনার প্রতি একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, ঠিক সেই পরিসরে যেটিতে পূর্বে নৃবিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে সার্বভৌম ছিলেন। এই চ্যালেঞ্জের সাড়া বিবিধ।

কয়েকজনা হটে গেছেন, এক অর্থে, গ্রন্থময়তার রাজনীতিতে [the politics of textuality]। অন্য ক'জনা মাঠ থেকে উৎসারিত হিংস্রতাকে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের বিষয়ে পরিণত করেছেন। এবং তৃতীয়ত, কয়েক'জনা নৃবৈজ্ঞানিক ডিসকোর্সকে সামাজিক পরিবর্তন কিংবা রূপান্তরের মডেল সৃষ্টির পরিসর হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও, কোনো সাড়াই এই প্রকল্প সম্পর্কে অতটা ইতিবাচক নয় যতটা ছিলেন ডেল হাইমস'এর *রি-ইনভেন্টিং এ্যান্থ্রোপলজি*'র সংস্কারবাদী অংশগ্রহণকারীরা কিংবা *ইন সার্চ অফ দ্য প্রিমিটিভ*'এর স্ট্যানলি ডায়মন্ড, এক বিদ্যাজাগতিক প্রজন্ম আগে। পরিশেষে "ইন্টারলকিউটার" শব্দটি। এখানে আবারো আমি ধাক্কা খাচ্ছি, আলাপচারী [ইন্টারলকিউটার] ধারণাটি এতখানি অস্থিতিশীল যে এটি নাটকীয়ভাবে দুটি মৌলিক অমীমাংসাযোগ্য অর্থে বিভাজিত হয়। এক দিকে, এটি প্রতিধ্বনিত হয় ঔপনিবেশিক সংঘাতের একটি সামগ্রিক পটভূমিতে, যেটিতে উপনিবেশকারীরা খোঁজেন একজন *interlocuteur valable**, এবং অপর পক্ষে, উপনিবেশিত মানুষজন ক্রমান্বয়ে বেপরোয়া সমাধান অনুসন্ধানে বাধ্য হন যেহেতু তাঁরা প্রথমে ঔপনিবেশিক কর্তার সূত্রবদ্ধ করা বর্গসমূহে আঁটার চেষ্টা করেন। তারপর, এধরনের সমাধান ব্যর্থ হতে বাধ্য সেটি স্বীকার করে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব সামরিক শক্তি প্যারিস কিংবা লন্ডনকে গ্রহণ করতে বাধ্য করবে যে তাঁরা হচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ আলাপচারী। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে, সেহেতু, সংজ্ঞামাত্রই একজন আলাপচারী হচ্ছেন তিনি যিনি বাধ্য, যিনি সেই শ্রেণীর যেটিকে ফরাসীরা আলজিরিয়ায় *evolue*$^{\Phi}$, *notable*$^{\beta}$, *caid*$^{\psi}$ (স্বাধীনতা পক্ষীয় গোষ্ঠী *beni -wewe* বা শ্বেতাঙ্গ পুরুষের নিগার, এই পদটি সংরক্ষণ করে রাখেন) ডাকতেন, কিংবা এমন একজনা যিনি ফ্যাননের নেটিভ বুদ্ধিজীবীর মত। তিনি কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, তাঁর সিদ্ধান্তমতে কেবলমাত্র চরমভাবে বিরুদ্ধ, সম্ভবত হিংস্র ক্ষিপ্র প্রত্যুত্তরই হচ্ছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সাথে একমাত্র সম্ভাব্য আলাপরীতি।

আলাপচারিতার অপর অর্থ আরো কম রাজনৈতিক। এটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে একটি বিদ্যাজাগতিক কিংবা তাত্ত্বিক প্রতিবেশ হতে উৎসারিত, এবং একটি চিন্তা-নিরীক্ষার [thought experiment] প্রশান্তি'সহ পচন নিবারক, নিয়ন্ত্রিত গুণাবলী ইঙ্গিত করে। এই প্রেক্ষিতে, আলাপচারী হচ্ছেন এমন একজন যাঁকে হয়তবা দরজায় চেঁচামেচি করতে দেখা গেছে। অন্য কোন জ্ঞানকাণ্ড, কিংবা ক্ষেত্র, হতে এসে তিনি এখানে ঢোকার জন্য বিচ্ছিরি ঝামেলা সৃষ্টি করছেন, দারোয়ানের কাছে বন্দুক বা পাথর জমা রেখে, আরো আলাপ চালানোর লক্ষ্যে ভিতরে ঢুকছেন। এই গৃহায়িত ফলশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয় কেতাপূর্ণ একাধিক তাত্ত্বিকভাবে পরস্পরসম্পর্কযুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ, উদাহরণস্বরূপ, বাখতিনের ডায়ালজিসম এবং হেটেরোগ্লসিয়া, য়ুর্গেন হাবারমাসের "আদর্শিক মৌখিক ভাষা পরিস্থিতি" [ideal speech situation] কিংবা রিচার্ড ররটির দার্শনিকদের আলোকচিত্র (*ফিলসফি এ্যান্ড দ্য মিরর অফ নেচার*'এর শেষে), সুসজ্জিত একটি বৈঠকখানায় যাঁরা উজ্জীবিতভাবে বাতচিতরত। আলাপচারীগণের এমন বর্ণনা কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও, এ ধরনের আলাপচারিতা ঘটার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং আত্মসাৎকরণ কিভাবে

সেটির প্রকৃতি বদল করে, এটি অন্তত তার পর্যাপ্ত চিহ্নাদি ধারণ করে। আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হল, এ ধরনের মাজাঘষা করা, সংক্রামক রোগবীজশূন্য আলাপচারী হচ্ছেন পরীক্ষাগারের সৃষ্টি, এটির রয়েছে অবদমিত এবং সেহেতু সংকট এবং সংঘাতের জরুরী পরিস্থিতির সাথে কপট যোগাযোগ, যে পরিস্থিতি প্রথমত তার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়েছে। নারী, প্রাচ্যের মানুষ, কৃষ্ণাঙ্গ, এবং অন্য "নেটিভ"গণ পর্যাপ্ত শোরগোল করার কারণেই তাদের প্রতি মনোযোগী হতে হয়েছে, বলতে গেলে তাদের ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়েছে। এর পূর্বে তাদের উপেক্ষা করা হয়েছিল, উনবিংশ শতকের ইংরেজী উপন্যাসের চাকরদের মতন, উপস্থিত, কিন্তু পটভূমির একটি কার্যকরী অংশ বাদে তাদের ভূমিকা ছিল হিসেবের বাইরে। আলোচনার বিষয় কিংবা গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের মৌলিক এবং গঠনমূলকভাবে ভিন্ন কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া। তাহলে, বিষয়সংগতি থেকেই যায়।

আমার সম্বন্ধে প্রায়শই যে সমালোচনাটি উচ্চারিত হয় এই পর্যায়ে সেটি সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিৎ, আমি সব সময় এ সম্পর্কে কিছু বলতে চেয়েছি যে, ইউরোপের নিকৃষ্ট অন্য উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য চিত্রাঙ্কন প্রক্রিয়ায় আমার কাজ নাকি কেবলমাত্র নেতিবাচক বাহাসে পর্যবসিত হয়েছে যেটি কোন নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক পন্থা বা পদ্ধতি উত্থাপন করে না, এবং অন্য সংস্কৃতিসমূহের সাথে গাম্ভীর্য্য'সহ কারবার করতে পারার পরিবর্তে কেবলমাত্র হতাশা ব্যক্ত করে। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করেছি তার সাথে এই সমালোচনাগুলো সম্পর্কিত, এবং যদিও সমালোচকদের প্রতিটি কথা ধরে সেগুলোর প্রত্যুত্তর করার কোন খায়েশ আমার নেই, আমি এমনভাবে আমার প্রতিক্রিয়া করতে চাই যেটি বর্তমানের আলোচনায় বৌদ্ধিকভাবে প্রাসঙ্গিক।

*'অরিয়েন্টালিজম'*এ আমি যে কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলাম সেটি ছিল একটি প্রতিপক্ষমূলক সমালোচনা কিন্তু কেবলমাত্র পরিসরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র নয়, সেটি একইসাথে ছিল সেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির যেটি সেই ডিসকোর্সটিকে সম্ভাব্য করে তোলে, এটিকে এত টেকসই করে তোলে। জ্ঞানতত্ত্ব, ডিসকোর্স, এবং অরিয়েন্টালিজমের মত পদ্ধতিসমূহের মূল্য হয়ে পড়ে নামমাত্র যদি সেগুলোকে লঘু করে জুতো গোছের বস্তু হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেগুলো ক্ষয় হয়ে গেলে তালি লাগানো যায়, পুরানো এবং ঠিকঠাক করার অযোগ্য হলে ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন বস্তু আনা যায়। প্রাচ্যবাদের মহাফেজখানার মর্যাদা, প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব, এবং পিতৃতান্ত্রিক দীর্ঘায়ু গুরুত্বের সাথে গৃহীত হওয়া উচিৎ কারণ মোটের উপর এটির বৈশিষ্টাবলী একটি জগৎ-সংসারের দৃষ্টিকোণ হিসেবে কাজ করে যেটির রয়েছে গুরুতর রাজনৈতিক শক্তি, এটি কেবলমাত্র জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। সেহেতু, আমার দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদ হচ্ছে একটি কাঠামো যেটিকে একটি গাঢ় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মধ্যে খাড়া করা হয়েছে যেটির প্রধান শাখাকে এটি পরিবেশন করত, এটিকে সম্প্রসারণ করত কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চা হিসেবে নয়, বরং একপক্ষীয় মতাদর্শ হিসেবেও। তা সত্ত্বেও প্রাচ্যবাদ আগ্রাসনকে এটির জ্ঞানচর্চাগত

এবং নন্দনতাত্ত্বিক বাগধারার অধীনে লুকোয়। আমি এগুলো দেখাতে চেয়েছিলাম, উপরন্তু, আমি যুক্তিতর্ক দাঁড় করিয়েছিলাম যে এমন কোন জ্ঞানকাণ্ড, বা জ্ঞানকাঠামো, বা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানতত্ত্ব নেই যেটি বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, এবং রাজনৈতিক গঠন হতে মুক্ত, এগুলো যুগসমূহকে দান করে সেগুলোর বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা।

এখন, আমি যে বিবিধ তাত্ত্বিক এবং ডিসকার্সিভ পুনর্মূল্যায়নের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে এটি সত্য যে তারা এই কলহময় বাস্তবতা হতে পালানোর পথ খোঁজে। তাঁরা দক্ষ গ্রন্থীয় কৌশল [textual strategies] উদ্ভাবনে রত যাতে জাতিতাত্ত্বিক রচনার কর্তৃত্বের প্রতি ফ্যাবিয়েন, তালাল আসাদ, এবং জেরার্ড লেক্লার্কের[৮] তীব্র আক্রমণকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা যায়: এই কৌশলসমূহ হতাশাব্যঞ্জকভাবে ল্যাপ্টালেপ্টি-করা, অসম্ভব রকমের অতি-ব্যাখ্যাকৃত এবং সংঘাতবদ্ধ নৃবৈজ্ঞানিক পরিসরকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি পদ্ধতি তৈরী করেছে। এটিকে ডাকতে পারেন নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। অন্যটি প্রায় পুরোপুরিভাবেই অনুশীলনের উপর মনোনিবেশ করেছে,[৯] ভাবটা এমন যে অনুশীলন হচ্ছে বাস্তবতার এমন একটি পরিসর যেটি এজেন্ট, স্বার্থ, এবং তর্কাতর্কি, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক, দুটিই ব্যতীত। এটিকে ডাকতে পারেন লঘুকারী বাস্তবমুখী প্রতিক্রিয়া।

*'অরিয়েন্টালিজম'*এ উভয় বোধনাশকের কোনটিই আমার মনে হয়নি পোষণ করা সম্ভব। চরম সংশয়বাদিতা হয়ত আমাকে মহাতত্ত্ব ও একান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভূমির অযোগ্য করে তুলেছে। কিন্তু আমার মনে হয়নি যে আমি যে প্রেক্ষিত বর্ণনা করছি তার বাইরে কোন আর্কিমেডীয় অবস্থান রয়েছে যেটিতে আমি নিজেকে অর্পণ করতে পারি, কিংবা একটি অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিমালা উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ করতে পারি যেটি সে নির্দিষ্ট বাস্তবিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিসমূহ হতে মুক্ত যা হতে প্রাচ্যবাদ উৎসারিত, এবং যেটি হতে সেটি পুষ্টি গ্রহণ করে। সে কারণে আমার মনে হয়েছে যে নৃবিজ্ঞানীদের, ইতিহাসবিদদের নয়, এই অবশ্যম্ভাবী সত্য, যেটি জিয়ামবাতিস্তা ভিকো সর্বপ্রথম আকৃতি দান করেন, সেটির কাঠিন্য গ্রহণে সবচাইতে অনিচ্ছুক হওয়া, বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি অনুমান করি যে – এবং এ বিষয়ে আমার আরও বলার আছে – যেহেতু নৃবিজ্ঞান সর্বোপরি, উৎসের মুহূর্ত হতেই, ঐতিহাসিকভাবে বিধিবদ্ধ এবং নির্মিত হয়েছে সার্বভৌম ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক এবং অ-ইউরোপীয় নেটিভ, যিনি, বলতে গেলে, কম মর্যাদার এবং দূরবর্তী স্থানের, এ দুইয়ের মধ্যকার জাতিতাত্ত্বিক অভিঘাতের মুহূর্ত হতে, এখন এটি হচ্ছে কোন এক, বিংশ শতকের শেষার্দ্ধের নৃবিজ্ঞানী যিনি সেই সক্ষমতার মুহূর্তের মর্যাদা চ্যালেঞ্জকারী কাউকে বলেন, " আমাকে তাহলে আরেকটি [মুহূর্ত] প্রদান কর"।[১০]

এই অপ্রাসঙ্গিক আক্রমণ আরেকটু পরে আবার চলবে, যখন আমি এটিরই ফলশ্রুতিতে ফিরে যাবো, যথা, পর্যবেক্ষকের সমস্যামূলে [the problematic of the observer], যেটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত শোধনবাদী নৃবৈজ্ঞানিক ধারায় লক্ষণীয়ভাবে কম-বিশ্লেষিত। এটি বিশেষভাবে সত্য, আমার মনে হয়, সাহলিন্স (তাঁর *আইল্যান্ডস অফ হিস্টরি*), কিংবা উফের (তাঁর *ইউরোপ এ্যান্ড দ্য পিপল উইদআউট হিস্টরি*)

মত দুর্দান্ত মৌলিক নৃবিজ্ঞানীদের কাজের ক্ষেত্রে। এই মৌনতা বজ্রধ্বনির মত, অন্তত আমার নিকট তাই। মহাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কাজে দেখুন, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রয়েছে খুবই বুদ্ধিমান সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক, কিংবা সাহলিন্স এবং উফের কাজে, আপনি হয়ত হঠাৎ লক্ষ্য করবেন কিভাবে কেউ একটি কর্তৃত্বশালী, অনিসন্ধিৎসু, পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিত কণ্ঠস্বরে কথা বলছেন, বিশ্লেষণ করছেন, প্রমাণাদি জড়ো করছেন, তত্ত্বায়ন করছেন, সবকিছু নিয়ে ভাবনা তৈরী করছেন – কিন্তু নিজ বাদে। বক্তা কে? কেন বলছেন, কাকে লক্ষ্য করে বলছেন? এই প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হয় না, যদি বা হয়ও, সেগুলো হয়ে পড়ে, জেমস ক্লিফর্ড যিনি লেখেন জাতিতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব নিয়ে, তাঁর ভাষায়, প্রধানত "কৌশলগত পাসান্দের" ব্যাপার।[১১] "অন্য"দের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, গ্রন্থাদি, এগুলোকে দেখা হয় পশ্চিমা উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে – এবং সেহেতু নিষ্ক্রিয়, নির্ভরশীল – কিংবা সংস্কৃতির এমন পরিসর হিসেবে যেটি হচ্ছে "নেটিভ" এলিটদের। তবে, এই বিষয়টি আরো অধিক আলাপ করার চাইতে, আমি প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয়টির চারপাশের পরিসরে খননকাজ করতে চাইব।

আপনি হয়ত ইতোমধ্যে অনুমান করেছেন যে পরিবেশন, কিংবা "উপনিবেশিত," বা "নৃবিজ্ঞান" এবং এটির "আলাপচারীগণ," এগুলোতে কোন সারবত্তামূলক কিংবা অনড় অর্থ আরোপ করা সম্ভব নয়। শব্দগুলো বিভিন্ন সম্ভাব্য অর্থের মধ্যে দুলতে থাকে কিংবা, কিছু ক্ষেত্রে, দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শব্দগুলো যেভাবে আমাদের মুখোমুখি হয় সে ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচাইতে স্পষ্ট তা হল এগুলো অপ্রতিকারযোগ্যভাবে একাধিক সীমানা এবং চাপ দ্বারা প্রভাবিত, যেগুলো উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সে অর্থে, "পরিবেশন," "নৃবিজ্ঞান," এবং "উপনিবেশিত" এমন প্রেক্ষাপটে নিহিত যেটি কোন পরিমাণ মতাদর্শিক হিংস্রতা দ্বারা খারিজ হবে না। তার কারণ, আমরা সাথে-সাথে সে শব্দাবলীর অস্থিতিশীল এবং বিস্ফোরণমূলক ভাষাগত ব্যবহার যা স্মৃতি হতে জেগে ওঠে তার সাথে ধস্তাধস্তি করতে থাকি, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দ্রুত প্রত্যাবর্তিত হই বাস্তব জগতে, যাতে খুঁজে পেতে পারি এবং দখল করতে পারি নৃবৈজ্ঞানিক পরিসর না হলেও অন্তত সেই সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেটিতে বাস্তবে নৃবৈজ্ঞানিক কাজ সম্পাদিত হয়।

"দুনিয়াদারিত্ব" [worldliness] ধারণাটি আমার প্রায়শই কাজে লেগেছে, দুটো শব্দ সেটির সহজাত হওয়ার কারণে, একটি, "পর-জাগতিক"-এর বিপরীতে সেক্যুলার জগতে বসবাস, এ ধারণাটির কারণে এবং দ্বিতীয়ত, ফরাসী শব্দ *mondanite* যা ইঙ্গিত করে, যে দুনিয়াদারীর গুণাবলী হচ্ছে একটি অনুশীলিত, একটু-আধটু অবসন্ন রুচিশীলতা, সেয়ানাপনা এবং পথেঘাটে চলতে-ফিরতে-জানা ঝানুপনা। নৃবিজ্ঞান এবং দুনিয়াদারিত্বের (উভয় অর্থেই) পরস্পরকে প্রয়োজন, আবশ্যিকভাবে। ভৌগলিক স্থানচ্যুতি, সেক্যুলার আবিষ্কার, এবং অন্তর্নিহিত কিংবা অন্তরীকৃত ইতিহাসসমূহের কষ্টসহিষ্ণু উদ্ধারপ্রকল্প: এগুলো জাতিতাত্ত্বিক রচনার অনুসন্ধানকে একটি সেক্যুলার শক্তির ছাপ প্রদান করে যেটি নির্ভুলভাবে মন-খোলা। তা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত জড়োকৃত ডিসকোর্সসমূহ, সঙ্কেতসমূহ, এবং নৃবিজ্ঞানের অনুশীলনমুখী ধারা, এটির কর্তৃত্বসমূহ, শৃংখলিত কাঠিন্য, কুলুজিবিদ্যাগত মানচিত্র, পৃষ্ঠপোষকতা

এবং সক্ষম বলে স্বীকৃত হওয়ার ব্যবস্থাসমূহ, পুঞ্জীভূত হয়েছে নৃবৈজ্ঞানিক হওয়া'র বিবিধ পদ্ধতিসমূহে। নিষ্পাপ হওয়ার এখন আর প্রশ্নই ওঠে না। এবং, আমরা যদি এমনটি সন্দেহ করি যে আর সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রের মতনই, রীতিমাফিক কাজ-করা সমবায়ের সদস্যদের যুগপৎ হতচেতন এবং বিযুক্ত করে, তাহলে আমরা সকল ধরনের শাস্ত্রীয় দুনিয়াদারিত্ব সম্পর্কে সত্য কিছু একটা বলছি। নৃবিজ্ঞান অনন্য নয়। তথাপি, নৃবিজ্ঞান, আমার নিজের ক্ষেত্র তুলনামূলক সাহিত্যের পরিসরের মতন, অন্যতা এবং ভিন্নতার উপর বর্ণিত, সেই প্রাণচঞ্চল, তথ্যমূলক ধাক্কার উপর যেটি অজানা এবং ভিনদেশীয় সত্য দ্বারা প্রদত্ত, জেরাল্ড ম্যানলি হপকিনের বাক্যাংশ অনুসারে, যেটি হচ্ছে "ভিতরে একদম তরতাজা"। এই দুটি শব্দ, "ভিন্নতা" এবং "অন্যতা," ইতিমধ্যে মাদুলীর মত গুণাবলী সংগ্রহ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো যে কত যাদুকরী, এমনকি অধিবিদ্যামূলক, সেটি দ্বারা হকচকিয়ে না যাওয়া প্রায় অসম্ভব, যেহেতু দার্শনিক, নৃবিজ্ঞানী এবং সাহিত্য তাত্ত্বিকগণ, এবং সমাজবিজ্ঞানীরাও এগুলোর উপর চোখ-ধাঁধানো ক্রিয়াকলাপ করে থাকেন। তা সত্ত্বেও, "অন্যতা," এবং "ভিন্নতা" হচ্ছে, আর সকল সাধারণ পদের মত, সেগুলোর ঐতিহাসিক এবং দুনিয়াদারী প্রেক্ষিত দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্ধারিত। সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রে "অন্য" সম্পর্কে কথা বলা, বর্তমানের নৃবিজ্ঞানীর জন্য, ধরুন, একজন ভারতীয় বা ভেনেজুয়েলার নৃবিজ্ঞানীর তুলনায় বেশ কিছুটা ভিন্ন: য়ুর্গেন গোল্টে "দখলের নৃবিজ্ঞান" [the anthropology of conquest] সম্পর্কে একটি চিন্তাশীল প্রবন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটি হচ্ছে যে, অ-আমেরিকান এবং সে অর্থে, দেশজ নৃবিজ্ঞানও, সাম্রাজ্যবাদের সাথে নিবিড়ভাবে বাঁধা, যেহেতু মহান মহানগরভিত্তিক কেন্দ্র হতে যে বৈশ্বিক ক্ষমতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেটি প্রচণ্ড রূপে অধিপতিশীল।[১২] সে কারণে, যুক্তরাষ্ট্রে নৃবিজ্ঞান চর্চা করার অর্থ কেবলমাত্র একটি বড় দেশে বসে "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা" অনুসন্ধান করা নয়; এটি হবে সেগুলোকে একটি প্রচণ্ড রূপে প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র যেটির বৈশ্বিক ভূমিকা হচ্ছে মহাশক্তির, সে প্রেক্ষিতে আলোচনা করা।

সে কারণে "ভিন্নতা" এবং "অন্যতা"র বস্তুকরণ এবং বিরামহীন উদযাপনকে দেখা যেতে পারে একটি অশুভ প্রবণতা হিসেবে। এটি কেবলমাত্র জনাথান ফ্রিডম্যান যেটিকে বলেছেন "নৃবিজ্ঞানের তামাশাকরণ" [the spectacularization of anthropology] যার মাধ্যমে "গ্রন্থীয়করণ" এবং "সংস্কৃতিকরণ" রাজনীতি এবং ইতিহাস ব্যতিরেকে ঘটে,[১৩] সেটিকে ইঙ্গিত করে না, এটি একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জগতের বিবেচনাহীন আত্মসাৎকরণ এবং অনুবাদকরণ ইঙ্গিত করে যেটি আপেক্ষিকতার শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও, জ্ঞানতাত্ত্বিক যত্ন এবং প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞপনার প্রদর্শন সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যের পক্রিয়া হতে সহজে পৃথক করা সম্ভব নয়। আমি এটি অত্যধিক জোর দিয়ে বলছি কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, নৃবিজ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব, গ্রন্থীয়করণ [textualization], এবং অন্যকরণ সংক্রান্ত বহু কাজ, যেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মালমশলা নৃবিজ্ঞান হতে ইতিহাস এবং সাহিত্য তত্ত্ব পর্যন্ত প্রসারিত, সেগুলোতে মার্কিনী সাম্রাজ্যিক হস্তক্ষেপের এমন ধরনের উল্লেখ প্রায় সম্পূর্ণরূপে

অনুপস্থিত যা তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রভাবিত করতে পারে। বলা হবে যে নৃবিজ্ঞান এবং সাম্রাজ্যের প্রসঙ্গকে আমি খুব মোটা দাগে যুক্ত করেছি, খুব অপৃথকীকৃত ঢংয়ে; এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি বলব কিভাবে – এবং সত্যিকার অর্থে কিভাবে – এবং কবেই বা এগুলো বিযুক্ত ছিল। ঘটনাটি কবে ঘটেছিল তা আমি জানি না, এটি আদৌ ঘটেছিল কিনা তাও জানি না। সে কারণে, এটি ঘটেছিল সেটি ধরে নেয়ার চাইতে, আমরা বরং দেখি মার্কিনী নৃবিজ্ঞানীদের নিকট সাম্রাজ্য প্রসঙ্গের কোনো গুরুত্ব আছে কি না, বাস্তবে বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাদের সকলের জন্য রয়েছে কি না।

বাস্তবতা ভীতি উদ্রেককারী। যেটি সত্য তা হচ্ছে আমাদের বিশাল বৈশ্বিক স্বার্থ রয়েছে, এবং আমরা সেগুলো প্রয়োগ করি। সেনাবাহিনী রয়েছে, রয়েছে পণ্ডিতকূলের বাহিনী যারা রাজনৈতিক, সামরিক এবং মতাদর্শিকভাবে কাজ করে। ভেবে দেখুন, উদাহরণস্বরূপ নিম্নের বাক্যটি যেটি সুস্পষ্টভাবে বৈদেশিক নীতি এবং "অন্য"কে সম্পর্কযুক্ত করে:

> সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (ডি ও ডি) এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যেগুলোর জন্য প্রয়োজন আচরণগত এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ..... বর্তমানে সামরিক বাহিনী কেবলমাত্র যুদ্ধে লিপ্ত নয়। তাদের ব্রতে শান্তিকরণ, সহায়তা প্রদান, "ভাবনার যুদ্ধ," ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসকল ব্রতের লক্ষ্যে প্রয়োজন হচ্ছে, আমাদের যে সামরিক কর্মীবৃন্দের শহুরে ও গ্রামীণ জনসংখ্যার সাথে যোগাযোগ হয়, তাদেরকে বুঝতে পারা–নতুন "শান্তিবিগ্রহ"এর কার্যক্রমে কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে। সমগ্র বিশ্বের বহু দেশে, আমাদের প্রয়োজন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আরো জ্ঞান; তাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, এবং অর্থনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে; এবং তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারার উপর আমাদের বিভিন্ন পরিবর্তন বা উদ্ভাবনের প্রভাব .... নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদি হচ্ছে উপাদান যেগুলো সামরিক সংস্থাসমূহের গবেষণা কৌশলের বিষয়াদিতে গুরুত্ব বহন করে। *গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা অঙ্গীকার:* (১) বিদেশের সামাজিক ও আচরণগত বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং প্রশিক্ষণ ... (২) বৈদেশিক সামাজিক বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রকল্প (৩) সামাজিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ যেটি স্বাধীন দেশজ বিজ্ঞানীগণ সম্পন্ন করবেন ... (৪) বিদেশী এলাকার কেন্দ্রস্থলে প্রধান মার্কিনী গ্রাজুয়েট অধ্যয়নসমূহ সামাজিক বৈজ্ঞানিক কার্যাদি সম্পন্ন করবে ... (৭) এমন ধরনের অধ্যয়নসমূহ যেগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পাদিত হবে ও অ-প্রতিরক্ষা সংস্থার অনুদান-প্রাপ্ত হবে, এবং বিদেশী অনুসন্ধানকারীর সংগৃহীত তথ্যাদির সুযোগ নেবে। তথ্যাদি, সম্পদ এবং বিশ্লেষণী পদ্ধতিসমূহের উন্নতির উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্যাদি অত্যধিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হতে পারে ...

> (৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহির্বিশ্বের সেসব অপরাপর প্রকল্পের সাথে সহযোগিতা করতে হবে যেগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মীবৃন্দকে "মুক্ত বিশ্বে"র বিদ্যাজাগতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদে চলমান প্রবেশাধিকার দেবে।[১৪]

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেই সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থা যেটি পৃষ্ঠপোষক এবং মক্কেলের একটি বিশাল জাল, এবং একই সাথে একটি গোয়েন্দা এবং নীতি-নির্ধারণী সংস্থা যেটি পূর্বের অবস্থার তুলনায় অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী, মার্কিনী সমাজের সকল কিছুকে আচ্ছাদিত করে না। প্রচার মাধ্যম নিঃসন্দেহে মতাদর্শিক মালমশলায় সিক্ত, কিন্তু একইসাথে এটিও সত্য যে, মিডিয়ার সকল কিছু সমভাবে সিক্ত নয়। সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমাদের চিনতে হবে স্বাতন্ত্র্যাবলী, আমাদের পৃথককীরণ করতে পারতে হবে, তবে একইসঙ্গে এটিও যোগ করা উচিৎ যে, এই মোটা দাগের সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি না দিলে চলে না যে, পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাস্তা কাটে সেটি বেশ প্রশস্ত, এবং বলতে গেলে, এটি কেবলমাত্র একটি রেগান কিংবা একাধিক কার্কপ্যাট্রিকের কারণে নয়, বরং এটি গুরুতরভাবে নির্ভরশীল সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স, জ্ঞান কারখানা, গ্রন্থ এবং গ্রন্থপনার উৎপাদন ও বিতরণের উপর, সংক্ষেপে বললে, সাধারণ নৃবৈজ্ঞানিক পরিসর হিসেবে যে "সংস্কৃতি", যেটি সাংস্কৃতিক কবিত্ব ও গ্রন্থনাকরণের ক্ষেত্রে বাঁধাধরা ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়, সেটির উপর নয় বরং বেশ-নির্দিষ্টভাবে আমাদের সংস্কৃতির ওপর।

বস্তুগত স্বার্থের কারণে আমাদের সংস্কৃতির গরজ আরো বেশি, লোকসান বহু গুণের। এসব কেবলমাত্র যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়াদিতে বিজড়িত নয়—তার কারণ, সাধারণভাবে যদি আপনি অ-ইউরোপীয় বিশ্বকে একটি সাপেক্ষিক কিংবা নিকৃষ্ট অঞ্চলে পরিণত করে ফেলেন, সেটিকে আক্রমণ করা, সেটিকে শান্ত করা আরো সহজ—এগুলো অর্থনৈতিক বরাদ্দকরণ, রাজনৈতিক প্রাধান্যপ্রদান, এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আধিপত্য ও অসমতার প্রশ্নে বিজড়িত। আমরা এখন আর এমন একটি বিশ্বে বসবাস করি না যেটির তিন-ভাগ শান্তিপূর্ণ এবং অনুন্নত। তা সত্ত্বেও, আমরা এখনো একটি কার্যকরী জাতীয় ধারা প্রবর্তন করিনি যেটির ভিত্ হচ্ছে উৎকৃষ্টতার নিয়তির তত্ত্বের পরিবর্তে, যেটি সকল সাংস্কৃতিক মতাদর্শের কম-বেশী গুরুত্বারোপের বিষয়, আরো সমতাভিত্তিক এবং অ-জোরপ্রদানকারী কিছু। এ প্রেক্ষিতে উৎকৃষ্টতার বিশেষ সাংস্কৃতিক ঢং প্রকাশ পায়—আমি একটি গৎবাঁধা উদাহরণ উল্লেখ করছি—আলী মাজরুইয়ের উপর *নিউ ইয়র্ক টাইমস*'এর নির্বোধ আক্রমণে (২৬শে অক্টোবর ১৯৮৬), কারণ তিনি আফ্রিকান হিসেবে আফ্রিকানদের নিয়ে চলচ্চিত্র বানানোর স্পর্ধা দেখিয়েছেন, যতদিন আফ্রিকাকে দেখা হবে ইতিবাচকভাবে এমন একটি অঞ্চল হিসেবে যেটি ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিকতা প্রদত্ত সভ্যকারী আধুনিকায়নে লাভবান হয়েছে ততদিন সহনশীলতা প্রদর্শন করা হবে; কিন্তু যদি আফ্রিকানরা এটিকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের কারণে বিপর্যস্ত, এ হিসেবে এখনো দেখেন, তাহলে এটিকে সাইজ করতে হবে, এটিকে দেখাতে হবে মূলগতভাবে নিকৃষ্ট হিসেবে, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ চলে যাওয়ার পর পতিত হয়ে যাওয়া হিসেবে। এবং সেহেতু

বাগাড়ম্বরতার অভাব নেই–উদাহরণস্বরূপ, প্যাস্কাল ব্রুক্নারের *টিয়ার্স অফ দ্য হোয়াইট ম্যান*, ভি এস নাইপলের উপন্যাসসমূহ, কনর ক্রুজ ও'ব্রায়ানের সাম্প্রতিক সাংবাদিকতা–যেটি সেই দৃষ্টিকে পুনর্শক্তি যোগায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরের নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাকি বিশ্বের মধ্যে কী ঘটে সে প্রসঙ্গে আমাদের রয়েছে একটি বিশেষ দায়িত্ব, যে দায়িত্ব লঘু কিংবা পালিত হয় না এটি বলে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো খারাপ। বিষয়টি হল, এই দেশ এবং এটির মিত্রদের ব্যাপারে আমরা দায়ী, এবং সে কারণে এটিকে প্রভাবিত করার জন্য আমরা আরো যোগ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য নয়। সে কারণে আমাদের সংশয়াপন্ন হয়ে প্রথমে অনুধাবন করতে হবে–সবচাইতে দৃষ্টিগোচরটির কথা উল্লেখ করছি–কিভাবে মধ্য ও লাতিন আমেরিকায়, এবং মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকায় ও এশিয়ায়ও, পূর্বতন মহান সাম্রাজ্যসমূহের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান অধিপতিশীল বহির্শক্তি হিসেবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এটি বলা অত্যুক্তি হবে না যে সৎভাবে দেখলে খেরোখাতার অবস্থা ভালো নয়, অর্থাৎ, যদি না আমরা এ ধারণাটি সমালোচনাহীনভাবে গ্রহণ করি যে আমাদের পাওনা হচ্ছে একটি পুর্ণাঙ্গভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নীতি যেটির লক্ষ্য হচ্ছে অপর রাষ্ট্রসমূহ, যেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা মার্কিনী নিরাপত্তা স্বার্থে অধি-গুরুত্বপূর্ণ, এটি হতে পারে আকারে-ইঙ্গিতে কিংবা ঘোষিত, সেগুলোকে প্রভাবিত করা, প্রভুত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ করায় চেষ্টারত থাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে প্রতিটি মহাদেশে মার্কিনী সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে, এবং নাগরিক হিসেবে আমরা যেটি কেবলমাত্র উপলব্ধি করতে শুরু করেছি তা হল এসব হস্তক্ষেপসমূহ বহু জটিল এবং ব্যাপক, এগুলো ঘটে বহুবিধভাবে, এবং এগুলোতে জাতীয় বিনিয়োগ বিশাল। এগুলো যে ঘটে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং এটিই হচ্ছে, উইলিয়াম এ্যাপেলম্যান উইলিয়ামের ভাষায়, সাম্রাজ্য হচ্ছে একটি জীবন যাপন পদ্ধতি। ইরানগেটের চলমান উন্মোচন এই জটিল হস্তক্ষেপের অংশবিশেষ, তা সত্ত্বেও এটি লক্ষ্য করা জরুরী যে বিশাল প্রচার মাধ্যম এবং মতামত বন্যায় খুব অল্প-সামান্য মনোযোগ দেয়া হয়েছে এই বিষয়ে যে, আমাদের ইরান এবং মধ্য আমেরিকার নীতিমালা–সেগুলো হতে পারে ইরানের "মধ্যপন্থী"দের মধ্যে একটি ভৌগোলিক-রাজনৈতিক ফাঁকের সুযোগ-সন্ধানী হওয়া, কিংবা নিকারাগুয়ার বৈধভাবে গঠিত এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কন্ট্রা "মুক্তি-যোদ্ধাদের" সাহায্য প্রদান–হচ্ছে নাঙ্গা সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা।

মার্কিনী নীতির এই সুস্পষ্ট দিক নিয়ে আমি বেশী সময় ব্যয় করতে চাই না, এবং এ কারণে আমি উদাহরণ দেব না, ও সংজ্ঞার বোকা-বোকা বিতর্কে জড়াব না। আমরা যদি মেনেও নেই, যেমনটি অনেকেই নিয়েছেন, যে বহির্বিশ্বে মার্কিনী নীতি হচ্ছে মূলত পরার্থবাদী এবং মুক্তি ও গণতন্ত্রের মত অনিন্দনীয় লক্ষ্যে নিয়োজিত, এ বিষয়ে সন্দেহবাদী হওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। কারণ আমরা কি, অন্তত আপাত দৃষ্টিতে, জাতি হিসেবে ফ্রান্স ও বৃটেন, স্পেন ও পর্তুগাল, হল্যান্ড ও জার্মানি যা যা করেছিল, সেটিরই পুনরাবৃত্তি করছি না? এবং আমরা কি দৃঢ়তা এবং ক্ষমতার সুবাদে মনে করি না যে আমরা পূর্বতন নোংরা সাম্রাজ্যবাদী অভিযান হতে মুক্ত এবং আমরা কি আমাদের

বিশাল সাংস্কৃতিক অর্জন, আমাদের সমৃদ্ধি, আমাদের তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানতত্ত্বীয় সচেতনতার প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখাই না? তাছাড়া, এমন একটি অনুমান কি আমাদের মধ্যে নেই যে আমাদের ভাগ্য হচ্ছে বিশ্বকে শাসন করা ও নেতৃত্ব প্রদান করা, এমন এক ভূমিকা যা আমরা বনের মোষ চরাতে যেয়ে নিজেদের প্রদান করেছি?

২

সংক্ষেপে বললে, গভীর, প্রচণ্ডভাবে বিপন্ন এবং বিপন্নতা উদ্রেককারী প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়েছে জাতিগতভাবে, এবং পূর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্যিক দৃশ্যপটে, অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে–অপর সংস্কৃতি, অপর রাষ্ট্র, অপর ইতিহাস, অপর অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, মানুষজন, এবং নিয়তি। এ প্রশ্নের সমস্যা হচ্ছে যে সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তবতার বাইরে কোন দৃকপট নেই, অসম সাম্রাজ্যিক এবং অ-সাম্রাজ্যিক ক্ষমতাসমূহের মধ্যকার সম্পর্কের বাইরে, বিবিধ অন্যের মধ্যে, এমন একটি দৃকপট যেটি নিজকে খোদ চলমান সম্পর্কসমূহের বোঝাপূর্ণ স্বার্থ, অনুভূতি, এবং মুখোমুখি হওয়ার ধারণাবলীর বিচার, মূল্যায়ন এবং ব্যাখ্যার জ্ঞানতত্ত্বীয় সুবিধাদি হতে মুক্তি প্রদান করবে। আমরা যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাদ বাকি বিশ্বের যুক্ততা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করি, আমরা হচ্ছি, বলতে গেলে, যুক্ততার অংশ, সেগুলির বাইরে, সেগুলির উর্ধ্বে নই। এ কারণে বুদ্ধিজীবী, মানবতাবাদী, এবং সেক্যুলার সমালোচক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জাতি এবং ক্ষমতার এই বিশ্ব-সংসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটিকে বাস্তবতার ভিতর হতে উপলব্ধি করা, এবং অংশগ্রহণকারী হিসেবে, বিযুক্ত পর্যালোচক হিসেবে নয় যাঁরা, ইয়েটসের চমৎকার সেই বাক্যের অলিভার গোল্ডস্মিথের মতন, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমাদের মনের মধুপাত্রে পান করে। এখন ঘটনা হল, সাম্প্রতিক ইউরোপীয় এবং মার্কিনী নৃবিজ্ঞানের ইদানিংকালের যাত্রা এই সমস্যাটির হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন ও বিবাদসমূহের লক্ষণাদি প্রকাশ করে। সেই সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ইতিহাস ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রধান বিধিবদ্ধকারী উপাদান হিসেবে ধারণ করে বহিরাগত পশ্চিমা জাতিতত্ত্বকারী-পর্যবেক্ষক এবং একটি আদিম, কিংবা অন্তত ভিন্ন কিন্তু নিঃসন্দেহে দুর্বল এবং অল্প উন্নত, অ-পশ্চিমা সমাজ। *কিম*'এ রুডয়ার্ড কিপলিং সেই সম্পর্কের রাজনৈতিক অর্থ নিরূপণ করেন এবং সেটিকে অসাধারণ শিল্পীয় ন্যায্যতাবোধের সাথে দেহবদ্ধ করেন কর্নেল ক্রেইটনের চরিত্রে, সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিতত্ত্বকারী, এবং একই সাথে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, সেই তথাকথিত মহা খেলায়, যেটির অংশ হচ্ছে তরুণ কিম। যাঁরা এই অনতিক্রম্য অসামঞ্জস্যতার মধ্যে কারবার করেন যথা, একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা যেটির ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগ, এবং অন্য'কে বিশদব্যাখ্যাদানমূলকভাবে [hermeneutically] এবং সহানুভূতিশীলভাবে এমন পদ্ধতিসমূহ দ্বারা উপলব্ধি করার একটি বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক কামনা, যেটি সবসময় বলপ্রয়োগ দ্বারা সংকুচিত এবং সংজ্ঞায়িত নয়, আধুনিক নৃবিজ্ঞান সেই তাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিক কাজের সাহায্যে আমাদের একইসাথে স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং আচ্ছন্ন করে, সেই সমস্যাজনক ঔপন্যাসিক প্রাক-চিত্রনটি।

এসকল প্রচেষ্টা সার্থকতা অর্জন করে, না কি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় সেটি এই প্রচেষ্টাটিকে বিশিষ্টতা দানকারী বিষয়ের তুলনায় কম আগ্রহের, কারণ শেষোক্তটিকে সম্ভব করে তোলে সাম্রাজ্যবাদী পটভূমি সম্বন্ধে সচেতনতা, প্রকটভাবে লজ্জাবনত কিন্তু গোপন-করা, যেটি সকল কিছু সত্ত্বেও, সর্বব্যাপৃত এবং অবশ্যম্ভাবী। কারণ, বাস্তবে, আমার জানা মতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ উপলব্ধি ছাড়া আমাদের নিজ সংস্কৃতি হতে জগৎ-সংসারকে উপলব্ধি করার কোন পথ নেই (কথা প্রসঙ্গে, এমন একটি সংস্কৃতি যেটির রয়েছে নির্মূল ও অন্তর্ভুক্তিকরণের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস)। এবং এটি হচ্ছে, আমার মতে, রাজনৈতিক এবং ব্যাখ্যাদানকারী গুরুত্বের দিক হতে অসাধারণ একটি সাংস্কৃতিক সত্য, কারণ এটিই সত্যভাবে সীমারেখা সংজ্ঞায়ন করে, এবং কিছুটা, "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা"র মতন নৈর্ব্যক্তিক এবং ভিত্তিহীন প্রত্যয়কে সক্ষমতা দান করে। যে আসল সমস্যাটি আমাদের ভূতের মতন তাড়া করে, সেটি কিন্তু রয়েই যায়: একটি চলমান কর্মসাধনা হিসেবে নৃবিজ্ঞান এবং অপর পক্ষে, একটি চলমান সংশ্লিষ্টতা হিসেবে সাম্রাজ্য, এ দুইয়ের সম্পর্ক।

কেন্দ্রীয় জাগতিক সমস্যামূল [problematic] যখন সুস্পষ্টভাবে বিবেচনার জন্য পুনর্স্থাপিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্তত তিনটি নির্ণীত বিষয় পুনর্নিরীক্ষণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত হয়। প্রথম হচ্ছে আমি পূর্বেই যেটির উল্লেখ করেছি, পর্যবেক্ষকের বিধিবদ্ধকারী ভূমিকা, জাতিতাত্ত্বিক "আমি" কিংবা সাবজেক্ট, যার মর্যাদা, ক্রিয়া পরিসর, এবং একইসঙ্গে চলমান কেন্দ্রটি, লজ্জাজনক দৃঢ়তার সাথে খোদ সাম্রাজ্যিক সম্পর্কটিকে ছোঁয়। দ্বিতীয় হচ্ছে ভৌগোলিক মনোভঙ্গি, যেটি অভ্যন্তরীণভাবে অতি প্রয়োজনীয়, অন্তত ঐতিহাসিকভাবে, জাতিতাত্ত্বিক রচনার লক্ষ্যে। যে ভৌগোলিক প্রতীকী-বিষয়বস্তু পশ্চিমের বহু সাংস্কৃতিক কাঠামোতে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটি নিয়মিত সমালোচকদের নিকট সশ্রদ্ধ অগ্রাধিকার পেয়েছে কালগততার [temporality] তুলনায়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, আমার বিশ্বাস, খোদ আমাদের সাম্রাজ্য, এবং একইসাথে ইতিহাস রচনা, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, এবং আধুনিক আইনী কাঠামোসমূহের বিবিধ ধরন হতো না, যদি না গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং কল্পনা-নির্ভর প্রক্রিয়াসমূহ পরিসরকে উৎপাদন, সংগ্রহ, ও অধীনস্ত করায়, সেটিতে বসতিস্থাপন করায়, ক্রিয়াশীল হ'ত। এই বিষয়টি আলোকিত হয়েছে সমসাময়িক কিন্তু পরস্পরের সাথে তুলনা-নিরর্থক বইসমূহে, যেমন নীল স্মিথের *আনইভেন ডিভেলপমেন্ট*, কিংবা রনজিৎ গুহ'র *রুল অফ প্রপার্টি ফর বেঙ্গল*, অথবা এ্যাল্ফ্রেড ক্রসবি'র *ইকলজিকাল ইমপিরিয়ালিজম*, যে সকল কাজ অনুসন্ধান করে কিভাবে নৈকট্য এবং দূরত্ব, দখল এবং রূপান্তরের একটি গতিশীলতা তৈরী করে যেটি আত্ম এবং অপরের সম্পর্কের প্রাচীরবেষ্টিত পুঙ্খানুপুঙ্খাঙ্কনে অনধিকার প্রবেশ ঘটায়। জাতিতাত্ত্বিক রচনায়, ভূগোলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ ক্ষমতার অনুশীলনটি তীব্র। তৃতীয় হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকীরণের বিষয়টি, গবেষকের তুলনামূলকভাবে প্রাইভেট পরিসর এবং তাঁর কর্মচক্র হতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিংবা প্রতিবেদনমূলক শাস্ত্রীয় কাজ স্তরে-স্তরে ছড়িয়ে নীতিমালা সৃষ্টি করে, নীতিমালা প্রয়োগ করে, এবং—এটি কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—পাবলিক প্রচারমাধ্যমের

দৃশ্যকল্পসমূহে কঠোর নিয়মানুবর্তী জাতিতাত্ত্বিক পরিবেশনের পুনর্সংবহন ঘটায়, যা এই নীতিসমূহকেই পুনর্শক্তি যোগায়। সুদূর কিংবা আদিম কিংবা "অন্য" সংস্কৃতি, সমাজ, মানুষজনকে নিয়ে করা কাজ কিভাবে মধ্য আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্ভরশীলতা, অধস্তনতা কিংবা হেজেমনির সক্রিয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহে অন্তর্ভুক্ত হয়, যোগসূত্র তৈরী করে, বাধাগ্রস্ত কিংবা প্রবল হয়ে উঠে?

দুটি উদাহরণ, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকা, সাক্ষ্য প্রমাণাদি হাজির করে যে বিশেষায়িত "বিষয়"-সংক্রান্ত পাণ্ডিত্য এবং পাবলিক নীতিমালার মধ্যে একটি সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, যেটি প্রচার মাধ্যমীয় পরিবেশনে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার পরিবর্তে নেটিভ সমাজের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ এবং নৃশংসতার ব্যবহারে পুনর্শক্তি যোগায়। বর্তমানে পাবলিক ডিসকোর্সে "সন্ত্রাসবাদ" কমবেশী স্থায়ীভাবে ইসলামের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে, অধিকাংশ মানুষজনের নিকট এটি একটি রহস্যমূলক ধর্ম কিংবা সংস্কৃতি, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (ইরানের বিপ্লবের পর, লেবানন এবং ফিলিস্তিনের বিবিধ বিদ্রোহের পর) "গুণী-জ্ঞানী" আলোচনায় এটি একটি বিশেষ ভীতি-প্রদর্শনকারী আকৃতি লাভ করেছে।[১৫] ১৯৮৬ সনে, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত) সম্পাদিত সংকলন *টেরোরিজম: হাউ দ্য ওয়েস্ট ক্যান উইন*'এ ছিল সার্টিফিকেটধারী প্রাচ্যবাদীদের লেখা তিনটি প্রবন্ধ, যার প্রতিটি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে যে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ সংযুক্ত। এধরনের বক্তব্য বাস্তবে যা উৎপাদন করে তা হল লিবিয়াকে বোমা মারার প্রতি সম্মতি, এবং একই ধরনের অভিযানের স্বপক্ষে স্থূল ন্যায়পরায়ণতাবোধ, যেহেতু মানুষজন ইতোমধ্যেই বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে ছাপাক্ষরে ও টেলিভিশন মারফৎ জেনে ফেলেছেন যে ইসলাম হচ্ছে, বলতে গেলে, একটি সন্ত্রাসবাদী সংস্কৃতি।[১৬] একটি দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত ডিসকোর্সে "ইন্ডিয়ান" শব্দটিকে ঘিরে যে জনপ্রিয় অর্থ সেটি, বিশেষ করে ইন্ডিয়ানগণ এবং সন্ত্রাসবাদ (কিংবা ইন্ডিয়ানগণের সাথে একটি পশ্চাৎপদ, স্থবির আদিম জনগোষ্ঠী ও প্রথাকৃত হিংস্রতা) যেহেতু একত্রিত। পেরুর সাংবাদিকদের একটি এ্যান্ডীয় গণহত্যা প্রসঙ্গে মারিও ভার্গাস লোসা'র বিখ্যাত বিশ্লেষণ ("ইনকোয়েস্ট ইন দি এ্যান্ডিস: এ ল্যাটিন এ্যামেরিকান রাইটার এক্সপ্লোরস দ্য পলিটিকাল লেসন্স অফ এ পেরুভিয়ান ম্যাসেকার," *নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন*, ৩১ জুলাই ১৯৮৩)'এর পত্তনী হচ্ছে এ ধারণা যে এ্যান্ডিয়ান ইন্ডিয়ানগণ সহজেই বিশেষ ভয়ংকর ধরনের বাচবিচারহীন হত্যা করেন; ভার্গাস লোসা'র গদ্য ইন্ডিয়ান রিচ্যুয়াল, পশ্চাৎপদতা, অন্ধকারাচ্ছন্ন অপরিবর্তনশীলতা, এসব বাক্যে ভরপুর যেগুলো সবই নৃবৈজ্ঞানিক বর্ণনার চূড়ান্ত কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত পক্ষে, কিছু বিশিষ্ট পেরুভীয় নৃবিজ্ঞানীগণ ছিলেন সে প্যানেলের সদস্য (ভার্গাস লোসার সভাপতিত্বে) যেটি গণহত্যার তদন্ত অনুষ্ঠিত করে।

এই বিষয়গুলো কেবলমাত্র তাত্ত্বিক গুরুত্বের নয়, প্রাত্যহিক গুরুত্বেরও। সাম্রাজ্যবাদ, সাগরের ওপারের ভূখ ও জনসমষ্টির নিয়ন্ত্রণ, বিকশিত হয় লাগাতারভাবে মনশ্চক্ষে বিবিধ ইতিহাস, সাম্প্রতিক অনুশীলন এবং নীতিমালা'সহ, বিভিন্নভাবে অঙ্কিত

সাংস্কৃতিক যাত্রাসমূহের সাহায্যে। তা সত্ত্বেও ইতোমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে আমাদের বেশ বড়-সড় একটি সাহিত্য ভাণ্ডার, যেটি একটি আবেগান্বিত তাত্ত্বিক এবং বাস্তবানুগ বক্তব্য উদ্দিষ্ট করে এলাকা অধ্যয়নের [area studies] পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের প্রতি, এবং নৃবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের প্রতি। সাম্রাজ্যবাদ হতে ভূগোলসমূহ, ইতিহাসসমূহ, এবং সংস্কৃতিসমূহ পুনরুদ্ধারের অংশ হচ্ছে এই সংশোধনবাদী উত্তর-ঔপনিবেশিক উদ্দিষ্টকরণ, আবার এটি একইসাথে বিবিধ বিশ্ব ডিসকোর্সে অনুপ্রবেশের একটি সমতাভিত্তিক পন্থাও। মনে পড়ে আনোয়ার আব্দেল মালেক ও আব্দুল্লাহ লারুইয়ের কথা, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর মত মানুষজনের কথা, সি এল আর জেমস এবং আলী মাজরুই, বিবিধ গ্রন্থ যেমন ১৯৭১এর বান্দুং ডিক্লারেশন (যেটি সরাসরি নৃবিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদ, কপটতা এবং সুবিধাবাদিতার অভিযোগ উত্থাপন করে), উপরন্তু নর্থ-সাউথ রিপোর্ট এবং দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন অর্ডার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই মালমশলার খুব অল্পই নগরীয় কেন্দ্রের অন্দর মহলে পৌঁছায়, কিংবা সাধারণ শাস্ত্রীয় বা ডিসকোর্সীয় আলোচনায় প্রভাব ফেলে। প্রকৃত পক্ষে, পশ্চিমা আফ্রিকাবিদগণ আফ্রিকীয় লেখকদের ব্যবহার করেন তাঁদের গবেষণার উৎস সূত্র হিসেবে, পশ্চিমা মধ্যপ্রাচ্যবিদগণ আরব কিংবা ইরানের গ্রন্থসমূহকে তাঁদের গবেষণার মৌলিক সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে দেখেন, যেখানে কিনা সাবেক-উপনিবেশিতদের তর্কাতর্কি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিজড়নের প্রত্যক্ষ, এমনকি নাছোড়বান্দা, অনুরোধসমূহ প্রধানত উপেক্ষিত হয়।

এসব ক্ষেত্রে তর্ক করা, ঘন বর্ণনা [thick description] এবং আবছা ধরন [blurred pattern], এই ফ্যাশনগুলো বাইরের কণ্ঠস্বরের শোরগোল, যা সাম্রাজ্য এবং আধিপত্য সংক্রান্ত দাবিদাওয়া বিবেচনার জন্য উত্থাপন করছে সেটিকে ঢুকতে দিচ্ছে না বা আটকাচ্ছে, অপ্রতিহতযোগ্য। প্রায়শ যেভাবে অঙ্কিত হয় তা সত্ত্বেও, নেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র একটি জাতিতাত্ত্বিক সত্য নয়, এটি প্রধানত কিংবা নীতিগতভাবে একটি বিশদব্যাখ্যাদানকারী নির্মাণও নয়; এটি হচ্ছে নৃবিজ্ঞান শাস্ত্র এবং অনুশীলনের ("বহিরাগত" ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে) প্রতি একটি বড়সড়ভাবে চলমান, দীর্ঘকালীন, এবং টিকে থাকা প্রতিপক্ষীয় প্রতিরোধ, গ্রন্থময়তা হিসেবে নয় বরং রাজনৈতিক আধিপত্যের একটি প্রত্যক্ষ এজেন্ট হিসেবে।

এতদসত্ত্বেও চলমান নৃবৈজ্ঞানিক কাজে রয়েছে চিত্তাকর্ষক, তথাপি সমস্যামূলক প্রচেষ্টাসমূহ যা এই উপলব্ধির সম্ভাব্য ফলশ্রুতিকে স্বীকার করে। রিচার্ড প্রাইসের বই *ফার্স্ট টাইম* সুরিনামে'র সারামাকা জনগোষ্ঠীকে নিরিখ করে, এমন একটি জনগোষ্ঠী যেটির বেঁচে থাকার উপায়ন্তর হচ্ছে কার্যত একটি গোপন জ্ঞানকে গোষ্ঠীগুলোতে ছড়িয়ে দেয়া, যে জ্ঞানকে তাঁরা ফার্স্ট টাইম নামে ডাকেন: সে কারণে *ফার্স্ট টাইম*, অষ্টাদশ শতকীয় ঘটনাবলী যা সারামাকাদের দান করে তাদের জাতীয় পরিচিতি, হয়ে "সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, এবং রক্ষিত"। প্রাইস বেশ অনুভূতিশীলভাবে বহিরাগত চাপের মুখোমুখি প্রতিরোধের এই ধরনটিকে উপলব্ধি করেন, এটিকে সযত্নে নথিবদ্ধ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি যখন এ প্রশ্নটি তোলেন, "সে মৌলিক জিজ্ঞাসা যে, যদি

তথ্য প্রকাশিত হয়ে যায় যেটি তার প্রতীকী ক্ষমতা অর্জন করে আংশিকভাবে গোপন হওয়ার কারণে সেটি অকার্যকর করে তোলে কি না সে তথ্যের অর্থ," তিনি তখন এ ধরনের যন্ত্রণাদায়ক নৈতিক বিষয়াদি নিয়ে খুব সংক্ষেপিত সময়ের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, গোপন তথ্য প্রকাশ করা শুরু করেন।[১৭] জেম্‌স সি স্কটের অবিস্মরণীয় বই *ওয়েপন্স অফ দ্য উইক: এভ্‌রিডে ফর্ম্‌স অফ প্রেজেন্ট রেজিজটেন্স*'এ একই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। স্কট চমৎকারভাবে দেখিয়ে দেন কিভাবে জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনাসমূহ বহিরাগত পদার্পণের প্রতি কৃষক প্রতিরোধের একটি "পুর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি" পেশ করে না, করতে পারে না, যেহেতু কৃষক কৌশলমাত্রই (পা ছ্যাঁচড়ানো, দেরী করা, খেয়ালিপনা, যোগাযোগহীনতা, ইত্যাদি) হচ্ছে ক্ষমতার অবাধ্য হওয়া।[১৮] এবং যদিও স্কট হেজেমনি প্রতিরোধের একটি চমৎকার প্রত্যক্ষণভিত্তিক তাত্ত্বিক বর্ণনা পেশ করেন, তিনি ঠিক সেই প্রতিরোধ যেটির সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা, যেটিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, সেটির শক্তিমত্তা ফাঁসের মাধ্যমে, এক অর্থে, সেটিকে লঘু করেন। আমি প্রাইস ও স্কটের উল্লেখ করছি কোনভাবেই তাঁদের অভিযুক্ত করার লক্ষ্যে নয় (সেটি তো দূরের কথা, যেহেতু তাঁদের বইগুলো অত্যধিক মূল্যবান) বরং নৃবিজ্ঞান সম্মুখিত কিছু তাত্ত্বিক স্ববিরোধী সত্য এবং ঘোষিত দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করার লক্ষ্যে।

৩

শুরুতেই যেমনটা বলেছিলাম, এবং এটি প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন যিনি ভেবেছেন সেই তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে যেগুলো এখন খুব স্পষ্টতই প্রতীয়মান, অনেক ধার-কর্জ করা হয়েছে সংলগ্ন পরিসরগুলো হতে, সাহিত্য তত্ত্ব, ইতিহাস, এবং ইত্যাদি হতে, কিছুটা কারণ এগুলির অধিকাংশই রাজনৈতিক বিষয়াদির কিনার ঘেঁষে যায় যেহেতু রাজনীতি নিয়ে আলাপ করার চাইতে কাব্যশাস্ত্র নিয়ে আলাপচারিতা আরো সহজ। তা সত্ত্বেও, ধীরে-ধীরে নৃবিজ্ঞানকে দেখা হয় একটি বৃহত্তর, আরো জটিল ঐতিহাসিক সমগ্রের অংশ হিসেবে, যেটি পূর্বের ধারণার তুলনায় পশ্চিমা ক্ষমতার পোক্তকরণের সাথে আরো বেশী ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জর্জ স্টকিং এবং কার্টিস এম হিন্সলির সাম্প্রতিক কাজ হচ্ছে বিশেষভাবে শক্তিশালী উদাহরণ,[১৯] একই সাথে তালাল আসাদ, পল র‍্যাবিনও, এবং রিচার্ড ফক্স সৃষ্ট বিবিধ ধরনের কাজ। চূড়ান্ত অর্থে এই পুনর্সংযুক্তিকরণের কারণ হচ্ছে, আমার মনে হয়, প্রথমত বয়ান পদ্ধতি [narrative procedures] সম্পর্কে আমাদের অর্জন করা নতুন এবং কম আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ উপলব্ধি, দ্বিতীয়ত বিকল্প এবং প্রতি-আধিপত্যবাদী অনুশীলনী ধারণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের অধিক সচেতনতা। আমি এখন উভয় বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানে বয়ান এখন অর্জন করেছে একটি প্রধান সাংস্কৃতিক সম্মিলনের মর্যাদা। রেনাটো রোজাল্ডো'র অবিস্মরণীয় কাজের সাথে যাঁরাই পরিচিত তাঁদের কেউই এটি বুঝতে ব্যর্থ হবেন না। হেডেন হোয়াইটের *মেটা হিস্টরি* এই ধারণাটি প্রবর্তন করে যে বয়ান অনুশাসিত হয় trope এবং genre দ্বারা – রূপক, লক্ষণা, সিনেকড্যাকি, পরিহাস, রূপক-বর্ণনা এবং ইত্যাদি–যেটি আবার নিয়ন্ত্রিত

করে, এমন কি উনবিংশ শতকের সর্বোত প্রভাবশালী ইতিহাসবিদ উৎপাদন করে, এমন মানুষ যাঁদের ঐতিহাসিক কাজ সম্পর্কে অনুমান ছিল যে, দার্শনিক এবং/অথবা মতাদর্শিক ধারণা প্রত্যক্ষণভিত্তিক সত্য দ্বারা সমর্থিত। হোয়াইট বাস্তব এবং আদর্শের প্রধানত্ব স্থানচ্যুত করেন; সে স্থানে তিনি স্থাপন করেন সর্বজনীন আনুষ্ঠানিক সঙ্কেতের কঠোর বয়ানগত এবং ভাষাভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ। তিনি যেটি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, কিংবা করতে চান নি তা হল, ইতিহাসবিদদের নিকট বয়ানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্বেগ, কেন, উদাহরণস্বরূপ, জেকব বার্কহার্ট এবং মার্ক্স বয়ানগত (নাটক কিংবা ছবির পরিবর্তে) কাঠামোকরণ ব্যবহার করেন, এবং বিবিধ সুরে বাঁধার কারণে এগুলো পাঠকের নিকট বিবিধ প্রতিক্রিয়া এবং লটবহর দ্বারা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অপরাপর তাত্ত্বিকগণ–ফ্রেডরিক জেমসন, Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov–বয়ানের আনুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যাবলী এমন সামাজিক এবং দার্শনিক পরিকাঠামোতে অনুসন্ধান করেন যা কিনা হোয়াইটের ব্যবহৃতগুলোর চাইতে বৃহত্তর এবং, খোদ সামাজিক জীবনে বয়ানের পরিসর এবং গুরুত্ব দেখান। বয়ান একটি আনুষ্ঠানিক নকশা কিংবা ছাঁচ হতে পরিবর্তিত হয়ে যায় একটি ক্রিয়াতে যেটিতে রাজনীতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, এবং ব্যাখ্যাদানের সম্মিলন ঘটে।

সাম্প্রতিকতম তাত্ত্বিক এবং বিদ্যাজাগতিক আলোচনার একটি বিষয় হিসেবে সাম্রাজ্যিক প্রেক্ষিতের প্রতিধ্বনি বয়ানে অবশ্যই অনুরণিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, পুনরুত্থানমূলক কিংবা নতুন, আঁঠার মত বয়ানের সাথে লেগে যায় ইতিহাসের কোন একটি ভাষ্যের কাঠামোকরণ, অঙ্গিভূতকরণ, কিংবা বর্জনকরণের লক্ষ্যে। বেনেডিক্ট এ্যান্ডারসনের *ইমেজিন্ড কম্যুনিটিজ* এই বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে উপলব্ধি করিয়ে দেয়, একই কাজ করেন এরিক হব্‌সবম্ ও টেরেন্স রেঞ্জার সম্পাদিত *দি ইনভেনশান অফ ট্র্যাডিশন*'এর বিবিধ ভাগীদারগণ। বৈধত্ব এবং স্বাভাবিকত্বদানশীলতা [normativeness]– উদাহরণস্বরূপ, সমসাময়িক আলোচনায় "সন্ত্রাসবাদ" এবং "মৌলবাদ"–সংকটের ধরনসমূহকে হয় বয়ান দান করেছে, কিংবা করে নি। আপনি যদি আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার এক ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনকে "সন্ত্রাসবাদী" হিসেবে উপলব্ধি করেন তাহলে আপনি সেটির বয়ানগত ফলশ্রুতি [narrative consequence] অস্বীকার করেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি সেটিকে বয়ানের মর্যাদা প্রদান করেন (যেমনটি নিকারাগুয়া কিংবা আফগানিস্তান) তাহলে আপনি সেটিতে প্রদত্ত করেন একটি পূর্ণাঙ্গ বয়ানের বৈধত্ব। অর্থাৎ, যেহেতু আমাদের মানুষজনকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে কারণে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন, অস্ত্রসজ্জিত হয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, মুক্তি অর্জন করেছেন; অন্য দিকে, অপর পক্ষের মানুষজন হচ্ছে লক্ষ্যবিহীন, দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসী। এ কারণে, বয়ানসমূহ রাজনীতিগত এবং মতাদর্শগতভাবে হয় অনুমোদনপ্রাপ্তি লাভ করে, কিংবা করে না।[১৭]

তথাপি উত্তর-আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত এই অব্দি গড়ে ওঠা প্রকাণ্ড তাত্ত্বিক সাহিত্যভাণ্ডারে বয়ান হচ্ছে একটি বিতর্কের বিষয়, যেটি হাল আমলের রাজনৈতিক বাতাস প্রভাবান্বিত করে। জাঁ ফ্রাসোয়াঁ লিওতার্দের বক্তব্য হচ্ছে যে মুক্তি এবং আলোকময়তার দুটি প্রধান বয়ান তাদের বৈধতাদানকারী ক্ষমতা হারিয়েছে এবং

এখন আরো ক্ষুদ্র স্থানিক বয়ান (*petits recits*) যেগুলোর বৈধতা প্রদানকারী ভিত্তি হচ্ছে কার্যকারিতা, তা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, অর্থাৎ, এটি হচ্ছে ব্যবহারকারীর স্বীয় স্বার্থে সংকেত ব্যবহারের যোগ্যতা যার লক্ষ্য হবে উদ্দেশ্য হাসিল করা।[২১] একটি সুন্দর সামালযোগ্য পরিস্থিতি, যেটি লিওতার্দ মোতাবেক সম্পূর্ণভাবে ঘটেছে ইউরোপীয় কিংবা পশ্চিমা কারণে: মহা বয়ান তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে, বিষয়টি কেবলমাত্র এটিই। যদি এই রূপান্তরটিকে সাম্রাজ্যিক গতিশীলত্বে স্থাপন করে আরেকটু ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাহলে লিওতার্দের যুক্তিতর্ক একটি ব্যাখ্যা [explanation] হিসেবে ধরা পড়ে না, বরং এটি ধরা পড়ে একটি লক্ষণ [symptom] হিসেবে। তিনি পশ্চিমা উত্তর-আধুনিকতাবাদকে অ-ইউরোপীয় বিশ্ব হতে বিযুক্ত করেন, উপনিবেশিত বিশ্বে ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ–এবং আধুনিকীকরণের–ফলশ্রুতি হতে বিযুক্ত করেন।[২২] ফলত, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, এটির উদ্ধৃতি, অতীত-আকুতি, এবং অপৃথকীকরণের নন্দনতত্ত্ব সমেত নিজ ইতিহাস হতে মুক্ত হয়ে পড়ে, যার অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের বিভাজন, সুস্পষ্ট শাস্ত্রীয় সীমানায় অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা, এবং জ্ঞানের বিরাজনীতিকরণ মোটামুটিভাবে ইচ্ছামত ঘটতে পারে।

লিওতার্দের যুক্তিতর্কের লক্ষণীয় বিষয় এবং এটিই সম্ভবত সেটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার হেতু হচ্ছে কিভাবে এটি মহাবয়ানের প্রধান চ্যালেঞ্জ, এবং কী কী কারণে সেগুলোর ক্ষমতা বর্তমানে প্রশমিত হয়েছে বলে মনে হয়, একে কেবলমাত্র ভুলভাবে পাঠ করে না, ভুলভাবে পরিবেশনও করে। এগুলো তাদের বৈধত্বকরণ বড় অংশেই হারায় আধুনিকতাবাদের সংকটের কারণে, যেটি নানাবিধ কারণে অবলোকনমূলক পরিহাসে নড়বড়ে কিংবা জড় হয়ে পড়ে, যার একটি হচ্ছে, খোদ ইউরোপে, যেটি সাম্রাজ্যিক পরিসরের উৎসস্থল, বিবিধ অন্যের বিব্রতকর আবির্ভাব। এলিয়ট, কনর‍্যাড, ম্যান, প্রুস্ট, উল্ফ, পাউন্ড, লরেন্স, জয়েস, ফর্স্টার-এর কাজে, অপরত্ব [alterity] এবং ভিন্নতা [difference] ধারাবাহিকভাবে অচেনা-অজানা মানুষের সাথে যুক্ত, যাঁরা হয়ত নারী কিংবা নেটিভ, কিংবা যৌন অনুসরণে খামখেয়ালি, প্রতিষ্ঠিত নগরীয় ইতিহাস, ধরনসমূহ, চিন্তন পদ্ধতি বিন্যাস করার লক্ষ্যে দৃশ্যপটে বিস্ফোরিত হন। এই চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে আধুনিকতাবাদ এমন একটি সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক পরিহাস সমেত প্রতিক্রিয়া করে যেটি না পারে হ্যাঁ, আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়া উচিৎ বলতে, কিংবা না, তা সত্ত্বেও আমরা ধরে রাখব বলতে: একটি নিষ্ক্রিয় আত্ম-সচেতনমূলক অবলোকন নিজকে গঠন করে, যেমনটি জর্জ লুকাশ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরিয়ে দেন, নান্দিকীকৃত ক্ষমতাহীনতার অসাড় ঈশারায়,[২৩] উদাহরণস্বরূপ, *এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়ার* পরিসমাপ্তিতে যেখানে ফর্স্টার লক্ষ্য করেন, এবং স্বীকার করেন এর পিছনের ইতিহাস, ডঃ আজিজ এবং ফিল্ডিং'য়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব–বৃটেন দ্বারা ভারতের বশীকরণ–কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি না বি-উপনিবেশকরণের পরামর্শ দিতে পারেন, না পারেন উপনিবেশকরণ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে। "না, এখনো না, এখানে না," ফর্স্টার প্রতিজ্ঞা হিসেবে কেবলমাত্র এটিই ব্যক্ত করতে পারেন।[২৪]

সংক্ষেপে বললে, ইউরোপ এবং পশ্চিমকে বলা হচ্ছিল অন্য-কে গাম্ভীর্য্যের সাথে গ্রহণ করতে। এটি, আমার মনে হয়, হচ্ছে আধুনিকতাবাদের মৌলিক ঐতিহাসিক সমস্যা। নিম্নবর্গ, এবং বিধিবদ্ধভাবে ভিন্ন মানুষজন, হঠাৎ একটি বিনাশকারী প্রকাশক্ষমতা অর্জন করেন ঠিক সেই ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যেখানে পূর্বে, দাবিয়ে রাখার জন্য, নীরবতা এবং সম্মতির উপর নির্ভর করা যেত। ভেবে দেখুন আধুনিকতাবাদের পরবর্তী এবং আরো তিক্ত রূপান্তর যেটি চিত্রিত হয় আল্বার্ট কাম্যু এবং ফ্যানন, উভয়েরই আলজিরিয়া সংক্রান্ত লেখাতে। *La Peste* এবং *L'Etranger*, উভয় বইয়ের আরবগণ হচ্ছেন নামবিহীন সত্তা যাদের কাম্যু পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেন ভবিষ্যতের ইউরোপীয় অধিবিদ্যার পূর্বলক্ষণ আবিষ্কার করার লক্ষ্যে, যিনি, আমাদের স্মরণ করতে পারা উচিৎ, তাঁর *Chronique algerienne*'তে আলজেরীয় জাতিত্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।[২৪] (কাম্যুর সাথে বর্দুকে, যিনি লিখেছেন *আউটলাইন অফ এ থিঅরি অফ প্র্যাক্টিস*, যেটি সম্ভবত সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের সবচাইতে প্রভাবশালী তত্ত্বীয় গ্রন্থ, যেটি উল্লেখ করে না ঔপনিবেশিকতাবাদ, আলজেরিয়া, এবং ইত্যাদি, যদিও তিনি অন্যত্র লিখছেন আলজেরিয়ার কথা, তুলনা করা কি খুব বেশী অবাস্তব হবে? *আউটলাইন*-এ বর্দুর তত্ত্ব নির্মাণ এবং জাতিতাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তায় আলজেরিয়ার বর্জন হচ্ছে লক্ষণীয়)। পক্ষান্তরে, ফ্যানন ইউরোপের উপর, যেটি "ঘুমন্ত সুন্দরীর দায়িত্বজ্ঞানহীন খেলা"র ["le jeu irresponsable de la belle au bois dormant"] ভূমিকায়রত, সেটির উপর জোরপূর্বকভাবে চাপিয়ে দেন একটি উদ্ভূত-হওয়া প্রতি-বয়ান [counternarrative], জাতির স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া।[২৫] তিক্ততা এবং হিংস্রতা সত্ত্বেও ফ্যাননের কাজের সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপীয় নগরকে একত্রে ভাবতে বাধ্য করা নিজ ইতিহাসের সাথে উপনিবেশের ইতিহাসকে, যা সাম্রাজ্যিক আধিপত্যের নিষ্ঠুর অসাড়তা এবং বিকৃত গতিহীনতা হতে জাগ্রত হচ্ছে, এইম সেজেয়া'র বাক্য মোতাবেক, "ভোগান্তির চৌহদ্দি দ্বারা মাপযোগ্য" ["measured by the compass of suffering"]।[২৬] নিঃসঙ্গ, এবং ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার জন্য প্রাপ্য স্বীকৃতি না দেয়াতে, ফ্যানন বলেন, আলোকময়তা এবং মুক্তির পশ্চিমা বয়ানসমূহ প্রকাশিত হয় বাতাসী কপটতা হিসেবে; এভাবেই, তিনি বলেন, গ্রীক-লাতিনীয় বেদী ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে।

আমরা, আমার বিশ্বাস, ফ্যাননের অন্তর্ভুক্তিকারী দৃকশক্তির চূর্ণবিচূর্ণকারী নতুনত্বকে–যেটি হচ্ছে সেজেয়া'র *Cahier d'un retour au pays natal* এবং লুকাশের *History and Class Consciousness*' দুর্দান্ত সংশ্লেষণ–সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করব যদি আমরা জোরারোপ না করি, যেমনটি তিনি করেছিলেন, বি-উপনিবেশকরণের প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত হতে হবে ইউরোপ এবং সেটির উচ্চতর ক্ষমতাকেন্দ্র। সেজেয়া এবং সি এল আর জেমস'এর মতনই ফ্যাননের সাম্রাজ্য-উত্তর পৃথিবীর মডেল নির্ভর করে মানব জাতির একটি সামষ্টিক'সহ বহুবিধ ভাগ্যের উপর, পশ্চিমা ও অ-পশ্চিমা, উভয়েরই। সেজেয়া যেমন বলেন, "এবং মানুষের অতিক্রম করতে হবে সকল নিষেধাজ্ঞা যা তার উত্তাপের খাঁজে লুকানো এবং সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তার উপর কোন নরবর্ণের একচেটিয়া দখল নেই/এবং বিজয়ের পুনাবর্তনে সকলের জন্য রয়েছে স্থান"।[২৮]

তথাপি: সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস যে প্রেক্ষিত প্রদান করে সেটির সাহায্যে বয়ানগুলো নিয়ে ভাবুন, সে ইতিহাস যেটির ভিত্তিরূপদানকারী দ্বন্দ্ব শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে মুক্তির নতুন এবং অধিকতর অন্তর্ভুক্তিকারী প্রতি-বয়ানে বীণার মত ভেসে উঠেছে। এটি, আমি বলব, হচ্ছে উত্তর-আধুনিকতাবাদের পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতি, যেটির জন্য লিওতার্দের বিস্মৃতিমূলক দৃকশক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাপৃত নয়। আবারো, পরিবেশন হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ, কেবলমাত্র বিদ্যাজাগতিক কিংবা তাত্ত্বিক উভসঙ্কটের কারণে নয় বরং একটি রাজনৈতিক বাছাই হিসেবে। নৃবিজ্ঞানী কিভাবে তাঁর শাস্ত্রীয় পরিস্থিতি পরিবেশন করেন সেটি এক পর্যায়ে অবশ্যই স্থানিক, ব্যক্তিক ও পেশাজীবিতার সন্ধিক্ষণের বিষয়। কিন্তু বাস্তবে এটি [পরিবেশন] হচ্ছে একটি সমগ্রতার অংশ, নিজ সমাজের, যেটির আকৃতি ও প্রবণতা নির্ভর করে পুঞ্জীভূত হ্যাঁ-সূচক, কিংবা নিবৃত্তিকারী, এবং বিরুদ্ধ ভারের বাছাইসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরম্পরার উপর। আমরা যদি বাগাড়ম্বিতায় আমাদের ক্ষমতাহীনতা কিংবা অকার্যকরতা অথবা উদাসীনতার জন্য আশ্রয় খুঁজি তাহলে আমাদের স্বীকার করতে প্রস্তুত হতে হবে যে এ ধরনের বাগাড়ম্বিতা চূড়ান্তভাবে একটি, কিংবা অপর প্রবণতার, ভাগীদার হয়। বিষয়টি হল যে নৃবৈজ্ঞানিক পরিবেশন যেমন পরিবেশনকারীর জগতে, আবার তেমনি কী বা কে পরিবেশিত হচ্ছে, তার উপরও প্রভাব ফেলে।

আমার মনে হয় না যে ফ্যানন এবং সেজেয়ার, এবং তাঁদের মতন অন্যদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়াটা ঘটেছে; এমনটিও নয় যে আমরা তাঁদেরকে গাম্ভীর্যের সাথে, সমসাময়িক বিশ্বের মনুষ্য মডেল, কিংবা পরিবেশন হিসেবে গ্রহণ করেছি। বাস্তবে, ফ্যানন এবং সেজেয়ার– আমি অবশ্য তাঁদের কথা বলছি ধরন হিসেবে–পরিচিতি [identity], এবং পরিচিতি-ঢংগীয় ভাবনার [identitarian thought] প্রশ্নে সরাসরি খোঁচা মারেন, যেটি "অন্যতা" এবং "ভিন্নতা" নিয়ে বর্তমান নৃবৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তার গোপন ভাগীদার। তাঁদের অনুগামীদের নিকট ফ্যানন এবং সেজেয়ার চেয়েছিলেন, এমন কি সংঘাতের উত্তাপময় মুহূর্তগুলোতেও, প্রতিষ্ঠিত পরিচিতি বিষয়ে অনড় ধারণার, এবং সাংস্কৃতিকভাবে কর্তৃত্বভুক্ত সংজ্ঞায়নের, পরিত্যাজ্যতা। ভিন্ন হও, তাঁরা বলেন, যাতে উপনিবেশিত মানুষজন হিসেবে তোমাদের ভাগ্য ভিন্ন হতে পারে; এ কারণে জাতীয়তাবাদ, সেটির আপাতদৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, হচ্ছে শত্রু। আমি জানি না নৃবিজ্ঞানের পক্ষে নৃবিজ্ঞান হিসেবে থেকেই ভিন্ন কিছু হওয়া সম্ভব কি না, অর্থাৎ, নিজকে বিস্মৃত করে সাম্রাজ্যবাদ এবং সেটির প্রতিপক্ষদের দ্বারা যুদ্ধের আহ্বানে প্রতিক্রিয়া করে অন্য কিছু হওয়া। নৃবিজ্ঞানকে আমরা যেভাবে জেনেছি হয়ত সেটি সাম্রাজ্যিক বিভাজনের কেবলমাত্র একটি দিকেই টিকে থাকতে পারে, আধিপত্য এবং হেজেমনির সঙ্গী হিসেবে।

অপর পক্ষে, সমসাময়িক কিছু নৃবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা যেগুলো সমালোচনামনস্কভাবে সংস্কৃতির ধারণার আদ্যপ্রান্ত পুনর্নিরিখ করে সেগুলো হয়তবা ভিন্ন কাহিনী বলা শুরু করেছে। আমরা যদি সংস্কৃতি, এবং সেটির সাথে তার অনুগামীদের সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে সন্নিহিত, পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সামগ্রিকভাবে মানানসই হিসেবে

না দেখে এটিকে ভাবি প্রবেশ্য হিসেবে, এবং সার্বিকভাবে, রাজনৈতিক এককের মধ্যকার প্রতিহতকারী সীমারেখা হিসেবে, তাহলে পরিস্থিতি অধিকতর ইতিবাচক মনে হতে পারে। তথাপি অন্য-কে তত্ত্ববিদ্যাগতভাবে তেমনটাই-থাকবে [ontologically given] হিসেবে না দেখে বরং ঐতিহাসিকভাবে বিধিবদ্ধ হিসেবে দেখলে ক্ষয় হয়ে যাবে আমাদের সেই বর্জনকারী পক্ষপাতিত্ব যা আমরা সংস্কৃতিতে আরোপ করি, সর্বোপরি নিজ সংস্কৃতিতে। সংস্কৃতি তাহলে পরিবেশিত হতে পারে নিয়ন্ত্রণ কিংবা পরিত্যাগ, স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতি, বলপ্রয়োগ কিংবা নির্ভরশীলতা, বর্জনকারী কিংবা অংশীদারী পরিসর হিসেবে, এসবই ঘটছে বৈশ্বিক ইতিহাসে যেটি হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশ।[২১] নির্বাসন, অভিবাসন এবং সীমানা পার হওয়া হচ্ছে অভিজ্ঞতাসমূহ যেগুলো আমাদের নতুন বয়ানমূলক ধরন, কিংবা জন বার্জারের বাক্যানুসারে, বলার অন্য পথ, প্রদান করতে পারে। এ ধরনের নতুন চলন আরো সহজে অনন্য দৃকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন কি না জাঁ জেনে, কিংবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইতিহাসবিদ যেমন ব্যাজিল ডেভিডসন, যাঁরা জাতিগতভাবে নির্মিত প্রতিবন্ধকতাসমূহকে নির্লজ্জভাবে পারাপার এবং লঙ্ঘন করেন, তাঁদের নিকট পেশাজীবী নৃবিজ্ঞানীদের তুলনায় আরো সহজে প্রাপ্তিযোগ্য কিনা, সেটি আমার বলতে পারার বিষয় নয়। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হল, এমন ধরনের উদাহরণের প্ররোচিত করার ক্ষমতা মানব বিদ্যা এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্য চমকপ্রদভাবে প্রাসঙ্গিক যেহেতু তারা সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সংগ্রামরত।

Edward W. Said, "Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors." *Critical Inquiry* 15 (Winter 1989). এটি সম্প্রতি Edward W. Said. *Reflections on Exile and Other Literary and Cultural Essays*, New Delhi: Penguin Books. 2001এ পুনপ্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদকের টীকা: উপরের তরজমায় চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেট হচ্ছে অনুবাদকের সংযোজন, রিচার্ড ফক্স এবং ১৪ নং পৃষ্ঠায় এইম সেজেয়া'র উদ্ধৃতাংশ বাদে। লেখক এবং অনুবাদক, উভয়েরই, চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেটের ব্যবহার পৃথক রাখার লক্ষ্যে আমি দুটো স্থানে, এডওয়ার্ড সাঈদের "একটি" চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেটকে "দুটো" করেছি।

প্রথমেই ড: জহির আহমেদকে ধন্যবাদ জানাই যাঁর কারণে এই লেখার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষিত হয়েছে। লেখাটির শীর্ষে এইম সেজেয়া'র ফরাসী কাব্যের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদে সাহায্য করেছেন শাহেদ রহমান এবং দিলরুবা করিম। তাঁদেরকে ধন্যবাদ। প্রবন্ধের বাকি অংশের ফরাসী অনুচ্ছেদ, বাক্য, শব্দ অনুবাদ করেছেন এক তুলনীয় দম্পতি: মজিয়া আবিদি এবং লুৎফি জিতুন। তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্যপরায়ণতায় আমি কৃতার্থ, এবং আবারো দিলরুবা করিমকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এই যোগাযোগে ঘটক হিসেবে কাজ করেছেন। "ইন্টারলকিউটার" শব্দটির অর্থোদ্ধারে সাহায্য করেছেন নিশিতা রেজা ইসলাম ও খাদেম-উল-ইসলাম। তাঁদেরও ধন্যবাদ। মানস চৌধুরী এবং সায়দিয়া গুলরুখ বরাবরের মত অনুবাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ধৈর্য্য সহকারে আমার ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

সমাজ নিরীক্ষণ, নং-৮৪, আগস্ট '০২
ভাষান্তর : রেহনুমা আহমেদ

তথ্যসূত্র :

১. দেখুন Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, অনুবাদ Constance Farrington (New York, 1966), এবং Albert Memmi, *The Colonizer and the Colonized*, অনুবাদ Howard Greenfield (New York, 1965).

২. দেখুন Carl E. Pletsch, "The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950 – 1975," *Comparative Studies in Society and History* 23 (Oct. 1981): 565 – 90. দেখুন Peter Worsley, *The Third World* (Chicago, 1964).

৩. দেখুন Fanon, *The Wretched of the Earth*, p. 101.

৪. দেখুন Eqbal Ahmad, "From Potato Sack to Potato Mash: The Contemporary Crisis of the Third World," *Arab Studies Quarterly* 2 (Summer 1980): 223 – 34; Ahmad, "Post-Colonial Systems of Power," *Arab Studies Quarterly* 2 (Fall 1980): 350 – 363; Ahmad, "The Neo-Fascist State: Notes on the Pathology of Power in the Third World," *Arab Studies Quarterly* 3 (Spring 1981): 170 – 180.

৫. দেখুন *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Movement in the Human Sciences*, সম্পাদিত, George E. Marcus এবং Michael M. J. Fischer (Chicago, 1986), *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*, সম্পাদিত, James Clifford এবং Marcus (Berkeley and Los Angeles, 1986).

৬. Richard Fox, *Lions of the Punjab: Culture in the Making* (Berkeley and Los Angeles, 1985), p. 186.

৭. দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, Sherry B. Ortner, "Theory in Anthropology Since the Sixties," *Comparative Studies in Society and History* 26 (Jan. 1984): 126 - 166.

৮. দেখুন *Anthropology and the Colonial Encounter* সম্পাদিত Talal Asad (London, 1973); Gerard Leclerc, *Anthropologie et colonialisme: essai sur l'historie de l'africanisme* (Paris, 1972); এবং *L'Observation de l'homme: une histoire des enquetes sociales* (Paris, 1979); Johannes Fabian, *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object* (New York, 1983).

৯. দেখুন Ortner, "Theory in Anthropology Since the Sixties," pp. 144 – 60.

১০. Marcus এবং Fischer, *Anthropology as Cultural Critique*, পৃ: ৯ এবং এপরবর্তী, জ্ঞানতত্ত্বের উপর জোরারোপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১১. James Clifford, "On Ethnographic Authority," *Representations* 1 (Spring 1983): 142.

১২. Jurgen Golte, "Latin America: The Anthropology of Conquest," দেখুন *Anthropology: Ancestors and Heirs*, সম্পাদিত, Stanley Diamond (The Hague, 1980), p. 391.

১৩. Jonathan Friedman, "Beyond Otherness or: The Spectacularization of Anthropology," *Telos* 71 (1987), 161 – 70.

১৪. Defense Science Board, *Report of the Panel on Defense: Social and Behavioral Sciences* (Williamstown, Mass., 1967).

১৫. আমি এটি আমার *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York, 1981) আলোচনা করেছি। আরো দেখুন, "The MESA Debate: The Scholars, the Media and the Middle East," *Journal of Palestine Studies* 16 (Winter 1987): 85 – 104.

১৬. দেখুন *Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question* সম্পাদিত, Edward W. Said এবং Christopher Hitchens (London, 1988), pp. 97 – 158.

১৭. Richard Price, *First-Time: The Historical Vision of an Afro-American People* (Baltimore, 1983), pp. 6, 23.

১৮. James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, Conn., 1985), pp. 278 – 350. আরো দেখুন, Fred R. Myers, "The Politics of Representation: Anthropological Discourse and Australian Aborigines,"

American Ethnologist 13 (Feb. 1986): pp. 138 - 153.

১৯. দেখুন George W. Stocking. Jr., Victorian Anthropology (New York, 1987), এবং Curtis M. Hinsley, Jr. *Savages and Scientists: The Smithsonian Institution and the Development of American Anthropology, 1846 – 1910* (Washington D C 1981).

২০. দেখুন Said, "Permission to Narrate," *London Review of Books* (16 – 29 Feb. 1984): 13 – 17.

২১. দেখুন Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, অনুবাদ Geoff Bennington এবং Brian Massumi, *Theory and History of Literature*, vol. 10 (Minneapolis, 1984), pp. 23 - 53.

২২. দেখুন Irene L. Gendzier, *Managing Political Change: Social Scientists and the Third World* (Boulder, Colo., 1985).

২৩. Georg Lukacs, *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, অনুবাদ Rodney Livingstone (London, 1971), pp. 126 – 34.

২৪. এই যুক্তিতর্ক আমার প্রকাশিতব্য *Culture and Imperialism* (New York, 1989)'এ আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

২৫. Albert Camus, *Actuelles, III: Chronique algerienne, 1939 – 1958* (Paris, 1958), p. 202. "আরব দাবি মেটানোর প্রতি আমরা যতই সম্মত থাকি না কেন, তা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আলজিরিয়ার জাতীয় স্বাধীনতার ভাবনা একান্তভাবে কাল্পনিক। (এখন পর্যন্ত) কোন আলজিরীয় জাতি গঠিত হয়নি। ইহুদী, তুর্কী, গ্রীক, ইতালীয়, বারবার, সকলেরই এই অপ্রকৃত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে প্রকৃত বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য এই জাতিটিকে দাবি করার সমান অধিকার রয়েছে।"

২৬. Fanon, *Les Damnes de la terre* (Paris, 1976), p. 62.

২৭. Aime Cesaire, Cahier d'un retour au pays natal [Notebook of a Return to the Native Land], *The Collected Poetry*, trans. Clayton Eshleman and Annette Smith (Berkeley and Los Angeles, 1983), pp. 76, 77.

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture: Selected Essays (London, 1980), pp. 37 - 47.

সার্ত্রের সঙ্গে আমার বিরোধ

বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী জ্যঁ-পল সার্ত্রে সমস্ত বিশ্ববাসীর দৃষ্টি থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতির প্রতি তার অন্ধ সমর্থনের কারণে ১৯৮০ সালে তার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি সমালোচকদের আক্রমণের শিকার হন। এমনকি তার প্রচারিত "হিউম্যানিস্ট এক্সিসটেনশিয়ালিজম (দিনেমার দার্শনিক কিয়ের্কে গার্ড থেকে উদ্ভূত এবং সার্ত্রে কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ যার মূলমন্ত্র হল নির্লিপ্ত ও প্রতিকূল বিশ্বে মানুষ এক নিঃসঙ্গ প্রাণী যে নিজকর্মের জন্য দায়ী এবং নিজ নিয়তি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন) ও আশাবাদ, স্বেচ্ছাসেবা ও পারস্পারিক মুক্তি বিনিময় প্রক্রিয়া সমর্থন করার কারণে উপহাসের খোরাক হচ্ছিল। সার্ত্রের সমস্ত শিল্পকর্ম অশ্লীলতার অভিযোগে প্রত্যাখ্যান করেছে মূলত দুই শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে একদল হল নব্যধনী শ্রেণীর চার্বাক দর্শনবাদী যাদের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রবিরোধী মতবাদকে উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং আরেক দল হল আদর্শচ্যুত পোস্ট স্ট্রাক্চারালিস্ট ও পোস্টমডার্নিস্ট যারা সার্ত্রের জনগণকেন্দ্রীক রাজনীতিকে সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। উপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, আত্মজীবনীকার, দার্শনিক, রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি এত বিস্তৃত কাজ করেছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ তাকে গ্রহণ করার বদলে যেন প্রত্যাখ্যান করেছে অনেক বেশি। গত ২০ বছরে সার্ত্রের লেখা পঠিত হয়েছে খুবই কম আর তাকে নিয়ে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তা তার পাণ্ডিত্যের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

আলজেরিয়া ও ভিয়েতনামে এক সময় তার যে অবস্থান ছিল এখন তা মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে।

১৯৬৪ সালে প্যারিসে ছাত্রদের মাওবাদী সংগ্রামের সময় নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তার অবদান এবং তার সাহিত্যিক বিক্ষোভ (যে কারণে তিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন)-এর ইতিহাস সবই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তিনি একমাত্র এ্যাংলো আমেরিকান বিশ্ব ছাড়া সর্বত্রই একজন ক্ষতিকর, 'অপকারী' এক্স-সেলিব্রেটিতে পরিণত হয়েছিলেন। এ্যাংলো আমেরিকান বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি কখনোই দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি পাননি। একজন উপন্যাসিক, আত্মজীবনীকার হিসেবেই তারা তাকে কিছুটা গ্রহণ করেছিল। একজন অধপতিত লেখকের মতো তারা তাকে মূল্যায়ন করেছিল এবং আলফ্রেড কামু'র চেয়ে তাকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হিসেবেই গণ্য করতো।

পুরনো ফ্যাশন নতুনভাবে ফিরে আসার মতো কিছুদিন আগে ফ্রান্সে সার্ত্রের পুনরুত্থান হয়েছিল। তার ওপরে বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছিল এবং কিছু সময়ের জন্য তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কিন্তু সে সময়টার স্থায়ীত্ব হয়েছিল খুবই

কম। ওইসময় তাকে নিয়ে সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী মহলে খানিক আলোচনাই হয়েছে কিন্তু তার লেখা সে সময় খুব একটা পঠিত হয়নি। আমার প্রজন্মের লেখক সাহিত্যিকদের কাছে সার্ত্রে বিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়াল হিরো হিসেবে সমাদৃত হবে আসছেন। আমার সময়ের লেখকদের কাছে তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার দূরদর্শীতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপহারগুলো আমাদের সময়ের যে কোনো প্রগতিশীল কাজের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। তারপরও সার্ত্রের কাজ ও মতবাদ এখন সবার কাছে না অভ্রান্ত না ভাববানীপূর্ণ। অবশ্য সম্প্রতি একজন বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করার জন্য এবং রাজনৈতিক সংকটের সময় জনগণকে একত্রিত ও সংহতিপূর্ণ অবস্থানে আনবার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সার্ত্রের বেশ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন সার্ত্রে যাই লিখতেন তাই পাঠককে আকৃষ্ট করতো কারণ তার লেখায় এক অসাধারণ শক্তি ও বিরুদ্ধস্রোতের ধৃষ্টতা রয়েছে।

হ্যাঁ তার লেখায় অবশ্যই একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে বিষয়ে একটু বলতে চাই। ১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে সার্ত্রের মিশর সফর (গত মাসে সাপ্তাহিক আল আহরাম পত্রিকায় ওই সফরের বিবরণ ও সেখানে তার আলোচনার ব্যাপারে লেখালেখি হয়েছে) এবং সেখানে তার দেওয়া বক্তৃতার ওপর দু'জনের সমালোচনা আমাকে এ বিষয়ে বলতে আগ্রহী করেছে। এ দুজনের একজন হলেন বার্নার্ড হেনরী লেভি যিনি সম্প্রতি তার প্রকাশিত একটি বইয়ে সার্ত্রের ওই মিশর সফরের সমালোচনা করেছেন। আরেকজন হলেন প্রয়াত মিশরীয় বুদ্ধিজীবী লতফি আল খোলি। তিনিও তার একটি বইয়ে সার্ত্রের মিশর সফরের কথা লিখেছেন। সার্ত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ও একান্ত পরিচয়ের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু এ সাক্ষাৎ ছিল কাব্যিক এবং বিশেষ তাৎপর্যময়।

সময়টা ১৯৭৯'র জানুয়ারি। খুব ভোরে নিউ ইয়র্কের বাড়িতে বসে একটা ক্লাসে লেকচার দেবার পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ডোরবেল বাজতেই দরজা খুলে দেখি আমার নামে একটা টেলিগ্রাম। খাম ছিড়ে দেখি সেটি এসেছে প্যারিস থেকে। ভেতরে লেখা, '*লেস টেমপ্স মডার্নস*' নামের একটি জর্নালের উদ্যোগে প্যারিসে মধ্যপ্রাচ্যশান্তি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের ১৩ ও ১৪ মার্চ। আপনাকে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সত্ত্বর জবাব দিন। ইতি সাইমন ডি বেভোয়ার এবং জ্যঁ পল সার্ত্রে।"

প্রথমে ভেবেছি তারযন্ত্রের মুদ্রণপ্রমাদ হয়তো আমার সঙ্গে ঠাট্টা মশকরা করেছে। আমি বড়জোর কোসিমা ও রিচার্ড ওয়েগণারের পক্ষ থেকে বৈরুৎ বেড়াতে যাবার–আমন্ত্রণপত্র পাবার আশা করতে পারি অথবা টিএস এলিয়ট ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাদের ডায়ালের অফিসে এক সন্ধ্যা কাটিয়ে আসার জন্য এ অধমকে ডাকতে পারে। নিউইয়র্কে ও প্যারিসে বসবাসরত আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেলিগ্রামে পাঠানো আমন্ত্রণপত্রের সত্যতা আবিষ্কারের জন্য আমার টানা দুদিন সময় লেগেছে। তাদের কাছ থেকে শুনে যখন নিশ্চিত হলাম যে নিমন্ত্রণপত্রটি ঠিক জায়গা থেকেই এসেছে তখন তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণের খবর পাঠাতে আমার আর দেরী হল না। (পরে

জেনেছি আমার প্যারিস যাবার রাহাখরচ দিয়েছিল লেস মোডালিটেস যেটি পল সার্ত্রের প্রতিষ্ঠিত টেমপ্‌স মডার্নস জর্নালেরই একটি শাখা সংগঠন)। তার এক সপ্তা পরেই আমি প্যারিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। '*লেস টেমপ্‌স মডার্নস*' প্যারিসে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরবর্তীতে এ পত্রিকাটি ইউরোপের এবং তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সার্ত্রে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিদের তার চারপাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাদের অনেকেই মতাদর্শের বিরোধী ছিলেন। তারা তার বিরোধী হলেও সার্ত্রেকে তারা সমীহ করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং সাইমন ডি বেভোয়ার, প্রখ্যাত দার্শনিক রেমন্ড এ্যারোন, সার্ত্রের সহপাঠী মাউরিস মার্লিড পন্টি, জাতীবিজ্ঞানী মাইকেল লিরিস প্রমুখ। কোন বড় ধরনে আন্তর্জাতিক ইস্যুই এই জর্নালের দৃষ্টি এড়াতো না। ১৯৬৭ সালে আরব ও ইসরাইলিদের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে 'লেস টেমপ্‌স মডার্নস' ঢাউস সাইজের একটি সংস্করণ বের করেছিল। ওই সংখ্যায় আই এফ স্টোনের লেখা আরব-ইসলাইল যুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমার প্যারিস যাত্রার পেছনে ওই প্রবন্ধ বড় ধরনের প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্যারিসে পৌঁছানো মাত্র বেভোয়ার এবং সার্ত্রের পাঠানো একটি ছোট চিরকুট পেলাম। তারা তখন আমার জন্য লাতিন কোয়ার্টারে ভাড়া করা হোটেল কক্ষে অপেক্ষা করেছিলেন। চিরকুটে লেখা "নিরাপত্তাজনিত কারণে মিশেল ফুকোর বাড়িতে নির্ধারিত মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।" আমাকে যথাসময়ে ফুকোর বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হল এবং পরদিন সকাল ১০ টায় তার এ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি লোকজন তেমন নেই এবং সার্ত্রেও অনুপস্থিত। কোন কারণে আমাদের আলোচনাস্থল বদলানো হল এবং সেই রহস্যময় নিরাপত্তা জনিত কারণ"টাই বা কি সে বিষয়ে কেউই কিছু বলতে পারল না। বেভোয়ার তার বিখ্যাত টুপি মাথায় দিয়ে অনেক লোকজনের মধ্যে বসে আছেন এবং কেট মিলেটের সঙ্গে ইরানে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণমূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি যতদূর জানি তারা একসময় ইরানের সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ওই আন্দোলনের বিষয়ে কিছু বলেন কিনা তা শোনার জন্য কানা খাড়া করে রইলাম। কিন্তু সে আলোচনার ধার দিয়েও তিনি গেলেন না। তারপর ঘণ্টাখানিক বা তার কিছু বেশি সময় পরে (সার্ত্রে আসার কিছুক্ষণ আগে) বেভোয়ার বেরিয়ে গেলেন এবং ওইদিন আর এলেন না।

ফুকো কিছুক্ষণবাদেই আমাকে জানালেন যে সেমিনারে তার বলার তেমন কিছুই নেই এবং প্রতিদিনকার মতো তিনি তখন তার 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল রিসার্চ' হাউসে যাবেন। তার টেবিলের এক কোনায় সংবাদপত্র ও জার্নালের গাদার ওপরে আমার লেখা '*বিগিনিংস*' বইটা দেখে ভালোই লাগল।

যদিও সে সময় বেশ আন্তরিকভাবেই তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি কেন ফুকো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির ব্যাপারে কোন কথা বলতে চাননি। ১৯৮৪ সালে তার মৃত্যুর এক দশক পরে এর কারণ কিছুটা হলেও জেনেছি। ফুকোর দুই বন্ধু লেখক দিদিয়ার এরিবোন এবং জেমস মিলার তাদের আত্মজীবনীতে লিখেছেন ১৯৬৭ সালে তিউনিসিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং

জুন মাসে যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই সেখান থেকে চলে আসেন। মিশেল ফুকো বলেছিলেন, ইসরাইলের কাছে বৃহত্তর আরবভূমি পরাজিত হবার কারণে সেখানকার জনগণের মধ্যে এন্টিসেমিটিক ও এন্টি ইসরাইল সেন্টিমেন্ট পয়দা হয় এবং যেহেতু তিনি ইসরাইলের সমর্থক ছিলেন সেহেতু তার ওপর যে কোন সময় হামলা হতে পারে– এ ভয় থেকেই তিনি তিউনিশিয়া থেকে চলে আসেন। কিন্তু ১৯৯০ সালে তিউনিশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের একজন অধ্যাপিকা ও ফুকোর সহকর্মী– আমাকে অন্য একটি তথ্য দিলেন। তিনি বললেন, ফুকোর সঙ্গে তার কয়েকজন ছাত্রের সমকামী সম্পর্ক ছিল এবং এ সম্পর্কের কথা প্রকাশিত হবার পরই তিনি তিউনিশিয়া ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। অবশ্য আমি এখনো জানি না কোনটা সত্যি। প্যারিস সেমিনারের সময় ফুকো জানিয়েছিলেন তিনি মাত্র কয়েকদিন আগে তার ইরানের সাময়িক আবাস থেকে প্যারিস এসেছেন। ইরানে তখন তিনি 'কোরিয়ার ডেলা সেরা'র বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। ৬৭'র ইসলামী বিপ্লবের প্রথম দিকের দিনগুলো সম্পর্কে ফুকোকে বলতে শুনেছি, "ভেরি এক্সাইটিং, ভেরি স্ট্রেঞ্জ, ক্রেজি"। আমার মনে হয় আমি তাকে বলতে শুনেছি (হয়তো ভুল করে বলে ফেলেছেন) যে তিনি তেহরানে পরচুলা লাগিয়ে ছদ্মবেশ ধরে থাকতেন। সে সময় তার লেখা প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ পাবার পর ইরানের সকল বিষয়কেই তিনি এড়িয়ে চলতেন। ১৯৮০ সালে গিলেজ দালিউজ আমাকে জানালেন তিনি এবং ফুকো এক সময়ের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ফিলিস্তিন সংকট প্রশ্নে এই দুই বন্ধুর মধ্যে বিরোধ ছিল। ফুকো সমর্থন করতেন ইসরাইলিদের এবং দালিউজ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করতেন।

ফুকোর এ্যাপার্টমেন্টটি ছিল লম্বা, বেশ বড়সড়ো এবং বাড়াবাড়ি ধরনের আরামদায়ক। ঘরের দেয়ালগুলোর চোখ ধাঁধানো রজতশুভ্র রং। সংসার বিচ্ছিন্ন দার্শনিক ও চিন্তাবিদের জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল। সেমিনারে কয়েকজন ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি ইহুদীকে দেখলাম। ওদের মধ্যে শুধু ইব্রাহিম দাক্কাককে চিনতে পারলাম। দুই ঘনিষ্ট বন্ধুর মাধ্যমে দাক্কাকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একজন হলেন জেরুজালেমের বিরজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাফিজ নাজাল এবং আরেকজন ইসরাইলিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বিশেষজ্ঞ ইয়েহোশোফাত হারকাবি। হারকাবি ইসরাইলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন এবং ভুলক্রমে একবার ইসরাইলি আর্মিকে সতর্ক সংকেত দেওয়ার জন্য তাকে বরখাস্ত করা হয়। বছর তিনেক আগে আমি আর দাক্কাক স্ট্যান্ডফোর্ড সেন্টারে বিহেভিওরাল সায়েন্সের ওপরে এক সঙ্গে গবেষণা করেছিলাম। সে সময় যদিও প্রত্যক্ষভাবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না, তবে আদর্শগত ভাবে দুজনের মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইসরাইল অথবা ফ্রান্সের ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক। এদের কেউ কট্টর ধার্মিক কেউ আবার কট্টর সেক্যুলার। তবে একদিক থেকে তাদের সবাই ছিলেন প্রো-জিওনিস্ট। ওদের মধ্যে এলি বেনগাল নামে একজনের কথাবার্তা শুনে মনে হল সার্ত্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। পরে অবশ্য জেনেছি এই ভদ্রলোক ইসরাইলে সার্ত্রের সফরসঙ্গী হিসেবে গিয়েছিলেন।

যাহোক, নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অবশেষে প্রত্যাশিত মহান সার্ত্রে দেখা দিলেন। সার্ত্রেকে সে সময় এত বৃদ্ধ ও বিপর্যস্থ মনে হচ্ছিল দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। তার চারপাশে অজস্রসহকর্মী, চাকরবাকর এমনভাবে তাকে সব সময় ঘিরে রাখেছিল যে তা দেখে আমার মনে হল তিনি পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই তাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। তার ছায়াসঙ্গী হিসেবে থাকতেন সার্ত্রের এক কথিত দত্তক কন্যা। পরে জেনেছি আলজেরিয় বংশোদ্ভূত ওই মহিলা সার্ত্রের সাহিত্যবিষয়ক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। আরেকজন হলেন সাবেক মাওবাদী রাজনীতিক ও সার্ত্রের সহযোগী প্রকাশক পিয়েরে ভিক্টর যিনি পরবর্তীতে কট্টর ইহুদীধর্মাবলম্বীতে পরিণত হন।

এই ভিক্টর আসলে মিশরীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি। কিন্তু তার আচরণ বা কথাবার্তায় বোঝারই উপায় নেই যে সে মিশরীয়। সে এখানে এসেছে বামপন্থি বুদ্ধিজীবী হিসেবে অনেকেটা প্রতারকের মতো।

তৃতীয় ব্যক্তিটি হলেন ভন বুলো নামের এক ত্রিভাষী মহিলা। সে একটা জার্নালে কাজ করে এবং সার্ত্রের সব লেখা অনুবাদ করাই মুখ্যত তার কাজ। যদিও সার্ত্রে দীর্ঘদিন জার্মান ছিলেন এবং শুধু হিডেগার নয়, উইলিয়াম ফকনার এবং ডস প্যাসোমের সমালোচনা লিখেছেন কিন্তু তিনি না জানতেন জার্মান না ইংরেজী।

দুদিন ব্যাপী সেমিনারে ভন বুলোকে সাত্রের গা ঘেঁসে বসে থাকতে দেখেছি। বুলা সার্ত্রের পাশের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ পরপর তার কানে ফিসফিস করে সেমিনারের বক্তব্য ফরাসীতে অনুবাদ করে দিচ্ছিল। বক্তাদের মধ্যে ভিয়েনা থেকে আগত ফিলিস্তিনি একজন আরবী ও জার্মান ভাষা ছাড়া অন্যভাষা জানেন না। তিনি ছাড়া অন্য সবাইকে ইংরেজিতে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমরা অধিকাংশই মত দিয়েছিলাম।

সেমিনারের বক্তব্য সার্ত্রে কতটুকু বুঝেছিলেন তা এখনো আমার পুরোপুরি অজানা। তবে আমি একটা বিষয়ে চমৎকৃত হয়েছি যে সার্ত্রে প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের বক্তব্য গভীর আগ্রহে শুনেছিলেন। তাঁর পুস্তক বিবরণীকার মাইকেল কনট্যাটও সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তিনি ওই আলোচনায় অংশ নিলেন না। মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হল অল্পদূরের একটি ছিমছাম রেস্তোরায়। খাবার দাবারের পরিবেশ পুরোপুরি ফরাসি। ফরাসিদের স্বাভাবিকভাবেই খাবার টেবিলে ঘণ্টা খানেক বা তারচে বেশি সময় লেগে যায়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। কেউ কেউ ট্যাক্সি করে চলে গেছেন। আমরা যারা বাকি ছিলাম তারা সবাই কমপক্ষে চার বৈঠকে খাওয়া দাওয়া করলাম। টানা সাড়ে ৩ ঘণ্টা বৃষ্টি হল। যারা ট্যাক্সি করে বাড়ি গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আবার ফিরে এসেছে। মোটামুটি আমাদের 'মধ্যপ্রাচ্য শান্তি' বিষয়ক সেমিনারের প্রথম দিন এভাবেই কাটল। কাজের কথা যা হল তা ফালতু আলোচনার তুলনায় একেবারেই কম। আমি যতটুকু দেখলাম, কারো সাথে কোন শলাপরামর্শ না করেই ভিক্টর আলোচ্যবিষয় নির্ধারণ করছিলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছিলাম ভিক্টর নিজেকে ওই সেমিনারের সর্বেসর্বা মনে করছিলেন এবং সার্ত্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে কর্তৃত্ব ফলাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সার্ত্রের সঙ্গে কিসব কানাকানি করে

নিয়েছিলেন। এসময় তাকে অতি আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল। ভিক্টর আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তিনটি এজেন্ডা নির্ধারণ করেছিলেন; সেগুলো হল–

১. মিশর ও ইসরাইলের শান্তি উদ্যোগের মূল্যায়ন (এ সময় ক্যাম্প ডেভিডের আলোচনা চলছিল)

২. ইসরাইল ও আরব বিশ্বের শান্তি প্রক্রিয়া এবং

৩. আরব বিশ্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত ইসরাইলের সঙ্গে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত সহাবস্থানের জটিলতা।

সেমিনারের আলোচ্যসূচির ধরন শুণে কোনআরব প্রতিনিধিকেই খুব খুশি হয়েছেন মনে হল না। আমার মনে হল ফিলিস্তিন স্বার্থ ডিঙিয়ে এ আলোচ্যসূচী নিধারণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের ধারণ-ধরন দেখে দাক্কাক এত বিরক্ত হলেন যে সেই দিনই তিনি কাগেজ পত্র নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

ওই দিনই আবিষ্কার করলাম সেমিনারের আয়োজকরা আরব বিশ্বের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সুক্ষ্ম আঁতাত করে ওই আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করেছিল এবং আমার সঙ্গে আয়োজকদের কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করেনি বুঝতে পারার পর আমার অসহ্যবোধ হল। পরে মনে হল আমাকে বেশি সাদাসিদে ও কলাকৌশলবর্জিত মনে করে হয়তো তারা তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা বলেনি পাছে আমি ওই অনুষ্ঠানে না আসি এবং সার্ত্রের সঙ্গে দেখা না করি। পুরো ব্যাপারটা যখন মাথায় এল ততক্ষণে সব আলোচনা রেকর্ড করা হচ্ছিল এবং যেটি পরে ওই বৈঠকী সার্ত্রের পত্রিকা '*লেস টেমপ্স মডার্নস*'এর বিশেষ সংখ্যায় (১৯৭৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যা) ছাপা হয়। পরে ভেবেছি পুরো বিষয়টিই অসন্তোষজনক। আমরা যার যার ক্ষেত্রে কম বেশি মোটামুটি পরিচিত। আমরা নৈতিক মনস্তাত্ত্বিকভাবে যা সমর্থক করিনা সার্ত্রে কৌশলে আমাদের দিয়ে তা সমর্থন করিয়ে নিলেন।

দ্বিতীয় দিন বেভোয়ার ইসলাম ও মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথাকে রীতিমতো গালাগাল করে, হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে বৈঠকী রুমের পরিবেশটাই গরম করে ফেললেন। তার বক্তব্য শুনে মনে হল তিনি সেখানে যদি অনুপস্থিত না থাকতেন তাহলে আমার দুঃখ করা উচিত হতো না। একটা বিষয় আমাকে হতবাক করলো। সেখানে সার্ত্রের উপস্থিতি ছিল যেন অনেকটাই পরোক্ষ, প্রতিক্রিয়াহীন ও এ্যাফেক্টলেস। কয়েক ঘণ্টা আলোচনার মধ্যে তিনি কিছুই বললেন না। দুপুরের খাবারের সময় আমার টেবিল থেকে বেশ দূরের একটা টেবিলে খেতে বসলেন। তাকে সে সময় বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল এবং কারও দিকে খেয়াল করছিলেন না। খাওয়ার সময় মুখে ডিম লেপ্টে একাকার অবস্থা করে ফেললেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না। কে জানে তিনি সে সময় বধির হয়ে গিয়েছিলেন কিনা। সে মুহূর্তে সার্ত্রেকে ভুতগ্রস্ত ও উন্মাদ প্রকৃতির মনে হচ্ছিল। তার মুখের জ্বলন্ত পাইপ এবং পরনের সৃষ্টিছাড়া জামাকাপড়গুলোকে লোকজনশূন্য ফাঁকা মঞ্চের বিক্ষিপ্ত খুঁটি বলে মনে হচ্ছিল। ১৯৭৭ সালে আমি ফিলিস্তিনি রাজনীতি সঙ্গে খুব বেশি জড়িত ছিলাম। ৭৭'এ আমি ন্যাশনাল কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলাম এবং আমি প্রায়ই আমার

মাকে দেখার জন্য বৈরুৎ যেতাম (তখন লেবাননে গৃহযুদ্ধ চলছিল)। ওই সময় আরাফাতসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই কথা হতো। আমার মনে হল ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে এবং ফিলিস্তিনিদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে করে বক্তারা যেভাবে এক পক্ষীয় বাকযুদ্ধে নেমেছেন তাতে আরাফাতের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততার বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে সার্ত্রেকে ক্ষেপিয়ে তোলা যেতে পারে। মধ্যাহ্নভোজের পর বিকেলের সেশন শুরু হল। আমি আগে সতর্ক ছিলাম পিয়েরে ভিক্টর নামে ভদ্রলোকটি এ আলোচনার মধ্যে স্টেশন মাস্টারের ভূমিকা পালন করবে। কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন ভিক্টর হাতবাড়িয়ে তা থামিয়ে দেবেন; এবং ভিক্টরের এই হস্তক্ষেপ থেকে সার্ত্রে নিজেও মুক্তি পাবেন না।

যা ভেবেছিলাম তাই হল– কিছুক্ষণ পরপর ভিক্টর সার্ত্রের সঙ্গে কানাকানি করছিলেন এবং সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছিলেন; আর সেই মোতাবেক আলোচনা মর্ডারেট করছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে উপস্থিত প্রত্যেকের তাদের কথা বলতে চাচ্ছিলেন।

তাদের সকলের বক্তব্য থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল যে এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার নামে ইসরাইল বন্দনা (যেটাকে আজ বলা হচ্ছে নরমালাইজেশন)। এ আলোচনার মধ্যে আরব অথবা ফিলিস্তিনিদের কোন কথা ছিল না। আলোচনা যখন শেষের পথে, তখন আমি একটি বিষয় ভেবে সাংঘাতিক বিরক্তি বোধ করছিলাম। আমি ভাবছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে আমি ফ্রান্স এসেছি সার্ত্রের বক্তব্য শোনার জন্য। অন্যদের মধ্যে যারা আলোচনা করছিলেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগকেই আমি আগে থেকে চিনি এবং তারা যা বলছিলেন তা থেকে ধারণ করার মতো কোনো বিষয় আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি আর থাকতে পারলাম না। আলোচনায়– অনেকটা বিঘ্নঘটিয়েই বললাম, অবিলম্বে আমরা সার্ত্রের বক্তব্য শুনতে চাই। আমার কথা শোনামাত্রই সার্ত্রের লোকলস্করের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক দেখা দিল বলে মনে হল। আলোচনা মুলতবি রেখে তারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ শুরু করলো।

এ সময় পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর ও করুণ বলে মনে হল, বিশেষ করে যখন দেখলাম তাদের সে শলাপরামর্শে স্বয়ং সার্ত্রের কোনো ভূমিকাই নেই। অবশেষে পিয়েরে ভিক্টর আবার আমাদের বৈঠকি টেবিলে ডাকলেন এবং রোমান সিনেটরদের মতো ভারিক্কি গলায় ঘোষণা করলেন, "মহামান্য সার্ত্রে আগামীকাল কথা বলবেন। ফলে আমরা সেই 'আগামীকালের' আলোচনা শোনার আগ্রহ নিয়ে সেদিনকার বৈঠক শেষ করলাম।

পরের দিন সার্ত্রে যা শোনালেন তা সত্যিই যথেষ্ট। টাইপ করা দুইপাতা পূর্ব লিখিত ভাষণ তিনি পড়ে শোনালেন যাতে অত্যন্ত গতানুগতিক, মামুলি উক্তি সর্বস্ব ভাষায় আনোয়ার সাদাতের প্রশংসা করা হয়েছে। বক্তব্যের বিষয় এত গতানুগতিক ছিল যে আমার ২০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতালব্ধ মেধার এক মুহূর্তের ভাবনায় তার বক্তব্য লেখা সম্ভব ছিল। তার সে বক্তব্যে ফিলিস্তিনিদের কথা, সীমান্ত সমস্যার কথা, ৬৭'র করুণ ইতিহাস ছিল বলে আমার মনে পড়ে না। তার বক্তব্যে ইসরাইলি বসতি স্থাপনার আধিপত্যবাদের কথা ছিল বলে মনে পড়ে না। রয়টার্সের একপেশে

সংবাদের মতো তার বক্তব্য ছিল চরম স্থূল। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে ওই বক্তব্য ছিল ভিকটরের লেখা।

নির্যাতিত মানুষের পক্ষে যে লোকটি একসময় লড়াই করেছেন, এবং এক সময় ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলেছেন সেই লোকটি (সার্ত্রে) শেষ জীবনে এসে এমন একজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রণাদাতার খপ্পরে পড়ে বশীভূত বালকের মতো হয়ে গেছেন ভেবে আমি ক্রোধে ফেটে পড়ছিলাম। পঠিত বক্তব্য শেষ করে বাকি সারাদিন সার্ত্রে আবার তার নিরবতায় হারিয়ে গেলেন এবং আগের মতোই অন্যান্যরা আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকলো। অথচ সার্ত্রে সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত রয়েছে যে তিনি নাকি একবার রোমে ফ্যাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং আলজেরিয়ার নাটক সম্পর্কে ১৬ ঘণ্টা এক দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছিলেন। সেই সার্ত্রে সিমোন ডি বেভোয়ারের পাল্লায় পড়ে চিরদিনের মতো নির্বাক হয়ে গেলেন!

কয়েকমাস বাদে সেমিনারের ট্রান্সক্রিপ্ট যখন প্রকাশিত হল, তখন দেখা গেল সার্ত্রের সেই বক্তব্যকে পুনরায় সংশোধন করে যতদূর সম্ভব দোষমুক্ত করা হয়েছে। কেন এমন করা হল আমি তা বুঝিনি বোঝার চেষ্টাও করিনি। 'লেস টেমপ্স মর্ডানস'এর ওই সংখ্যা এখনো আমার কাছে রয়েছে কিন্তু তা পুনর্বার পড়ার প্রবৃত্তি আমার হয় না। ওই কাগজটাকে এখন আমার যাচ্ছেতাই মনে হয়। মিশরে আমন্ত্রিত হয়ে সার্ত্রে যেইভাবে উৎসাহ নিয়ে আসতেন আমিও সেইভাবে প্যারিসে গিয়েছিলাম। তার দেশের লোকজনদের মিশরে যেইভাবে সমাদর করা উচিৎ বলে মনে করতেন আমিও সেই আশা করেছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি পিয়েরে ভিক্টর নামের একজন মধ্যস্থতাকারীর হস্তক্ষেপে সংকুচিত হয়েছিলাম যিনি এখন কালের গলিত অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। আরেকটা ঘটনা বলি। কয়েক সপ্তা আগে বার্নার্ড পিভোটের সাপ্তাহিক টেলিভিশন টক শো 'বুইলোন ডি কালচার' এর আমি অংশ নিয়েছিলাম যেটি ফ্রান্স টেলিভিশনে এবং কিছুক্ষণ পরে মার্কিন টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। ওই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত সার্ত্রের তীর্যক সমালোচনার মাধ্যমে তাকে মৃত্যুপরবর্তী পুনর্বাসিত করা। অনুষ্ঠানে বার্নার্ড হেনরী লেভি যিনি সার্ত্রের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রজ্ঞার কাছে প্রায় তুচ্ছ পর্যায়ের তিনিও তার সমালোচনা করেন এবং সার্ত্রে যেসব প্রাচীন দার্শনিকদের গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন দিয়েছেন তাদের তিনি কোনোভাবেই মূল্যায়ন করতে চাননি (অবশ্য স্বীকার করেই বলছি সার্ত্রে নির্দেশিত ওই দার্শনিকদের বই আমি এখনো পড়িনি এবং শিগগিরই পড়ার কোনো পরিকল্পনাও আমার নেই)। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন বিএইচএল এর প্রতিনিধি বললেন, সার্ত্রে আসলে খুব খারাপ লোক ছিলেন না। খারাপ ছিলেন না তার কারণ বিএইএল'র মতে, 'ইসরাইল বিষয়ে সার্ত্রের চিন্তাভাবনা সঠিক ছিল, তিনি কখনো তার আদর্শচ্যুৎ হননি এবং জীবনের শেষে এসে তিনি ইহুদী রাষ্ট্রের একজন পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

তবে সার্ত্র যে কন জিওনিজমের পক্ষের মৌলবাদী সমর্থক ছিলেন তা আজো আমরা জানি না।

হয়তো এমনও হতে পারে যে তাকে 'এন্টি-সিমেটিক' বলা হতে পারে সে ভয় তার ছিল, হয়তো ইহুদী নিধন হওয়ার পর সার্ত্রে নিজেকেই অপরাধী বলে মনে করেছেন

সেজন্যে, অথবা, হয়তো ফিলিস্তিনি আন্দোলনের স্বপক্ষে কথা বলে এবং ইসরাইলি জাস্টিসের বিপক্ষে কিছু বলে তিনি ভিকটিম হতে চাননি। এমন অনেক কারণ থাকতে পারে যা আমি কোনোদিনই জানতে পারব না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি সার্ত্রে তার যৌবনকালে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন শেষ বয়সে এসে তা আবার খুইয়েছেন; প্রত্যেকটি আরব নাগরিক (আলজেরীয়রা ছাড়া) যারা একদা সার্ত্রের প্রশংসা করতেন তারা তাঁর ক্রমপরিবর্তনে, চরম দুঃখ পেয়েছিলেন। অবশ্যই বার্ট্রান্ড রাসের এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে ভাল ভূমিকা রেখেছেন (যদিও সার্ত্রের মতো তিনিও বৃদ্ধ বয়সে আমার এক সময়ের বন্ধু ও সহপাঠী র‍্যালপ সোয়েনমেরের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন)। আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সব সময়ই ইসরাইল পলিসির সমালোচনা করে এসেছেন। আমার মনে হয় আমাদের সুক্ষ্মভাবে উপলব্ধী করা দরকার কেন মহান মহান ব্যক্তিত্বরা শেষ বয়সে এসে তাদের অনুজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের হাতের মুঠোয় চলে যায় এবং অশুদ্ধ রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে। এই চরম দুঃখজনক ব্যাপারটি সার্ত্রের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ঘটেছিল।

আলজেরিয়া বাদে (আলজেরিয়া ইহুদি অধ্যুষিত হবার কারণে) সমগ্র আরব বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই সার্ত্রে খুশি করতে পারেননি। এর কারণ হয়তো তার অত্যাধিক ইসরাইলপ্রীতি, এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার কট্টরবাদীতা দায়ী। এক্ষেত্রে তার বন্ধু জিন জেনেট অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। জেনেট ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন তার '*কাতরে হিয়ারেস আ সাবরা এট চ্যাটিলা*' এবং '*লে ক্যাপটিফ এ্যামুরেক্স*' নামের দুটি অসাধারণ গ্রন্থে। প্যারিসের ওই বৈঠকের এক বছর পরে সার্ত্রে মারা গেলেন এবং আমার মনে পড়ছে তার মৃত্যু আমাদের কতখানি দুঃখ দিয়েছিল!

আজকের কাগজ, ২ সেপ্টেম্বর, '০৪

ভাষান্তর : সারফুদ্দিন আহমেদ

গোলকায়নের সংকট

একটি ছোট খবর থেকে জানা গেল যে সৌদি আরবের প্রিন্স ওয়ালিদ ইবনে তালাল কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিকে দশ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন। এই টাকা আমেরিকান স্টাডিজ সেন্টার গড়তে ব্যয় করা হবে। এই তরুণ বিলিয়নয়ার ১১ সেপ্টেম্বরের পর নিউইয়র্ক শহরের জন্য দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান দেন। এই অনুদানের সঙ্গে যে চিঠি পাঠানো হয় তাতে নিউইয়র্কের প্রতি অর্ঘ্যের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি মার্কিন পরিকল্পনার পুনর্বিবেচনার ইঙ্গিত ছিল। তিনি ইসরাইলের প্রতি বলগাহীন মার্কিন পক্ষপাতের দিকেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর অমায়িক প্রস্তাবে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পর্যুদস্ত করার যে সাধারণ ভূমিকা অথবা নিদেন পক্ষে এই ধর্মের বিরুদ্ধে অসম্মান প্রকাশের দিকটিও নির্দেশ করা হয়েছিল।

নিউইয়র্কের তৎকালীন মেয়র রুডলফ গালিয়ানি, যিনি ইহুদী ধর্মাবলম্বিদের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠীর এই নগরীর প্রতিনিধি, তিনি ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে এই চেকটি ফিরিয়ে দেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়ায় আমি বলবো মাত্রাছাড়া বর্ণবাদী ঘৃণা এবং অপমান করবার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। নিউইয়র্কের ইমেজ বা ভাবমূর্তির পক্ষে তিনি এই শহরের সাহসিকতা ও বাইরের বিশ্বের বিরুদ্ধে নীতিগত প্রতিরোধের মনোভাবকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন এবং একটি আপাত সংঘবদ্ধ ইহুদি নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করেছেন।

তার এই দুর্ব্যবহার ১৯৯৫-এর ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই বছর (ওসলোর সিদ্ধান্তের অনেক পরে) ফিলার মনিক হলে অনুষ্ঠিত কনসার্টে জাতিসংঘের অন্য সবার সঙ্গে ইয়াসির আরাফাতকে প্রবেশাধিকার দেয়ার ব্যাপারে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তরুণ অবয়বের বিরুদ্ধে তার যে ভূমিকা বা উত্তর তা অবসম্ভাবিই ছিল। যদিও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের স্বীকার নিউইয়র্কে টাকার প্রয়োজন ছিল এবং এই টাকা মানবিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর কর্তাব্যক্তিগণ ইসরাইলকে সবকিছুর ওপরে গুরুত্ব দেয়, ইসরাইলের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী (টাকার মালিক হিসেবে) এবং সদা-সক্রিয় লবিইস্টরা কোন ভূমিকা নিলো কিনা তা গৌণ বিষয়।

গালিয়ানী টাকা ফেরত না দিলে কী হতো তা কেউ জানে না। তবে অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, তিনি ইসরাইলি লবির কাজটি অগ্রিম সাধন করেছেন। নিউইয়র্ক রিভিউ অফ বুক্স (১)-এ উপন্যাসিক জোন ডিডিয়ন যেমন লিখেছিলেন যে, এটি (ইসরাইল) মার্কিন পলিসির সারবস্তু, যা প্রথম সচ্ছতা পায় রুজভেল্টের মাধ্যমে, তাঁর মতে আমেরিকা সমস্ত যুক্তির বিপরীতে একদিকে সৌদি রাজতন্ত্র ও অপরদিকে ইসরাইল

রাষ্ট্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। এই বৈপরিত্ব এতোই তীব্র যে ডিডিয়নের মতে 'ইসরাইলের বর্তমান সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের যে বিষয় খুবই স্পর্শকাতর বলে বিবেচিত সেই বিষয়েই আমরা আলোচনাও করতে পারছি না।'

প্রিন্স ওয়ালিদের বিষয় মার্কিনিদের প্রতি আরবদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। প্রায় তিন জেনারেশনের আরব নেতৃত্ব, রাজনীতিবিদ ও আমেরিকায় শিক্ষিত উপদেষ্টারা তাদের নিজ দেশের জন্য যে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন তার ভিত্তি ছিল আমেরিকা সম্পর্কে প্রায় গল্পের মতো মনোলোভা ধারণাসমূহ। মূল ধারণাটি হল এই যে, মার্কিনীরাই সবকিছু পরিচালনা করে। এই ধারণার ডিটেইলে বা মধ্যে যা খুঁজে পাওয়া যায় তা বিস্তৃত এক বিষয়, যা-তে নানান জগাখিচুড়ী মতামত দিয়ে সৃষ্ট। আমেরিকাকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা থেকে শুরু করে নিঃস্বের জন্য ত্রাণ কার্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা যার সর্বশীর্ষে অলিম্পিয়ান ঈশ্বরের মতো বসে আছেন হোয়াইট হাউজের সেই সাদা চামড়ার গদিধারী ব্যক্তিটি।

আমার মনে পড়ে সেই সময় যখন ২০ বছর আগে আরাফাতকে আমি বোঝাতে চেয়েছি যে আমেরিকা একটি জটিল সমাজ যেখানে নানান স্রোত, স্বার্থ, চাপ ও ইতিহাস একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সিরিয়া যেভাবে শাসিত হয়েছে তেমনটা আমেরিকায় ঘটেনি, ক্ষমতা এবং শাসনের একটি ভিন্নধরণ বুঝতে পারার প্রয়োজন আছে। আমি একবাল আহমেদকে মার্কিন মুল্লুকের উপর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করি। আমার এই প্রয়াত বন্ধু ছিলেন সম্ভবত ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের পক্ষের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। আশির দশকে শুরুর দিকে প্যালেস্টাইনদের সঙ্গে মার্কিনিদের বাদানুবাদের দিনগুলোতে আমি ঐ ব্যক্তি ও আরো অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আরাফাতকে কথা বলতে বলি। এই অনুরোধের কোন প্রকার ফল হয়নি। আহমেদ আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি ফৌজের সঙ্গে ফ্রান্সের ১৯৫৪ থেকে ৬২ সাল পর্যন্ত যুদ্ধকালীন সম্পর্কের ওপর এবং উত্তর ভিয়েতনামিরা কিভাবে হেনরী কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন সে বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ভিয়েতনামবাসী ও আলজেরীয়দের মেট্রোপলিটন সমাজ সম্পর্কে যে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল তার পাশে মার্কিনীদের সম্পর্কে প্যালেস্টাইনিদের মতামত ক্যারিক্যাচার বা ব্যাঙ্গর মতো। শোনা কথা ও টাইম পত্রিকায় সামান্য চোখ বুলানোর ফলে যে ধারণা এর বাইরে প্যালেস্টাইনিদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আরাফাতের ধারণা ছিল যে হোয়াইট হাউসে গিয়ে সবচেয়ে সাদা লোকটির সঙ্গে কথা বললেই কর্ম সিদ্ধ হবে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে দিয়ে কাজ সমাধা করে নেয়াকে তিনি ইজিপ্টের মুবারক বা সিরিয়ার হাফেজ আল আসাদের মাধ্যমে কিছু করানোর মতো বিষয়ই মনে করেছিলেন।

ক্লিনটন নিজেকে মার্কিন রাজনীতির প্রভূপ্রতীম সত্তা হিসেবে তুলে ধরে প্যালেস্টাইনিদের হতবিহ্বল এবং পরাভূত করে ফেলেছেন অনায়াসে তাঁর মোহ এবং প্রয়াসকে ইচ্ছানুযায়ী নাড়াচাড়া করতে পারার ক্ষমতা দিয়ে। তবে মার্কিনীদের

সম্পর্কে ধারণা অপরিবর্তিতই রয়ে যায় এবং এখনও তা একই রকম। প্রতিরোধের বিষয়টি বা এক সুপার পাওয়ারের বিশ্বে কিভাবে রাজনীতির খেলা খেলতে হবে সে বিষয়ে অবগত হওয়ার ব্যাপারটি গত অর্ধেক শতাব্দীর নানা বিষয়ের মতো অজ্ঞাত বা অচর্চিত রয়ে যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষ তাঁদের হাত উপড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল নৈরাশ্যজনক, আমি আর সেখানে ফিরে যেতে চাই না।'

আশাব্যঞ্জক যে গল্প তা প্রিন্স ওয়ালিদের পরিবর্তিত দিক নির্দেশনায় লক্ষণীয়। এই বিষয়ে আমি কেবল আন্দাজ করতে পারি। আরব বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কিন সাহিত্য এবং রাজনীতির গুটিকতক কোর্স ছাড়া অন্য কোন একাডেমী নেই যেখানে পদ্ধতিগত উপায়ে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এর জনগণ এবং সমাজ ও ইতিহাস পড়ানো হয়। এমনকি কায়রো এবং বৈরুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোতে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব এমনকি কিছু ইউরোপীয় দেশেও এই অবস্থা তথৈবচ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অপ্রতিরোধ্য এক মহাশক্তির মুষ্ঠির মধ্যে যে পৃথিবী তার অধিবাসী হয়ে সেই শক্তির ঘূর্ণিগতিকে জেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক। এবং এটি সাধন করতে যে ইংরেজীর দক্ষতা প্রয়োজন খুব কম আরব নেতারই তা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ম্যাকডনাল্ড, হলিউড, সিএনএন, জিন্স ও কোকাকোলার রাজ্য। সহজে ভোগের সুবিধার্থে তৈরি বিষয়ের প্রতি যে ক্ষুধা তা মেটাতে সাহায্য করছে গোলকায়নের প্রক্রিয়া, বহুজাতিক কোম্পানি। কিন্তু এইসব বস্তুর উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ে সরলীকরণের বিষয়টির বিপদ থেকে দূরে থাকতে উৎপত্তির সঙ্গে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলো জড়িত তার বিশ্লেষণ জরুরি।

এ লেখা আমি যখন লিখছি তখন সারা পৃথিবী আমেরিকার দ্বারা দলিত হচ্ছে যখন এই পরাশক্তি ইরাককে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই জনবিরোধী ও অসমর্থিত কাজে পক্ষে পেয়েছেন সুবিধাবাদী সহশক্তি যেমন স্পেন ও ইতালি। যেভাবে সারা বিশ্বময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মিছিলের মাধ্যমে সাধারণের বিবেক প্রতিফলিত হচ্ছে, যুদ্ধ করার মানে দাঁড়াবে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন দখলদারিত্বের উলঙ্গ প্রকাশ।

অথচ যে হারে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, এশিয়ান, আফ্রিকান ও লাতিন আমেরিকানরা যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমেছেন তাতে বোঝা যায় যে অনেক পরে হলেও মানুষ আমেরিকা সম্পর্কে অথবা বলতে হয় যে গুটিকতক জুডিও খ্রিস্টান সাদা মানব সন্তান বর্তমানে আমেরিকার সরকার চালাচ্ছে তাদের একনায়কোচিত গোয়ার্তুমীর বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

আমি এখন মার্কিন দেশের ব্যতিক্রমী দৃশ্যপটটি তুলে ধরতে চাই। আমেরিকার একজন হয়ে, আমেরিকায় আয়েশ সহকারে বহু বছর বসবাসের পর, আমি একজন প্যালেস্টাইনি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে আউটসাইডার বা বাইরের একজন হিসেবে যে তুলনামূলক দৃষ্টিক্ষেপে পারদর্শী সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমেরিকাকে দেখাবো। আমার উদ্দেশ্য হবে আরব বিশ্বে যে একক বা একহারা সত্ত্বা হিসেবে আমেরিকাকে দেখা হয় রোহিত করে একে বুঝে ওঠার নানান পথ নির্দেশ করা।

আমেরিকা এবং অতীতের ধ্রুপদী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, সাম্প্রতিক এই সাম্রাজ্য অদ্ভুতভাবে জোড় দিচ্ছে অনিত্য এক হিতৈষণার আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের সাধুবৎ সরলতার ওপর। এটি উৎকণ্ঠার বিষয় যে এমন অলীক নৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। আরো উৎকণ্ঠার বিষয় হল প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারা যারা এক সময় বামপন্থী ও উদার নৈতিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ব্যক্তিগণই আগে মার্কিনিদের বিদেশের মাটিতে যুদ্ধ করার ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু আজ এরাই নৈতিক সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্রিয়াশীল। একাকী সাম্রীর ইমেজটিকে বিশেষায়িত করা হচ্ছে এবং এই বুদ্ধিজীবীরা এমন ধারায় ক্রিয়াশীল যার প্রকাশ জনগণের জোশ জাগানিয়া দেশাত্মবোধ থেকে শুরু করে মিনিমিজম... পর্যন্ত বিস্তৃত। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে টুইন টাওয়ার ও প্যান্টাগনে হামলার ঘটনা ধরে নেয়া হচ্ছে আকস্মিক এক ঘটনা হিসেবে। এটিকে মোটেও সাগরের অপর পারের পৃথিবীর মার্কিন উপস্থিতি ও খবরদারির প্রতি উন্মত্ত উত্তর হিসেবে দেখা হচ্ছে না। ইসলামিক সন্ত্রাসকে ছাড় দেবার জন্য এমনটা করা হচ্ছে না, এই সন্ত্রাস সর্বোতভাবেই ঘৃণ্য। আফগানিস্তানের প্রতি মার্কিন জবাবের যে লোকদেখানো সৎ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এখন ইরাকের ক্ষেত্রে যেমনটা করা হচ্ছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাস ও মাত্রাজ্ঞান দুইই তিরোহিত।

চরম বিদেশনীতিতে বিশ্বাসী উদারপন্থীরা কখনো খ্রিস্টীয় ডানপন্থীদের কথা মুখে আনেন না (এই দল সবদিক থেকেই ইসলামী চরমপন্থীদের সঙ্গে তুলনীয়)। মার্কিন রাজনীতিতে এই ডানপন্থীদের মূখ্য ভূমিকা রয়েছে। এদের দর্শন ওল্ডটেস্টাম্যান্ট থেকে উদ্ভূত, ইসরাইলের সঙ্গে যার হুবহু মিল। এই দলের নিকট বন্ধু ও এর সঙ্গে সবদিক থেকে তুলনীয় দেশ হল ইসরাইল। ইসরাইলের প্রভাবশালী নব্য রক্ষণশীলদের সঙ্গে আমেরিকার নব্য রক্ষণশীলতা ও খ্রিস্টিয় চরমপন্থীদের সাপোর্টারদের একটি অদ্ভূত মিল রয়েছে। এরা (মার্কিনী রক্ষণশীলরা) জায়নিজ্‌ম্ বা ইহুদিবাদের পক্ষ নেন কারণ তারা ইহুদিদের নিজ ভূমে ফিরে আসা ও ত্রাণকর্তার (ম্যাসায়া) দ্বিতীয় আবির্ভাবের জন্য ইহুদীদের প্রস্তুত করায় বিশ্বাস করেন, এই প্রস্তুতি মূলত ইহুদিদের দল থেকে খ্রিস্টান হওয়ার উপলক্ষে, তা না হলে নিশ্চিহ্ন হওয়ার অপেক্ষায়। এই উদ্ভট ও মাত্রাতিরিক্ত সেমেটিক বিরোধী ধর্মতত্ত্বের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয় সামান্যই, ইসরাইলপন্থী ইহুদিরাতো অবশ্যই এটিকে এড়িয়েই চলেন।

আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধার্মিক দেশ। আল্লাহর উল্লেখ এখানে সর্বত্র– কয়েন থেকে শুরু করে দালান কোঠা, বক্তৃতায় 'আমরা আল্লাহ'র বিশ্বাসী', 'আল্লাহর দেশ', 'আমেরিকাকে আল্লাহ রহমত করুক' এইসব বাক্যে তা প্রকাশিত। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ক্ষমতার ভিত্তি ষাট থেকে সত্তর মিলিয়ন খ্রিস্টান মৌলবাদী, যারা তার মতোই বিশ্বাস করে যে খ্রিস্টকে তারা দেখেছেন এবং আল্লাহর দেশে তারা সবাই আল্লাহ'র কার্যসাধন করতে এসেছেন। ফ্রান্সিস ফুকুইমাসহ আরো অনেক ভাষ্যকার তর্ক উত্থাপন করেছেন যে, আমেরিকাতে সমকালীন ধর্ম কমিউনিটি ও স্থিরতার প্রতি তৃষ্ণা থেকে জন্ম নিয়েছে। মার্কিন সমাজের প্রায় ২০% মানুষ এক অঞ্চল থেকে

অপর অঞ্চলে সদা ভ্রাম্যমান, এই সঞ্চরণশীলতা থেকে স্থায়িত্বের তৃষ্ণার জন্ম। এই বিষয়টি এক পর্যায় পর্যন্ত সত্যি। আরো বেশি যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল তা হল ধর্মের রকম-সকম। রসুলীয় জ্ঞান, একটি শেষ উদ্দেশ্য সাধনে দুর্মর প্রত্যয় এবং ছোট বাধা-বিপত্তিকে ধর্তব্যে না আনার এই বিষয়গুলি আমেরিকানদের পাথেয়। এমনকি মার্কিন মুল্লুক থেকে যে অপরাপর অস্থির বিশ্বের দূরত্ব যোজন, এই বিষয়টিরও একটি ভূমিকা রয়েছে। কানাডা ও মেক্সিকোর মতো দেশ প্রতিবেশী হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারটিও একই কারণে একটি জরুরি বিষয়, কারণ মার্কিন স্ফূর্তি ধ্বংস করার মতো ক্ষমতা এদের নেই।

মার্কিন ত্রুটিহীনতা, শুভ ভাব, মুক্তি, অর্থনৈতিক প্রতিজ্ঞা এবং সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওপরের বিষয়গুলো তাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে তা মোটেও মতবাদ বলে প্রতিভাত হয় না বরং প্রাকৃতিক সত্য বলে মনে হয়। আমেরিকা শুভ বা কল্যাণভাবের প্রতীক, আর কল্যাণভাব দাবি করে সর্বাত্মক ভালোবাসা এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততা। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি এদের অন্ধ ভক্তি বিদ্যমান এবং সংবিধানের প্রতিও এই একই ভক্তি দেখানো হয়। কারণ এটিকে এক যুগান্তকারী রচনা বলে মনে করা হয়। যদিও তা মানুষের সৃষ্টি। প্রাক মার্কিন যুগ যেন আকাট্টা প্রমাণের শেকড়।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উড়ন্ত পতাকা এমন আইকনগ্রাফি বা প্রতীক চিহ্নে পরিণত নয়। আমরা একে সর্বত্র বিরাজ করতে দেখি– টেক্সিক্যাবে, কোটের লেপেলে, বাড়ী-ঘরেরসামনে, জানালায় এবং ছাদে। এটিই জাতীয় ভাবমূর্তির মূল কাঠামো এবং এটি ঘৃণ্য অপগণ্ড শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ও বীর বিক্রমে টিকে থাকার প্রতীক। দেশাত্মবোধ হল সর্বোৎকৃষ্ট গুণ, যা ধর্মাধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দেশে ও বিদেশের মাটিতে সঠিক কাজটি সাধন করার অনুপ্রেরণা। দেশাত্মবোধও এখন ক্রয় ক্ষমতার শক্তি প্রকাশ করার মাধ্যমে নির্ধারিত। সেপ্টেম্বর এগারো'র পর আমেরিকানরা কেনাকাটা করার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরোধিতা করেছে।

বুশ, ডোনাল্ড রামসফিল্ড, কলিন পাওয়েল, কণ্ডালিজা রাইঝ এবং জন এশক্রফ্ট ৭,০০০ মাইল দূরে সাদ্দামকে শিক্ষা দেবার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলছেন। এই সবকিছুর নিচে পুঁজিবাদের কাঠামোটি স্পষ্ট, যা বর্তমানে আমূল ও নাজুক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ জুলি শোর দেখিয়েছেন যে, মার্কিনিরা বর্তমানে অনেক ঘণ্টা বেশী শ্রম দিয়েও আগের চেয়ে টাকা কম রোজগার করছেন। তিন দশক আগেও আরো কম শ্রমে তারা বর্তমানের চেয়ে বেশি রোজগার করতো। কিন্তু পুঁজিবাদের 'মুক্ত বাজারের সুযোগ' এই ডগমা বা দুর্মর প্রত্যয়ে কোনরূপ আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়নি। ব্যাপারটা যেন এমন যে, করপোরেট বা কোম্পানী কাঠামো প্রজাতন্ত্রের সহযোগী হয়ে সব মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করতে পারলেও এই বিষয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই।

এটিই হচ্ছে মার্কিন মতৈক্যের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া রুল, একেই ব্যবহার করে রাজনীতিবিদরা এবং সরলীকৃত করে স্লোগানে এবং ভাষ্য আকারে প্রচার করছেন

রাজনীতিবিদগণ। কিন্তু এই জটিল সমাজটির মধ্যে যা আবিষ্কার করা যায়, তা হল একটি একক মতের বিরুদ্ধে আরো কত বিপরীত মত ও স্রোত বহমান আছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে জাগ্রত কণ্ঠস্বর, এটি আমেরিকার ফর্মাল ও মিডিয়ায় প্রকাশিত উল্টা দিক থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে। প্রেসিডেন্ট বুশ একে ছোট করে দেখতে চাচ্ছেন এবং মূল স্রোতের প্রচার মাধ্যম (নিউইয়র্ক টাইমস্-এর মতো পত্রিকা, টেলিভিশন সম্প্রসার কেন্দ্রগুলো এবং অন্যান্য পাবলিশিং ও ম্যাগাজিন ইণ্ডাস্ট্রি) সব সময় এই ভিন্ন স্রোতকে রোহিত করতে প্রস্তুত। সাদ্দামের নামের সঙ্গে যেভাবে সিএনএন-এর সংবাদ পাঠকেরা বারবার কুকীর্তি ও শয়তানির কথা উচ্চারণ করেন এবং যেভাবে 'আমাদের' এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা বলেন, সরকার ও প্রচার মধ্যমগুলোর মধ্যেকার এমন নির্লজ্জ ঐক্য এর আগে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। এয়ার ওয়েভে কেবলই অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার, সন্ত্রাস-বিশেষজ্ঞ ও মধ্যপ্রাচ্য পলিসি এনালিস্টে ভরে গেছে। কিন্তু এঁদের কেউই এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় ভাষাও জানে না, কখনো হয়তো মধ্যপ্রাচ্যেও গমন করেন নাই এবং যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার মতো উপযুক্ত শিক্ষাও এরা গ্রহণ করেন নাই। এরা তাদের বিতর্কে যে বিষয়টি উত্থাপন করতে ওস্তাদ, তা হল 'আমাদের' কিভাবে ইরাককে রোহিত করতে হবে এবং কিভাবে ইরাকের পয়জন গ্যাস আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি হিসেবে জানালায় ডাক টেপ লাগাতে হবে। এই সবই তারা রিচুয়ালে উচ্চারিত মন্ত্রের মতো বলে যেতে থাকেন।

যেহেতু মার্কিন ঐকমত্যের বা কনসেনসাসে একটি নিয়ন্ত্রিত বিষয়, তাই এটি একটি শাশ্বত বর্তমানে অবস্থান করে। এই ঐকমত্যের কাজে ইতিহাস একটি অচ্ছুৎ বিষয়। এমনকি সাধারণের আলোচনাতেও ইতিহাস শব্দটি শূন্যতার সমার্থক। কাউকে অপদার্থ ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে আমেরিকানরা সব সময়ই একটি বিদ্বেষমূলক উক্তি করেন– 'তুমি ইতিহাস'। আমেরিকাতে ইতিহাস হচ্ছে আমেরিকান হিসেবে নিজেদের সম্পর্কে তর্কাতীত, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন কিছু বিশ্বাস (ইতিহাস বাকী পৃথিবী সম্পর্কিত নয়, কারণ তা পুরনো এবং এই কারণে অপ্রাসঙ্গিক)। এখানে একটি বিস্ময়কর বৈপরিত্ব বিদ্যমান। জনমানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের উর্ধ্বে বিদ্যমান। অথচ সমস্ত কিছুর ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সর্বগ্রাসী তৃষ্ণাও রয়েছে। ছোট অঞ্চল থেকে শুরু করে বিশাল সাম্রাজ্য-এই সকল কিছু নিয়েই তাদের অনুসন্ধিৎসা। আমেরিকার নানান কাল্ট বা চিন্তাস্রোত ভারসাম্য রক্ষাকারী দুই বিপরীত থেকে উৎসারিত– এ দিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ আর অপরদিকে আধ্যাত্মবাদিতা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। কোন প্রকৃতির ইতিহাস শেখানো হবে এই বিষয়টি নিয়ে আমেরিকাতে এক ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। যারা মার্কিন ইতিহাসকে এর ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া নির্ভর একটি একমুখো বা একক রচনা হিসেবে প্রচার করেন তারা এটিকে তাদের আইডোলজি বা মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী বিষয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। কারণ ছাত্রদেরকে বাধ্য নাগরিকে পরিণত করতে এটি জরুরি এবং এই মতের অধিকারীরা সর্বদাই আমেরিকার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্কের বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব অপরিবর্তনীয় ধরে নেন। এই চরম

এসেনশিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তর-আধুনিকতা ও বিভেদের ইতিহাস (সংখ্যালঘু, নারী ও কৃতদাস) বিতাড়িত। কিন্তু এর ফলাফল দাঁড়াচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত, এই হাস্যকর মানদণ্ড চাপিয়ে দিয়েও কাজ হচ্ছে না।

লিণ্ডা সিমকক্স লিখেছেন, 'বন্য রক্ষণশীলরা সাংস্কৃতিক শিক্ষার নামে যা চেষ্টা করেন তা হল ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে এক দ্বন্দ্বহীন, ঐকমত্যের ভিত্তিতেগড়া দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করা। কিন্তু এই প্রকল্প ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। সামাজিক ও বৈশ্বিক ঐতিহাসিকদের হাতে যে স্টেণ্ডার্ডস বা মানদণ্ডগুলি নির্মিত হয়েছে তা শেষমেশ বহুত্ববাদী দর্শনকে ত্বরান্বিত করেছে। অথচ সরকার বহুত্ববাদিতা রোহিত করার জন্যই তৎপর। যে সমস্ত ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, সামাজিক সুবিচার এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, এই বিষয়গুলো অতীত বিষয়ে আরো বিমিশ্রিত বক্তব্য দাবি করে তাঁদের ছাড়াই ঐকমত্যের ইতিহাস খণ্ডিত হচ্ছে।'

গণ-পরিসরে মূলস্রোতের মিডিয়াগুলো তাদের ন্যারেথিমস বা বিষয় বর্ণনার মাধ্যমে আলোচনা নির্মাণ, নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও ওপরে ওপরে তারা বৈচিত্র ও বহুত্বের ভান করে। আমি যে সমস্ত বিষয়ে এখন আলোচনা করবো যা প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এর একটি জরুরী বিষয় হচ্ছে– একত্রিত উচ্চারণ 'আমরা'। এই শব্দটি হচ্ছে জাতীয় পরিচয় যা বাঁধাহীনভাবে প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ রাষ্ট্রের সেক্রেটারি, মরুভূমিতে সেনাবাহিনী অনায়াসে উচ্চারণ করে। এবং 'আমাদের' স্বার্থ দেখা হয় প্রতিরক্ষার পরিসর থেকে। কোন ভিন্ন উদ্দেশ্য এই স্বার্থ যেন কখনোই পরিচালিত হয় না এমন ইনোসেন্ট বা অবলাভাব এতে সংযোজিত হয়, যেমন ঐতিহ্যমণ্ডিত নারীকে ভাবা হয় অবলা, শুদ্ধ ও পাপবিরোহিত সত্ত্বা হিসেবে।

২.

আরেক ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্প হল ইতিহাসের অপ্রাসঙ্গিকতা এবং ঐতিহাসিক যোগসূত্রগুলো অস্বীকার করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সাদ্দাম ও বিন লাদেনকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিন অস্ত্র সরবরাহ করেছে অথবা ভিয়েতনাম যে আমেরিকার জন্য 'মন্দ' ছিল– যেমন জিমি কার্টার এই যুদ্ধ সম্পর্কে একদা উল্লেখ করেছেন যে এটি ছিল 'পারস্পরিক ধ্বংসযজ্ঞ', এই সব বিষয়ের উল্লেখ একেবারেই নিষিদ্ধ। অথবা আরো পোক্ত উদাহরণ দেয়া চলে যে, মার্কিন অভিজ্ঞতার দু'টি জরুরি ও মৌল বিষয়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখা হয়েছে। এর একটি হল আফ্রো-আমেরিকানদের ক্রীতদাস হিসেবে আমেরিকায় নিয়ে আসা ও মানবগোষ্ঠী হিসেবে নেটিভ আমেরিকানদের ডিসপোজেস বা ত্যাগ করা, এমনকি প্রায় গণহত্যার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। ঐকমত্যের দূর্মর সত্যে এই বিষয়গুলোর কোন ছোঁয়া এখনো পর্যন্ত লাগেনি। ওয়াশিংটন ডিসিতে বৃহৎ এক হলকস্ট জাদুঘর আছে, কিন্তু নেটিভ আমেরিকান বা আফ্রো-আমেরিকানদের জন্য কোন মেমোরিয়াল নেই।

অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরিলক্ষিত প্রত্যয়টি হল এই যে, বিরোধিতা মানেই মার্কিন স্বার্থ পরিপন্থী। এর উৎস 'আমাদের' গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সম্পদ এবং বীরত্ব অথবা বিদেশী নোংরামি (যেমনটা ফরাসীদের মার্কিন যুদ্ধ বিরোধিতায় মার্কিনীরা

খুঁজে পান) এসব বিষয়ে মিথ্যা গর্ব। মার্কিনীরা ইউরোপীয়দের বার বার মনে করিয়ে দেয় যে তারা বিংশ শতকে দুইবার তাদের উদ্ধারকর্তা ছিল এবং এর মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে ইউরোপিয়রা বসে বসে কেবল নেত্রপাত করেছে যখন মার্কিনিরা আসল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল।

এই ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্পের বদল হয়ে যায় যখন মিডল ইস্ট বা লাতিন আমেরিকায় পঞ্চাশ বা তারও অধিক সময় ধরে আমেরিকানদের উপস্থিতির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে মার্কিনীরা হয়ে ওঠেন সৎ ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী, পক্ষপাতহীন কাজী বা বিচারক ও এমন এক কল্যাণকামী শক্তি যে অজাতশত্রু। এই বিশেষ-গল্পে ক্ষমতা অর্থনৈতিক স্বার্থ, সম্পদ হস্তগত করা, বর্ণের প্রতি পক্ষপাত কিংবা জোরপূর্বক অথবা গোপনে শাসক পরিবর্তনের মতো বিষয় (যেমনটা ইরানে ১৯৫৩ তে এবং চিলিতে ১৯৭৩-এ ঘটিয়েছে) আলোচিত হওয়ার সুযোগ নাই। এই বিষয়গুলো আড়ালেই থাকে, যদি না কেউ হঠাৎ মনে করিয়ে দিয়ে গোলমাল সৃষ্টি করে। কেউ যদি এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিতও করতে চান তবুও তা সরকারি বুদ্ধি ধারা অনুযায়ী ইউফেমিজম বা আপাত কোমল প্রতিশব্দ ও ভাষা ব্যবহার করে করতে হয়। এমন বাক্যবন্ধন ব্যবহার করা হয় যা লঘু ক্ষমতা, তার প্রয়োগ এবং মার্কিন স্বপ্ন স্পষ্ট করে তোলে। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আড়াল করা হয় তা হল পৃথক পৃথক পলিসি, যেগুলো মার্কিনীদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তৈরি করা হয়েছে। যেমন ইরাকে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে যে সাধারণ মানুষের ক্ষতি, আরিয়াল শ্যারনের প্যালেস্টাইন জনগণ বিরোধী কেম্পেন, তুর্কী ও কলাম্বিয়ান দুঃশাসকদের পক্ষে ও তাদের নিজ নিজ জনসাধারণের প্রতি যে নাশকতা তারও পক্ষে দাঁড়ানোর বিষয়গুলো নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়। পলিসি বা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় এই সব বিষয় ধর্তব্যের সীমানার বাইরে থাকে।

সবশেষে যে ন্যারেথিম বা বিশেষ গল্প সেটি হচ্ছে হেনরী কিসিঞ্জার, ডেভিড রকে ফেলারের মতো ব্যক্তিত্বসহ সাম্প্রতিক সরকারের সকল অফিসিয়ালদের নৈতিক প্রজ্ঞা সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করা। রিচার্ড নিক্সন যুগের দুই অপরাধি এলিওট আব্রাহাম ও জন পোয়েনডেক্সটারকে বর্তমান সরকার মূল্যবান পদে বসিয়েছেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন মন্তব্যই শোনা যায়নি, বিরুদ্ধাচরণতো পরের বিষয়। অতীত ও বর্তমান প্রশাসনের প্রতি যে অন্ধ ভক্তি তা ভাষ্যকারদের সম্ভাষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কোন ভাষ্যকারই কোন প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার মসৃণ বদনের বর্ণনা দেন, যা কোন রকম অপরাধের প্রমাণ দ্বারা কলঙ্কিত নয়।

এই যে ব্যবহার, এর পেছনে রয়েছে মার্কিনিদের প্রেগমেটিজম বা প্রয়োগবাদী দর্শনকে বাস্তবতা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বিশ্বাস করা। প্রয়োগবাদীতা হচ্ছে অধিবিদ্যা ও ইতিহাস বিরোধী, এমনকি দর্শন বিরোধী। উত্তর আধুনিকতায় নাম ও চিহ্ন বিরোধিতার নামে সব কিছুকেই বাক্যের যে স্ট্রাকচার এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে যাচাই করে, এই বিষয়টিও এই গোত্রীয়। উত্তর আধুনিকতা হল এনালিটিক বা বিশ্লেষণী দর্শনের পাশাপাশি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিন্তার জগতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারা। আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে হেগেল এবং

হাইডেগার বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও সাহিত্য বিভাগে পড়ানো হয়, কিন্তু দর্শন হিসেবে এদের পাঠ করা হয় না বললেই চলে। মার্কিনীদের তথ্য প্রচারের নতুন উদ্যোগ (বিশেষত মুসলিম বিশ্বে) এই মহাগল্প ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

মার্কিন এই ট্রেডিশনের তুমুল বিরোধী স্রোত এবং ইমিগ্রেন্ট সমাজের ভিন্ন ভাবনা, এই সবই প্রশাসনের তৈরি ন্যারেথিম বা বিশেষগল্পের পাশাপাশি ও ভিতরে ভিতরে বেড়ে উঠছে। কিন্তু এই বিষয়গুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই স্পষ্ট হতে দেয়া হচ্ছে না। বহিঃবিশ্বের চিন্তাবিদেরা হামেসাই এই বিরুদ্ধস্রোত চিহ্নিত করতে সক্ষম হন।

আমরা যদি ইরাকে যুদ্ধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে তীব্র বাধাগুলোর জন্ম হয়েছে তার প্রতিটি অংশকে বিশ্লেষণ করি তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এই মার্কিন দেশ বাইরের সাহায্য-সহযোগিতা, আলোচনা ও ঘটনার প্রতি অধিক সদয় ও সহনশীল। আমি ঐসব লোকদের বাদ রাখছি যারা রক্তক্ষয় ও সম্পদের ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক বিপত্তির ভয়ে এই যুদ্ধ এড়াতে চাচ্ছেন। আমি ডানপন্থীদের মত নিয়েও ভাবিত না। যারা সর্বদা বিষোদগার করে যে আমেরিকা দুষ্ট বিদেশী, জাতিসংঘ ও আল্লাহীন কমিউনিস্টদের দ্বারা আক্রান্ত।

ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদী ও একাকিত্বপন্থীরা, যারা ডান ও বামের অদ্ভুত মিশ্রণে তৈরি, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমি এই আলোচনায় যুক্ত করতে চাই মার্কিন দেশের একটি আদর্শবাদী বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। এই দল হচ্ছে মার্কিন অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ পোষণকারী ছাত্র সমাজ। এরা আদর্শ তাড়িত এবং কখনো কখনো কিছুটা এনার্কিকধর্মী। এই দলই ভিয়েতনাম, সাউথ আফ্রিকা এবং মার্কিন সিভিল রাইট বিষয়ে ক্যাম্পাসগুলো সবসময় সরগরম করে রাখতো। এদের পর বাকি থাকে আরো কতেক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস তাড়িত দল। ইউরোপ এবং আফ্রো ভাষায় যাদের বাম বলে চিহ্নিত করা চলে। যদিও আমেরিকাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পার্লামেন্টারী বাম বা সমাজতান্ত্রিক ধারা বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দুই দলীয় শক্তির দলনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ডেমোক্রেটিক দল কখনো কখনো বামের শূন্যস্থান পুরণে মৃদু এগিয়ে আসতো। বর্তমানে ডেমোক্রেটিক দল এমন দূরবস্থায় পতিত যা থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।

আফ্রো-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল অংশকেও আমি উপরোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতে চাই। এরা সেই সমস্ত নাগরিক দল বা গোষ্ঠী যারা পুলিশের অত্যাচার, চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। এদের নেতৃত্বে আছেন বেভারেন্ড অ্যাল শার্পটন, কর্নেল ওয়েস্ট, মোহম্মদ আলী, জেসি জ্যাকসন (যদি ইনি এখন এক ম্রিয়মান নেতা) এবং অন্যান্যরা। এরা সকলেই মার্টিন লুথারের ভূমিকায় নিজেদের কল্পনা করেন।

বিপরীত স্রোতের এই আন্দোলনে আরো অনেক নৃগোষ্ঠীর একটিভিস্টরা জড়িত। এদের মধ্যে লাতিন আমেরিকান, নেটিভ বা আদি আমেরিকান ও মুসলিমরা রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই কমবেশী চেষ্টা করেছেন মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হতে। প্রত্যেকেই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্ম সাধনে অথবা টেলিভিশনের টক শোতে হাজির হয়ে অথবা বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, কলেজ ও করপোরেশনের প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত -

হতে চেষ্টা করে আসছেন। এই জনগোষ্ঠীগুলো উচ্চাকাঙ্ক্ষার বদলে তাদের প্রতি যে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও অনাচার সেই বিষয়ে সচেতনতার দ্বারাই পরিচালিত। এ কারণেই এরা আপাদমস্তক আমেরিকান স্বপ্নে (বিশেষ করে সাদা মধ্যবিত্তের স্বপ্নে) ডুবে যেতে রাজি না। শার্পটন ও রেক্ষ নাদের ও তাঁর পক্ষের অনুসারীদের কষ্ট করে টিকিয়ে রাখা গ্রীণ পার্টির মার্কিন মুল্লুকে কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। এমনকি প্রচার ও প্রকাশও রয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হল এসব সত্ত্বেও এঁরা সকলেই আউট সাইডারের মতো এবং মার্কিন সমাজের গতানুগতিক পুরস্কারের লোভ তাঁদের আপন আদর্শের প্রতি কোন ঝুঁকির কারণ নয়। কারণ এরা সকলেই নিজ আদর্শে অটল এবং সামাজিক পুরস্কারের প্রতি তাঁদের কোন লোভ নেই।

মার্কিন সমাজের নারী আন্দোলনের মূল ধারাটিও এই সমাজের মূল স্রোত বিরোধী। এঁদের এবোরশনের অধিকার, যৌন হয়রানি ও অত্যাচার এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সম অধিকারের মতো ইস্যুগুলোর মাধ্যমেই তাঁরা বিরোধী স্রোতের শক্তিশালী অংশ। আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় এবং স্বাভাবিক স্বার্থ ও উন্নয়ন অনুসারী জীবিকায় নিয়োজিত দলগুলো (যেমন চিকিৎসক, আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞ শিক্ষক সম্প্রদায় এমনকি কিছু কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন ও পরিবেশ আন্দোলনে জড়িত গোষ্ঠীসমূহ) বিরুদ্ধ স্রোতের গতিকে চালিত করে। যদিও এই গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্বার্থের কারণেই সমাজের নিয়মানুগ কার্যক্রম ও তা থেকে সৃষ্ট এজেণ্ডা বা পরিকল্পনাসমূহের ওপর আস্থা রেখেই চলে।

পরিবর্তন ও বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্র হিসেবে চার্চগুলোকেও বাদ দেয়া চলে না। মৌলবাদী ও টেলিএভেনজেলিস্টরা (যারা টিভি মারফত ধর্ম প্রচারে বিশ্বাসী), তাদের থেকে এই সংগঠিত চার্চের সদস্যরা পৃথক। কেথোলিক বিশপ, যুদ্ধের বিরুদ্ধে এপিসকোপালিয়ান চার্চের যাজক ও সাধারণ সদস্য, কোয়াকার (যে সব খৃস্টান ইনফর্মাল ধর্মীয় সম্মেলনে বিশ্বাসী) এবং প্রেসবাইট্যারিয়ানদের সিনোড্ বা সভা অবিশ্বাস্যরকম দৃঢ়। এরা শান্তির পক্ষে উদারনৈতিক ভূমিকা নিচ্ছে এবং মানব অধিকার লঙ্ঘন ও অতিশয় স্ফীত মিলিটারী বাজেট ও নব্য উদারনৈতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও এরা কথা বলতে প্রস্তুত।

ঐতিহাসিকভাবেই ইহুদী সমাজের একাংশ সব সময়ই প্রগতিশীল সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে আন্দোলনে জড়িত। কিন্তু রিগান আমলে নব্য-রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় আরোহণের পর মার্কিন ও ইসরাইলি ধর্মীয় ডানপন্থীদের একত্রিত শক্তি ইসরাইলের যে কোন রকম সমালোচনাকে সেমেটিক বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করা শুরু করে। ফলে ইহুদী এই প্রগতিশীল ধারার ধ্বনাত্মক দিক প্রায় নিশ্চিহ্ন।

অন্য গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা রেলী, প্রতিবাদ মার্চ এবং শান্তি-সমাবেশের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর এগারো পরবর্তী হৃদয় অন্ধকার করা দেশাত্মবোধের বিরোধিতা করেছে তাদের কথা বলব জরুরী। এঁরা মার্কিন 'পেট্রিওট এক্ট'-এর বলীতে পরিণত সিভিল মুক্তি ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে জড়ো হয়েছেন। যে বিষয়গুলো মধ্যবিত্তের গতি-প্রকৃতিকে লজ্ঘিত করে, এই দলগুলো তারই বিরোধী ধারণার প্রবক্তা। কেপিটাল পানিশম্যান্ট, গুয়েনতানামো সাগরের ডিটেনশন ক্যাম্পে মানবাধিকার লঙ্ঘন, এছাড়াও সামরিক বাহিনীতে সিভিলিয়ান নেতৃত্বে অবিশ্বাস ও ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত মার্কিন জেল-

হাজত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই এরা সোচ্চার।

এসবের সমান্তরালে রয়েছে সাইবার জগতের মজাদার যুদ্ধ। যেখানে সরকার ও সাধারণ দ্বন্দ্বে রত। বর্তমান পতনোন্মুখ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ধনী-গরীবের পার্থক্য, করপোরেট গুরুদের অপব্যয় ও দুর্নীতি এবং প্রাইভেটাইজেশনের লালসার তোপে পরা সোশাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা মার্কিন পুঁজিবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারণাগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন হল– বুশের আক্রমণাত্মক বিদেশ নীতি ও বিপদজ্জনকরকম সাদামাটা অর্থনৈতিক দর্শনের পেছনে আমেরিকানরা একত্রিত কি না? আমেরিকার পরিচিতি কি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে? এবং আমেরিকা এমন কিছু বিষয় কি ধারণ করে যার বিপরীতে পৃথিবীর কোন কোন শক্তি (শান্ত থাকতে চাইছে না) দাঁড়াতে সক্ষম?

এই লেখায় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখার অন্য একটা পথ বাতলাতে চেষ্টা করেছি। বলতে চেয়েছি যে এটা একটা বিপদে আক্রান্ত দেশ এবং এর মধ্যে নানান বিবাদমান বাস্তবতা বর্তমান। আমার মনে হয় আমেরিকাকে বলা যায় যে, এটি নানান পরিস্থিতির দ্বন্দ্বে পতিত এক জাতি। যেমন মার্কিনীরা বাইরের বিশ্বে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে তেমনটা অভ্যন্তরেও। আমেরিকা হয়তো কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, কিন্তু এর ফলাফল এদেশের ভিতরেই এখনো স্পষ্ট না। আর এই দ্বন্দ্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। মার্কিন হোমড়াচোমড়াদের মিলিটারী ও রাজনৈতিক শক্তির এককেন্দ্রীকতার দিকে এমনভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হয় যে আভ্যন্তরীণ ঘটমান দ্বন্দ্বগুলিকে হেলা করা হয়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান এখনো অনেক দূরে। এবোরশনের অধিকার এবং বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেয়া, এই বিষয়গুলোর কোন সুরাহাই এ যাবতকাল পর্যন্ত হয়নি।

ফুকুইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তির থিসিসের ভুল এবং হাটিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব বিষয়ক তত্ত্বের ত্রুটি অনেকটা একই রকম। তারা দু'জনেই ভুলবশত ধরে নেন যে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে, শুরু, মধ্য এমনকি শেষও আছে। অথচ সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি হচ্ছে এর চরিত্র, স্বনির্ধারিত সংজ্ঞা এবং এই বিষয়ের ভবিষ্যতে প্রক্ষেপণের চেষ্টার ক্ষেত্র। দুই তাত্ত্বিকই সঞ্চরণশীল সংস্কৃতির অনিত্য উত্তালতার ধারণাকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট সীমানা ও সুনির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন মেনে নেন।

সংস্কৃতি– বিশেষ করে ইমিগ্রেন্ট সংস্কৃতি–আমেরিকাতে অপর সংস্কৃতির সাথে সংমিশ্রিত হচ্ছে। গোলকায়নের অনভিপ্রেত একটি ফল হচ্ছে আন্তঃজাতীয় কমিউনিটিগুলোর আত্মপ্রকাশ। মানবাধিকার, নারীর পক্ষে ও যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যমে এই কমিউনিটি বা সমাজগুলো সৃষ্ট ও পরিচালিত। এগুলোর দ্বারা আমেরিকা মোটেই অপমাণিত হচ্ছে না। তবে, আমেরিকার আপাত ঐক্যের অভ্যন্তরে যে মতবিরোধ তা পৃথিবীর সকল সমাজেই বিদ্যমান। এই সত্য আবিষ্কারে আশা ও প্রেরণা জাগ্রত হয়।

আল আহরাম
খবরের কাগজ, ৮ এপ্রিল '০৩
ভাষান্তর : মোস্তফা জামান

সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য যুদ্ধ

বুশ প্রশাসনের অবিরাম একতরফা যুদ্ধতৎপরতা অনেকগুলো কারণে অত্যন্ত আপত্তিজনক ও বিরক্তিকর। কিন্তু আমেরিকান জনগণের কথা ভাবলে এই পুরো দুঃস্বপ্নময় দৃশ্যটি গণতন্ত্রের এক বিশাল ব্যর্থতা। বিপুল সম্পদশালী ও প্রবল পরাক্রমশালী একটি রাষ্ট্র ছিনতাই হয়ে গেছে কতিপয় ব্যক্তির একটি ক্ষুদ্র চক্রের হাতে। তারা কেউই নির্বাচিত নন, তাই জনমতের চাপকে ভ্রূক্ষেপ করছে না, স্রেফ মুখ ফিরিয়ে আছে। এই যুদ্ধকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে অজনপ্রিয় যুদ্ধ বললে অতিরঞ্জন হবে না।

ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের চরম পর্যায়ে বিশ্বজুড়ে যেসব যুদ্ধবিরোধী মিছিল-সমাবেশ হয়েছে, এবার ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ যুদ্ধবিরোধী মিছিল করেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই। লক্ষণীয়, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মিছিল-সমাবেশগুলো হয়েছিল কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলার পর, আর ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই।

আমি কত জায়গায় ঘুরে বেড়াই, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু একজন মানুষও আমি এ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি যিনি ইরাকে যুদ্ধ চান। আরো খারাপ কথা হচ্ছে, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক এখন মনে করছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি এত দূর এগিয়ে গেছে যে এটা আর থামবে না, আর তাই আমরা এখন আমাদের দেশের এক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। ডেমোক্র্যাটিক দলের কথাই ধরুন না কেন, অল্প কয়েকজন ব্যতিক্রম ছাড়া দলটির অধিকাংশ সদস্যই মেকি দেশপ্রেম দেখাতে নির্লজ্জভাবে প্রেসিডেন্ট বুশের পক্ষে মত দিয়েছেন। কংগ্রেসের যেখানেই তাকাই না কেন, সবখানেই হয় ইহুদি লবি, দক্ষিণপন্থী খ্রিস্টান লবি, নয়তো সামরিক শিল্পপতি লবির প্রতি সহানুভূতির লক্ষণ দেখা যাবে। এই তিনটিই অত্যন্ত প্রভাবশালী সংখ্যালঘু গ্রুপ, যারা আরব বিশ্বের প্রতি সমানভাবে শত্রু মনোভাবাপন্ন আর চরমপন্থী ইহুদিবাদের প্রতি তাদের সমর্থন সীমাহীন। এবং তারা মনে করে যে তারা ফেরেশতাদের পক্ষে কাজ করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০টি কংগ্রেসীয় এলাকায় একটি করে প্রতিরক্ষা শিল্প আছে। তাই যুদ্ধ এখন একটা কর্মসংস্থানের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এটি কোনো নিরাপত্তার বিষয় নয়। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন– দেশের চলমান অর্থনৈতিক মন্দা, সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থার প্রায়নিশ্চিত দেউলিয়াত্ব, ক্রমবর্ধমান জাতীয় ঋণ, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক ব্যর্থতা ইত্যাদির প্রতিকার এই অবিশ্বাস্য রকম ব্যয় সাপেক্ষ যুদ্ধ থেকে কীভাবে হবে?

অন্যদিকে আমেরিকার সংবাদমাধ্যম বুশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টারই একটা হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টেলিভিশন থেকে যুদ্ধবিরোধী

কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেছে। বড় বড় প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, সাবেক সিআইএ এজেন্ট, সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আর সুপরিচিত নয়া রক্ষণশীল ব্যক্তিদের 'কনসালট্যান্ট' হিসেবে নিয়োগ করছে। তারা এমনভাবে কথা বলে, যেনবা তারা নিজেদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করছে। কিন্তু কার্যত তাদের সব কথাই মার্কিন প্রশাসনের পক্ষে যায়– জাতিসংঘ থেকে শুরু করে আরবের মরুভূমি পর্যন্ত যেখানে যা-ই করুক না কেন বুশ প্রশাসন। শুধু বাল্টিমোরের একটি দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট ছেপেছে যে আমেরিকা নিরাপত্তা পরিষদের ছয়টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যকার কথাবার্তায় আড়ি পেতেছে, বার্তা আদান-প্রদানে, ইন্টারসেপ্ট করেছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে যুদ্ধবিরোধী কথা শোনা বা পড়ার সুযোগ মিলছে না। সরকারি প্রচারমাধ্যম, নিউইয়র্ক টাইমস, নিউইয়র্কার-এ, ইউএস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট, সিএনএন-কোথাও কোনো আরব বা মুসলমানের বক্তব্য বা ইসরায়েলের সমালোচনার জায়গা নেই। এই প্রচার মাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার চালিয়েছে, যে ইরাক জাতিসংঘের ১৭টি প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু ইসরায়েল যে জাতিসংঘের ৬৪টি প্রস্তাবকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছে (যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে) এই তথ্যটি তারা কখনোই উল্লেখ করেনি। গত ১২ বছর ধরে ইরাকের জনগণ যে অবর্ণনীয় কষ্ট-দুর্ভোগের মধ্যে দিনযাপন করছে, সেকথাও কখনো উল্লেখ করা হয় না।

সাদ্দাম যা করেছেন, আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট ইসরায়েল আর শ্যারনও তা-ই করেছেন। কিন্তু ইসরায়েল ও শ্যারনের ব্যাপারে কেউ কিছু বলছেন না, অথচ সাদ্দামের ব্যাপারে তর্জন-গর্জন চলছে। বুশ বা অন্যরা যখন বলেন যে, জাতিসংঘকে নিজের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তখন সেটা মশকরা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে আমেরিকার জনগণের সঙ্গে মিথ্যাচার করা হচ্ছে, ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের স্বার্থগুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বুশ ও তার পারিষদবর্গের এই যুদ্ধের আসল লক্ষ্য ও অভিপ্রায়গুলো তাদের চরম ঔদ্ধত্যের আড়ালে রয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, যিনি কোনো নির্বাচিত ব্যক্তি নন, পেন্টাগনে তার সেবক কর্মকর্তারা-উলফোভিৎস, ফেইথ আর পার্ল, কিছু সময় ধরে পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরায়েলের ভূমি দখলের পক্ষে এবং অসলো শান্তি প্রক্রিয়া থামানোর পক্ষে প্রকাশ্যে ওকালতি করেছেন, তারা ইরাকের বিরুদ্ধে (পরে ইরানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নেতানিয়াহুর পক্ষে সফল প্রচারাভিযানের সময় তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসেবে তারা ফিলিস্তিন থেকে কেড়ে নেওয়া ভূমিতে বেশি করে ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। আজকে তাদের কথাগুলোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসরায়েলি সৈন্যদের হাতে নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনি হত্যার খবর যদি আদৌ কখনো ছাপা হয়, প্রতিবেদনের শেষের দিকে সেগুলো সামান্য জায়গা পায়। কিন্তু সাদ্দামের অপরাধের সঙ্গে ইসরায়েলের এসব বর্বর হত্যাযজ্ঞের তুলনা টানা হয় না। ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অন্যায় দস্যুনীতি চরিতার্থ করার জন্য আমেরিকার জনগণের মতামত না নিয়ে তাদের করের টাকা ইসরায়েলে পাঠানো হয়। গত

দু'বছর ইসরায়েলি সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবে প্রায় আড়াই হাজার নিরীহ সাধারণ ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করেছে। গুরুতরভাবে জখম করেছে ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষকে। আধুনিক ইতিহাসে দীর্ঘতম সামরিক দখলদারিত্বের এই সময়কালে একটি জাতিকে শাস্তি দেওয়ার, লাঞ্ছিত করার, অপমাণিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসরায়েলি সৈন্যদের।

ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছার পর থেকে আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমের মূলধারায়, তা সে উদারপন্থি, মধ্যপন্থি বা প্রতিক্রিয়াশীল যে অংশই হোক না কেন, কোনো আরব বা মুসলমানের বক্তব্য নিয়মিতভাবে স্থান পায়নি। আরো একটা বিষয়, এই যুদ্ধের প্রধান পরিকল্পনাকারীরা কেউই কয়েক দশক ধরে আরব বিশ্বের কোনো দেশে বাস করা দূরে থাক, ধারেকাছেও যাননি (তথাকথিত বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড লুইস ও ফুয়াদ আজামির কথা বলাই বাহুল্য)। কলিন পাওয়েল, কন্ডোলিৎসা রাইস ও ডিক চেনির মতো সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা এবং তাদের মহান ঈশ্বর খোদ জর্জ ডব্লিউ বুশও মুসলমান বা আরব বিশ্ব সম্পর্কে যেটুকু জানেন তা ইসরায়েল,তেল কোম্পানি আর সামরিক সূত্রে জানেন। এর বাইরে তারা কিছুই জানেন না। তাই ইরাকের বিরুদ্ধে এই মাত্রার একটি যুদ্ধ সেখানে বসবাসরত জনমানুষের জন্য কী পরিণতি বয়ে আনবে সেই ধারণাও তাদের নেই।

অথবা পেন্টাগনে উলফোভিৎস ও তার সহযোগীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথাই ধরা যাক। নিদ্রিতপ্রায় কংগ্রেস তাদের জিজ্ঞেস করল যে যুদ্ধের সম্ভাব্য খরচ ও পরিণতিগুলো কী রকম হতে পারে। কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব ছাড়াই তাদের পার পাইয়ে দেওয়া হল। এর অর্থ হচ্ছে, আর্মি চিফ অব স্টাফ যে বলেছেন ১০ বছরে ৪ লাখ সৈন্য বিশিষ্ট সামরিক বাহিনীর পেছনে খরচ হবে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার– এটা সত্য নয়।

কতিপয় ব্যক্তির একটি ছোট গ্রুপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব এমনভাবে নিয়েছে, যেনবা এটিও আরব বিশ্বের একটি দেশ। এটা খুবই সঙ্গত প্রশ্ন-যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় কারা? কারণ খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান মার্কিন প্রশাসন যে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে তার মধ্যে জনমত প্রতিফলিত হচ্ছে না। আর আমেরিকার সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে ছোট একটি গ্রুপ যারা সরকারের জন্য চিন্তার বা উদ্বেগের কারণ হতে পারে এমন সবকিছু গণমাধ্যম থেকে ছেঁটে ফেলে।

দি ডন
প্রথম আলো, ১৯ মার্চ '০৩
ভাষান্তর : মশিউল আলম

মার্কিন মুলুকে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য

আমি এমন একজন আরব অথবা মুসলমানকে চিনি না, যিনি এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেকে শত্রু শিবিরের সদস্য হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন না। এদেশে বসবাসের বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমানরা পরিকল্পিত বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে সরকারী পর্যায়ের বিবৃতিতে দাবি করা হচ্ছে যে, ইসলাম ও মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু নয়। তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাই বলছে। শত শত আরব তরুণকে আটক করা হয়েছে এবং ফেডারেল গোয়েন্দা ব্যুরো (এফবিআই) ও পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মুসলিম অথবা আরবীয় নাম হলে রক্ষা নেই। এমন নামের লোক বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং তাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে জামা-কাপড় খুলেও পরীক্ষা করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। আরবদের প্রতি বৈষম্যের এমন ভুরি ভুরি ঘটনা রয়েছে। কেউ আরবীতে কথা বললে অথবা আরবীতে লেখা কোন কাগজপত্র পাঠ করলে তার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। প্রচার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ, ইসলাম ও আরবদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য বহু 'বিশেষজ্ঞ' ও 'ভাষ্যকার' নিয়োগ করা হয়েছে। এদের উচ্চারিত প্রতিটি ছত্রই ইসলামের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও ভুল ধারণা দিচ্ছে। প্রচার মাধ্যম আফগানিস্তানে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং ইরাকে সম্ভাব্য হামলার ব্যাপারেও তারা একই ভূমিকা পালন করছে। সোমালিয়া ও ফিলিপাইনসহ বেশ কয়েকটি দেশে মার্কিন বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা গড়ে তোলা হচ্ছে। ইসরাইল পরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের হত্যা করছে এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও অন্যরা যা বলছেন– আমেরিকা ঠিক তা নয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার উপদেষ্টারা বলছেন যে, তারা একটি 'ন্যায় যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়েছেন এবং তারা এ যুদ্ধকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াই হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। আমাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, আমাদের অবশ্যই এ যুদ্ধের যৌক্তিকতা মেনে নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। আরও বলা হচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার অনুমতি পাওয়ায় আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন। আমেরিকা বরাবরই একটি অভিবাসীদের দেশ। এদেশে ঈশ্বর নয়, জনগণই আইন তৈরী করে। আমেরিকায় আজকে যারা বসবাস করছে তাদের

প্রায় সবাই অভিবাসী। এমনকি প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও। এদেশের সত্যিকার বাসিন্দা হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ানরা। যুক্তরাষ্ট্রে একেকজন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর জন্য সংবিধান আলাদা নয়। কিন্তু আমেরিকান 'তালিবানরা' তাই মনে করছে। আফগান তালিবানদের মত মার্কিন তালিবানরাও অন্যের বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। মিঃ বুশ আমেরিকায় ধর্মের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছেন। তিনি চীন এবং অন্যান্য দেশে গিয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম প্রচার করছেন। কিন্তু তিনি তার মতামত নাগরিকদের উপর চাঁপিয়ে দিতে পারেন না অথবা তার সুরে কথা বলতে বাধ্য করতে পারেন না। মার্কিন সংবিধান রাষ্ট্র ও সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টেনেছে।

গত নভেম্বরে প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম সংশোধনীর পুরো ধারা হয় বাদ দেয়া হয়েছে নয়ত উপেক্ষা করা হয়েছে। নতুন আইনে ঘটনার শিকার ব্যক্তি আইনজীবী নিয়োগে সমস্যায় পড়বে এবং সে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। এ আইনে গোপনে বিচার, আড়িপাতা ও অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এটি মার্কিন সরকারকে 'যুদ্ধবন্দীদের অস্ত্রহরণ' তাদেরকে অনির্দিষ্টকাল আটক এবং জেনেভা কনভেনশন লংঘন করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। এ আইন পাস হওয়ার জন্যই গুয়ানতানামো ঘাঁটিতে বিদেশী বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা এবং তাদেরকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশ। স্বাক্ষরদানকারী কোন দেশ তাই এই আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করতে পারে না। তবু এদেশে তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিবাদ উত্থিত হচ্ছে। ওহাইও'র ডেমোক্রেট দলীয় কংগ্রেস সদস্য ডেনিস কুচিনিচ গত ১৭ ফেব্রুয়ারী এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেছেন যে, সীমা-পরিসীমা ও যুক্তিছাড়া সারাপৃথিবীর' বিরুদ্ধে যুদ্ধ (অপারেশন এনডিউরি ফ্রীডম) ঘোষণার, প্রতিবছর ৪০ হাজার কোটি ডলারের বেশী সামরিক বাজেট বৃদ্ধি এবং বিল অব রাইটস বাতিল করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট অথবা সরকারের নেই। এ ধরনের ক্ষমতা তাদেরকে কেউ দেয়নি। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেন, আমরা চাইনি যে, ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় নিহত নিরীহ মানুষের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য আফগানিস্তানের নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করা হোক।

কংগ্রেসম্যান কুচিনিচই মার্কিন সরকারের আগ্রাসী নীতির প্রতিবাদকারী সর্বোচ্চ মার্কিন কর্মকর্তা। আমার মতে, তার বক্তব্যে আমেরিকার নীতি ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্য আমি চাই যে, তার ভাষণটি আরবীতে পুরোপুরি প্রকাশিত হোক, যাতে আরবীভাষী মানুষ জানতে পারে যে, বুশ ও ডিক চেনিই যুক্তরাষ্ট্রের সবকিছু নয়। বর্তমান মার্কিন নীতির সমালোচনা চলছে এবং নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু সরকার এগুলো চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নজিরবিহীন ক্ষমতাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেটাই আজকের বিশ্বের সমস্যা। বুশের আশপাশে যে ক'জন মুষ্টিমেয় লোক রয়েছে তারা বিশ্বাস করে যে, মার্কিন স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে ওয়াশিংটন যা খুশী তাই করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সমর্থন অথবা তাদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষারও কোন প্রয়োজন

নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ মনোভাব এখন আর গোপন নেই। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে মার্কিন নীতিতে ইসরাইলীকরণ ঘটেছে। জর্জ বুশের মনোযোগ কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে। অন্য কিছু নিয়ে ভাবার তার সময় অথবা প্রয়োজন কোনটাই নেই। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বুঝতে পেরেছেন যে, ফিলিস্তিনীদের হত্যার এটাই সুযোগ। তাই তিনি ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কথা হচ্ছে যে, ইসরাইল যুক্তরাষ্ট্র নয়, আবার যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল নয়। কিন্তু এ বাস্তবতা সত্ত্বেও ইসরাইল প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন পাচ্ছে। ইসরাইল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে মুসলিম আরব রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে। তাকে টিকে থাকতে হবে ঐ এলাকার পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, মার্কিন সমর্থন অথবা আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে নয়। এই সত্তা অধিকাংশ ইসরাইলীও অনুধাবন করতে পারছে। তাই তারা শ্যারনের আগ্রাসী নীতিকে আত্মঘাতী বলে আখ্যায়িত করছে। ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে ইসরাইলের রিজার্ভ সৈন্যরাও প্রতিবাদ করছে। রিজার্ভ সৈন্যদের সঙ্গে কোন কোন ইসরাইলীও কণ্ঠ মিলাচ্ছে। এদের সংখ্যা দিন দিনই ভারি হয়ে উঠছে। খোদ ইসরাইলীদের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হলেও মার্কিন নীতিতে পরিবর্তন আসছে না। যুক্তরাষ্ট্র একের পর এক কাল্পনিক ভীতির পেছনে ছুটছে এবং নিজেকে সংঘর্ষে জড়িয়ে ফেলছে। প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার পরিষদবর্গও মনে করছেন যে, তারা সঠিক পথে রয়েছেন। বিগত সপ্তাহগুলোর পত্র-পত্রিকা যারা পাঠ করেছেন তারা একথা বুঝতে পেরেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জনগণ মার্কিন নীতির অস্পষ্টতায় বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, যে কোন দেশকে টার্গেট করার অধিকার তাদের রয়েছে। এ ধরনের মনোভাব থেকে সে বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি করছে এবং এসব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। লক্ষ্য অর্জন এবং যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। 'দুই সন্ত্রাসবাদ' দমন বলতে যুক্তরাষ্ট্র কি বুঝাতে চায়? সে তার বিরুদ্ধাচরণকারী প্রত্যেককে উৎখাত অথবা তার ইচ্ছামত বিশ্বের মানচিত্র বদলাতে পারে না। আমরা যাদেরকে 'সুবোধ ব্যক্তি' অথবা সাদ্দাম হোসেনের মত যাদেরকে 'দুর্বৃত্ত' বলে আখ্যায়িত করি, তাদের কাউকে সে উৎখাত করতে পারে না। ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রকে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে দেখতে চান এবং এ লক্ষ্যে তারা একটি দূরবর্তী টার্গেট হিসেবে বিশ্বকে বেছে নিয়েছেন। তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে বাস্তবতাবর্জিত। কারণ, তারা বসে থাকেন পেন্টাগনের ডেস্কে।

তাদের কাছ থেকে যে কোন দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের দূরত অন্তত ১০ হাজার মাইল। তবু এসব রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র হুমকি হিসেবে গণ্য করছে। হাজার হাজার জঙ্গী বিমান, ১৯টি বিমানবাহী জাহাজ, কয়েক ডজন সাবমেরিন, প্রায় ১৫ লাখ সৈন্য ও হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বুশ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিসা রাইস স্বস্তি পাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই প্রতিরক্ষা খাতে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। তারপরেও প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ দেশকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এদেশের প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক তাকেই সমর্থন করছেন। মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলো তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা এটা বুঝতে চান না যে, যে বিশ্বে আমরা বসবাস করছি সে বিশ্ব গতিশীল এবং বিশ্বকে বুঝতে হলে বিশ্ব রাজনীতিকে বুঝতে হবে। মার্কিনীদের মধ্যে এমন একটা ধারণা কাজ করে যে, আমেরিকা বরাবরই ন্যায়ের পক্ষে এবং তার শত্রুরা অন্যায়ের পক্ষে। টমার্স ফ্রিডম্যান অক্লান্তভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন এবং এসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি আরবদেরকে আত্মসমালোচনাকারী হওয়ার জন্য বার বার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু তার মত অন্য মার্কিনীদেরও যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি মানতে নারাজ। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জন্য তিনি চোখের পানি ফেলছেন এবং এ হামলায় নিহতদের জন্য রোদন করছেন। তার মনোভাব এরকম যে, যুক্তরাষ্ট্রেই কেবল এ ধরনের ভয়ংকর হামলা হয়েছে এবং মার্কিনীরাই কেবল সন্ত্রাসীহামলায় প্রাণ হারাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১১ সেপ্টেম্বরের চেয়েও ভয়াবহ ঘটনায় যারা নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের প্রতি তার কোন অনুভূতি নেই এবং অন্যান্য দেশে সংঘটিত ঘটনাগুলো তার বিচারে কোন ঘটনাই নয়। ইসরাইলী বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের অনুরূপ। ইসরাইলী বুদ্ধিজীবীরা শুধু নিজেদের লোকজনের মৃত্যুই দেখতে পায়; কিন্তু ইসরাইলী ট্যাংক, বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতি মুহূর্তে যে অগণিত ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে সেদিকে তাদের চোখ যায় না। এজন্য তাদের কোন দুঃখবোধ নেই। জুলুমের প্রতি সহনশীল হওয়া অথবা দেখেও না দেখার ভান করা আজকের বিশ্বে একটি স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে চক্রান্তের অংশীদার হওয়া অথবা ফাঁদে পা দেয়া শোভনীয় নয়। এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে। সকল মানুষের দুর্ভোগ সমান, একথা মুখে উচ্চারণ করে পরবর্তী মুহূর্তে শুধু নিজেদের লোকজনের জন্য বিলাপ করাই যথেষ্ট নয়। বিরোধে জড়িত শক্তিশালী পক্ষ কি করছে তা দেখতে হবে এবং শক্তিশালী পক্ষের কার্যকলাপ সমর্থন করার পরিবর্তে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে হবে। বৃহৎ শক্তিকে সমালোচনা করা এবং এ শক্তির বিরোধিতা করাই বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিবেকের দাবি। বুদ্ধিজীবীরা বিবেকের এ দাবি পূরণ করছেন না বলেই ভিকটিমকে উল্টো দোষারোপ করা হচ্ছে এবং অত্যাচারীরা উৎসাহিত হচ্ছে।

৬০ জন মার্কিন বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইকে সমর্থন দিয়ে একটি বিবৃতি দেন। এ বিবৃতি ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও ইউরোপের বড় বড় কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে কোন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এক সপ্তাহ আগে এক ইউরোপীয় বন্ধু এ বিবৃতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বিস্মিত হই। এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রান্সিস ফুকয়ামা, ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহাস প্রমুখ।

রক্ষণশীল নারীবাদী বুদ্ধিজীবী জীন বেথকি এ্যাল্‌সটেইন বিবৃতিটি তৈরী করেছিলেন। অধ্যাপক মিশেল ওয়ালজারের উৎসাহে তিনি এ বিবৃতি তৈরি করেন। অধ্যাপক ওয়ালজার ইসরাইলী লবির লোক হিসেবে পরিচিত। এ ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে

ইসরাইলের কোন ভুল ধরা পড়ে না। বরং ইসরাইল যা কিছু করে সবকিছুই তার কাছে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত। অধ্যাপক ওয়ালজার একজন মেকি সমাজতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রীর খোলস গায়ে দিয়ে তিনি ইসরাইলের পক্ষে ওকালতি করেন। তবে এ বিবৃতি তৈরীতে উৎসাহ যোগানোর সময় তিনি তার সমাজতন্ত্রী খোলস খুলে ফেলেন। তিনি তার বর্তমান ভূমিকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমেরিকাকে সন্ত্রাস ও শয়তানের বিরুদ্ধে একটি আদর্শ যোদ্ধা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল হচ্ছে এমন দু'টি দেশ যাদের লক্ষ্য হচ্ছে অভিন্ন। অধ্যাপক ওয়ালজারের উক্তি সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসরাইল হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্র যেখানে ইহুদী ছাড়া আর কেউ নাগরিক নয়। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সকল নাগরিকের দেশ। ওয়ালজারের একথা বলার সাহস কখনো হবে না যে, তিনি ইসরাইলকে সমর্থন করতে গিয়ে বরং ইসরাইলের ইহুদীবাদী নীতিকেই সমর্থন দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রকে শ্বেতাঙ্গ ও খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে বিরোধিতা করবেন। বিবৃতির পেছনে অধ্যাপক ওয়ালজারের ভূমিকা যেমন গোপন রাখা হয়েছে তেমনি মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছাও গোপন রাখা হয়েছে। বিবৃতিতে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ লড়াই নয়, বরং যারা সকল ধরনের ন্যায়-নীতির বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে এ লড়াই। সকল মানুষ সমান। ধর্মের নামে নরহত্যা পাপ, বিবেকের স্বাধীনতা সবার উপরে, মানুষই হচ্ছে সমাজের মূল শক্তি এবং মানুষের মৌলিক বিকাশের শর্তগুলো লালন এবং রক্ষা করাই হচ্ছে সরকারের কাজ। বিবৃতিতে এসব নীতিকথা উল্লেখ করে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত। এজন্য কোথাও কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে। ধর্ম, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে নীতিবাক্য আউড়ে বিবৃতির শেষাংশে একটি ফিরিস্তি দেয়া হয়। এ ফিরিস্তিতে ১৯৮৩ সালে বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সৈন্যদের হতাহত হওয়ার ঘটনাসহ কোন আরব ও মুসলিম দেশে এবং অন্যান্য ঘটনায় কতজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়। তবে ইরাকে মার্কিন মদদে জাতিসংঘ অবরোধে কতজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ফিলিস্তিনে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী ইসরাইলী বিমান হামলায় এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অপারেশনে নিহতদের সম্পর্কে বিবৃতিতে একটি লাইনও নেই।

ইনকিলাব, ২৫ মে '০২
ভাষান্তর : সাহাদত হোসেন খান

বেঁচে থাকার পর কী ঘটবে?

প্যালেস্টাইনের সঙ্গে যদি কারও সামান্যতম সংযোগও থাকে তিনি বিমূঢ়, ক্রোধ ও যন্ত্রণার মধ্যে দিনাযাপন করছেন। ১৯৮২-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তিই ঘটল তবু জর্জ বুশের হতবাক করা অজ্ঞতা এবং বীভৎস রহস্যময়তায় প্রলিপ্ত সমর্থন সমেত প্যালেস্টাইনের ওপর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক ঔপনিবেশিক চূড়ান্ত হানাদারি প্যালেস্টিনীয় জনতার ওপর শ্যারনের ১৯৭১ ও ১৯৮২-এর গণসন্ত্রাসের থেকে অনেক বেশি ন্যক্কারজনক। এক্ষণের রাজনৈতিক পরিবেশ অনেক বেশি ভোঁতা, নৈতিক পরিবেশ অবক্ষয়গামী। গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক, তারা প্যালেস্টিনীয় ভূখণ্ডের ওপর ইসরায়েলের ৩৫ বছরব্যাপী অবৈধ দখলদারির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে শুধু প্যালেস্টাইনির আত্মঘাতী আঘাত হানার প্রয়াসকেই বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরছে এবং ইসরায়েলের দৃষ্টিভঙ্গিকে আনুকূল্যের প্রসাদ দান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তা প্রায় প্রতিপক্ষহীন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আলোচনাসূচির পুরোটাই দখলে নিয়ে ফেলেছে এবং তারই সঙ্গে আরব পরিমণ্ডলের কথা যদি বলতে হয় এত অসমন্বয় ও এত বেশি বিখণ্ডিত চরিত্র আগে কখনও দেখা যায়নি।

শ্যারনের 'খুনি' প্রবণতা (শব্দটি যদি সঠিক হয়) আগের তুলনায় অনেকখানি বেড়ে গেছে, দানবীয় হয়ে উঠেছে। এর অর্থ হল এই আগের তুলনায় হত্যা ও ধ্বংসে তিনি আরও সক্রিয় হবেন, যদিও ঘৃণা এবং অস্বীকার করার একবগ্গা প্রবণতার কারণে শ্যারন যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্যের ক্ষেত্রে যে নিষ্ফল ব্যর্থতায় তিনি পৌঁছেছেন তাকে ছোট করে দেখানো হচ্ছে। জনগণের মধ্যেই যে দ্বন্দ্বের বিষয়গুলো রয়ে গেছে তাকে তো ট্যাঙ্ক আর বোমারু বিমান দিয়ে মুছে ফেলা যায় না এবং নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে এই যে যুদ্ধ– শ্যারন যতবারই তার 'সন্ত্রাস', 'সন্ত্রাস' মন্ত্রের দুন্দুভি বাজান না কেন– কোন দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান আনতে পারে না, যেমনটা নাকি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। প্যালেস্টিনীয়রা সরে যাবে না। তদুপরি তার নিজের জনতার দ্বারাই শ্যারন নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত হবেন। প্যালেস্টাইন ও প্যালেস্টিনীয়দের সর্বস্ব ধ্বংস করা ছাড়া শ্যারনের আর কোন প্রকল্পই নেই। এমনকি আরাফাত ও সন্ত্রাস বিষয়ে তার বদ্ধ বুলিতে তিনি তার জনতার সম্মান তো বাড়াতে পারেননি বরং নিজের আধিপত্যবাদী বিকারকেই প্রকাশ করে ফেলেছেন।

সুতরাং আদতে তিনি ইসরায়েলেরই সমস্যা। দস্যুবৃত্তির যুদ্ধে মানুষের ওপর প্রচণ্ড কষ্ট ও ধ্বংস চাপিয়ে দেয়া হল তার বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষমতায় যা কিছু করা যায়, যতদূর করা যায় আমাদের দিক থেকে তা করতে হবে। বিগনিউ ব্রেজনস্কির মতো প্রখ্যাত, সম্মানীয় অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ টেলিভিশনে যখন বলেন, শ্বেত

আধিপত্যবাদী শাসনকালের বর্ণবিদ্বেষীদের মতোই আচরণ করছে ইসরায়েল, আমরা তখন অনুভব করি, ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি একাকী নন এবং আমেরিকাসহ অন্যত্র এমন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, যারা ক্রমশ মোহমুক্ত শুধু নয়, ইসরায়েলের ওপর বিরক্ত হচ্ছেন। আমেরিকার বখাটে এবং অপচয়কারী কুসন্তান হিসেবেই দেখছেন, যার জন্যে বড্ড বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে, যার জন্যে মিত্রদের কাছে, নাগরিকের কাছে দেশের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। প্রশ্ন হল এই তীব্র সংকটের এই প্রহরকালে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী আমরা স্বচ্ছ যুক্তিবাদ দিয়ে বুঝে নিতে পারব এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করে নিতে পারব?

আমার এখন যা বলার, তা যথেষ্ট নির্বাচিত এবং এই কথাবার্তা আরব ও পশ্চিমি-উভয় দুনিয়ারই একজন মানুষের কথা, যে দীর্ঘদিন ধরে প্যালেস্টাইনের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমি সবটাই জানি, এমন নয়। সুতরাং সব বলছিও না। এগুলো একগুচ্ছ চিন্তাসূত্র মাত্র, যা এই সঙ্কটময় সময়ে আমি তুলে ধরতে পারি। নিচে যে ৪টি সূত্র উল্লেখ করছি, তারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(১) ভাল এবং মন্দ উভয় অর্থে প্যালেস্টাইন শুধু আরব ও ইসলামি ঘটনা নয়, স্ববিরোধযুক্ত এবং স্রোত প্রতিস্রোতসম্পন্ন বিভিন্ন দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনা। প্যালেস্টাইনের জন্য কাজ করতে হলে এসব ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রতিনিয়ত সেগুলো বিষয়ে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে। সে জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রবলভাবে শিক্ষিত, সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ নেতৃত্ব এবং তার পক্ষে গণতান্ত্রিক সমর্থন। এবং সর্বোপরি, ম্যান্ডেলা যেমন তার সংগ্রাম সম্পর্কে অক্লান্তভাবে বলতেন, আমরাও যেন সচেতন থাকি, প্যালেস্টাইন আমাদের অন্যতম নৈতিক বিষয়। একথা মনে রেখে এ বিষয়ে আমাদের কর্মধারা পরিচালিত হবে। এটি কোন বাণিজ্যিক বিষয় নয়, চুক্তিগত দর কষাকষি নয় অথবা পেশা বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি নয়। এটি একটি ন্যায্য বিষয়, যা প্রত্যেক প্যালেস্টিনীয়র উচ্চতর নৈতিক ক্ষেত্র অধিকার করার কথা এবং সে অধিকার কায়েম রাখার কথা বলে।

(২) ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে, তাদের মধ্যে সামরিক ক্ষমতা অধিকতর স্পষ্ট। গত ৪৫ বছর ধরে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল যা করে আসছে অত্যন্ত প্রযত্ন ও বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে নির্মিত প্রচার-কৌশলের ফলে সম্ভব হয়েছে। এই প্রচার-কৌশলে ইসরায়েলের কাজ-কর্মে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং একই সঙ্গে প্যালেস্টাইনের কাজ-কর্মের অবমূল্যায়ন এবং তাকে মুছে দেয়া হয়েছে। শুধু দুর্ধর্ষ সমরবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করা নয়, মতামতকে সংগঠিত করা এবং তা থেকে শক্তি সংগ্রহ করা। ধীরে এবং অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক মতামত সংগঠনে মানুষ ইসরায়েলের বিষয়কে নিজের বিষয় ভাববে এবং প্যালেস্টাইনকে ভাববে ইসরায়েলের শত্রু। সুতরাং প্যালেস্টাইন 'আমাদের' বিপক্ষে এবং ঘৃণ্য বিপজ্জনক। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তিকাল থেকে মতামত ভাবমূর্তি এবং চিন্তা সংগঠনের ক্ষেত্রে ইউরোপের ভূমিকা মলিন হয়ে প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। আমেরিকা হল যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র। এই দেশটাতে পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক কর্মসংগঠনের গুরুত্ব আমরা

শিখিনি, যাতে করে গড়পড়তা আমেরিকানরা প্যালেস্টাইনের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই 'সন্ত্রাসবাদ'-এর কথা না ভাবে। এই সংগঠনই ইসরায়েলি দখলদারি প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমরা যা অর্জন করেছি তা রক্ষা করবে। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলকে যা সমর্থন করেছে তা হল আমাদের রক্ষা করবে। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে ইসরায়েলকে যা সমর্থন করেছে তা হল আমাদের রক্ষা করার জন্য কোন জনমত পরিসর নেই, যা যুদ্ধের অপরাধে শ্যারনকে প্রতিরোধ করতে পারে; যা করছি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য করছি- শ্যারনের এই বুলি থামিয়ে দিতে পারে। সিএনএন-এর প্রকাণ্ড, প্রসারিত, চাপিয়ে দেয়া প্রচার ধারার কথাই যদি উল্লেখ করা যায়, প্রতি ঘণ্টায় অন্তত ১শ' বার এরা 'সুইসাই বোমা'র কথা বলছে এবং আমাদের দিক থেকে চূড়ান্ত ঔদাসীন্যের বিষয় হল হান্নান আশরাবি, লায়লা শাহিদ, ঘাসান খাতিব, আফিক সাফিদের (কয়েকটি মাত্র নাম বললাম) নিয়ে আমাদের কোন দল নেই, যারা সিএনএন অথবা অন্য কোন চ্যানেলে চলে যেতে পারে শুধু প্যালেস্টাইনের কথাগুলো বলতে, যাতে মানুষ পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝতে পারে এবং যাতে করে অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে আমাদের নৈতিক ও বর্ণনাত্মক উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। আমাদের প্রয়োজন আগামী নেতৃত্ব, যারা বৈদ্যুতিক গণসংযোগের যুগের এই অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এবং এই পাঠ গ্রহণ না করাই আজকের দিনের ট্রাজেডির বড় একটা অংশ।

(৩) বৃহৎ শক্তিধর আমেরিকা বিষয়ে নিবিড় পরিচিতি ও জ্ঞান ছাড়া ওই বৃহৎ শক্তিধর দেশের আধিপত্যদলিত পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও দায়িত্বশীলভাবে বিচরণ করা নেহাৎ অর্থহীন। আমেরিকার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান, স্রোত-প্রতিস্রোত এবং একইসঙ্গে প্রয়োজন আমেরিকার ভাষা নিয়ে কাজ চলার মতো দখল। আরবের অন্য দেশগুলোসহ আমাদের দেশের মুখপাত্রদের কথা শুনে মনে হয়, আমেরিকা বিষয়ে কখনো তারা হাস্যকর কিছু বলছে, কখনো আমেরিকার দয়ার কাছে নতজানু হচ্ছে, একবাক্যে আমেরিকাকে অভিশাপ দিচ্ছে। অন্য বাক্যে তার সহায়তা মাগছে, আর সবটাই করছে ভয়ঙ্কর এক ভঙ্গুর ইংরেজিতে এবং এই আদিম স্তরের অদক্ষতা দেখলে কান্না পেয়ে যায়। আমাদের বন্ধু আছে এবং আমাদের সম্ভাব্য বন্ধুও আছে। আমরা এই কৌমের চর্চা করতে পারি, তাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি এবং আমাদের কৌমের মিত্র কৌমগুলোকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের রাজনীতিতে ব্যবহার করতে পারি, যেমন করে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যবহার করেছিল অথবা যেমন করে আলজেরিয়া ব্যবহার করেছিল ফ্রান্সে তাদের মুক্তি সংগ্রামের সময়। পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা এবং সমন্বয়–অহিংসার রাজনীতিকে আমরা আদৌ বুঝতে পারিনি। তদুপরি ইসরায়েলবাসীকে সরাসরি সম্বোধন করার প্রয়াসের শক্তিও আমরা বুঝতে অসমর্থ হয়েছি, যেমন করে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস জড়িয়ে নেয়া এবং পারস্পরিক সম্মানের রাজনীতি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদেরও সম্বোধন করেছিল। ইসরায়েলি নিষ্কাশনবাদ ও হানাদারির বিরুদ্ধে সহাবস্থানই আমাদের উত্তর। এটা পিছিয়ে আসা নয়, বরং ঐক্য নির্মাণ করা এবং এভাবে নিষ্কাশনবাদী, জাতিবিদ্বেষী ও মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করা।

(৪) আমাদের পক্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠ গ্রহণ করতে হবে তা ইসরায়েল দখলিকৃত ভূখণ্ডে, যা ঘটিয়ে চলেছে সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। ঘটনা হল আমরা মানবগোষ্ঠী, সমাজ এবং ইসরায়েলের হিংস্র আক্রমণ সত্ত্বেও আমাদের সমাজ এখনো কাজ করে চলেছে। আমরা মানবগোষ্ঠী, কারণ আমাদের একটি কার্যকরী সমাজ আছে যা কাজ করে চলেছে– প্রত্যেক অপব্যবহার, ইতিহাসের সকল নিষ্ঠুর বাঁক, সহে যাওয়া সকল দুর্ভাগ্য, মানবগোষ্ঠী হিসেবে। প্রত্যেকটি বিয়োগান্ত অধ্যায়ের মধ্যে পথচলা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ গত ৫৪ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের মহত্তর জয় হল এই শ্যারন এবং তার ধরনের মানুষের আমাদের সমাজের এই সপ্রাণতা বোঝার ক্ষমতাই নেই এবং সেই কারণেই প্রকাণ্ড শক্তিমত্ততা, ভয়াবহ, অমানবিক নৃশংসতা সত্ত্বেও তাদের পতন অনিবার্য। আমরা আমাদের ট্রাজেডি, অতীতের স্মৃতিকে অতিক্রম করতে পেরেছি, অথচ শ্যারনের মতো ইসরায়েলিরা পারেনি। একজন আরব-হত্যাকারী, একজন ব্যর্থ রাজনীতিবিদ হিসেবেই তিনি কবরে যাবেন, তিনি তার জনগণের জন্যে অধিকতর অশান্তি ও অনিরাপত্তা বয়ে এনেছেন। একজনের নেতৃত্ব তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে উত্তরাধিকার হিসেবে নিশ্চয়ই এমনকিছু রেখে যাবে, যার ওপর ভাবি প্রজন্ম নির্মাণকার্য চালাতে পারবে। শ্যারন, মোফাজ এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অন্যরা তাদের এই হুঙ্কার, হত্যা ও ধ্বংসের অভিযানে কবরখানার ইটকাঠ ছাড়া আর কিছুই রেখে যাচ্ছেন না। নেতিমূলকতা নেতিমূলকতারই জন্ম দেয়।

প্যালেস্টিনীয় হিসাবে আমি মনে করি, আমরা আজ বলতেই পারি আমরা একটি ভবিষ্যৎ ছবি এবং একটি সমাজ রেখে গেলাম, যাকে খুন করার সকল প্রয়াস সত্ত্বেও সে বেঁচে ছিল এবং এটাই অনেকখানি। এটি আমার এবং আপনার সন্তানদের প্রজন্মের জন্য ওই দিগন্ত থেকে যাত্রা করতে হবে সমালোচনামূলক, যুক্তিবাদী, মানসভঙ্গি এবং আশা ও সহিষ্ণুতাকে সঙ্গে নিয়ে।

সংবাদ, ২১ মার্চ '০৩
ভাষান্তর : মশিউল আলম

প্রভাববিস্তারী জীবনবীক্ষা

যে সমস্ত প্রভাব আমাদের চিন্তা ও জীবনধারাকে বিশেষ আকার দিয়ে থাকে তা অসংখ্য; স্পষ্টত তার মধ্যে পরিবার, ঐতিহ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও বইপত্র গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইকবাল আহমেদের মতো বিশেষ ব্যক্তিত্বের সাথে কদাচিৎ মানুষের সাক্ষাৎ ঘটে থাকে এবং তাঁকে জানার সুযোগ হয়, যিনি উলিখিত উপাদানসমূহের মতো মানুষের জীবন ও ভাবনার খোলনলচে পালটে দিতে পারেন। ১৯৭০সালের শরতে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী ও সক্রীয় কর্মী অধ্যাপক ইব্রাহিম আবু লাঘোদের শিকাগোর বাড়িতে ইকবালের সাথে আমার প্রথম দেখা। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এরপর গত ৩৬ বছর ধরে আমি আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এবং ইসলাম নিয়ে যে লেখালেখি করছি সে প্রসঙ্গে ও সমসাময়িক পৃথিবী সম্পর্কে আমার চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের ক্ষেত্রে এই দুই ব্যক্তি সম্ভবত সবচেয়ে বড় প্রভাব হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু, হায়! এখন তারা দুইজনই প্রয়াত, ইকবাল মারা গেছেন ১৯৯৯ সালের মে মাসে আর ইব্রাহিম ঠিক তার দুইবছর পর।

আরব ও ইসলাম সম্পর্কে উভয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আমি মূলত ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনো করেছি, তবে তারা আমাকে সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞানে ঋদ্ধ করেছেন। ইকবাল তার জীবনে প্রথমে ঔপনিবেশিক অতীত, তারপর স্বাধীনতার সময়কাল ও শেষমেষ উত্তর-ঔপনিবেশিক সংগ্রামকে ধারণ করেছেন। আমার সাথে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি আমার মাঝে এক অর্ন্তদৃষ্টি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অন্য যে কারো চেয়ে আমি ভালো জানি যে, তিনি আমাদের সময়কার দুইটি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বিষয়কে গভীর সহানুভূতি ও খোলাখুলিভাবে বুঝেছিলেন, যা আমার মনে হয় তিনি নিজের মাঝে ধারণ করতেন, আমেরিকা ও ইসলাম : সমস্ত বৈপরীত্য, জটিলতা, পরস্পরগ্রন্থিত ঐতিহ্য এবং নিবিড় জনগোষ্ঠীর মাঝে তিনি বসবাস করেছেন।

আমার পরিচিতজনদের মধ্যে ইকবাল আহমেদই সেই মানুষ যিনি নির্মম মৃত্যুর শিকার হয়ে যেন অসময়ে চলে না যান সবসময় আমি সেই প্রত্যাশাই করতাম। আমার এবং আমাদের এই ক্ষতিকে মেনে নিতে আমার অনেক সময় লেগেছে। তিনি সেই মানুষ যার প্রজ্ঞা, ধৈর্য, উদারতা এবং প্রচণ্ড স্বচ্ছতা এই সময়ে আমাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি ধর্মকে সেইভাবেই বোঝার চেষ্টা করেছেন ধর্মের যেমন হওয়া উচিৎ এবং ধর্ম যেমন হয়েছে তার নিরিখে।

শিক্ষার ক্ষমতার ওপর তিনি আস্থা হারাতেন না, যে শিক্ষার সাথে অন্যের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি ব্যাখ্যা করার এবং কখনো কখনো আমাদের এই বিধ্বস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে শুরু হওয়া তীব্র বিরোধ মেটানোর মন্ত্র সম্পৃক্ত হয়। আফগানিস্তান, ইরান,

ভারত, পাকিস্তান, ফিলিস্তিন, ইরাক, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা : তাঁর গত দুইদশকের লেখালেখির উপর চোখ বুলালে সহজে প্রমাণ পাওয়া যাবে ওইসব দেশ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কতটা গভীর এবং ভবিষ্যৎসূচক ছিল।

আমার পরিচিতজনদের মাঝে, নেলসহ ম্যান্ডেলাসহ, তাঁরই কেবল নৈতিক অধিকার ছিল আমাদের সাথে কথা বলার, আর তা এইজন্য নয় যে, তিনি একটি উচ্চপদে আসীন কিংবা তিনি অনেক জানেন (আসলেই তিনি অনেক জানতেন), তা এইজন্য যে, আমরা সবসময় অনুভব করতাম যে, তিনি আন্তরিকতা ও সহানুভূতির একবারে গভীর থেকে কথা বলতেন যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। তিনি ছিলেন মহান একজন মানুষ, এবং যেটুক বলা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি আমি বঞ্চিত হচ্ছি। তাঁর চরিত্রের যে অনন্য বৈশিষ্ট্য তা হলো মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসা এবং তাঁর জন্য মানুষের ভালবাসা। সার বিশ্বে আমি তাঁকে বিভিন্ন পরিবেশে দেখেছি। যেখানেই তিনি যেতেন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতেন। কণ্ঠে আনন্দ আর উচ্ছাস নিয়ে লোকে বলতেন, 'ইকবাল, আপনি এখানে!' বিরক্তি, অহংকার বা গর্বের কারণে কাউকে অপদস্ত করতে তাকে কখনো দেখিনি। বিশাল উদারতার এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। আর ছিল বিস্ময়কর সৃষ্টিশীল মেধা।

ডন, শুক্রবার ১৬ মে ২০০৩

ভাষান্তর : শরীফ আতিক-উজ-জামান

স্মৃতিকথা লেখার বিষয়ে

প্রতিটা পরিবারই তাদের বাবা-মা এবং সন্তানদের একটা আদলে গড়ে তোলে, প্রত্যেককে একটা ইতিহাস, চারিত্রিক গুণাবলী, ভাগ্য এবং এমনকি ভাষা দিয়ে সৃষ্টি করে। বাবা-মা আর চার বোনের সংসারে নিজেকে আমার সবসময়ে বাইরের লোক এবং অনাহূত বলে মনে হয়েছে। কৈশোরের অধিকাংশ সময়েই আমি বুঝতে পারতাম না এটা আমার নিজের বোঝার ভুল নাকি মানুষ হিসাবে আমার ব্যর্থতা। কখনও কখনও আমার আচরণ ছিল আপোষহীন দুর্দান্ত এবং সে জন্য আমি গর্বিত বোধ করতাম। বাকি অন্য সময়ে নিজেকে নিজের কাছে চারিত্রিক গুণাবলীরহিত ভীতু, অনিশ্চিত, ইচ্ছাশক্তিহীন একটা সত্তা বলে মনে হয়েছে। আমি আগেও বলেছি, 'এডোয়ার্ড' একটা মামুলি ইংলিশ নামের সাথে অভ্রান্তভাবে আরবি পারিবারিক নাম 'সাঈদ'-এর মিশেলের সাথে আমার প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছে খাপ খাইয়ে নিতে বা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে বলতে হয় অস্বস্তিবোধ কমতে। সত্যিকারের 'এডোয়ার্ড' ছিল আমার জন্মের বছরে এক যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের নাম এবং 'সাঈদ' নামে আমার অগণিত চাচা আর চাচাতো ভাই ছিল। কিন্তু 'সাঈদ' নামে কোনো ঠাকুরদা খুঁজে না পেলে এবং যখন আমি আমার মনোহরী ইংরেজি নামের সঙ্গে আরবি সঙ্গীর যোগসূত্র ঘটাতে যাই তখন আমার বিচারবুদ্ধি হতবুদ্ধি হয়। বছরের পর বছর এবং যথাযথ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি হয়ত 'এডোয়ার্ড'কে পাশ কাটিয়ে 'সাঈদ'কে গুরুত্ব দিয়েছি বা কখনও ঠিক উল্টো কাজটা করেছি বা দু'জনকে পরস্পরের সাথে এতদ্রুত জুড়ে দিয়েছি যে উভয়েই গুরুত্ব হারিয়ে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। একটা জিনিষ আমি কখনও হজম করতে পারিনি যদিও প্রায়শই আমাকে তা সহ্য করতে হয়েছে, সেটা হল অবিশ্বাস, এবং সেই সাথে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিক্রিয়া: এডোয়ার্ড? সাঈদ?

ভাষার প্রশ্ন যখন এর সাথে জড়িত হল এমন একটা নাম বহনের পরিশ্রমী প্রচেষ্টা সমান একটা অস্থির করা দ্বিধার সাথে যুক্ত হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। আমি বলতে পারব না ছোটবেলায় প্রথম কোন ভাষায় আমি কথা বলেছিলাম। আরবি না ইংরেজি, বা সন্দেহাতীতভাবে আমার নিজের ভাষা কোনটা। অবশ্য আমি যা জানি সেটা হল দুটো ভাষাই আমার জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, একটার ভিতরে অন্যটা প্রতিধ্বনিত হয়, কখনও সশ্লেষে, কখনও হয়তো নস্টালজিকভাবে, বা প্রায়ই একটা অন্যটাকে শুধরে দেয়, নিয়ন্ত্রণ করে। দুটোকেই আমার আদি অকৃত্রিম মাতৃভাষা বলে চালিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু সেটা সত্যি না। আমি আমার মায়ের ভিতরে এই মুখ্য অস্থিরতা প্রথম লক্ষ করি যে আমার সাথে আরবি আর ইংরেজি দুটো ভাষাতেই কথা বলত যদিও চিঠি লেখার ক্ষেত্রে সে সবসময়ে ইংরেজি ব্যবহার

করত—সপ্তাহে একবার, সারা জীবন তার এই অভ্যাস বজায় ছিল, আমিও তার প্রতিটা চিঠির উত্তর ইংরেজিতেই দিতাম। তার কয়েকটা কথ্য প্রবচন ছিল, যেমন *তিসলামলি* বা *মিশ 'আরফা শু বিদ্দি 'আমল?* বা *রোহ 'হা*—কয়েক ডজন হবে—সবই আরবি, এবং আমার কখনও তাদের ভাষান্তর করার কথা মনে হয়নি বা, *তিসলামলি*'র মতো শব্দগুচ্ছের কথাই ধরা যাক, আমি তাদের ঠিক ঠিক মানে আজও জানি না। শব্দগুলো ছিল তার চিরন্তন মাতৃসত্তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, আজও ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে আমি মৃদু কণ্ঠে নিজেকে বলতে শুনি *ইয়া মামা*, সবসময়ে স্বপ্নের মতো লোভনীয় তারপরেই ঝটকা দিয়ে কেড়ে নেয়া, কোনো কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত না দেয়ার মতো।

কিন্তু তার আরবি ভাষায় ইংরেজি শব্দ যেমন *নটি বয়* এবং অবশ্যই আমার নাম, উচ্চারণগুনে যা হত *এডওয়ার্ড* এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। মাছের বাজার বন্ধ হবার মুখে তার কণ্ঠে উচ্চারিত *এডওয়ার্ড* ডাক সন্ধের বাতাসে আলতোভাবে ভেসে বেড়াত, এবং আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতাম, উত্তর দেব, না আরও কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে নিজেকে প্রার্থিত হিসাবে কল্পনা করার আনন্দ উপভোগ করব, আমার নিজের নীরবতা যতক্ষণ না অসহ্য মনে হত আমার সত্তার অ-এডোয়ার্ড অংশ সাড়া না দেবার ভেতরে আরামদায়ক অবসর খুঁজে পেত, আজও সেখানে সেই একই সময়ে তার ডাক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। তার ইংরেজির কল্যাণে আমার ভাষায় যে অলঙ্কার আর বাক্যবিন্যাস গড়ে উঠেছে তা আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি। মা কখনও আরবির বদলে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলে *তার* প্রথম ভাষা আরবির সমস্ত প্রশ্রয় আর ছন্দোবদ্ধ আন্তরিকতা মুছে গিয়ে নিমেষেই একটা বস্তুনিষ্ঠ আর গম্ভীর মাত্রা লাভ করত। আমার যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স তখনই আমি জানি যে আমি প্রতিকারের অসাধ্য *দুরন্ত* এবং স্কুলে গিয়ে গুরুজনের ভ্রুকুটিযোগ্য তাবৎ কিছু যেমন *গুলতানি মারা* বা *বাউণ্ডুলেপনা* মকশো করি। সচেতনভাবে অনর্গল ইংরেজি বলতে শুরু করার পরে, যদিও সবসময়ে শুদ্ধ হত না, আমি নিয়মিত নিজেকে *আমি*'র বদলে *তুমি* বলে উল্লেখ করতে থাকি। "দুষ্টু ছেলে, মা তোমাকে একদম আদর করে না," মা হয়তো বলত এবং আমি স্পর্ধিত সম্মতি আর অবজ্ঞার মাঝামাঝি কণ্ঠে উত্তর দিতাম: "মা তোমাকে আদর করে না কিন্তু মিলিয়া খালা তোমাকে আদর করে।" মিলিয়া খালা ছিল মায়ের অবিবাহিত বড় বোন, ছেলেবেলায় আমাকে প্রচণ্ড আদর করতেন ভদ্রমহিলা। "না, সে মোটেই তোমাকে পছন্দ করে না," মা তার জেদ বজায় রাখত। "ঠিক আছে। সালেহ তো আমাকে পছন্দ করে," আমি সিদ্ধান্ত নিতে চাইতাম—সালেহ হল মিলিয়া খালার গাড়িচালক—চারদিক ছেয়ে-আসা হতাশার ভিতরে আমি আশার আলো খুঁজতে থাকতাম।

মা ইংরেজি কোথায় শিখেছিল তখন সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না বা জাতীয়তার বিচারে সে কোথায় অবস্থান করে: আমি যখন স্কুলের পড়া শেষ করছি তখনও অনেক বড় হওয়া অব্দি এই আজব অবহেলা বজায় ছিল। কায়রোতে, আমার ছেলেবেলার অনেকটা সময় কেটেছে, সেখানে মা অনর্গল আরবি বলত মিশরীয় টানে, কিন্তু আমার উৎসুক কানে এবং তার পরিচিত অনেক মিশরীয়রা ঠিকই বুঝতে

পারত, তার আঞ্চলিকতার টানটা *শামি* , অন্তত পুরোপুরি না হলেও বহুলাংশে তার দ্বারা প্রভাবিত। *শামি* (দামেস্কীয়) শব্দটা মিশরীয়রা সমষ্টিগত বিশেষণ আর বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করত আরবি-ভাষী লোকদের বোঝাতে যারা মিশরীয় না কিন্তু একইসাথে বৃহত্তর সিরিয়ার অধিবাসী, মানে, সিরিয়া সাথে লেবানন, ফিলিস্তিন, আর জর্ডান; কিন্তু *শামি* শব্দটা একজন *শামির* কথ্যভাষা বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাবার চাইতে, মায়ের সাথে তুলনা করলে তার ভাষাগত দক্ষতা অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের, মায়ের ধ্রুপদী ভাষা আর কথ্য ভাষার উপরে চমৎকার দখল ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে কেউ তাকে মিশরীয় ভেবে ভুল করবে না, অবশ্য সে তা কখনও ছিলও না। তার জন্ম নাজারেথে, তারপরে তাকে পড়ালেখার জন্য বৈরুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, তার মা যদিও ছিল লেবাননের বাসিন্দা সে কিন্তু ছিল ফিলিস্তিনি। তার বাবাকে আমি চিনি না, কিন্তু সে ছিল, আমি পরে আবিষ্কার করি, নাজারেথে ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক, যদিও সে ছিল মূলত সাফাদের বাসিন্দা, কিন্তু কিছুকাল টেক্সাসেও কাটিয়েছিল।

স্বাভাবিক পারিবারিক পরম্পরায় এইসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচ্যুতি আর অবরুদ্ধতা আমি যে কেবল মেনে নিতেই পারিনি, তারচেয়েও কম আত্মস্থ করতে পেরেছি; আমি বুঝতে পারিনা তাকে সোজাসুজি ইংরেজ মাম্মি বলতে সমস্যাটা ঠিক কোথায়। নানান পরিচয়ের এই অস্থির-করা বোধটা আমার ভিতরেও কাজ করে—যার অধিকাংশই আবার পরস্পরের সাথে যুধ্যমান—আমার সারা জীবন আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছি যে আমরা যদি কেবল পুরোপুরি আরবিয় বংশোদ্ভুত, বা পুরোপুরি ইউরোপীয় এবং আমেরিকান, বা পুরোপুরি খৃস্টান, বা পুরোপুরি মুসলিম, বা পুরোপুরি মিশরীয় বা, অন্য কোনো পরিচয়ে, পরিচিত হতে পারতাম। প্রশ্ন, বিশ্বাস, আর স্বীকৃতির জটিল প্রক্রিয়ায় আমি প্রতিনিয়ত নিজেকে যে কেন্দ্রবিন্দু, ভ্রুকুটি আর মন্তব্যের মুখোমুখি দেখেছি তার মোকাবেলায় আমি দুটো বৈকল্পিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি: "তোমার পরিচয়?" "কিন্তু সাঈদ একটা আরবি নাম।" "তুমি আমেরিকার নাগরিক?" "আমেরিকায় প্রচলিত নাম ছাড়াই তুমি আমেরিকান, এবং তুমি কখনও আমেরিকায় যাওনি।" "তোমাকে দেখে আমেরিকার নাগরিক বলে মনে হয় না!" "তোমার জন্মস্থান জেরুজালেমে আর তুমি এখানে বাস করো এটা কিভাবে সম্ভব?" " সর্বোপরি তুমি আরবি বংশোদ্ভুত কিন্তু কোন গোত্রের?"

আমার মনে পড়েনা এইসব ভ্রুকুটির প্রত্যুত্তরে চেঁচিয়ে আমি স্মরণীয় বা সন্তোষজনক কিছু কখনও বলেছি কি না। আমার বৈকল্পিক পন্থা পুরোপুরিই আমার নিজের উদ্ভূত একজন কাজ করে, ধরা যাক, কোনো স্কুলে, কিন্তু সে কোনো গির্জায় বা রাস্তায় আমার কোনো বন্ধুর সাথে কাজ করবে না। আমি প্রথমে চেষ্টা করতাম আমার বাবার তো দুর্বিনীত আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে নিজেকে শোনাতে : "আমি আমেরিকার একজন নাগরিক আর সেটাই শেষ কথা।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকার কারণে পরবর্তীতে তিনি আমেরিকায় বসবাস করার সুযোগ পান আর সেইসূত্রে তিনি আমেরিকান। আপাতগ্রাহ্যতা না থাকায় কিন্তু আমার উপর আরোপিত হবার কারণে এই বৈকল্পিক পন্থাটা আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে

মনে হয়েছে। যুদ্ধকালীন কায়রোতে যখন বৃটিশ সেনাবাহিনীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ এবং আমার দৃষ্টিতে যাকে পুরোপুরি মিশরীয় জনগণ বলে মনে হয়েছে তাদের সামনে ইংলিশ স্কুলের ভঙ্গিমায় বা রীতিতে "আমি আমেরিকার নাগরিক" বলাটা আমার কাছে হঠকারী বলে মনে হয়েছে, যা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ আমার জাতীয়তা জানতে চাইলেই কেবল বলা উচিত; একান্ত সঙ্গোপনে আমি কখনই এই পরিচয়টা বেশীক্ষণ বহাল রাখতে পারতাম না, নিশ্চয়তার প্রলেপ বাস্তবতার জারণক্রিয়ায় বড্ড দ্রুতই সম্ভ্রম হারায়।

আমার দ্বিতীয় বৈকল্পিক পন্থাটা আরো কম কার্যকর। সেটা হল নিবিড় বিশৃঙ্খলতায় আপতিত আমার নিজের প্রকৃত ইতিহাস আর জন্মবৃত্তান্ত যা আমি বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছি তা খুলে বলা এবং তারপরে তাদের সেই আপাত-বিশৃঙ্খলতার মাঝে একটা অস্পষ্ট ইতিহাসের সন্ধান করা। কিন্তু মুশকিল হল আমার তথ্যভাণ্ডার কখনওই সমৃদ্ধ ছিল না; আমার জ্ঞাত বা কোনোভাবে অর্জিত তথ্যানুষঙ্গের মাঝে কখনও কার্যকরী সম্পর্কও ছিল না; পুরো ছবিটা কখনই আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। আমার বাবা-মা, তাদের অতীত এবং নামের মাঝেই গণ্ডগোলের বীজটা প্রোথিত ছিল। আমার বাবার নাম ছিল ওয়াদি যেটা পরে হয় উইলিয়াম (বহুকাল আগের একটা বৈষম্য যা অনেকদিন পর্যন্ত আমি ভেবেছি তার আরবি নামের ইঙ্গকরণ হিসাবে কিন্তু শীঘ্রই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে সন্দেহজনকভাবে আরোপিত পরিচয়ের একটা উদাহরণ হিসাবে প্রতিভাত হয়, তার নিজের স্ত্রী আর বোনেরা ছাড়া বাকি সবাই কোনো সঙ্গত কারণ ব্যাতিরেকে তার 'ওয়াদি' নামটা বর্জন করে)। ১৮৯৫ সালে জেরুজালেমে তার জন্ম (আমার মায়ের ভাষ্যমতে সালটা ১৮৯৩ হবার সম্ভাবনাই বেশি), সারা জীবনে সে তার অতীত সম্বন্ধে আমাকে দশটা কি এগারোটার বেশি কথা বলেনি, যার সবগুলোই ছিল অপরিবর্তনীয় এবং স্থানান্তরযোগ্য শব্দের প্রবহমান একটা ধারা, এর বেশি আর কিছুই তাদের বলা যাবে না। আমার জন্মের সময়ে তার বয়স ছিল কমপক্ষে চল্লিশ বছর।

জেরুজালেম ছিল তার চক্ষুশূল, এবং যদিও আমার জন্ম সেখানেই আর দীর্ঘদিন সেখানে বসবাস করেছি তারপরেও একটা কথাই সে কেবল বলত শহরটা সম্পর্কে আর সেটা হল শহরটার কথা মনে হলেই তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। তার বাবা কোনো এক সময়ে দোভাষী হিসাবে কর্মরত ছিল এবং জার্মান ভাষা জানার কারণে কাইজার উইলহেলমের ফিলিস্তিন ভ্রমণের সময়ে সে তার দোভাষী হিসাবে কাজ করেছিল। বাসায় কেউ তাকে নাম ধরে সম্বোধন করত না, কেবল আমার মা, যে তাকে কখনও দেখেনি, সেই তাকে ডাকত, "আবু আসাদ" বলে, আমার ঠাকুরদার কুলনাম ছিল "ইব্রাহিম"। স্কুলে তাই আমার বাবার নাম ছিল ওয়াদি ইব্রাহিম। আমার কাছে আজও পরিষ্কার না "সাঈদ" কোথা থেকে উড়ে এসেছে এবং কেউ এর কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যাও আমাকে দিতে পারেনি। আমার বাবা তার নিজের বাবা সম্পর্কে আমাকে কেবল একটা কথাই বলা প্রাসঙ্গিক মনে করেছে সেটা হল যে আবু আসাদের মতো এত নির্মমভাবে সে কখনও আমাকে চাবুকপেটা করেনি। "তুমি সহ্য করতে কিভাবে?" আমি জিজ্ঞেস করলে সে মুচকি হেসে বলেছিল : "বেশিরভাগ

সময়ে আমি দৌড়ে পালাতাম।" আমি কখনও সেটা করিনি এবং সত্যি কথা বলতে সম্ভাবনাটার কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি।

একদিন আমার মা ঘোষণা করলেন জন গিয়েলগাড কায়রো আসছেন অপেরা হাউজে *হ্যামলেট* মঞ্চস্থ করতে। "আমরা অবশ্যই দেখতে যাব," সংক্রামক সংকল্প নিয়ে সে কথাটা বলে, এবং সত্যি সত্যি আমরা একদিন নাটক দেখতে যাই যদিও জন গিয়েলগাড কে সে বিষয়ে আমরা কোনো ধারণাই ছিল না। আমার তখন নয় বছর বয়স এবং কয়েকমাস আগে বড়দিনের সময়ে পাওয়া চার্লস আর মেরি ল্যাম্বের সংকলিত শেক্সপিয়ারের গল্প পড়ে বিষয়টা সম্পর্কে সামান্য ধারণা জন্মেছে। আমি আর আমার মা একসাথে নাটকটা আবৃত্তি করব, এটাই ছিল আমার মায়ের ইচ্ছা। এই উপলক্ষে বইয়ের তাক ঘেঁটে একটা এক-খণ্ডের শেক্সপিয়ার রচনাবলী নামান হয়, এর লাল মরক্কো চামড়ার সাবলীল সুদর্শন বাঁধাই আর পিয়াজের খোসার মত নমনীয় কোমল পাতা, চির জীবনের মতো আমার কাছে দামি আর বিলাসী বইয়ের মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। পেনসিল বা কাঠকয়লায় নাটকীয় মুহূর্তগুলোর আঁকা ছবি বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে, বিশেষ করে *হ্যামলেট* নাটকে হেনরি ফুসিল্যের আঁকা ডেনমার্কের রাজপুত্র, হোরেশিও আর প্রেতাত্মার মাঝে মৃত্যুর ঘোষণা আর তৎপরবর্তী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার টানটান রূপায়ন ছিল বইটাতে।

আমরা দু'জনে সামনের বসার ঘরে গিয়ে বসতাম, মা তার বিশাল আরামকেদারায় আর আমি তার পাশে একটা টুলে। মায়ের বাম দিকে থাকত ধোঁয়াটে প্রায় নিভুনিভু অগ্নিকুণ্ড, আমরা দু'জনে একত্রে *হ্যামলেট* আবৃত্তি করতাম। গারট্রুডের আর ওফেলিয়ার অংশ মা আবৃত্তি করত আর আমি হতাম কখনও হ্যামলেট, কখনও হোরেশিও বা ক্লডিয়াস। আমার বাবার সাথে যেন একাত্মতা ঘোষণা করতেই, সে পলোনিয়াসের ভূমিকায় আবৃত্তি করত, যে প্রায়ই উদ্ধৃতি দিত "কখনও ঋণ নেবে না, কখনও ঋণ দেবে না" আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে নিজে টাকা খরচ করার বিষয়টা আমার জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। নাটকের-ভিতরে-নাটকের পুরো অধ্যায়টাই বিভ্রান্তকারী অলঙ্কারে পূর্ণ আর আমাদের দু'জনের পক্ষে জটিল বিধায় আমরা সেটা বাদ দিয়ে আবৃত্তি করতাম।

কায়রো, বাবা, আর আমার বোনদের বাদ দিয়ে, কেবল আমরা দু'জনে, কমপক্ষে চারবার, এবং হয়তো পাঁচ-ছয়বারও হতে পারে ঠিক মনে নেই, একই বই থেকে আবৃত্তি করতাম পুরো ব্যাপারটার ভিতরে একটা নাটুকে আমেজ সৃষ্টি করতে।

অনেক পঙ্‌ক্তির অর্থই আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না, যদিও হ্যামলেটের অকৃত্রিম পরিস্থিতি, বাবার মৃত্যু আর মায়ের পুনর্বিবাহের কারণে তার ক্ষোভ, তার শেষ না-হওয়া শাব্দিক দোদুল্যমানতা, আধোচেতন মনে আবছা বুঝতে পারতাম। অজাচার বা ব্যভিচার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, কিন্তু মাকেও জিজ্ঞেস করতে পারতাম না, নাটকের প্রতি প্রখর মনোনিবেশ তখন তাকে আমার কাছ থেকে দূরে তার নিজের ভিতরে গুটিয়ে ফেলেছে বলে মনে হত। আমার আজও মনে আছে গারট্রুডের ভূমিকায় আবৃত্তি করার সময়ে তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বদলে নুতন নাটুকে স্বরে শব্দ প্রক্ষেপণের ব্যাপারটা: স্বরের তীক্ষ্ণতা বেড়ে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় বাঁধা

পড়ে হয়ে উঠত অনায়াস সাবলীল আর সর্বোপরি একাধারে শান্ত সমাহিত; আবার প্রণয়ী আমেজ এক সাথে মিশে তার কণ্ঠস্বর একটা সম্মোহনী শক্তি অর্জন করত। "লক্ষী হ্যামলেট" আমার স্পষ্ট মনে আছে হ্যামলেটকে না আমার উদ্দেশ্যে সে বলত "তোমার অশুভ প্রভাব মুছে ফেলে/বন্ধুর চোখে তাকাও একবার ডেনমার্কের দিকে।" আমার কেবলি মনে হত সে আমার ভালো, কম অসহায়, তখনও শাদ্বল সত্তার উদ্দেশ্যে কথা বলছে, হয়তো জীবনের বিহ্বল কর্তব্যবিমুখতা থেকে আমাকে মুক্ত করতে, উদ্বেগ আর আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই সে জীবন ভারাক্রান্ত যে আমি আজ নিশ্চিত বলতে পারি তারা আমার ভবিষ্যতকেও হুমকির সম্মুখীন করত।

আমার ছেলেবেলার অন্যতম স্মরণীয় স্মৃতি, *হ্যামলেট* আবৃত্তি করা, নিজের কাছে নিজের ছোট হয়ে ওঠা আমার জন্য, তার চোখে ছিল আমার মর্যাদার স্বীকৃতি। দু'জনের কাছে আমরা ছিলাম দু'টো কণ্ঠস্বর, ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ দু'টো সুখী আত্মা। নাটকের অন্তরস্থ মিথস্ক্রিয়া যা ব্যভিচারী রানী আর মরিয়া রাজপুত্রকে একসূত্রে গেঁধেছিল সচেতনভাবে আমি তার কিছুই জানতাম না, বা আমি সত্যিই বুঝতে পারতাম না যখন পলিনাস মারা যায় তারপরে তাদের ভিতরের ক্রোধোন্মত্ত দৃশ্যের মাহাত্ম্য এবং হ্যামলেট যখন আক্ষরিক অর্থেই কথা দিয়ে গারট্রুডকে ধুয়ে দেয়। আমরা দু'জনে একসাথে পুরোটা আবৃত্তি করতাম, যদিও একটা অ-হ্যামলেট-সুলভ কৌতূহলে, অপরূপ মাতৃতুল্য, সংরক্ষণোন্মুখ, প্রশ্রয়ী সত্ত্বা না-হয়েও আমার আবেগ আর অনুভূতির মাত্রা স্পর্শ করার ক্ষেত্রে তার উপরে নির্ভর করতে পারার ব্যাপারটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজের সন্তানের প্রতি অর্পিত দায়িত্বের সাথে সে তঞ্চকতা করছে মনে না হয়ে আমার মনে হত যে এইসব আবৃত্তি আমাদের দু'জনের মাঝে বিদ্যমান নৈকট্যের গভীরতাই নিশ্চিত করে: বহু বছর তার স্বাভাবিকের চাইতে চড়া কণ্ঠস্বর, তার স্বভাবের নিরুদ্বেগ ভঙ্গিমা, তার উপস্থিতির শান্ত প্রশমিত অবয়ব, যেকোনো মূল্যে নিজের মান বজায় রাখার অভিপ্রায় আমার মনে ছিল কিন্তু আমার কর্তব্যবিমুখতা শনৈ শনৈ বাড়তে থাকলে, তার বিধ্বংসী আর বিনাশী ক্ষমতা আমাকে আরও বেশি করে বিপর্যস্ত করে তোলে।

অপেরা হাউজে নাটক দেখার সময়ে যখন গিয়েলগাড উদ্দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে "পীর পয়গম্বরের দোহাই আমাদের রক্ষা কর" এবং সেটা যখন মায়ের সাথে একান্ত নিভৃতে আবৃত্তি করার প্রতি একটা অলৌকিক সম্মতির অনুভূতি সঞ্চারিত করলে, আমার আসন থেকে ছিটকে পড়ার দশা হয়। ছেলেবেলায় ফুসিল্যের আঁকা চিত্রপটে দেখা অবিকল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝোড়ো মঞ্চ, তাতে অনুরণিত হয় তার কাঁপা কণ্ঠস্বর, দূরে চমকায় প্রেতাত্মার অস্পষ্ট অবয়ব যা বহুদিন আগে দেখেছিলাম, এবং আমার চেতনাকে এমন একটা মাত্রায় নিয়ে যায় যা আমি আগে কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু আমার আর মঞ্চে উপস্থিত অভিনেতার মাঝে বিদ্যমান শারীরিক বৈসাদৃশ্য তার লাল আর সবুজ পাতলুনে আবৃত পায়ের নিখুঁত সুগঠিত আকৃতি যেন আমার আনাড়ি দেহভঙ্গিমা, আমার অপরিশীলিত গতিবিভঙ্গ, আমার হাড়সর্বস্ব বিকৃত পায়ের গঠনকে পরিহাস করে, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। গিয়েলগাড আর সোনালি চুলের মানুষটা যে লারর্টাসের চরিত্রে অভিনয় করেছিল তাদের সবকিছুতেই

একটা সাবলীল আর আত্মবিশ্বাসী অস্তিত্ব প্রকটিত হয়—ইংরেজ নায়ক বলে কথা—যা আমাকে কীটাণুকীট মর্যাদায় অভিষিক্ত করে, এরপরে আর নাটক উপভোগ করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কয়েকদিন পরে, আমার স্কুলের টনি হাওয়ার্ড নামে এক অ্যাংলো-আমেরিকান সহপাঠী তার বাসায় গিয়েলগাডের সাথে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালে আমি গিয়ে কোন মতে তার সাথে নীরবে কোনোমতে করমর্দন করি। গিয়েলগাডের পরনে সেদিন ছিল একটা ধূসর রঙের স্যুট, কিন্তু সে কোনো কথা বলেনি; আমার ছোট হাতটা নিয়ে বিশ্বজয়ীর অর্ধ প্রস্ফুটিত হাসি হেসে হাল্কা চাপ দিয়ে ছেড়ে দেয়।

বহুদিন আগে কায়রোতে সেইসব অলস দুপুরে একসাথে আবৃত্তি করা *হ্যামলেট*'র স্মৃতিই হয়তো, মা'কে তার জীবনের শেষ দু'তিন বছর, পুনরায় একত্রে মঞ্চনাটক দেখতে উৎসাহিত করেছিল। সবচেয়ে স্মরণীয় সময় ছিল যখন—ততদিনে কর্কট রোগের উপস্থিতি ঘোষিত হয়ে গেছে—সে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে আমেরিকায় যাবার পথে বৈরুত থেকে লন্ডন এসেছিল: আমি তাকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানায় এবং রাতটা ব্রাউন'স হোটেলে কাটাবার জন্য তাকে নিয়ে যাই। দু'ঘণ্টা পরেই পুনরায় যাত্রার প্রস্তুতি নিতে হবে, রাতের খাবার তাই আগেই সেরে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরেও আমি যখন হগমার্কেটে গিয়ে ভেনেসা রেডগ্রেভ আর টিমোথি ডালটন অভিনীত এ্যান্টনি আর ক্লিওপেট্রা দেখবার আমন্ত্রণ জানাই, সে দ্বিতীয়বার না ভেবেই যেতে রাজি হয়ে যায়। খুব একটা খ্যাতনামা প্রযোজনা সেটা ছিল না এবং আমি অবাক হয়েছিলাম লম্বা নাটকটা তাকে যেভাবে বিবশ করে রেখেছিল। বহুবছর লেবাননের গৃহযুদ্ধ আর ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিভীষিকার মাঝে কাটাবার কারণে সে খানিকটা বিক্ষিপ্ত, কখনও হয়তো কলহপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, নিজের স্বাস্থ্য আর নিজেকে নিয়ে কী করবে এসব চিন্তা প্রায় সময়েই তাকে উৎকণ্ঠার মাঝে রাখত। আমরা যখন শেক্সপিয়ারের নাটক দেখছি আর শুনছে, তখন অবশ্য আর সবকিছুই মূলতবি হয়ে পড়ে (আমাদের ওষ্ঠে আর চোখে অনন্তের বরাভয়/ আমাদের ভুরুর বাঁকে প্রশান্তির পরশ) যুদ্ধকালীন কায়রোর সেই বিশেষ বাচন ভঙ্গিতে কেউ যেন আমাদের সাথে কথা বলছে, আমরা ফিরে যাই আমাদের নিভৃত আশ্রয়ে, ভীষণ সমাহিত আর মনোযোগে ভাষাটার আমেজ উপভোগ করি এবং দু'জনের ভিতরে একটা আত্মিক আদানপ্রদান চলতে থাকে– হতে পারে আমাদের দুজনের বয়সে অনেক ফারাক এবং আমাদের ভিতরে মা-ছেলের সম্পর্ক—সেই শেষবারের মতো। আট মাস পরে সে রোগের কাছে পরাভব মানতে শুরু করে যা তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে, কর্কট রোগের আগ্রাসী বিস্তার তার মনকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, মৃত্যুর দুমাস আগে সে পুরোপুরি বাকশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিল, যার ফলে সে কণ্ঠে ভয় জাগিয়ে তার চারপাশের নানা ষড়যন্ত্রের কথা অনবরত বলে যেত। মানসিকভাবে সুস্থ অবস্থায় আমার উদ্দেশ্যে তার শেষ আন্তরিক উক্তি 'আমার খুদে সোনামণি'—এক মায়ের তার সন্তানের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার করুণ আর্তিতে উচ্চারিত। আঠারো মাস পরে আমার দেহে লিউকেমিয়ার উৎপাত ধরা পড়ে, মা যখন মারা যায় নিশ্চয়ই সে সময়ে যা আমার দেহে উপস্থিত ছিল।

আমার ছেলেবেলায় আমি সবসময়ে আশা করতাম আমি খেলছি আর সেটা সে দাঁড়িয়ে দেখছে বা কেবল সেই আমার শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখবে, আমার শুদ্ধিকরণ আর আত্মিক উন্নতির যৌথ কার্যক্রমে বাবার সহকারী হিসাবে সে দায়িত্ব পালনে বিরতি দেবে। সে মারা যাবার পরে, এবং যখন তাকে আর প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতে হয় না বা প্রতিদিন তার সাথে টেলিফোনে কথা বলার প্রয়োজন শেষ হলে, আমি তার স্মৃতিকে নীরব সাথী হিসাবে আগলে রাখি। ছেলেবেলায় আমাকে তার আদর করতে ইচ্ছে করলে তখন সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরত এবং মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিত সেটা ছিল সত্যিই প্রশান্তিকর কিন্তু খুঁজে বা হ্যাংলার মতো চেয়ে কখনও এই মনোযোগ পাইনি। তার মেজাজমর্জি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করত, এবং আমার মনে আছে ছেলেবেলায় এবং কৈশোরে আমার সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি ছিল, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এবং সাফল্যের সম্ভাবনা ব্যতিরেকে, তাকে তার কঠোর কর্মদাতার ভূমিকা থেকে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা, এবং আমাকে উৎসাহ বা বাহ্‌বা দিতে তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করাটা। কোনো ভালো কাজ, পরীক্ষায় ভালো নম্বর, পিয়ানোতে সুন্দরভাবে সুর তোলার জন্য হতো সহসা তার মুখাবয়বের ভঙ্গি বদলে যেত, কণ্ঠে জেগে উঠত নাটকীয় মাত্রা, আমাকে দু'বাহু প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে সে বলত : 'সাবাশ, এডোয়ার্ড, আমার সোনা ছেলে, সাবাশ, সাবাশ। দেখি তোমার কপালে একটা চুমু দেই!'

মা আর বাড়ির কর্ত্রী হিসাবে কর্তব্যবোধ তাকে অধিকাংশ সময়ে চালিত করত যার প্রধান কণ্ঠ যা সেই সময় থেকে আজও আমার কানে গুঞ্জরিত হয় তা হল তার উচ্চারিত সব আদেশ: 'এডোয়ার্ড মন দিয়ে পিয়ানো বাজাও!' 'যাও বাড়ির কাজ করতে বসো।' 'সময় নষ্ট কোরো না; গিয়ে সারমর্ম লিখো।' ' কড-লিভার অয়েল, টমেটোর রস আর দুধ ঠিক সময়ে খেয়েছ?' ' প্লেটের খাবার শেষ কর।' 'চকলেটগুলো কোথায় গেল? এক বাক্স চকলেট হাওয়া। এডোয়ার্ড!!'

সময় যেন সবসময়েই আমার প্রতি বৈরী, এবং সকালের সামান্য সময়টুকু ছাড়া যখন আমি অনাগত দিনের সম্ভাবনা আঁচ করতে ব্যস্ত থাকি, বাকি সময়টা সময়সূচী, দৈনন্দিন কাজ আর বরাদ্দ কাজের চাপে নতজানু হয়ে থাকি, অলস উপভোগ বা কল্পনার জন্য এক মুহূর্তও বরাদ্দ নেই। আমার এগার কি বারো বছর বয়সে, আমি প্রথম ঘড়ি পাই, বিষণ্নদর্শন এক টিসট ছিল সেটা; পরবর্তী কয়েকদিন আমি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কাটাই, কাঁটার সঞ্চালন দেখতে আমার অপারগতা আমাকে বিভ্রান্ত করে, কেবলই মনে হতে থাকে ঘড়িটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়িটার গায়ের কয়েকটা সন্দেহজনক দাগ দেখে আমার মনে হতে থাকে একদম নতুন বোধহয় না ঘড়িটা, কিন্তু আমার অভিভাবক আমাকে তার নতুনত্ব সম্পর্কে আশ্বস্ত করে এবং বলে উপরিভাগের হাল্কা হলুদ রঙ (কমলালেবুর কষ) সেই বিশেষ মডেলের বৈশিষ্ট্য। ঘড়ি-সংক্রান্ত আলোচনার সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ঘড়িটা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি প্রথমে আমার স্কুলে যারা ঘড়ি পড়ে তাদের সাথে একে তুলনায় নামাই, দেখি, মিকি মাউস আর পাপাই মডেলের ঘড়ি যা

আমেরিকার নিদর্শন এবং আমি সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত না, আর সবার ঘড়িই আমারটার চাইতে নিম্নমানের। বিভিন্নভাবে ঘড়ি বাঁধার মহড়া শুরু হয় এরপরে: ঘড়ির ডায়াল বাইরের দিকে; শার্টের হাতার উপরে; নীচে; শক্ত করে বাঁধা; আলগা করে বাঁধা; কব্জির সামনের অংশে বাঁধা; এবং ডান হাতে বাঁধা। শেষ অব্দি বাম হাতের কব্জিতে এসে ঘড়িটা থিতু হয়, বহুদিন সেখানে তার অবস্থান আমাকে আমার পরিচ্ছদের ব্যাপারে পূর্ণতার অনুভূতি দিয়েছে।

কিন্তু ঘড়িটার অবিশ্রান্ত সম্মুখগতি দেখে মুগ্ধ হওয়া আমার কখনও শেষ হয়নি, যা সবসময়ে আমার ভিতরে পিছিয়ে পড়ার অনুভূতি জাগিয়েছে এবং আমার নিজের কর্তব্য আর প্রতিশ্রুতির সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। আমি কখনও ঘুমকাতুরে ছিলাম বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমার মনে পড়ে প্রতিদিন সকালে নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বেজে-ওঠা সঙ্কেতধ্বনি এবং বিছানা ত্যাগের মুহূর্তে অনুভূত অত্যাবশ্যক উদ্বিগ্নতা। ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়ে বা গড়িমসি করে কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ ছিল না যদিও দুটো বিষয়ই আমার খুব প্রিয়। সেই সময়েই আমার সারাজীবনের অভ্যেস সময়কে খরচের বিষয় হিসাবে দেখতে শেখা এবং সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়সীমার আগে বেঁচেবর্তে থাকা। কিছু সময়ে বেশি বেশি করে কাজের ভণিতা (চোরাগুপ্তা বই পড়া, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা, কাগজ কাটার ছুরি বা গতকালের শার্টের মতো অনর্থক জিনিষ খোঁজায় কালক্ষেপণ করা) করে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করার জন্য। আমার ঘড়ি আমার সহায় হিসাবে আবির্ভূত হয় যখন সে আমাকে দেখাতে শুরু করে সময় নষ্ট করার মতো সময় একেবারেই নেই, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে অভিভাবকের আদেশ, শিক্ষক আর অপরিবর্তনীয় সময়সূচির পাশে দাঁড়িয়ে সে আমাকে পাহারা দিয়েছে।

কৈশোরের শুরুতে, প্রীতিকর অপ্রীতিকর দু'ভাবেই, ধারাবাহিক সময়সূচীর একটা পর্যায়ক্রম হিসাবে কালক্ষেপণের একটা অভ্যাস আমাকে পেয়ে বসে—সত্যি কথা বলতে আমার সেই অভ্যেস আজও অটুট আছে। প্রাত্যহিক কর্মগুলো দিনের শুরুতে করার অভ্যাস সে সময়েই গড়ে উঠেছে এবং তা আজও বহাল আছে। সাড়ে ছয়টা (বা প্রচণ্ড তাড়া থাকলে ছয়টায়—আমি আজও বলি "ছয়টার সময়ে উঠে আমি এটা শেষ করব) হল ঘুম থেকে ওঠার সময়: সাড়ে সাতটায় শুরু হয় ভূতের নৃত্য, ক্লাস, চার্চ, পিয়ানো বাদন থেকে পুনরায় শোবার সময় না-হওয়া পর্যন্ত আমি ঘণ্টা আর আধ ঘণ্টার গণ্ডিতে বিভক্ত একটা কঠোর নিয়মাবলীর ভিতরে প্রবেশ করি। নির্দিষ্টকৃত শ্রমের পর্যায়কালে বিভক্ত দিনের এই অনুভব আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি, সত্যি বলতে উত্তরোত্তর আরও প্রকট হয়েছে। সকাল এগারোটা আজও আমার মনকে একটা অপরাধবোধে জর্জরিত করে যে সকালটা কোনো উল্লেখযোগ্য অর্জন ব্যতীতই খরচ হয়ে গেল—এই লেখাটা আমি যখন লিখছি তখন ঘড়িতে সময় হয় রাত ১১.২০— এবং রাত নয়টা মানে আমার কাছে 'অনেক রাত' যা দিন শেষের সূচক, বিছানায় যাবার প্রস্তুতি নেবার সময় এটা, এরপরে কাজ করার মানে ভুল সময়ে কাজ করা, ক্লান্তি আর ব্যর্থতা সব একসাথে জোট পাকাতে শুরু করে, সময় ধীরে ধীরে তার মোক্ষম মুহূর্ত অতিক্রম করছে, সব কিছুতেই দেরি করে ফেলেছি।

এই সব কিছুর একটা বুনিয়াদি প্রতিকল্প আমার ঘড়ি তৈরি করে, একটা নৈর্ব্যক্তিক মূলনীতি যা পুরো ব্যবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অবসর বড়ই মহার্ঘ। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে প্রথম সকালের পরে পাজামা পরে থাকার বিরুদ্ধে বাবার কঠোর আদেশের কথা; বিশেষ করে চপ্পল ছিল তার চক্ষশূল। আমি আজও ড্রেসিংগাউন পরে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না : কালক্ষেপণের অপরাধবোধ আর অলস অনৌচিত্য আমাকে ভারাবনত করে ফেলে। নিয়মনীতির বেড়াজাল পাশ কাটাবার প্রচেষ্টায়, স্কুল থেকে দূরে থাকবার প্রয়াসে অসুস্থতার (কখনও ভাণ করে, কখনও বাড়িয়ে বলে) বাহানা সবসময়েই সাদরে গ্রহণযোগ্য ছিল। আঙ্গুলে, কনুইয়ে বা হাতে অপ্রয়োজনীয় পট্টি জড়িয়ে থাকার কারণে পরিবারের সবার কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ প্রতিপন্ন করেছিলাম। আর আজ নিষ্ঠুর বিড়ম্বনায় আমি সতত আমার মাঝে আগ্রাসী, বিশ্বাসঘাতক লিউকেমিয়ার প্রকোপ আবিষ্কার করি, যা উটপাখির মতো, আমি আমার মন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখতে চেষ্টা করি, আমার নির্ধারিত সময়ব্যবস্থার ভেতরে আপাত-সাফল্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাই, পঞ্চাশ বছর আগে প্রশিক্ষিত অতিকাল আর তার ভয়াবহতা এবং অপর্যাপ্ত অর্জনের অনুভূতি এবং যে দীক্ষা আমি সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করেছিলাম তার মাঝে নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাই। কিন্তু, আরেক অদ্ভুত বৈপরীত্যে, আমি নিজের মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করি যে এই কর্তব্যবোধ আর তার ভয়াবহতার কার্যপ্রক্রিয়া আমাকে এখন হয়তো রক্ষা করবে, যদিও আমি জানি যে আমার অসুস্থতা চোখের আড়ালে ছড়িয়ে পড়ছে, আমার প্রথম ঘড়িতে প্রজ্ঞাপিত সময়ের চাইতেও গোপন আর পরিশ্রমী তার একাগ্রতা, যা কব্জিতে বহন করার সময়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না সে কিভাবে আমার আয়ুষ্কাল সীমিত করে চলেছে, বন্ধ্যা সময়ের পর্যায়কাল অপরিবর্তিত রেখে তাকে নিখুঁতভাবে বেঁটে চলেছে অনন্ত ধারাবাহিকতায়।

আউট অব প্লেস থেকে
ভাষান্তর : সাদেকুল আহসান

ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতা (১৯৬৮-১৯৬৯)

নিকট প্রাচ্যের সমসাময়িক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে কেউ শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হল, সমস্যাটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বিভ্রান্তির সব ধরনের উপাদানই এই সমস্যায় বিদ্যমান। কোনো একটা সময় পর যে কোনো বিভ্রান্তিই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে আসে। যদি এখনো পর্যন্ত সবাই বিশ্বাস করে যে, নিকট প্রাচ্যের সমস্যাটা আসলে ইসরায়েল এবং ইসরায়েলের দ্বারা ছত্রভঙ্গকৃত বা কব্জাকৃত ফিলিস্তিনী আরবদের মধ্যে, তাহলেই তার পক্ষে সমস্যার পরিষ্কার চেহারাটা দেখা সম্ভব। এই অঞ্চলে বিদ্যমান বিভ্রান্তির জন্য যা মূলত দায়ী তা হল, প্রায় সকলেই এখানে ফিলিস্তিনীদের উপস্থিতি মেনে নিতে নারাজ। এটা যেমন ফিলিস্তিনীদের নিজেদের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি অন্য আরব সম্প্রদায় বা ইসরায়েলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার পর্যবেক্ষণে এটাই ধরা পড়ে যে, ১৯৬৭ সাল থেকে এই দ্বন্দ্ব ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে কারণ কারণ ফিলিস্তিনীরা এই সত্যটা বুঝতে পেরে এ বিষয়ে কাজ করতে শুরু করেছে। ফিলিস্তিনীদের এই আত্মচেতনাকেই আমি ফিলিস্তিনবাদের উৎস বলে মনে করি। ফিলিস্তিনবাদ একটি রাজনৈতিক আন্দোলন যা নির্মিত হয়েছে ফিলিস্তিনের বহুবর্ণ এবং বহুধর্মের যে ইতিহাস তার প্রতি অনুগত থাকার প্রেরণা থেকে। ফিলিস্তিনবাদের মূল লক্ষ্য ভূমির সাথে আরব ফিলিস্তিনদের নিরঙ্কুশ একাঙ্গীকরণ এবং তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে তাদের একাত্মকরণ যা তাদেরকে বিগত একুশ বছর যাবৎ কোনো-না-কোনোভাবে একান্ত বশীভূত কয়েদী বানিয়ে রেখেছে।

এটা আমার কাছে অনর্থক ছল বলেই মনে হয়—যা ফিলিস্তিন সম্পর্কিত বেশিরভাগ বিবাদেই দেখা যায়—যে জুডাইজমের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের প্রচলিত প্রতিবাদকে আরব সেমিটিয় বিরোধিতার সহজ অংশ বলে ধরে নেয়া হয়, অথবা ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরেকটি গণহত্যার হুমকিস্বরূপ মনে করা হয়। আমি নিজে এটা অনুভব করেছি যে, এই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য যা জরুরি তা হল, ফিলিস্তিন অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দুইভাবেই পাঠকের সামনে হাজির করা। আমি মনে করি দুইটি পথই যথেষ্ট স্বচ্ছ ফিলিস্তিনবাদকে উপস্থাপন করার জন্য এবং মিশর বা লেবাননের মতো দেশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্যভাবে মানানসই। এছাড়াও স্বস্তির ব্যাপার এই যে, উভয় দেশই পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে পরিচিত তথা আমার কাছেও। এমনকি ফিলিস্তিনবাদের অস্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জর্ডানের যৌক্তিক ভূগোল ও আদর্শও এই দুটি দেশের সাথে সমান্তরালে রাখা যায় ফিলিস্তিনবাদের মর্ম উদ্ধারের প্রয়োজনে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি সুবিধা এই যে ফিলিস্তিনীদের

নিজেদের নয় এমন একটি ভাষায় ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করার সমস্যা তাতে অনেকটা কমে আসে। যেসব সমস্যা এখনো ফিলিস্তিনীদের মধ্যে বিদ্যমান, যেসব সমস্যা এখনো ফিলিস্তিনীদেরকে বিব্রত করে সেসব সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে ইংরেজিতে যেসব রচনাগুলো রচিত হয় তা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনীদের সীমান্ত, প্রতিবাদহীনতা ও স্থানচ্যুতির সমস্যাগুলোকে একটি নাটকীয় রূপ দেবার চেষ্টা করে। এসবকে মাথায় রেখেই বলতে হয়, ফিলিস্তিনবাদ একধরনের প্রত্যাবাসনের চেষ্টা, কিন্তু বর্তমান ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতা নির্বাসন থেকে ফিরে আবারো একজন ফিলিস্তিনী হবার আদি সমস্যাটির কথাই জানান দেয়।

বৈরুতের দু'টি প্রাচীনতম সমুদ্র বেলাভূমির নাম সেন্ট সিমন ও সেন্ট মিচেল যারা একত্রে আরবিতে আল-গানাহ্ নামে পরিচিত যদিও তা ফরাসি নামের যথোপযুক্ত পরিচয় প্রকাশ করে না। ফরাসি ও আরবি নামের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ সবাই স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে, যার সাথে সম্প্রতি সেন্ট পিকট নামে তৃতীয় আরেকটি সামুদ্রিক বেলাভূমি সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা অনতিদূরেই অবস্থিত। ১৯৬৯-এর জুন মাসে বৈরুতে থাকাকালীন সময়ে এই নতুন জায়গা ও এর নামটি আমার জন্য একটি প্রতীকী অর্থ বয়ে আনে। যে কেউই সহজে বুঝতে পারার কথা যে "সেন্ট" মানেই "সামুদ্রিক বেলাভূমি" এবং জর্জ পিকট তখনো কোনো বিস্মৃত নাম নয়। সুতরাং শব্দগুলোর বা নামগুলোর সংযুক্ততা কারোই বোধগম্য না হয়ে পারে না। কিন্তু তার পর থেকেই ঘটনাসমূহের দ্বন্দ্ব ও পরস্পর বিরোধিতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। লেবাননে তখন স্মরণাতীতকালের তীব্রতম আভ্যন্তরীণ সংকট চলছে যার স্বরূপ একেক জনের কাছে একেক রকম এবং তা ছিল রীতিমতো সমাধানের অযোগ্য ও বিশ্লেষণ-বহির্ভূত। সেখানে কোনো মন্ত্রিপরিষদ ছিল না বিধায় দেশ শাসনের ভার ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর। আকস্মিক এই সংকটের একটি ছিল লেবাননের সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায় এমন একটি সংজ্ঞার অভাব। ঠিক সে সময়েই অগণিত ফিলিস্তিনী ফেদাইনরা দক্ষিণে অবস্থান গ্রহণ করে। যদিও তাদের আরব ভ্রাতারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ ঘটনা লেবাননের অস্থিরতার জন্য দায়ী ছিল, যদিও তা লেবাননের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর কিছু বয়ে আনেনি। এভাবে ফিলিস্তিনীরা তাদের অবস্থান ধরে রাখল, সংকট দীর্ঘায়িত হল ও লেবাননে উত্তেজনা অব্যাহত রইল আরো কয়েক সপ্তাহ। বৈরুত দৃষ্টিভঙ্গির এই সংঘাতকে চলতে দিল তার নিজের মতো করে। যদিও সংঘাতের রূপটি ছিল একেবারেই অনাবৃত ও মূর্ত অন্য আর সব নিকট-প্রাচ্যের সমস্যার মতোই। এভাবেই সাধুসুলভ পিকটের নামে একটি লেবানিজ সামুদ্রিক বেলাভূমিকে ইউরোপীয় নামে বৈসাদৃশ্যমূলকভাবে সজ্জিত করে যা ছিল মন্ত্রিপরিষদ-সংক্রান্ত সমস্যারই প্রভাব। এর পেছনে আরো ছিল সিরিয়া, জর্দানি, ইসরায়েলী, মিশরীয়, আমেরিকান এবং রাশিয়া-সংক্রান্ত অস্থিরতা। আর বেশি ছিল পশ্চিম থেকে আরব বিশ্বে প্রবেশের প্রাকৃতিক উন্মুক্ত স্থান হিসেবে বৈরুতের মর্যাদা।

ইতিহাসের আশ্চর্যজনক বৈচিত্র্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকা লেবানিজরা প্রায়শ নিজেদেরকে বিভিন্ন রূপে আবিষ্কার করে যার বেশিরভাগই দ্বন্দ্বমূলক, যেমনটা আমি

বলে আসছি যে, কোনো সমাধানে পৌঁছতে তাদের মধ্যে একধরনের উদ্ভট খেয়ালী মনোভাব কাজ করে। এভাবেই এসব দ্বন্দ্ব সরাসরি জনগণের মধ্যে কার্যকারিতা পেয়েছে এবং সমগ্র দেশটাকে একটা অতি ছোট লেবাননে পরিণত করেছে। এই হচ্ছে লেবানন এবং গত এক শতাব্দী ধরেই তা অপরিবর্তনীয়। এভাবেই লেবাননের রীতি সবকিছুকে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের ভেতর জায়গা করে দেয় এবং এর জনগণ যা তাদেরকে পঙ্গু করে দিতে পারে তার সাথে সহাবস্থান গ্রহণ করে। বৈরুতে বসবাস করা মানে হল অনেক জিনিসের মধ্য থেকে কোনো কিছু করা, অনুভব করা, চিন্তা করা, বলা এমনকি বাস করার জন্য নিজের প্রয়োজনীয় সুযোগটি গ্রহণ করা। বৈরুতে বসবাস করার মানে হল খ্রিস্টান, মুসলমান, ড্রুজ, আর্মেনিয়ান, ইহুদি, ফরাসি, আমেরিকান, ব্রিটিশ, আরব, কুর্দিশ, ফনেশিয়ান, প্যান-ইসলামীবাদের কিছু অংশ, আরব জাতীয়তাবাদের কিছু অংশ, আদিবাসী, নাগরিক, নাসেরন, কম্যুনিস্ট, সোশালিস্ট, পুঁজিবাদী, হেজেনিস্ট, পিউরিটান, ধনী কিংবা গরিব অথবা এমনকি কোনো প্রকার আরব সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত নয়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব সংগ্রামেরও সহযোগী নয়, এদের সবার মাঝে বসবাস করা। দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও ডানপন্থি বা বামপন্থি লেবেল বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে।

তাহলে লেবানন বাসস্থান, সহনশীলতা, বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বের অর্থ বহন করে। উদাহরণ হিসেবে এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আরব জাতীয়তাবাদ, আধুনিক ভাষা হিসেবে আরবির রেনেসাঁ, মিশরীয় প্রেসের ভিত্তিপ্রস্তর, বর্তমানের ভালো জীবনযাপন করার যে সম্ভাবনা বা ব্যবসায়িক যে উত্থান তার সবকিছুর আদিতম স্থানটি অবশ্যই লেবানন। যদিও ১৯৬৯ এর সংকটের পেছনে দায়ী যেভাবে অতীতে লেবাননকে অন্যের সামনে হাজির করা হয়েছে তাতে লেবানিজদের নিজস্ব জিনিসের অভাব। এছাড়াও আরো ছিল লেবানিজদের ভবিতব্যকে টেনে আনার জোর চেষ্টা। বৈরুতে থাকাকালীন আমি লক্ষ্য করেছি যে, যদি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতকে একই সাথে সমঝোতার কাতারে আনা যায় তবে সংকট অত্যাসন্ন ও দীর্ঘ হয়ে ওঠে। একে বলা হয় ভারসাম্য রক্ষা, কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান তাতে মেলে না। আমার কাছে স্পষ্টই মনে হয়েছে যে, বৈরুত তার উদারতা এবং সংস্কৃতির বিবিধ প্রয়োগ এই দুইয়ের এক নেতিবাচক শিকার, এমনকি এর জন্য সঠিক সময়ে সঠিক শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণের অভাবও সমানভাবে দায়ী। এর তুলনায় দামেস্কের ঘটনাবলী বরং অনেক বেশি আড়ালে চলে গেছে। একজন আমেরিকান হিসেবে ব্যক্তিগত ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা আমাকে দামেস্কে প্রবেশ করতে দেয়নি। কোন আমেরিকানেরই দামেস্কে প্রবেশের সুযোগ নেই। যদিও আমি জেরুজালেমের একটি আরব পরিবার থেকে এসেছি কিন্তু আমেরিকান নাগরিক হওয়ার ফলে আমি আম্মান যেতে সিরিয়া হয়ে যাওয়ার সুযোগটি নিতে পারিনি। আম্মানে যাবার প্লেন থেকে নিচের দামেস্কের দিকে তাকিয়ে একে আমার দেখা সবচে অনাকর্ষণীয় শহর বলে মনে হয়েছে। শহরটাকে আমার কাছে দুর্বোধ্যতার কারণে ফুলে-ফেঁপে থাকা জটিলতা ছাড়া আর অন্য কিছু মনে হয়নি। বাথ রাজনীতির গোপনীয়তায় ভরা সিরিয়ান অঞ্চলটি আলীপন্থি ধর্মীয় ব্যক্তিদের

রহস্যভরা কার্যক্রমও বহন করে এবং এসব কারণেই জীবনকে পর্যবেক্ষণ করার স্বাদ এ শহর থেকে মুছে গেছে।

কঠোর নীতিপরায়ণতার জন্য ১৯৬৭-এর জুনের পর থেকে ফিলিস্তিনীদের বিষয়ে আম্মানের অবস্থান শক্তিশালী হতে শুরু করে। ১৯৪৮-এর আগ পর্যন্ত এর শহর হিসেবে তেমন কোনো অস্তিত্বই ছিল না বরং এর পরিকল্পনাহীন বেড়ে ওঠা একে পরিণত করেছিল ভুলের শহরে। এর চারপাশে ছিল প্রচুর শরণার্থী শিবির এবং বৈরুতের সাথে যা বৈসাদৃশ্যময় ছিল তা হল বৈরুতের আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীতে আম্মানের এখানে-সেখানে চোখে পড়ত ব্রিটিশবিরোধী আস্তানা। রাস্তাগুলো ভর্তি হয়ে থাকত লক্ষ্যহীন পথিকদের আনাগোনায় ও গাড়িতে, যদিও প্রথমেই যা চোখে পড়ত তা হল একধরনের সামরিক নিয়ন্ত্রণের আবেশ। আমি অনবরত মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করতাম এদের মধ্যে কারা ফিলিস্তিনী আর কারা জর্দানি। সবুজ রংয়ের পোশাক পরিহিত মানুষগুলো আমার প্রশ্নকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু পৌঁছার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি প্রশ্ন করা থামিয়ে দিলাম। ততক্ষণে আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম হাশেমী সম্প্রদায়ের রাজত্ব চলমান থাকা সত্ত্বেও সকল জর্দানিরাই একেকজন অস্থায়ী ফিলিস্তিনীতে পরিবর্তিত হয়েছেন। যতদূর সম্ভব আমি মন্তব্য করতে পারি যে, কেউই আর আম্মানকে আপন ঘর হিসেবে অনুভব করে না এবং কোনো ফিলিস্তিনীই আম্মান ছাড়া অন্য কোথাও নিজের ঘরকে এতটা বেশি অনুভব করে না। পাহাড়ের উপর অবস্থিত কিছু বিলাসবহুল বাড়ি ছাড়া পুরো শহরটাই একমুখী ফিলিস্তিনী শক্তিতে উজ্জীবিত। শহর জুড়ে বাণিজ্যিক জীবনযাপনের কোলাহলপূর্ণ চিত্র চোখে পড়লেও আরব ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহমর্মিতার চিত্রটিও সহজে চোখ এড়ায় না। আম্মানে কেউই এই ব্যাপারটিকে পাশ কাটাতে পারবেন না, ফিলিস্তিন প্রশ্ন এখানকার সবার হৃদয় ছুঁয়ে আছে। ক্যাফে, টেলিভিশন, সিনেমা, সামাজিক অনুষ্ঠান—সর্বত্রই ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতার উপচে-পড়া আলোচনা দৃশ্যমান।

আম্মানের জনগণের মধ্যে দুই ধরনের প্রবণতা মূলত চোখে পড়ে। এক হচ্ছে শরণার্থী হিসেবে কোনো শিবিরে জীবন কাটানো, দুই—প্রতিবাদী কোনো সংগঠনের তৎপর সদস্য হিসেবে যোগ দেয়া। কোনো শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে এসে কারো পক্ষে সে অভিজ্ঞতা মনে রাখা কষ্টকর শিবিরগুলোর অত্যন্ত নোংরা পরিবেশের কারণে, এমনকি শরণার্থীদের কষ্ট ও দারিদ্র্যতাও তেমন কোনো সহানুভূতির উদ্রেক করে না। প্রত্যেকটি শরণার্থী শিবিরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; এখানে বসবাসকারীরা এ ভেবেই কোনো প্রকারে জীবন চালিয়ে নিচ্ছে যে, একদিন তারা আপন মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। একজন ফিলিস্তিনী ইউএনআরডব্লিউ (UNRW) সদস্য আমাকে জানান তিনি এই ভেবে বিস্মিত যে, মানুষগুলো এমন পরিবেশে থাকছেই বা কী করে! তিনি শরণার্থীদের জীবনযাপন বর্ণনা করার জন্য যথেষ্টই সমস্যা পোহাচ্ছিলেন এবং প্রাণপণে যে শব্দটি এড়াতে চাচ্ছিলেন তা হল—"অসাড়তা"। তিনি বলে যেতে লাগলেন যে, যদিও প্রতিটি শিবিরে প্রায় ৩৫,০০০ করে লোক বাস করে, সেখানে অপরাধ বা সামাজিক অস্থিরতার কোনো সংবাদ তার জানা নেই। আমি গভীরভাবে

তার কার্যক্রম লক্ষ্য করছিলাম—নিজে একজন শরণার্থী হয়ে তিনি অন্য শরণার্থীদের রক্ষা করছিলেন অথবা তাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করেছিলেন। শরণার্থী জীবনের অকথিত মানে যে একধরনের নৈতিক সত্য ঘটনা এবং এ জীবনের অবসান যে সঠিক সময়েই হবে—তার এই চিন্তাকে আমিও গ্রহণ করলাম।

উদাহরণের জন্য মহিলা ও শিশুদেরকে বাদ দিয়ে শুধু পুরুষ ও যুবকদের কথা ধরা যাক। যদি "ঘোর"-এ দিনমজুর হিসেবে যোগ না দেয় তবে কোনো গেরিলা সংগঠনে যোগ দেয়াই তার একমাত্র পথ। বালকেরা যোগ দেয় "আশবাল"-এ যেখানে উপযুক্ত শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। প্রায় প্রতিদিনই উর্বর ঘোর এলাকায় ইসরায়েলীদের বিমান হামলা হয়। যদিও তাদের লক্ষ্য সামরিক আস্তানা কিন্তু তারা যা অর্জন করে তা হল—শস্য ও জনবসতিপূর্ণ গ্রামের পরিপূর্ণ ধ্বংস। কিন্তু শরণার্থী শিবিরের মতো এখানেও জীবন এগোতে থাকে, কারণ তাদের আশাবাদের জায়গাটা একেবারে অমূলক নয়। আমার সাথে তিনজন ফাতাহ'র কথা হয় যারা মাত্র একটি আক্রমণ থেকে বেঁচে এসেছে, যদিও পাঁচজন সক্রিয় সদস্য মারা গেছেন। তাদের প্রত্যেকেরই শরণার্থী শিবিরে স্ত্রী ও মা আছেন। এখন তাদের আরো আছে জীবিত বা মৃত আত্মীয় ও সাথীরা যাদের অবস্থান পশ্চিম তীরে। এই পরিস্থিতি সকল শরণার্থী আরবদের সাথে মানিয়ে যায় যারা "অন্যের স্বার্থে ব্যবহৃত", "ফুটবল" বা "সন্ত্রাসী" এসব শব্দগুলো ছাড়া আর কোনো পরিচিতি পায় না।

গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বলা যায়, আর কোনো আরব নগরীই আম্মানের মতো এতটা প্রাণবন্ত নয়। এটা ১৯৪৮ থেকে সবসময়ের জন্য সত্য নয়, কিন্তু বর্তমানে এটাই সত্য। আরব দেশগুলোর প্রকৃতপক্ষে কী করতে হবে তা বিবেচনায় আনলে এ কথা স্পষ্ট হবে। আমি সেসব বিষয়েই সংক্ষেপে আলোকপাত করব। ফিলিস্তিনী আরবদের কাছে জর্ডানের সাথে ইসরায়েলের যে সীমান্ত আছে তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সীমান্ত পার হবার বিষাদময় অভিজ্ঞতা বা এর সাথে ফিলিস্তিনীদের স্থানচ্যুতির স্মৃতি জড়িত থাকায় এই সীমান্ত এতটা গুরুত্ব দাবী করে। একই কারণে আম্মান হয়ে উঠেছে স্থানচ্যুতির পর অস্থায়ী আশ্রয়স্থল যদিও বাহ্যিকভাবে শহরটি একটি মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। আম্মানে ফিলিস্তিনীরা হয় তাদের সাধ্যমতো ভালোভাবে থাকে নয়তো গেরিলা বাহিনীতে গন্তব্য খুঁজে নেয়। ফিলিস্তিনীরা প্রকৃত অর্থেই কুয়েত, বৈরুত বা কায়রো সম্পর্কে আর মোটেই আগ্রহী নয়। তারা শুধুমাত্র নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত—কিভাবে পুনরায় একজন ফিলিস্তিনী হয়ে ওঠা যায় অথবা সবকিছু তার জন্য কী অর্থ দাবী করে—এটাই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ১৯৪৮ থেকে এখানে আবাস গড়তে শুরু-করা ফিলিস্তিনীরা তাদের সাম্প্রতিক থিতু হবার উদাহরণ পর্যন্ত এমনভাবে একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

জনপ্রিয় কোনো আত্মা বা ব্যক্তির বা ধারণার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া আমি অসম্ভব বলেই মনে করি। আমি এখন যা লিখছি তা একধরনের মিথ্যে বিনয় ছাড়া অন্যকিছু নয়, কারণ ফিলিস্তিনীদের চলমান দুর্ভাগ্যকে বুঝতে পারার জন্য যে অবস্থান

প্রয়োজন তা থেকে আমি অনেক দূরে। ফিলিস্তিন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বাস্তবতা নিহিত তা একই সময়ে জটিল ও বিস্মৃতিপ্রবণ। কিন্তু আমাকে অবশ্যই যা বলতে হবে তা হল ফিলিস্তিনীদের নতুন এই রূপান্তরের কথা জানানো ফিলিস্তিনবাদেরই একটি অংশ। যে কেউই বুঝতে পারবেন যে আম্মান কোনো জেরুজালেম নয়। আবার বৈরুত কোনো আম্মান নয় অথবা কায়রোও আম্মানের সমকক্ষতা অর্জন করেনি—আম্মানে সামগ্রিক আরব-সম্পর্কিত যে স্বপ্ন তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে সবাই জানে ফিলিস্তিনী হওয়া মানে জেরুজালেম, গাজা, বেনলুস বা জেরিকোতে সামরিক শাসনের নিচে মাথা পেতে থাকা নয়, বরং আম্মানে থাকাটাই ফিলিস্তিনী হবার অংশ। অতীতের মতো কেউ আর বৈরুত বা যুক্তরাষ্ট্রে যাবার চিন্তায় বিভোর নয়—তারা অতীতের সেসব স্মৃতিকে ভুলে থাকতে চায়। তারা বুঝতে শিখেছে বিদেশে পাড়ি দেবার এই প্রবণতা ইসরায়েলের সাথে তাদের যে সমস্যা তাকে শুধু জিইয়েই রাখে।

জনপ্রিয় প্রতিরোধের কথা ধরলে ১৯৬৭-এর জুন মাসে ফিলিস্তিনীদের সাথে সংঘটিত হওয়া তাদের রাজনৈতিক শত্রু ইসরায়েলের সংঘর্ষের ঘটনাটি আমলে নেয়া যায়। ১৯৬৮-এর মার্চ মাসের কারামেহ যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। যখন দখলকারী ইসরায়েলী বাহিনীর সাথে স্থানীয় একটি বাহিনীর সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তা থেকে সরে আসার কোনো উপায় ছিল না। শেষমেশ তা জুডাইজম ও ফিলিস্তিনবাদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হিসেবে পরিচিতি পায়। এই সংঘর্ষ বিশ্বব্যাপী প্রচার উপযোগী সংবাদ হিসেবেও সমাদৃত হয়।

প্রত্যেক ঘটনাই একটি বিশেষ মর্যাদা পায় তা ঘটে যাবার পর। সব ঘটনাই এক অর্থে পৌরাণিক, সব পুরাণ কাহিনীতেই থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রভাব। কারামে যুদ্ধ ফিলিস্তিনীদের পরিচয় নির্দিষ্টকারী একটি ঘটনা ছিল। তাদের পরিচয় নির্দিষ্ট হয়েছিল মূল ঘটনার আগে ও পরের অন্যসব ঘটনাকে ঘিরে। কারামেহতে যা ঘটেছিল তা পশ্চিম তীরের আল-সাম্মু গ্রামের মতো নয়। ইসরায়েলীরা প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেছিল নির্মমভাবে। যুদ্ধটা ছিল একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত বাহিনীর সাথে একটা অনিয়মিত বাহিনীর। পরবর্তীতে এই যুদ্ধের প্রতিউত্তরে পুরো কারামেহ গ্রামটিকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। এভাবেই এই যুদ্ধ ফিলিস্তিনী অভিজ্ঞতাকে পূর্ব ও পরবর্তী দুটি ভাগে বিভক্ত করে। ইতিহাসে ১৯৪৮ পরবর্তী ঘটনাবলী প্রত্যেক ফিলিস্তিনীর মনে শূন্যতা ও স্থিরতার একটি নাটকীয় ধারণার জন্ম দেয়। এই শূন্যতা ও স্থিরতার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আর অন্যটি বিচ্ছিন্নতা যা পুনঃসংযোগের দাবী রাখে।

ফিলিস্তিনীদের তাদের ভূমির সাথে পুনরায় সংযুক্ত হবার যে বাসনা তার বিরুদ্ধে যেসব শক্তি নিয়োজিত সেসব অবশ্যই মারাত্মক। এ-সংক্রান্ত যুদ্ধ মাত্র শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসরায়েল যে সমস্ত কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে তা সবই ফিলিস্তিনী জনগণের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। এসব কর্মপ্রণালী হার্জেল (Herzl) এর সময় জুডাইজমের যে লক্ষ্য ছিল তখন থেকেই সক্রিয়। এ-সংক্রান্ত মনোভাব পশ্চিম তীরে অবস্থানরত আরবদের মধ্যেই তীব্র কারণ তাদের অন্তত অধিবাসী হিসেবে

স্বীকৃতিটুকু আছে। এর বাইরে আরবদের প্রতিনিয়ত তাদের অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতার সাথে লড়তে হয় যা গত একুশ বছর ধরে চলে আসছে। এটাই সত্য যে ফিলিস্তিনীরা তাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কাছ থেকে ভোগান্তি, মৃত্যু, নির্বাসন ইত্যাদির যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা অনেকটাই স্থায়ী রূপ পেয়ে গেছে। ফিলিস্তিনীদের শত্রুরা অবিসংবাদিতভাবেই তাদের রাজনৈতিক শত্রু। কিন্তু সমস্যা প্রকট হয় তখনই যখন ইহুদিদের ভোগান্তি ও ফিলিস্তিনী আরবদের ভোগান্তিকে এক করে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ সমস্যাটিকে যখন কূটনৈতিক পর্যায়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয় তখন সবসময় বলা হয় যে এটি ইহুদি ও আরবদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা। ইহুদি ও তার সমর্থকেরা শান্তিপ্রিয় ও তাদের জমি ফেরত পেতে চায়, অন্যদিকে আরবরা তা হতে দেবে না। ইসরায়েলীদেরকে দেখানো হয় আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল রেখে-চলা এক শক্তি হিসেবে যা বর্তমানে ইসরায়েল নামক রাষ্ট্রের আসল আয়তন ছাড়িয়ে তিনগুণ স্ফীত হয়েছে। অপরদিকে আরবদেরকে পাশ্চাত্যের প্রতি সেমিটিয়বিরোধী আচরণের জন্য দায়ী করা হয় তাদের অনিঃশেষ ভোগান্তি সত্ত্বেও। এটাই প্রকারান্তরে বলার চেষ্টা করা হয় যে আরবদের অস্তিত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে তবে তা ইসরায়েলের অধীনতাকে স্বীকার করে।

ফিলিস্তিনীদের কাছে এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির সাথে শান্তির কোনো সম্পর্ক নেই। যদি তারা কোনোসময় শান্তি চায় তবে অবশ্যই একধরনের বিরতি যা ইসরায়েলের অর্থনীতিকে সচল রাখতে জরুরি। বেশিরভাগ ফিলিস্তিনী অন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর বৃহৎ পরিসরে বিক্রি-বাট্টাকে ভয় পায়। এই আতংকই ফেদাইন ও আরব সরকারগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার কারণ। একে অপরের মুনাফার ব্যাপারে ঘোরতর সন্দিহান। আরব সংগঠনগুলোর একের পর এক স্থানীয় দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপও আরেকটি ভয়ের কারণ। আসলে বৃহত্তর ফিলিস্তিন কিছুটা বাড়তি মনোযোগ ছাড়া অন্য কিছু দাবী করে না। ফিলিস্তিনীদের পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে অর্জন করার মতো কিছু নেই। এর প্রমাণ ভিয়েতনামী কৃষক, কালো আমেরিকান অথবা লাতিন আমেরিকার শ্রমিকদের প্রতি তাদের অন্তহীন সহানুভূতির মধ্যেই বিদ্যমান। একজন আরবের কিছু পাওয়ার নেই কারণ সে একজন ইহুদির বিপরীতে দাঁড়িয়ে। একই সঙ্গে আমেরিকায় বসবাস করা ও এই সত্যকে জানা একটি বেদনাদায়ক ব্যাপার। এখানে ইতিহাসের সব নোংরা অধ্যায়ের সমর্থনে আরবদের উদাহরণ টানা হয়। এমনকি "আরব" শব্দটিকেও খুব সহজে একটি অপমান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সবশেষে ইউরোপীয় ইহুদিদের আমেরিকায় প্রবেশে সেদেশের অনাগ্রহ, লর্ড ময়েনের হত্যা, ব্রিটিশদের শোচনীয় ভূমিকা, লেভন সমস্যা, রবার্ট কেনেডির হত্যাকাণ্ড, স্টার্ন বাহিনীর হাতে বার্নাডোটের নিহত হওয়া—সব নিয়ে পুরো ব্যাপারটাই ভীষণ গোলমেলে যার কমেন্টারি পত্রিকার পাতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

এখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে আমি নিচে দেওয়া কিছু ভাবনা উপস্থাপন করার প্রয়াস নিতে পারি। ১৯৪৮ সালে আমি ছিলাম বার বছর বয়সী কায়রোর এক ইংরেজি স্কুলের ছাত্র। আমার একেবারে নিকটাত্মীয়রা ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী। এক বা তারও অধিক বিভিন্ন কারণে তাদেরকে জর্ডানে পুনরায় আবাস গাড়তে হয়। কেউ চলে যান মিশর বা লেবাননে আর অল্প কিছু আত্মীয়-স্বজন থেকে যান ইসরায়েলে। তখন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি ছিল একজন ইহুদি বালক যার একটি স্পেনিশ পাসপোর্ট ছিল। আমার এখনো মনে পড়ে সে একদিন বলেছিল, শরৎকাল কতটা লজ্জাহীন হয়ে গেছে যে ছয়টি দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছে। আমার বিশ্বাস ছিল তার ইঙ্গিতটা ছিল আমার খেলাধুলার প্রতি অতি আগ্রহের দিকে। আমার খারাপ লাগা সত্ত্বেও তখন কিছু বলিনি। একই রকম পরিস্থিতিতে অনেক বছর পর আমি আবারো কিছু বললাম না। আমি জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছি, একইভাবে আমার বাবা, তার বাবা এবং তারও বাবা। আমার মা যে নাজারেথ শহরে জন্মগ্রহণকারী তা কালেভদ্রে উল্লেখ করা হয়। ডিগ্রি অর্জনের পর এখন আমি একজন অধ্যাপক। ইউরোপীয় সাহিত্য নিয়ে আমার লেখা বই আছে। নিকট-প্রাচ্যের রাজনীতি সরগরম হতে শুরু করাতে আমি প্রায়ই আমার পরিবারকে কখনো মিশর, কখনোবা জর্ডান ও শেষমেশ লেবাননে ছুটি কাটাতে দেখেছি। ১৯৬৭-তে আমি লেবাননেই ছিলাম।

জুন মাসের সেই ভয়ংকর সপ্তাহ আমার জন্য শুভ কিছু বয়ে আনেনি। আমি ছিলাম একজন "আরব" এবং আমার বেশিরভাগ বন্ধুরাই চাবকানোর হাত থেকে রেহাই পায়নি। আমি একটি বা দুটি চিঠি টাইম্‌স্ পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সেগুলো ছাপা হয়নি। তারপর আমি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের সংবাদ সংরক্ষণ করতে শুরু করলাম। তার দেড় বছর ঐসব সংরক্ষিত সংবাদ থেকে তথ্য নিয়ে আমি "অংকিত আরব" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখি যেখানে আমি শোকানুভূতির সাথে দেখিয়েছি ইসরায়েলীদের তুলনায় আরবদের অবস্থা, যা আমেরিকায় প্রচলিত। অশ্লীল অধঃপতন নামে যে যুদ্ধকে আমি অভিহিত করি তা আমেরিকানদের আরববিরোধিতা ছাড়া কিছুই নয়। কোনো কিছু সম্পূর্ণরূপে বুঝে ওঠার আগেই আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল অতি ঘনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের ধারণাটা ইসরায়েলী ও আরবদের মধ্যে সমানভাবে অজানা ছিল। ১৯৬৭-এর জুনে আরবদের আসল পরিচয়টাই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। এরপর অবশ্য আমি আমার কাজে ও আরবরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরব কর্ম বলতে আমি বুঝি জুনের সেই যুদ্ধের পর আরব দেশসমূহ তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে যা যা করেছিল সেসব কর্মকাণ্ডকে। নিকট অতীতে তারা যা করেছে তা খারাপ নয় বরং প্রয়োজনীয় ছিল। আরবদের স্বাধীনতার ব্যাপারটি অতীতের মতো বর্তমানেও পশ্চিমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। আমি কোনো রাজনৈতিক বিজ্ঞানী বা সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ নই, তবুও আমি আমার ইন্দ্রিয়প্রসূত জ্ঞান দ্বারা যা বুঝি তা হল আরব স্বাধীনতা সেই অর্থে অর্জিত হয়নি, যা কিছুটা অনুমোদন পেয়েছে তা সবই ঔপনিবেশিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে। একটি বিখ্যাত ঘটনাকে সামনে আনলেই সবাই তা বুঝতে পারবেন। দি সেভেন পিলারস্ অব উইজডম (The Seven pillers of Wisdom)-এ ধীরে ধীরে এটাই প্রকাশিত হয় যে লরেন্সের বিজয়োল্লাস আরবদের বিবর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে মধ্যযুগীয় রোমান্টিক স্বপ্নে পর্যবসিত হয়। যদি লরেন্স

এবং আরবরা উভয়েই স্বপ্নের ছলনা থেকে জেগে উঠত, তবুও স্বপ্নের পারিপার্শ্বিকতা থেকে মুক্ত হতে আরবদেরই অধিক সময় লাগত। এজন্যই স্বাধীন জাতীয়তাবাদের ধারণাকে উপস্থাপন করা হল, তা করা হল খণ্ডিতভাবে। স্বাধীন জাতীয়তাবাদের ধারণাটা ছিল কর্তৃত্বময়, লক্ষ্যহীন, স্বেচ্ছাশ্রমের, তুলনামূলক যৌক্তিক—কিন্তু একেবারেই সহজলভ্য। এই পরিবর্তিত প্রক্রিয়া প্রকৃত অর্থে ব্যয়বহুল ছিল, কারণ আরব স্বাধীনতার অপর্যাপ্ততা তখন উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিয়েছে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটাই ছিল আরব জাতীয়তাবাদের পরিচয়কে বিনির্মাণ করা, বিনিময়ে প্রকৃত স্বাধীনতা কেড়ে নেবার পন্থা। আজ বেশিরভাগ আরব দেশসমূহে পরিবর্তিত প্রক্রিয়াটি একটি বামপন্থী ধারা লাভ করেছে, কিন্তু সর্বৈব সত্য না হলেও এতটুকু বলা যায় যে, এসব দেশের সনাতন শ্রেণীবিন্যাসকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

দিপলিটিক্স অব ডিসপোজেশন থেকে
ভাষান্তর : তানজীম আল বায়েজীদ

সাক্ষাতকার

এডওয়ার্ড সাঈদের সাথে মোস্তফা বেওয়ামির কথোপকথন

◆ *একদা আপনি লিখেছিলেন যে, 'পদ্ধতিগতভাবে কোনোকিছুর শুরু তত্ত্বের সাথে প্রায়োগিক চাহিদা, পদ্ধতির সাথে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়কে একত্রে মেলায়।' আপনার স্মৃতিকথা Out of Place–এ আপনি মিশর, ফিলিস্তিন, লেবানন ও আমেরিকাতে কাটানো আপনার যৌবনের দিনগুলোর অনেক 'আত্মনিষ্ঠ বিষয়' অব্যক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখেছেন। আপনি মূলত ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ-পরবর্তী আপনার যে জীবন তার ওপর আলোকপাত করেছেন। এই ধরনের সূচনার পিছনে আপনার অভিপ্রায় কী?*

শরীরের রোগনির্ণয় করে যখন অদ্ভুত কোনোকিছু সনাক্ত করা হয় তখন আপনার অনুভূতি কেমন দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। যেমন, ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে আমি এইরকম একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তখন আমাকে বলা হলো যে, আমার খুবই অস্পষ্ট একটা রোগ ধরা পড়েছে, যদিও লিউকোমিয়ার ক্ষেত্রে এরকম হয়েই থাকে। যেহেতু আমার মাঝে রোগের কোনো লক্ষণই পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই আমাকে বলা হলো যে, আমার মাথার ওপর সারাক্ষণই ডেমোক্লিসের খড়গ ঝুলছে, যে কোনো সময় তা নেমে আসতে পারে এবং আমি মারা যেতে পারি।

আমি মনে করি না সজ্ঞানে আমি কখনো মৃত্যুকে ভয় পেয়েছি। তবে আমি দ্রুতই সময় ফুরিয়ে আসার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। প্রথমেই মনে হলো, নিউইয়র্ক থেকে আমার নির্জন কোনো স্থানে চলে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু ভাবনাটা খুব বেশি সময় দাঁড়াল না। তারপর হঠাৎ করেই আমার শৈশবের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে লেখার চিন্তাটা মাথায় এলো, বিশেষ করে যে ঘটনাগুলো মায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সম্ভবত মায়ের মৃত্যুর কারণেই ভাবনাটা আমার মনে এসেছিল, তিনি ১৯৯০ সালে মারা যান। এর আড়াই বছর পর ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আমি আমার স্মৃতিকথা লেখার কাজ শুরু করি।

চিকিৎসাকালীন সময়ে স্মৃতিকথা লেখাটা আমার জন্য একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল বেলাটা লেখার কাজে ব্যয় করতাম এবং আমার যে জগৎ প্রতিদিন একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছিল তাকে আবার নির্মাণ করার জন্য স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করলাম। বইটাকে দাঁড় করাতে আমি সেইসব স্থানের ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম; মিশর, ফিলিস্তিন ও লেবানন, যে দেশগুলো আমার জীবদ্দশায়ই আমূল পালটে গেছে। এইসময় ওই দেশগুলো আমি আবার ভ্রমণ

করলাম। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর ১৯৯২ সালে আমি প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিন গেলাম, ওই একই বছর লেবাননেও যাই, ১৯৮২ সালে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর প্রথম।

◆ *জাতীয় ক্ষতির এই বিষয়মুখ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সাড়া দেওয়ার বিপরীতে মনের মাঝে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়াটা আপনার জন্য কী অর্থ বহন করে?*

মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে লেখালেখির সময় পছন্দ বা অপছন্দে যেভাবেই হোক না কেনো আমার ওপর চেপেবসা দায়দায়িত্বগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছি *Out of Place* লেখার মধ্য দিয়ে। সবসময় একটা না একটা রাজনৈতিক প্রশ্নে আমাকে প্রতিক্রিয়া জানাতেই হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে আমার সমস্ত ব্যস্ততার ভিত্তিই রাজনীতি। এছাড়া অন্য বেশিকিছু করার সময় আমি পাইনি।

বিশেষ এক যন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে *Out of Place* রচিত। একটা দীর্ঘসময় ধরে আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন কয়েকটা চরণ লেখার পর উঠে হয় ওষুধ খেতে হতো নয়তো বিশ্রাম নিতে হতো। আমার জন্য *Out of Place* লেখাটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি অভিজ্ঞতা। আমি বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে বইটা লিখিনি যদিও আমার সন্তানদের প্রজন্মকে সম্বোধনের চিন্তাটা মাথায় ছিল, তবে ওরা কেউ আমার পিতাকে চিনত না। এই স্মৃতিকথাটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে আমার শৈশব চেনানো এবং যেসব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আমার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল তা লিপিবদ্ধ করা আর আমার মায়ের খালা ও আমার ফুফু যাদের নিয়ে লিখেছি তাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ওইরকম ছিল। আমি যখন তরুণ তখন তারা দুজনই আমার ও আমাদের সম্প্রদায়ের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ভার্জিলীয় বেদনার এক অনুভূতি অনেক বস্তুতে প্রাণ দান করেছে যেগুলো এখন আর নাই। *Out of Place* এক অর্থে প্রুস্তীয় বিবেচনা।

◆ *এটাকে আপনি কীভাবে আপনার আরেকটি দীর্ঘ আত্মজৈবনিক রচনা After the Last Sky-এর সাথে তুলনা করবেন?*

After the Last Sky লেখা হয়েছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া জানাতে। ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘের জেনেভাস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভার ঘটনাসূত্রে বইটি লিখেছিলাম। ওখানে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনিদের ছবির নিচে কোনোপ্রকার শিরোনাম লেখার অনুমতি দেয়নি। প্রায় একইসময় আমার সাথে আলোকচিত্রী জাঁ মোহর এবং লেখক জন বার্জারের সাক্ষাৎ হয় যাদের উদ্যোগ—*Another Way of Telling* এবং *Seventh Man* দারুণভাবে আলোড়িত করে। এটা ছিল একটি রাজনৈতিক ঘটনা যা ফিলিস্তিনিদের জীবন ও অভিজ্ঞতা পুনর্নির্মাণের একটি উদ্যোগ। অপরদিকে ভাটির টান ধরা আমার জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

◆ *Out of Place শুরু হয়েছে পরিবার ও সত্তা আবিষ্কারের ধারণা দিয়ে যা আপনার প্রথম বই Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography —এর অনুরণন। আপনার লেখনীতে ফুকো বা ফ্রাঞ্জ ফ্যানো অপেক্ষা কনরাড এতটা মূল অবস্থানে রয়েছেন কেনো?*

প্রিন্সটনে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন, যখন আমার বয়স সতেরো কী আঠারো তখন প্রথম আমি কনরাড পড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের ছাত্র, *Heart of Darkness* পড়লাম, বইটা আমাকে রীতিমতো হতবিহ্বল করে ফেলল। এইরকম লেখনীর সাথে আমার আগে কখনো পরিচয় ছিল না। শৈশবে আমি অনেক পড়েছি–ওয়াল্টার স্কট, কোনান ডয়েল, আলেক্সান্ডার দুমাস, ডিকেন্স, থ্যাকারে–আর তাতে আমার পড়াশুনোর একটা দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হলো যার মাঝে শুধুমাত্র অভিযান কাহিনী ছিল তা নয়, বরং তা ছিল উন্মুক্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার–যার মাঝে সবকিছুই সহজলভ্য ছিল। *Heart of Darkness*–এ অভিযান কাহিনীর ফর্ম আছে, কিন্তু যতই আমি এর গভীরে প্রবেশ করতে লাগলাম ততই সেই কাহিনী উধাও হয়ে যেতে লাগল। মনে পড়ে ডরমিটরিতে বন্ধুদের সাথে আলোচনার সময় কুর্টজ কে, *The horror* কী ইত্যাদির অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলাম। কিছুকাল পরে স্নাতকবর্ষে প্রবেশের আগে আমি কনরাড সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনো শুরু করলাম, যতই পড়ি ততই তার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি, হার্ভাডে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন কানিংহাম গ্রাহামকে লেখা তার একগুচ্ছ পত্রাবলী পড়বার সুযোগ হলো, আমি অবাক হলাম তার চিঠি ও তার উপন্যাসের মধ্যে একটা যোগাযোগ পরম্পরা রয়েছে– তার চিঠিপত্রের অনেক ঘটনা অন্যভাবে তার উপন্যাসে এসেছে।

কনরাড বারংবার নানাভাবে আমার লেখায় চলে আসেন। আমার ধারণা তার নির্বাসন, লেখনীর চড়াস্বর, বাচনভঙ্গি, বিচ্যুতি, ভাষার ভিতর-বাহির করা, তার সংশয়, চরম অনিশ্চয়তাবোধ অর্থাৎ সবসময় মারাত্মক কোনোকিছু ঘটে চলেছে এমন ভাবনা, যা নিয়ে ফস্টার মজা করেছেন–একটা ভয়ঙ্কর সংকট সৃষ্টি হবে কিন্তু বলতে পারছেন না কী সেটা–এই সবকিছুর জন্য অন্য যে কোনো লেখক অপেক্ষা ফর্স্টার আমাকে বেশি করে আকর্ষণ করেছে।

◆ *কিভাবে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপঠিত গিয়ামবাতিস্তা ভিকো আপনার লেখনীতে এতো উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত?*

প্রিন্সটন ও হার্ভাডে আমার সহপাঠী আর্থার গোল্ডের মাধ্যমে হঠাৎ করেই ভিকোকে আবিষ্কার করি আমি। ভিকোর যে বিষয়টি আমাকে আগ্রহী করে তোলে তা হলো, তিনি স্ব-নির্মিত এবং স্ব-শিক্ষিত একজন লেখক। ভিকো এমন একজন লেখকের প্রতিকৃতি যে আপন চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতা দ্বারা সফল হয়েছে। তার লেখনীর মাঝে বন্য ও উদ্ভট সব চিত্রকল্প রয়েছে–দানব, নরনারীর সঙ্গম, বজ্রপাত ও অন্যান্য বিক্ষুব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার ক্ষেত্রে চিত্রকল্পরাশি ব্যাখ্যাতীতভাবে ইতিহাস রচনার সাথে সম্পৃক্ত, তার সাথে আরো যুক্ত হয় চিত্রকল্প ও শব্দের যোগসূত্র, প্রথমত কিভাবে শব্দ ধ্বন্যাত্মক-ভীতি ও বিহ্বল আবেগের আদি অনুকৃতি। ভিকো পুরোপুরি কার্তেসীয় শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের নমুনা পালটে দিয়েছিলেন।

ভিকোর যে বিষয়টি আমাকে আরো টেনেছিল তা হলো তার ভাষাতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ এবং তার আপেক্ষিক অস্পষ্টতা। তিনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক, ১৮ শতকের শুরুতে নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন তিনি।

তার সম্পর্কে যতই পড়েছি ততই আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি আমাকে এরিখ অরবাখের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, কারণ অরবাখ জার্মান ভাষায় ভিকো অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়া ভিকোর একান্ত কিছু বিষয় ছিল যেমন ছিল কনরাডের, যেহেতু দুজনের কেউই পুরোপুরি প্রকাশিত হননি। আমি এই বিষয়টার গুরুত্ব দিয়েছি এবং আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু করতে চেষ্টা করেছি শিক্ষায়তনিক কার্যক্রমের বাইরে যা করছিলাম তাকে সুযুক্তিপূর্ণ করার অংশ হিসাবে। শেষমেষ কনরাডের সাথে সাথে দেখলাম, ভিকোর *The New Science*–এর কাঠামো পুরোপুরি মৌলিক, প্রায় শৈল্পিক। ভিকো *Beginnings* –এর মহাতাত্ত্বিক।

◆ *এভাবেই কি আপনি Beginnings নিয়ে লিখতে উদ্বুদ্ধ হলেন?*

Beginnings আসলে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের ফসল। এইসময় গ্রীষ্মে আমি কলাম্বিয়ায় ছিলাম, ইলিনয়স বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে একটা ফেলোশিপ দেওয়া হলো, সেখানে আমি ১৯৬৭-১৯৬৮ এই দুইবছর সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে কাটাই।

তখন আমি জুরি হিসাবে কাজ করছিলাম। যুদ্ধ শুরু হলো জুনের ৫ তারিখ, সেদিন ছিল জুরির সদস্য হিসাবে আমার প্রথম দিন। একটি ছোট্ট রেডিওতে আমি যুদ্ধের খবরাখবর শুনতাম। 'আমরা কেমন করছি?' জুরির সদস্যরা জানতে চাইতেন। দেখলাম আমি কোনোকিছু বলতে পারছিলাম না– অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেখানে আমিই একমাত্র আরব ছিলাম আর প্রত্যেকেই ইসরায়েলিদের সাথে ভীষণভাবে একাত্মবোধ করছিল। নিউইয়র্কে কাটানো সেই গ্রীষ্মে আমি জাতিসংঘের সভার কারণে আরবের রাজনৈতিক জগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লাম। আমি রাজনৈতিকদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলাম এবং দীর্ঘ ১৬ বছর এই দেশে বসবাস করার পর আমি হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম, আমি সরাসরি মধ্যপ্রাচ্য ও আরববিশ্বের সংস্পর্শে ফিরে গেছি।

ইলিনয়সে আমার প্রকল্প ছিল সুইফটের ওপর একটা বই লেখা। কিন্তু যখন আমি ইলিনয়সে পৌঁছালাম যুদ্ধের কারণে এক সংকটময় অবস্থার মধ্যে নিজেক আবিষ্কার করলাম, মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং পৃথিবীর একটা অংশ যা এখন আমাকে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে সে ব্যাপারে ধীরে ধীরে সতর্ক হয়ে উঠলাম। তাছাড়া আমার বিয়েটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। একদিন দেখলাম আমি *Beginnings* নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি। আমি *Meditation on Beginnings* শিরোনামে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলাম যা আসলে আমার পূর্বেকার আবাসস্থলকে পুনরায় সূত্রবদ্ধ করার একটা প্রচেষ্টা ছিল। সেন্টার অব অ্যাডভান্সড স্টাডির সেই ঘরটার কথা মনে পড়ে যেখানে সারি সারি তাকের ওপর জোনাথন সুইফটের নিজের ও তাঁর সম্পর্কে লেখা বই সাজানো, কিন্তু *Beginnings* -এর চিন্তাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। পরের বছর স্ত্রীর সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এবং আখ্যানের সাথে সূচনার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম, যা আমাকে ভিকোর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। *Beginnings* আসলে একটি সংকটের প্রতিক্রিয়াজাত প্রকল্প ছিল যা আমি কী করছিলাম তা নিয়ে পুনরায় ভাবতে বাধ্য

করেছিল এবং আমার জীবনে দমিয়ে রাখা, অস্বীকার করা বা লুকিয়ে রাখা বস্তুনিচয়ের মাঝে বেশি করে সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে জোর দিয়েছিল।

◆ *একটি সাংস্কৃতিক আদর্শের মাঝ দিয়ে এই অস্বীকৃতি বা নিগ্রহের থিমটিই Orientalism বয়ান করছে। এটা দারুণ প্রভাববিস্তারী একটা বই, অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে, কিন্তু আপনি উত্তরকথনে লিখেছেন যে, বোর্হেসীয় সূত্র ধরে এটা একের অধিক গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে, বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কী কারণে বইটর এত ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়া ও ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে বলে আপনার ধারণা?*

প্রতিটি প্রসঙ্গসূত্র আলাদা পাঠক ও আলাদা অপব্যাখ্যার জন্ম দেয়। *Orientalism* –এ আমি একটি ধারণা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তা হলো, ব্যাখ্যা হচ্ছে এক ধরনের অপব্যাখ্যা। সঠিক ব্যাখ্যা বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নাই। যেমন– সম্প্রতি আমি *Orientalism* –এর বুলগেরীয় সংস্করণের প্রকাশকের কাছ থেকে বইটির মুখবন্ধ লিখে দেওয়ার অনুরোধ সম্বলিত একটি পত্র পেয়েছি। ভেবে পেলাম না কী করব। *Orientalism* হাঙ্গেরি, ভিয়েৎনাম, এস্তোনিয়ায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এইসব স্থানে আমি কখনো যাইনি এবং এ সম্পর্কে আমি খুব কমই জানি। সুতরাং ভেবে দেখুন এই সমস্ত ব্যাখ্যা কতটা নিয়ন্ত্রিতহীন হতে পারে এবং আমার ধারণা, এক ধরনের বিকৃতি ও বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

আপনি বাগে রাখতে পারেন শুধুমাত্র আপনার নিজস্ব ধারণা। যদি এই বিষয়কে আপনার অনুগামী শিষ্যদের মাধ্যমে কিংবা পুনলিখন এবং বক্তৃতার ভিতর দিয়ে পুনরাবৃত্তি, সরলীকরণ, সহজীকরণ কিংবা সহজবোধ্য করে ফেলেন তাহলে আপনি এক ধরনের বোর্হেসীয় ফাঁদ পাততে যাচ্ছেন যার কথা আপনি একটু আগে উল্লেখ করলেন। ওটা না করার ব্যাপারে আমি খুবই সচেতন। আমি সবসময়ই আমার ধারণাগুলোকে আরো উন্নত করতে চাই, কিন্তু বলা চলে, উলটে এক অর্থে তাকে আরো বেশি জটিল ও দুর্বোধ্য করে ফেলি। যেমন– একসময় খেয়াল করলাম যে, আমি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কিছু বিচ্যুতি ও অসামঞ্জস্যের বিষয়ে বেশিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠেছি, আর তা *Orientalism*mn। সেখানে কিছু দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গতি রয়েছে যাকে আমি বলি স্ববিরোধী *(Antinomy)* যার মীমাংসা সম্ভব নয় এবং সেগুলোর বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গভীর অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার বক্তব্য হলো, সেগুলো ওখানে রয়েছে, সেগুলো হারিয়ে যাক তা চাইনা, আবার থিওডোর অ্যাডোর্নোর বক্তব্য অনুযায়ী, জবরদস্তি করে তার মাঝে সমন্বয় সাধন করারও প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করা এবং প্রভাবকে আরো গভীর ও অনুভবক্ষম করে তোলা, যার জন্য প্রয়োজন আরো কাজ এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ধারণা।

◆ *একেবারেই সামঞ্জস্যহীন স্ববিরোধিতার ধারণা বেসুরো সঙ্গীতের মতো শোনায়। জেন অস্টিনের Mansfield Park নিয়ে লিখিত নিবন্ধে টমাস বার্ট্রাম কর্তৃক ক্রীতদাস আটকে অ্যান্টিগুয়ায় আখচাষের ব্যাপারে অস্টিনের নীরব থাকা প্রসঙ্গে আপনি আলোচনা করেছেন। সবাক ও মৌন উপস্থিতি আপনার সাহিত্য সমালোচনায় খুবই*

গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে আপনার দক্ষতা আপনার সাহিত্যের পঠন-পাঠনে কতখানি কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন?

খুবই চমৎকার প্রশ্ন। আর পি ব্লাকমারের কাছ থেকে যে ধারণাটি আমি ধার করেছি, সাহিত্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপনের ধারণা, তা অবশ্যই সঙ্গীতের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। ধারণাটা হলো, শিল্পকর্ম প্রকাশধর্মিতা, সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার ওপর একধরনের দণ্ডারোপ করে থাকে। লেখনী ও উপস্থাপনার সাথে যে বিষয়গুলো আমরা সম্পৃক্ত করি তার সাথে একটি প্রতর্ক জড়িয়ে আছে, যাকে শুধুমাত্র উন্মুক্ত করার পরই উপস্থাপন করা উচিৎ।

কিন্তু একইসাথে আমার আগ্রহ কী বাদ পড়ছে তা নিয়েও। সেইজন্য আমার কৌতূহল *Ode on a Grecian Urn*–এর মানবমূর্তির ব্যাপারে, সেইসব 'মৌন' প্রতিরূপগুলো যারা 'চিন্তার মাঝে আমাদের ঠাট্টা করে' *(dost tease us out of thought)*। সেই কারণে আমার আগ্রহ পল্লীগৃহের কবিতা *(Country House Poetry)* নিয়ে রেমন্ড উইলিয়ামস–এর আলোচনার প্রতি, যেখানে গ্রামের বাড়ির উপস্থাপনা সঙ্গত কারণেই কৃষকদের মৌনতাকে অগ্রাহ্য করেছে, যে কৃষকদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সাফসুতরো করে চমৎকার মসৃণ জায়গায় রূপান্তর করা হয়েছে, জেন অস্টিন তার উপন্যাসে সেটাকেই অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন, তিনি দেখাচ্ছেন জীবিকা এখানে সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। আমার আগ্রহ যা দেখানো হলো আর যা বাদ পড়ল, যা চাপা পড়ে গেল আর যা প্রকাশ পেল তার মধ্যে একধরনের স্নায়ুবিক চাপের ব্যাপারে। আমার জন্য প্রামাণ্য দলিল নিয়ে প্রশ্ন তোলার একটা বিশেষ পটভূমি রয়েছে। এইসব দলিল-দস্তাবেজে কী আছে আর কী নেই। সেই কারণে আমি নিম্নবর্গের ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠি প্রান্তিক কণ্ঠস্বর সম্পর্কে কথা বলার জন্য। বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হলো, আমাদের বেলায় কী ঘটেছে সেই বিষয়গুলো প্রমাণ করার জন্য কোনো সাক্ষী-সাবুত নাই। ইসরায়েলি নয়া ইতিহাসবিদ বেনি মরিসের কথাই ধরা যাক। তিনি খুবই আক্ষরিক একজন মানুষ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, কিন্তু তার একটা পূর্বানুমান হলো, ১৯৪৭-৪৮ সালে কী ঘটেছিল সেই সম্পর্কিত কোনো তথ্যপ্রমাণ দেখাতে না পারলে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। আমার কথা হলো, বেশতো, চাপা পড়ে যাওয়া এইসব বিষয়কে জাগিয়ে তোলেন না কেন? কেনো মাহমুদ তাহার কবিতা পড়েন না, যিনি আল-নাকবা নিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে লিখেছেন? কেনো মৌখিক ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরান না? ভৌগোলিক তথ্যপ্রমাণের দিকে তাকান না কেনো? কোনো খেয়াল করেন না ভৌগোলিক সীমানার দিকে? ধ্বংস বা বাতিল বলে গণ্য হওয়া নির্জনতার মাঝ থেকে পুনঃনির্মাণের পদ্ধতি অনুসরণ করেন না?

হেগেলীয় মাত্রার বিপরীতে আমার অনেক কাজেরই এই দৃঢ় ভৌগোলিক মাত্রা রয়েছে। জর্জ লুকাস ও আন্তোনিও গ্রামসি এখানে আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লুকাসের প্রতিতুলনায় গ্রামসি সময় সম্পর্কে বেশিমাত্রায় উদ্বিগ্ন। শিল্পের ক্ষেত্রে একটি ভূখণ্ড সম্পর্কিত, ভৌগোলিক ও বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে যা সবসময় দালিলিক

প্রমাণে উল্লেখ থাকে না। গ্রামসির ক্ষেত্রে ভূখণ্ড-বৈশিষ্ট্য নানাভাবে প্রকাশিত হয় : নির্যাতিতের সাক্ষ্য, উদ্বাস্তু, যারা এখনো তাদের ঘরের চাবি বয়ে বেড়াচ্ছে যে ঘর থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে। মৌনতা এবং ভূখণ্ডগত বৈশিষ্ট্য আমার লেখনীতে, যা আগে লিখেছি বা এখন লিখছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

◆ *এই উদ্বেগ কি মৌনতা ও ধ্বনি'র সাথে যে ধরনের সঙ্গীত আপনাকে টানে তাতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সঙ্গীত ও শ্রুতিমধুর সুরের মিশ্রণপ্রণালী (Contrapuntal)–এর মধ্যে সম্পর্ক কী, Contrapuntal ধারণাটি সঙ্গীত থেকে ধার করা হয়েছে এবং Culture and Imperialism গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ঐ একই গ্রন্থে আপনি অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে উন্নত ও তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যপাঠের ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাই না?*

একটা বিষয়, যা নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে– এবং যার প্রতি আমিও সাড়া দিয়েছি– তা হলো, আমি বিশেষ ধরনের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ব্যাপারে আগ্রহী। কেনো একক কণ্ঠ ও মিষ্টিসুরের ওপর গুরুত্ব প্রদানকারী বেলিনি, দোনিজেতি কিংবা ভার্দির সঙ্গীত অপেক্ষা বাখ কিংবা ওয়াগনারের সঙ্গীত আমাকে বেশি করে টানে? সোজাসাপটা কারণ হলো, আমি একক কণ্ঠের গানের ব্যাপারে আগ্রহী নই। সমবেত কণ্ঠের গান আমাকে টানে বেশি। একাধিক কণ্ঠের সংমিশ্রণ আমাকে টানে, যেভাবে একটা কণ্ঠ অন্য কণ্ঠের অধীন হয়ে পড়ে। আমি ব্যাখ্যাকারীর বেলায়ও সেই সম্ভাবনার বিষয়ে বেশি করে আগ্রহী, যিনি কণ্ঠকে বের করে নিয়ে আসবেন, যে কণ্ঠ লেখক বা রচয়িতার কাছে অতোটা স্পষ্টত প্রতীয়মান ছিল না। যেমন–উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একটা বাক্যাংশ থেকে কোনো ধরনের ধ্বনির সংমিশ্রণ সৃষ্টি হতে পারে তা অনুমান করার এক অসাধারণ ক্ষমতা বাখের ছিল। বহুস্বরিক সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো কিছু অনুমান করা যায় না। গ্লেন গোল্ডের ক্ষেত্রে কোনো পূর্বানুমান সম্ভব নয়, কোন বিশেষ মুহূর্তে কোন কণ্ঠটা তিনি প্রধান করে তুলতে চান। সমবেত সঙ্গীতে কিছু কিছু কণ্ঠ আছে যেগুলো সবসময়ই বিদ্যমান যদিও সবসময় প্রত্যক্ষ নয়। সেখানে ব্যাখ্যাদানকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈচিত্র্য (Leeway) প্রদান করা হয় একটা কণ্ঠের বিপরীতে আরেকটা কণ্ঠকে প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য, যাতে করে অন্যকণ্ঠগুলো অন্যভাবে বেরিয়ে আসতে পারে কোনো কণ্ঠকে একেবারে মেরে না দিয়ে। ফলে একটা বহুস্তরীয় ধ্বনির ইফেক্ট তৈরি হয়।

◆ *সঙ্গীতের মধ্যে কি এমন কোনোকিছু আছে যা শিল্পী বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একধরনের বিচ্ছিন্নতা লালন করেন?*

অবশ্যই। বেশিরভাগ সঙ্গীতজ্ঞ সুরজগতের মাঝে ডুবে যান। প্রথমত কাজটাতে ভীষণ পদ্ধতিগত দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। ভাষার কারণে এটা সংকেতধর্মী নয় এবং প্রতিদিনকার সাংসারিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত এটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামুখি, বিশেষ করে অনুষ্ঠাতাদের ক্ষেত্রে। তাদের একটা নির্দিষ্ট স্তরের শারীরিক চর্চার প্রয়োজন পড়ে। তবে অনুষ্ঠাতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক অংশটি খুবই গৌণ, কারণ তারা একই সুর বারংবার বাজাতে থাকেন।

কিন্তু আমি সঙ্গীতের সামাজিক অংশটার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। যেমন- প্রসঙ্গসূত্রে অ্যাডোর্নো যে প্রশ্নটা তুলেছিলেন, সঙ্গীতে নৈতিক সমস্যাটা কোথায় যেখানে ক্যাম্প কমান্ডার দিনের বেলায় মানুষ হত্যা করছে আর রাতের বেলায় বাখের সুর বাজাচ্ছে? সাম্প্রতিক কালের খুবই বেদনাদায়ক একটি উদাহরণ রয়েছে যে প্রসঙ্গটি আমি একদা তুলেছিলাম দানিয়েল ব্যারেনবোয়েমের কাছে এবং কয়েকটি প্রতিবেদন দ্বারা বিষয়টা নিশ্চিত করা গেছে। আমার ছেলের এক বন্ধু যে হামাসের সদস্য ছিল, একদিন আমাকে বলল যে, সে বিটোভেনের সুর সহ্য করতে পারে না। আমি জানতে চাইলাম কেনো। সে বলল যে, ইসরায়েলে নির্যাতন জায়েজ এবং সোহাগ করে বলা হয়, 'পরিমিত শারীরিক পীড়ন।' ইসরায়েলিরা রাতের বেলায় তাকে একটি নির্জন সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে যতটা সম্ভব উচ্চস্বরে ধ্রুপদী সঙ্গীত ছেড়ে দিত তার ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগের জন্য। এর মানে কী? যাদের খুব উঁচু সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি রয়েছে, বিশ্বের যে কোনো অর্কেস্ট্রা দলের মতো যাদের বিশাল ধ্রুপদী অর্কেস্ট্রা বিটোভেনের সুর তুলতে সক্ষম–সেই মানুষেরাই ধ্রুপদী সঙ্গীতকে ব্যবহার করছে 'ইনটেরোগেশন সেল'–এ ফিলিস্তিনিদের জেরা করার জন্য, এটা একবারেই অমার্জনীয় অপরাধ।

মঞ্চে সঙ্গীতজ্ঞরা এক চূড়ান্ত অবস্থানে থাকেন যেখানে তাদের পরিবেশনা পরিকল্পিতভাবে ছকে এঁকে নেওয়া হয়। দেখতে গিয়ে আমি নির্দিষ্ট কিছু যোগসূত্র খুঁজতে আগ্রহী হই যা অন্যভাবে দেখা সম্ভব ছিল না। যেমন-সঙ্গীত ও পৃষ্ঠপোষকতা, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্র। এই বিষয়টাই প্রথম আমাকে অ্যাডোর্নোর প্রতি আকর্ষণ করেছিল এবং সবসময় তার প্রতি আমার আগ্রহ ধরে রেখেছে। অ্যাডোর্নোর বেলায়, তার জীবনপ্রক্রমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সঙ্গীত সমাজের সাথে একটি স্থায়ী পরস্পরবিরোধী এবং দ্বান্দ্বিক চাপ তৈরি করেছে। অ্যাডোর্নোর কয়েকজন সমালোচক স্বীকার করেছেন যে, সঙ্গীত তার দর্শন ও সংস্কৃতি অনুধ্যানের সারবস্তু। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র এবং শারীরিক চিত্রকলায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও সঙ্গীতের সাথে তাদের তেমন কোনো যোগসূত্র নাই, কিন্তু আপনি যতই অ্যাডোর্নো পড়বেন, ততই উপলব্ধি করবেন যে, সঙ্গীত সবকিছুর সাথেই, নিজের সাথেও, এমনকি যে গান তার কাছে অধিক গুরুত্ব বহন করা সত্ত্বেও তার ওপর একটা চাপ তৈরি করে। সর্বাপেক্ষা অনমনীয়, অসঙ্গতিপূর্ণ ও খাপছাড়া হিসেবে আর্নল্ড শোয়েমবার্গও প্রয়াত বিটোভেন–এর মতো নির্দিষ্ট কয়েকজনকে আলাদা করে রেখেছেন। এ ধরনের রূঢ়তা, যা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং কোনোপ্রকার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না, অ্যাডোর্নোর সেই বিষয়টাই আমাকে বেশি করে টানে। তথাপি তিনি এই ধরনের বিসঙ্গতিতে কোনো বিয়োগান্ত মাত্রা দেননি, আমার ক্ষেত্রে যা সবসময়ই ঘটেছে।

আমার ক্ষেত্রে বিসঙ্গতির ধারণা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য। আপনি কী বলছেন আর কী করছেন তা কোনো ব্যাপার নয়, আপনি সম্পূর্ণ দুটি বিসদৃশ অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করছেন :

একদল প্রতিজ্ঞা করেছে আরেকদলকে অস্তিত্বহীন করে ছাড়বে, ইসরায়েলিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকমই, আর ফিলিস্তিনিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হলো তারা ভুলতে পারে না, বা ছাড় দিতে পারে না তাদের যা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই কারণেই শান্তির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমার একটি নৈরাশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যখন ঐকমত্যে আসার আলোচনা চলছে তখন আমার কাছে মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বিষয়টি অস্বীকার করা এবং চরম বিরোধিতা করার মতো ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে।

◆ *এবং এই সমঝোতাহীনতা প্রকাশিত হয়েছে অসলো শান্তিচুক্তির অনুমিত পুনঃমিত্রতার মাঝে?*

হ্যাঁ, এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে অস্বীকার করা চলতেই থাকবে। যেহেতু ইসরায়েলিরা অসলো চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তারা মিষ্টিকথার ফুলঝুরি ছড়াতে চেষ্টা চালাবে। ৫ শতাংশের পরিবর্তে তারা তাদের ৪০ শতাংশ জমি দেবে। বেশি জমি দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নাই, কারণ তা তাদের বেশি পৌরসমস্যা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, তাতে ফিলিস্তিনিদের নিরাপত্তা সীমানা এবং প্রকৃত আর্থনীতিক স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে শক্তির ব্যাপক পার্থক্য থাকবে ফিলিস্তিনিরা যন্ত্রণা সইতেই থাকবে, আর তা কতটা তাতে কারো কিছু যায় আসে না।

ইসরায়েলের ভিতর ফিলিস্তিনিদের অবস্থা সবসময়ই অভিশপ্ত। সেখানে সমস্যা হলো, এই ভোটাধিকার বঞ্চিত নাগরিকদের ব্যাপারে কী করবেন। সেখানে চলাফেরায় সমস্যা, অধিকৃত এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমস্যা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, বেকারত্ব এবং উদ্বাস্তু সমস্যা বিদ্যমান। এগুলো অনুল্লেখ থাকবে। বিশ্বব্যাঙ্ক বা দাতাদেশগুলো থেকে কী পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল সেটা কোনো ব্যাপার নয়, অর্থনীতি এখনো সচল হচ্ছে না। আমরা সাড়ে চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন উদ্বাস্তুদের কথা বলছি যাদের ইসরায়েল কোনো অবস্থাতেই ফিরিয়ে নিচ্ছে না। লেবাননের ফিলিস্তিনিরা এখনো ভোটাধিকারবঞ্চিত। চূড়ান্ত পর্যায়ের সমঝোতায় আংশিক ব্যবস্থা হয়ত নেওয়া হবে, এখানে সেখানে কিছু উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হবে। কিন্তু মূল সমস্যাটা—একটি অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ—অনিশ্চিত অবস্থায় রয়ে যাবে।

অপূর্ণ জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বিভিন্ন আরবদেশে সুশীল, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে মিলেমিশে রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় এসবের মাধ্যমে রসদ পাচ্ছে। গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা, যেগুলো মিশরে বিরাট প্রশ্ন, জর্ডান ও মিশরের সংবাদপত্র আইনে আমার মনে হয় একটা পরিবর্তনশীলতা আছে, যা শান্তিপ্রক্রিয়া দূরে ঠেলে রাখছে। এটা গায়ে পড়ে নাক গলানো। এই সমস্যা ফিরে আসবে কারণ ইকবাল আহমেদের ভাষায় 'ক্ষমতার রোগনির্ণয়বিদ্যা' এইসব দেশগুলোতে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পোক্ত হচ্ছে। সেগুলোকে কেউ চ্যালেঞ্জ করছে না।

মিশরের মতো একটি দেশের কথাই বিবেচনা করা যাক, যেখানে সামরিক বাহিনীই একমাত্র নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ। কী ঘটবে যখন সেনাবাহিনীর শোষণক্ষমতার

সমাপ্তি ঘটবে? কতদিন তারা অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করতে থাকবে যেগুলো তারা ব্যবহারই করতে পারেনা? কতোদিন ধরে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার শীর্ষে থাকা ছোট গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনী এই অবস্থা ধরে রাখতে পারবে? কায়রোর মতো শহর যা পূর্বাপেক্ষা আকারে ছয়গুণ বড় হয়েছে, তার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ বেকার, আশ্রয়হীন, মৌলিক চাহিদাবঞ্চিত। এভাবে তারা কতোদিন চলবে? এই সমস্ত বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে চলবে না, অর্থাৎ– ফিলিস্তিনিদের সমস্যা মীমাংসা করতে হবে, করতে হবে সিরিয়ানদের সমস্যা, লেবাননিদের সমস্যা, আর আমরা তা একসপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলব–এমন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, কারণ তার সাথে সবকিছু আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

আরব জাতীয়তাবাদের আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আরব বিশ্ব এখনো নানাদিক দিয়ে একটি সংহত বিশ্ব। তারা ইলেকট্রোনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা, যাতায়াত, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে যাচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থা বেদনাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, নিরক্ষরতা আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে চলেছে। মিশরের মতো দেশে এখন নিরক্ষরতার হার পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। মিশরীয় বিপ্লব থেকে যা অর্জিত হয়েছিল তা থেকে তারা পিছিয়ে পড়েছে অনেক। বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। সর্বোপরি আরববিশ্বের যে প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রধানত তেল, তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সত্তরের দশকের তুলনায় তেলের দাম তিনভাগের একভাগে নেমে এসেছে। আর খরচের ধরন এবং গৃহিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্বোধের মতো এতটা বাজেভাবে সাজানো হয়েছে যে, সৌদিআরবসহ এইসব দেশ ভয়াবহ আর্থিক সমস্যার মাঝে নিপতিত হয়েছে। আমরা এখন এইসব ঝামেলা মোকাবেলা করছি, বিল ক্লিনটন বা পেরেজ প্রতিশ্রুত মিডল ইস্টার্ন কমন মার্কেট গড়ে ওঠেনি। এই বাজার কাদের সেবা দেবে? ব্যাপক সংখ্যক মানুষ এর দ্বারা কি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না? জর্ডানে তারা ১৫টি নতুন পাঁচতারা হোটেল তৈরি করতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের হাত একেবারে শূন্য। এগুলো কাদের জন্য? দেশটি একটি অর্থনৈতিক ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে।

◆ *এইসব দ্বন্দ্বের সমঝোতাহীন প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও আপনি এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে সবাই চিনতে পারছে যে, একটা ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের সমাধানই ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলিদের জন্য সঠিক বাস্তবসম্মত এবং সর্বোপরি সঠিক। এই দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানে কখন এবং কীভাবে পৌঁছালেন? মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত অন্য যে স্বপ্ন, যে সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন, তার সাথে এগুলোকে মেলাবেন কীভাবে?*

মূলত সেখানে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমত বিচ্ছিন্নতা এবং ভাগাভাগির তত্ত্ব মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষসময় থেকে আজ পর্যন্ত এবং শান্তিপ্রক্রিয়াসহ। ভাগাভাগির বিষয়ে আগ্রহী আমার ছাত্র জো ক্লিয়ারি ফিলিস্তিন, আয়ারল্যান্ড ও ভারতীয় উপমহাদেশের ভাগাভাগি নিয়ে কাজ করেছে, তার কাজের মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করলাম দেশভাগ কোনো সমাধান নয়। এইসব দেশ থেকে সমস্যা যায়নি। এইসব দেশে মানুষ একসাথে অসাম্য ও

বৈষম্যের মাঝে বসবাস করছে। আর বাস্তবতা হলো, দেশভাগ বা বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও লোকে একত্রে বসবাস করছে। প্রশ্ন হলো, সমঅধিকারের ভিত্তিতে একটা পদ্ধতির মধ্যে কি তারা বসবাস করতে পারবে, যা বর্ণবাদ অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়? আর এটাই ফিলিস্তিনিদের সমস্যা।

কিন্তু আরবের অন্যত্র সমজাতিক রাষ্ট্রের যে ধারণা– মিশরীয় রাষ্ট্র, সিরিয় রাষ্ট্র, জর্ডানীয় রাষ্ট্র–তা জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রকাশ। এটা অভিবাসী, উদ্বাস্তু ও সংখ্যালঘু জনসংখ্যার বাস্তব অবস্থার কোনো সমাধান দিতে পারবে না, সে কুর্দি, শিয়া, খ্রিষ্টান বা ফিলিস্তিনি–যারাই হোক না কেনো। বিভিন্ন ধরনের সংখ্যালঘু রয়েছে। মিশরীয়দের জন্য একটি মিশরীয় রাষ্ট্র, ইহুদিদের জন্য ইহুদি রাষ্ট্রের দাবী বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার সামিল। যা দরকার তা হলো বর্তমান সহঅবস্থান ও সরন্ধ্র সীমানার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। বিচ্ছিন্নতা ও ভাগাভাগির দৃষ্টান্ত ফেলে আমরা অতীত থেকে আরো অনেক দৃষ্টান্ত নিতে পারি। আমরা যদি আন্দালুশিয়া ও ফিলিস্তিনিদের বহুসাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখব মডেলগুলো সাদামাটাভাবে জাতীয়তাবাদী এবং সমজাতিক নয় বরং সত্যিকার বহুসাংস্কৃতিক ও বহুসম্প্রদায়ের সমাজ। এমনকি অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীন এক সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সহঅবস্থানের অনুমতি ছিল। অবশ্য সেখানে সমতার ঘাটতি ছিল। কিন্তু তারা একটা হাস্যকর ধারণা নিয়ে বসবাস করত, তা হলো প্রত্যেক জওয়ারের নিজস্ব দেশ রয়েছে। তারা জাতীয় সম্প্রদায় হিসেবে বসবাস করত। ইসরায়েল আরবদের জন্য তা করার যোগ্যতা রাখে না। ইসরায়েল আরবরা জাতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হিসেবে পরিচিত হবে না। একইভাবে প্রাচীন মিশরীয় খ্রিষ্টানরা জাতীয় সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে না। আমি বলছি না যে, কারো উপদলীয় অনুভূতিকে শোচণীয় করে তোলা উচিৎ হবে। আমি শুধুমাত্র বলতে চাইছি যে, বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত, দেশভাগের দৃষ্টান্ত ঠিক সফল হয় না।

অন্যকোনো উপায় আছে কি যেখানে এই ধরনের উপদলীয় অসূয়ার বাইরে কেউ এমন কোনো ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারে? লেবাননীরা এক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টান্ত : উপদলীয় বিরোধ নিয়ে পনরো বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলেছে। ১৯৯০ সালে তায়েফে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান হয়েছে। লেবানন এখনো উপদলে বিভক্ত কারণ সরকার-পদ্ধতিগুলো এখনো বিকশিত হয়নি। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে, যেমন আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস, ভারত ও অন্যান্যদেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা পালন করেছেন। ওই ধরনের বিচিত্র ভাগাভাগি ও বিচ্ছিন্নতা আমাদের অংশে ঘটুক তা কল্পনাও করতে চাই না।

ইসরায়েলের সাথে ইহুদিদের সহঅবস্থানের প্রসঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে আরববিশ্বে অদ্ভুত নিস্পৃহতা রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে মিশরে দাঙ্গা পর্যন্ত হয়েছে যা আমার মতে খুবই লজ্জার। আমি বলছি না যে, কাউকে ইসরায়েলি সরকারের সাথে স্বাভাবিক হতে হবে, কিন্তু স্বাভাবিকীকরণের অন্যপন্থা আছে। 'তুমি ইহুদি, আমি ফিলিস্তিনি' কিংবা 'আমি আরব আর তুমি ইহুদি' এইসব বিবেচনা বাদ দিয়েও অন্য অনেককিছুর

ওপর ভিত্তি করে মানুষের সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। সেখানে রাজনীতি ও শ্রেণীর প্রশ্ন বিদ্যমান, সেগুলো আলোচনার প্রয়োজন এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে মৈত্রী সম্ভব। ক্ষমতাসীন শ্রেণীর কপটতা এতোটাই যে, তারা সবসময় বলে আসছে যে, সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ক্ষমা করে না, তথাপি তারা ইসরায়েলের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপন করে। একইভাবে মিশরীয়, জর্ডানীয় এবং ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবীরাও বলে যে, তারা সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ চায় না, তথাপি কারা তাদের সাহায্য করতে পারে তার ভিত্তিতে ইসরায়েলিদের সহায়তা করতে চায়। আমার কাছে এই অবস্থান রীতিমতো বোকামি মনে হয়, কারণ সেখানে ওইসব দেশে অন্যান্য নির্বাচকমণ্ডলী আছেন যাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, শ্রমিক সংগঠন এবং সংখ্যালঘুদের মতো অনেক কিছুরই মিল আছে। সেফারডিক সংখ্যালঘু ও ইসরায়েলে মিজরাহিমদের কথাই ধরুন। তাদের সাথে কেউ কখনো সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেনি। আমার ওকালতির উদ্দেশ্য হলো, অন্যদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। আজকের আরববিশ্বের কথাই ধরুন না কেনো, বর্তমানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েলি ও হিব্রু শিক্ষার কোনো বিভাগ পাওয়া যাবে না। এটা শেখানো হয় না। পশ্চিম তীরে ৬০টি গবেষণা ইনস্টিটিউট আছে তার একটিতেও ইসরায়েলি সমাজশিক্ষা দেওয়া হয় না। তথাপি ইসরায়েলে কতগুলো প্রতিষ্ঠানে আরব-সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়? ডজন-ডজন প্রতিষ্ঠানে। আমরা নিজেদের একটি অসাম্যের মাঝে রেখে দিয়েছি এবং একটা আসন্ন জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে সামনে তাকাতে অস্বীকার করছি। আমরা বলে থাকি যে, সমস্ত ইসরায়েলিরা শেষমেষ নেতানিয়াহু ও বারাকের বর্ধিত সংস্করণ, তারপরও যা প্রস্তাবনা করা হয়েছে আমরা তার জটিলতা বিবেচনা করতে অস্বীকার করি। রোজমেরি সাঈঘ একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, 'অনেক বেশি বৈরি মানুষ' এবং আমাদের অনেক শত্রু রয়েছে। তা সত্ত্বেও, আমাদের দুর্বলভাবে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে যেটা আমার ধারণা আমাদের দৌর্বল্য। কিন্তু আমাদের কখনোই সেই নেতৃত্ব ছিল না যারা বুঝত আমাদের প্রতিবাদ আসলে কিসের বিরুদ্ধে। আমাদের কখনোই যথেষ্ট সংহত দক্ষতা ছিল না, আমরা কখনোই আমাদের জনগণকে সঠিকভাবে সংঘবদ্ধ করতে পারিনি। এমনকি তথাকথিত জঙ্গি আন্দোলনের চরম পর্যায়ে, ইনতিফাদা বা তার আগে, আম্মান সময়কালে এবং ১৯৮২ পর্যন্ত, ফিলিস্তিনিদের এক ক্ষুদ্র শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত ছিল। মেধাবীদের একটা বড় অংশকে এই প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়নি।

যেহেতু আমাদের আদৌ কোনো কেন্দ্র বা কোথাও কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না, সেটাই আমাদের সমস্যার একটি অংশ। আমার ধারণা, কখনোই আমাদের জিয়নবাদীদের মতো কোনো কৌশলগত মিত্র ছিল না। প্রথমে তাদের ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্য : ১৯৪৮ সালের পর তাদের ছিল আমেরিকানরা। আমাদের তুলনা করার কেউ ছিল না। আজকের ইউনিপোলার বিশ্বে বড় কাউকে বেছে নেওয়ার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। প্রশ্নটা হলো, ইসরায়েল-আমেরিকান সম্পর্কের

মাঝে ফিলিস্তিনিদের জন্য কতখানি জায়গা আছে? এটা কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রশ্ন নয়? উত্তরটা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এটাই বর্তমান নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো যে, আমরা কখনোই জাতিসংঘের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি যেভাবে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC) বুঝতে পেরেছিল এবং গণসম্পৃক্ততার ভিত্তিতে আমরা কখনোই একটি মানবাধিকার প্রচারাভিযান সংগঠিত করার চেষ্টা করিনি। নেতা ও সুধীজনরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের চূড়ান্ত ভরসার জায়গা গোষ্ঠীশাসন। তারা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি হলো এইরকম এবং এর প্রমাণ হচ্ছে এই ধরনের রাষ্ট্র, যা এখন তারা গড়ে তুলছে। এটা মূলত একটা পুলিশরাষ্ট্র, গোষ্ঠীশাসকরা পরিচালনা করছেন। প্রশ্ন হলো, এটা কোন গন্তব্যে অগ্রসর হচ্ছে?

আমি মনে করি না যে, আমরা আমাদের সংগ্রামে ইসরায়েলি জনগণের একাংশকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি। অঘঈ শুরুতে ঘোষণা করেছিল যে, তারা শ্বেতাঙ্গদের তাদের অবস্থানেই অন্তর্ভুক্ত করবে। আমরা কখনোই তা করিনি। এমনকি এখন সহমর্মী ইসরায়েলিদের আর পশ্চিমতীর ও গাজার ফিলিস্তিনি প্রতিষ্ঠানগুলো সমঅংশীদারী হিসাবে স্বাগত জানানো হয় না। তারা আমন্ত্রিত হয় না। তার মানে এই নয় যে, ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি শিক্ষাবিদদের মাঝে কোনোপ্রকার সম্পর্কোন্নয়ন ঘটছে না। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে সবসময়ই এরকম উদ্যোগ চলছে। তবে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের জঙ্গি রণাঙ্গণে যোগ দেওয়া আর এই ব্যাপারটা এক নয়।

আমাদের শত্রুর স্বভাব যথেষ্ট জটিল। এটা এমন নয় যে, আমরা রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বা আলজেরিয়ার শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে লড়ছি। এইসব মানুষ, যাদের মানসিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তা বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও হলোকাস্টের পর এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা ভিকটিম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে, এই সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। আমাদের কয়েকটি প্রজন্ম পার করতে হবে। এই বর্ণবাদী শান্তি, যা তারা প্রস্তাব করেছে, তা সম্ভবত টিকতে পারে না। এটা হবে ফলাফল নিরূপণকারী এবং এটা একটা শান্তিচুক্তির সাথে শেষ হবে। একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হবে, কিন্তু তা ন্যায়বিচার বা ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার প্রকৃত প্রয়োজনকে এড়িয়ে ইসরায়েল ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেভাবে নির্দেশ দেবে সেভাবে হবে। এটা আদৌ কোনো শান্তি নয়, এবং তা প্রকৃত সহঅবস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে না।

◆ *দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে আপনি যা বললেন সেই প্রসঙ্গসূত্রে আপনাকে মানবাধিকার সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। একস্থানে আপনি লিখেছেন, 'আজকের দিনে মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিন হলো একটি পরশপাথর, তবে তা এ কারণে নয় যে, এর সপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো সহজ ও রাজকীয়ভাবে যুক্তি উপস্থাপন করা যায়, বরং তা এইজন্য নয় যে, একে সহজভাবে তুলে ধরা যায় না।' এই ধরনের অবস্থান নির্ভর করে*

মানবাধিকারের সার্বজনীন মূল্যবোধের স্বীকৃতির ওপর. এমনকি একই প্রবন্ধে আপনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কীভাবে পাশ্চাত্য উদারবাদ ঐতিহাসিকভাবে এর মূলসূত্রের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে অতিআগ্রহী যখন দুর্বলদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি সবলদের খুবই জটিল ও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয় (আলজেরিয়া নিয়ে দ্য তোকভিল, আইরিশদের নিয়ে স্পেন্সার, ভারত নিয়ে স্টুয়ার্ট মিল)। আমাদের কি মানবাধিকার বিষয়ে একটি বলপ্রয়োগের উপযোগী পরিকল্পনা থাকা সম্ভব যখন ক্ষমতাশালীরা মানবাধিকারের বৈধতা বিষয়ে অনবরত খবরদারি করে? পার্থ চ্যাটার্জী যার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন সেইরকম একটি 'নব্য সর্বজনীনতাবাদ' কি সম্ভব, বিশেষ করে গত কয়েকবছরে জাতিসংঘের যে কলুষিত ইতিহাস? গোষ্ঠী-অধিকার ধারণাপূর্ব ব্যক্তির সার্বভৌমত্বের ওপর নির্ভরশীল মানবাধিকারের পশ্চিমা ঐতিহ্যে আজকে যেমন আমরা দেখছি এই ধরনের গোষ্ঠী অমর্যাদার ব্যাপার-স্যাপার, তখন তারা কি কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে?

আমার তাই মনে হয়। আমি যে ধরনের কাজ করতে চেষ্টা করেছি এবং অনেকেই একইভাবে চেষ্টা করেছেন, তার সমস্ত প্রসঙ্গ হলো প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মানবাধিকারের ধারণাকে সম্প্রসারিত করা, সংকুচিত করা নয়। এই ধরনের যুক্তি শোনার ব্যাপারে আমার কোনো ধৈর্য নাই এবং একথা প্রায়শই প্রাচ্য ও পৃথিবীর এই অংশে শোনা যায় যে, মানবাধিকার একটি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ধারণা।। এর কোনো মানে নেই। নির্যাতন নির্যাতনই। বেদনা সিঙ্গাপুরে যেমন অনুভূত হয়, তেমনি অনুভূত হয় সৌদিআরব, ইসরায়েল, ফ্রান্স কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে।

এই ধরনের ব্যতিক্রমের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, যেমন আপনি দ্য তোকভিলের উদাহরণ তুলে ধরলেন। সম্প্রতি মানবাধিকারের ওপর একটি নতুন বই বের হয়েছে, বইটার একটি সমালোচনা লিখেছেন জেফরি রবিনসন। সেখানে তিনি পৃথিবীর মানবাধিকারের প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, কিন্তু তিনি ফিলিস্তিনিদের উদ্ধৃতি দেননি। যদি আপনি সর্বজনীন মূল্যবোধ হিসেবে মানবাধিকারের কথা বলতে চান তাহলে সবক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখাতে হবে। কসোভোর প্রবাহের সময় আমি এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি; দেখাতে চেয়েছি কতটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ভুল যুক্তির অবতারণা সেখানে করা হয়েছে, দেখাতে চেয়েছি এটা অপর্যাপ্ত, কসোভোর দৃষ্টান্তের বেলায় যেমন, তুরস্ক, সৌদিআরব কিংবা ইসরায়েলের সমান্তরাল দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেও তেমন।

আমি মনে করি যে, মানবতাবাদের সামগ্রিক প্রশ্নে এখনো বিরাট ভূমিকা রাখার প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে আমেরিকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। মানবতাবাদের শাশ্বত মূল্যবোধের ধ্বজা ওড়ানো খুব ভালো, কিন্তু ওইসব মূল্যবোধ সবসময় প্রয়োজনের মুহূর্তে হোঁচট খায়, যেমন—আমেরিকান জাতক, আফ্রিকান আমেরিকান, আরব আমেরিকানদের বেলায় খেয়েছে। মানবতাবাদের জন্য একমাত্র পরমায়ু যা সম্ভব তা হলো, একটি সর্বজনীন ধারণার স্বার্থে একে জাগিয়ে তোলা। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যতিক্রমবাদের বিশেষ ইতিহাস, 'সুস্পষ্ট নিয়তি' এবং দেশপ্রেম।

আমেরিকান সদগুণ–এ ধারণা হলো 'আমরা আমেরিকান'রা পরার্থপরতার লড়াই লড়ে থাকি এই বোধ থাকা। এই ধারণার পুরাণত্বমোচন এবং ক্ষমতা সম্পর্কিত সংস্কৃত সমালোচনামূলক নিবন্ধ দ্বারা এর প্রতিস্থাপন সম্ভব। এই দেশের অনেক বিদ্যমতাবলম্বীদের কাজে আকারে ইঙ্গিতে তা প্রকাশিত, এই আধুনিককালে, উইলিয়াম অ্যাপলম্যান উইলিয়ামস থেকে গ্যাব্রিয়েল কোলকো, নোয়াম চমস্কি পর্যন্ত। ইসলামিক ঐতিহ্যসহ আমাদের প্রাচীণ ঐতিহ্য থেকে রসদ নিয়ে আমাদের মানবতাবাদের একটি নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করানো প্রয়োজন।

যেমন–প্রত্যেকে মনে করেন যে, মানবতাবাদের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল ১৫ শতকে ইতালিতে। কিন্তু জর্জ মাকদিসি *The Rise of Colleges : Institution of Learning in Islam and the West* শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেছেন যাতে তিনি দেখাচ্ছেন যে, জ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতির উৎস যাকে আমরা মানবতাবাদ বলি, তার উদ্ভব ১৫ ও ১৬ শতকের রেনেসাঁর সময় ইতালিতে নয়, যেমনটা জ্যাকব বার্কহার্ট এবং আরো অনেকে বিশ্বাস করেন বরং এর উদ্ভব অষ্টম শতক থেকে আরবের কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ এবং ইরাক, সিসিলি, মিশর, আন্দালুশিয়ার বিদ্যালয় থেকে। ঐ স্থানসমূহ আইনসংক্রান্ত ও ধর্মতত্ত্বের পাঠ্যসূচি এবং ঐতিহ্য সৃষ্টি করার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু করেছিলেন–তথাকথিত *Studia Abadiya*–যার থেকে ইউরোপীয় মানবতাবাদীরা তাদের অনেক ধারণা খুঁজে পেয়েছিলেন, আর তা শুধুমাত্র শিক্ষা সম্পর্কে নয়, শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কেও বটে, যেখানে ভিন্নমত, বিতর্ক এবং যুক্তি-প্রতিযুক্তি ছিল নিত্যদিনকার কর্মকাণ্ডের অংশ। মানবতাবাদ মোটেও একচেটিয়া পাশ্চাত্য ধারণা নয়। এটা ভারতীয়, চৈনিক ও ইসলামিক ঐতিহ্যে বিদ্যমান ছিল।

আমার ধারণা, পাশ্চাত্য উদারবাদের চেয়ে অনেক বেশি মানবিক ঐতিহ্যের সাথে মানবতাবাদকে সুসঙ্গত করা যায়। আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য উদারবাদ একধরনের দেওউলিয়াত্ব প্রকাশ করে। আজকের নব্যউদারবাদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক, হোক সে ক্লিনটন বা ব্লেয়ার ঘরানার। তাদের কাছে এর অর্থ বিশ্বায়ন, এর অর্থ তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতি, যা পুঁজিতন্ত্রের তুলনায় আর্থসামাজিক এমনকি আত্মিক পার্থক্যকে আরো গভীর করে তুলেছে। আমি বিকল্পে আগ্রহী যা বিশ্বায়নের সংস্কৃত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে। আজকের পৃথিবী ছোট এবং একধরনের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছে যার সূচনা ১৯ শতকে সাম্রাজ্যবাদের শুরুতে, যখন প্রথমবারের মতো সমস্ত বৈশ্বিক দৃশ্যপট একটি অর্থনৈতিক এককে পরিণত হয়েছিল। এর সামনে কোনো ধরনের মানবতাবাদ কি সম্ভব? আজকের দিনে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার উত্তর জানা দরকার যখন ফিলিস্তিন ও আয়ারল্যান্ডের মতো পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত স্থাপন সিদ্ধান্তের জন্য হাহাকার করছে।

◆ *মানবতাবাদের এই ধারণা নবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী?*

বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একধরনের অবাস্তব স্থান এবং আমি এগুলোকে সংরক্ষণ করতে চাই একটা স্থান হিসেবে যেখানে নির্দিষ্ট কিছু

জিনিস ঘটানো সম্ভব। শ্রেণীকক্ষ একটা জায়গা যেখানে জ্ঞান বা সত্য অনুসন্ধানের পরিবর্তে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ পড়ানোর ধারণাটি শিক্ষায়তনিক স্বাধীনতার প্রতি একধরনের ছলনা হিসেবে আমাকে ভীষণ আঘাত দেয়। নৃতত্ত্ব, সমকাম শিক্ষার সূচনার সাথে জরুরি রাজনৈতিক ও আত্মপরিচয়ের সংকট বিষয়ক রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠে এসেছে এবং তা বিচার্যবিষয় হয়ে উঠেছে। ঐ সমস্ত বিষয়ে আমার খুব প্রাচীনপন্থী ধারণা রয়েছে। আমি এমন একজন লোক যে রাজনৈতিকভাবে খুব করে জড়িত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্রত সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে তা নিউম্যানের ধারণার সাথে মিল রয়েছে।

◆ *একইসাথে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোম্পানিকরণের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন।*

আমার আগ্রহ বারংবার ফিরে যায় ষাটের দশকের দিকে যখন আমার কাছে প্রকাশ পেল যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, যে প্রকল্পগুলো অন্য সমাজ আবিষ্কার ও সেখানে অনুপ্রবেশের ফিকির অনুসন্ধান নিয়ে কাজ করছে। পড়াশুনোর মাধ্যমে আমি আবিষ্কার করি যে, এগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্যারোল গ্রুবারের একটি বই আছে, নাম *গধৎং ধহফ গরহবণধ*। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতীয় প্রতিরক্ষার কবজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন জন দেউয়ূ'র মতো লোক ও অন্যান্যরা কীভাবে ভূমিকা রেখেছিলেন, তারা অনেকের চাকুরি খেয়ে ফেলেছিলেন কারণ তারা যথেষ্ট জার্মান-বিরোধী ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অপব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে আর তা দক্ষিণ ও বামপন্থীদের দ্বারাই। আমার ধারণা আমরা বেশি করে আমাদের স্বায়ত্বশাসন হারাচ্ছি।

সম্প্রতি আমি *Who Paid the Piper* শিরোনামের একটি বইয়ের সমালোচনা লিখছি, বইটির লেখক ফ্রাঁসেস সোনর সাঁদারস, বইটি খুবই অসাধারণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সব তাবড় তাবড় শিক্ষাবিদ, বিশেষ করে পূর্বতীরের রবার্ট লোয়েল, এলিজাবেথ হার্ডউইক, সিডনি হুক, আরভিং ক্রিস্টল এবং লিওনেল ট্রিলিং–এঁরা সবাই শিক্ষার রাজনীতিকরণের সাথে জড়িত ছিলেন অর্থাৎ সক্রীয়ভাবে সিআইএ'র অর্থ ও সমর্থন নিয়ে ঠাণ্ডাযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন। এটা ইতিহাসের একটা বড় সত্য। প্রশ্ন হলো : কেউ কি বৈধ মানবতাবাদ গঠন করতে পারে, তেমন কেউ যার জ্ঞান, দৃঢ়তা, শিক্ষণবিজ্ঞানের প্রতি অঙ্গীকার রয়েছে তথাপি সমাজের নাগরিকত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? কীভাবে একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেটা করতে পারেন? একটি সংঘাতময় পরিস্থিতিতে কীভাবে আমরা মানবতাবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, আর বিশেষ করে সারা দুনিয়া যখন সেই সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে?

◆ *এই প্রশ্নটি মনে হয় একটি অদমনমূলক, অকর্তৃত্বব্যঞ্জক জ্ঞানের ধারণার বিস্তৃতি যা আপনি Orientalism- এ তুলে ধরেছেন?*

হ্যাঁ, একদম সঠিক। যদি আমরা বিশ্বায়ন, সম্মিলিত হস্তক্ষেপ, সহিংসতা, আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, ঠাণ্ডাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মতো বিভিন্ন সমস্যার প্রসঙ্গসূত্রে অদমনমূলক জ্ঞানের ধারণাকে পরীক্ষা করে দেখি তাহলে কি একটা মানবতান্ত্রিক.

ভাষাভিত্তিক পেশা সম্পর্কে কথা বলা সম্ভব? আমি এইরকম মনে করি। আমার কখনোই মনে হয়নি যে, সাহিত্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রশ্নসমূহ আমার বেলায় কোনো প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আমি কখনোই একজন রাজনীতি-বিজ্ঞানী হতে চাইনি। সাহিত্য বিষয়ে পঠন-পাঠন একধরনের কঠোরতা আরোপ করে থাকে। এখানে প্রাচীন, আকর্ষণীয় এবং খুব সমৃদ্ধ একটি ঐতিহ্য বিদ্যমান যার আজকের দিনে কোনো মূল্য নাই। ঐতিহ্য বলতে আমি শুধু অতীত বোঝাতে চাইনি, বারো বা তেরো শতকে ফিরে যেতে চাইনি, বরং সেই ঐতিহ্যকে বোঝাতে চেয়েছি যা উনিশ শতকের বিশিষ্ট ভাষাবিদদের কাজের মধ্য দিয়ে ধারবাহিকতা বজায় রেখেছে : আলেক্সান্ডার ভন হামবোল্ড, সিলভেস্টার দ্য সাচি, মোমসেন এবং পরবর্তী সময়ে কারতিয়াস, স্পিৎজার, অউরবাখ এবং মাসিগননের মতো বিশিষ্ট ফরাসি বুদ্ধিজীবীর কাজের মাধ্যমে। আমার মনে হয় না, এই ঐতিহ্যের নবায়ন প্রয়োজন।

◆ *আর আপনার ধারণা, তা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝেই হওয়া সম্ভবপর?*

অন্য কোথাও হতে পারে এমনটা আমার জন্য ভাবা কঠিন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় একঅর্থে একটি সুরক্ষিত স্থান। কোনোপ্রকার রোমান্টিকিকরণ না করেই বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র সুরক্ষিত স্থান। অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে ব্যবসায়-জগৎ ও সামরিক বাহিনীর গোপণ আঁতাত রয়েছে। এই বিষয়ে প্রশ্নতোলার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ওইটাই সব নয়। রেমন্ড উইলিয়ামসের কথায় ফিরে যাওয়া যায়, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা কতখানি দেউলিয়া হলো সেটা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু সমস্ত বিকল্পগুলো আপনি শেষ করে ফেলতে পারেন না। অন্যান্য বিকল্পগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোনো অবসরকালীন ক্লাসের জন্য থাকতে পারে। কিন্তু কোথায় থাকবে? আমি মনে করি, হতে পারে কোনো সেমিনারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুরক্ষিত এলাকা হিসাবে সাড়া দিতে পারে যা আমাদের দ্রুত হারাতে থাকা ঐতিহ্য দ্বারা ধরে রাখা সম্ভব।

◆ *এক অর্থে এটা শোনাচ্ছে স্বতন্ত্র শিল্প ও অঙ্গীকারাবদ্ধ শিল্পের যে পার্থক্য অ্যাডোর্নো নির্দেশ করেছেন তার Commitment শিরোনামের প্রবন্ধে তার মতো। সেখানে তিনি প্রথমটাকে দ্বিতীয়টার চেয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন কিনা। অঙ্গীকারের পূর্বে কি স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করতে হবে?*

অ্যাডোর্নোর মতে, শিল্পের শক্তি—যা প্রধানত সঙ্গীত—নিহিত রয়েছে সমাজের দ্বান্দ্বিক বিরুদ্ধবাদিতায়। তিনি বুঝতেন যে, শিল্পকর্ম ও সমাজের মধ্যে একধরনের দূরত্ব রয়েছে। দার্শনিক ও সমালোচকের কাজ হলো স্বতন্ত্র শিল্প ও সমাজের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক বিরুদ্ধতার ওপর গুরুত্বারোপ করা। কিন্তু এর সমস্যা হলো, একবার যদি আপনি অন্যটাকে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন, বিসঙ্গত চাপকে, শিল্প তার স্বতন্ত্রতা হারায়, যেহেতু সমালোচক শিল্পকে ব্যবহার করেন একটি সামাজিক উদ্দেশ্যে। অবস্থা তখন যথেষ্ট জটিল হয়ে দাঁড়ায় এবং আমি জানি না এটা কোনোভাবে ধারণ করা সম্ভব হবে কিনা।

বেশিমাত্রায় দুরকল্পী না হয়েও অ্যাডোর্নোর বরাত দিয়ে যে ধারণাটি আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তা হলো, তার মানসিক চাপ, গুরুত্বারোপ ও নাটকীয়করণের

ধারণা, যাকে আমি বলি বিসঙ্গতি। আর এই বিসঙ্গতি সবসময় অভিজ্ঞতালব্ধ। তারা বিমূর্ত নয়, আমার মতে, তারা ফিরে যায় ফিলিস্তিনির বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ডে এবং তারা দেশভাগের সামগ্রিক প্রশ্নের প্রসঙ্গের দিকে ফিরে তাকায়। কীভাবে আপনি একজনের বেশি মানুষকে সামলাবেন যারা দাবী কোরে বলে এটা আমাদের ভূখণ্ড? স্বভাবজাত সাম্রাজ্যবাদী উত্তাধিকার বলে, 'ভাগ করো এবং ছেড়ে চলে আসো'। আপনি একটা জায়গা ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু যাওয়ার আগে ভাগ করে যান, যেমনটা ইংরেজ করেছে ভারতে, ফিলিস্তিনে, আয়ারল্যান্ডে, সাইপ্রাসে আর এখন ঘঅঞঙ ও যুক্তরাষ্ট্র করছে বলকান এলাকায়। আরো অনেক উদাহরণ আছে। আমার ধারণা, দেশবিভাগ ব্যর্থ হয়েছে, আর তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, ভূগোলের পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যাও, সেই বিসঙ্গতির কাছে এবং আমার পরামর্শ হলো, পর্দা টেনে এই অংশ আমার, এই অংশ তোমার-এই কথা বলার পরিবর্তে সেখান থেকে আবার শুরু করো, তাদের মেনে নাও, বন্ধন তৈরি করো। আমি যেখান থেকে অধিক্রমণ করেছি সেই মধ্যবিন্দুর ব্যাপারে আগ্রহী। অভিজ্ঞতার স্বভাব হলো আসলে অধিক্রমণ। যেমন-ফিলিস্তিনিদের ইতিহাস বাদ দিয়ে ইসরায়েলের ইতিহাস রচনা করার কোনো উপায় নেই। আবার উলটোটাও। যেমন-রিপাবলিকানদের দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে উত্তরাঞ্চলের আইরিশদের ইতিহাস রচনা অসম্ভব। এইজন্য আমি নিম্নবর্গের ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী। ফিল্ড ডে গ্রুপ এবং সেইসব লোকদের লেখনী, যারা এইসব বিসঙ্গতি নিয়ে চিন্তাশীল পদ্ধতিতে কাজ করেছেন, বাদপড়া সেইসব উপাদান, যার কারণে কোনো লিখিত ইতিহাস বা তথ্যপ্রমাণ নাই, সেগুলো খুব খুঁটে খুঁটে দেখেছেন। এখান থেকেই রনজিৎ গুহ তার কাজ শুরু করেছেন। ভারতের ইতিহাস অবশ্যই সেইসব মানুষের ইতিহাস যারা কখনো ইতিহাস রচনা করেনি। এটা ঔপনিবেশিক ইতিহাস নয়, নয় গান্ধীজীর ইতিহাস কিংবা নেহেরুর। এটা বরং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি জায়গা যা আমার মনোযোগ কেড়েছে।

◆ *সুতরাং বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা হলো এইসব বিসঙ্গতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া?*

আমর ধারণা, এটা বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। আমার ক্ষেত্রে এটা খুবই ফলপ্রসূ কারণ বিশ্বায়ন সবকিছুর উত্তর, একমাত্র নীতিনির্ধারক, থমাস ফ্রিডম্যানের মতো কারো এই ধরনের মন্তব্যের জবাবে কিছু বলার চেষ্টা না করে বুদ্ধিজীবীরা একটি নির্দিষ্ট অবস্থার বিসঙ্গতি ব্যাখ্যা করছেন এবং নাটকীয়করণ করছেন, এটা আমাকে তা দেখার যোগ্য করে তুলছে। এই ধরনের প্রণোদনার ক্ষেত্রে অ্যাডোর্নো জোরালো এক সংশোধনী। বিশেষ করে নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত পরিস্থিতি সংশোধন করা যায় না, আমার কাছে মনে হয় যে, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা হলো এই অবস্থাকে একটি ভাষা দেওয়া, সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে কোন মাটিতে সে পা ফেলছে।

◆ *তথাপি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়ে যে চাপ-অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা ও প্রতিশ্রুতি-তা হলো এমন একটি চাপ যা আপনার নিজস্ব কর্ম ও অভিজ্ঞতায় বিদ্যমান থাকতে পারে। অন্যকথায়, যেভাবে আপনি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকাকে ধারণ করেন, অঙ্গীকার থেকে*

স্বতন্ত্রতা. নির্বাসিত একজন ভ্রমণকারী পর্যন্ত সেখানে কোনো ফিকির আছে কি? মধ্য আশি থেকে শুরু করে ১৯৯১ সালের শরৎ পর্যন্ত আপনি বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনবরত লিখে এসেছেন। ফিলিস্তিনিদের জাতীয় সংগ্রামের সাথে আপনার ইতিহাস এবং PNC-এর সাথে আপনার কর্মকাণ্ড এ কথার সাক্ষ্য বহন করে এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের শেষে আপনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, নিজেকে থিতু করবার একমাত্র পথ হলো কোনো উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা... এটাই আমার কাছে এক নম্বর অগ্রাধিকার। আর কোনোকিছু নয়।' তথাপি বুদ্ধিজীবীদের তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনি আধুনিক বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টান্তরূপে নির্বাসিত ভ্রমণকারীকে ব্যবহার করে থাকেন। অসলো চুক্তির পর কি বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আপনার ধারণা পালটে গেছে?

আমার তা মনে হয় না। সেখানে অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি আছে কি না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু নিদেনপক্ষে আমি অনুভব করি এটা একই জিনিস, আর তা সচেতনভাবেই। মাদ্রিদ বৈঠকে আমেরিকা প্রদত্ত শর্তানুসারে, বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এবং সাদ্দাম হোসেনের সাথে ইয়াসির আরাফাতের আঁতাতের পর, *PNC* আর ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

১৯৯১ সালে গ্রীষ্মের সময় আমি হানান আশরাবি, ফয়সল হুসেইনি, নাবিল সাথ এবং অন্যান্যদের সাথে মিলে আমেরিকানদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা আদায় করতে চাইছিলাম যে, আমরা ফিলিস্তিনিরা মাদ্রিদ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে চাই। আমাদের শর্তগুলো যথেষ্ট কঠোর ছিল। আমাদের ন্যূনতম চাহিদাগুলো আমরা জানিয়েছিলাম। সেক্রেটারি অব স্টেট জেমস বাকের সেটা নিশ্চিত করবেন বলে কথা ছিল। তিনি আরাফাতকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমরা কয়েকটি যৌক্তিক প্রস্তাব দিয়েছিলাম : যেমন-দখলদারিত্ব অবসান এবং এই প্রক্রিয়া বন্ধ ছাড়া আমরা কোনোকিছু মেনে নেব না। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। কিন্তু আমি দেখলাম যখন আমেরিকানদের কাছে এই দাবীগুলো পেশ করা হলো, আরাফাত সব বাতিল করে দিলেন। তিনি ইসরায়েল ও আমেরিকানদের কাছে পরিষ্কার করলেন যে, তার কোনোপ্রকার শর্ত নেই। তিনি শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে চান। এইসব কারণেই আমার মনে হয়েছিল যে, আমার চঘঈ ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। আমার আরো মনে হয়েছিল যে, এইসব শর্ত মেনে নেওয়ার পর আরাফাত আর ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না, কিন্তু তার সভাপতিত্বে PLO–এর পুনর্জাগরণ অপেক্ষা তাকে আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতাম।

আরাফাত চতুর ও কৌশলী একজন রাজনীতিবিদ। PLO–এর সমস্ত কাজকাম কঠোরভাবে তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো সবাই তার বেতনভুক। অনেকে PLO–এর কেন্দ্রিয় কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাদের মধ্যে মাহমুদ দারবিশ, শফিক আল হাউত এবং আব্দুল্লাহ অরানি। অনেক মানুষ তীব্র উৎকণ্ঠার মাঝে ছিল। কিন্তু আমি ছিলাম একা ও নিসঙ্গ যখন আমি অসলো চুক্তি ঘোষণার পর ১৯৯৩ সালের শেষদিক থেকে PLO–এর

বিরুদ্ধে লেখা শুরু করলাম। প্রকৃতপক্ষে আমি ওই রাজনৈতিক সংগ্রামের কোনো অংশ ছিলাম না। আবার আমি PLO–এর প্রকৃত বিকল্প হিসেবে নিজের দালালি করছি না। আমার ধারণা, আমি অজস্র ফিলিস্তিনিদের জন্য কাজ করছি যাদের ভোটাধিকার নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অজস্র উদ্বাস্তু এই চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন।

সেইসময় থেকে আমার মনে হলো যে, আমার একটি স্বাধীন কর্মকাণ্ড রয়েছে এবং আমি একটি ভোট এলাকার হয়ে কথা বলতে পারি। আমি কোনো অফিসিয়াল প্রতিনিধি নই; আমি স্বাধীন থাকতে চাই। কিন্তু আমি এখনো অনুভব করি আমার যোগাযোগ বেশিরভাগ ফিলিস্তিনির সাথে যারা গাজা বা পশ্চিমতীরের ভিতর বসবাস করে না। আমাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেখতে পাচ্ছি যে, ভিতরে যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি ফিলিস্তিনি ফিলিস্তিনের বাইরে বসবাস করছে। যদিও ১৯৯৬ সালে আরাফাত আমার বই নিষিদ্ধ করেছিলেন, তারপরও সেগুলো বিক্রি হচ্ছে, এমনকি কিছু স্থানীয় পত্রিকা, যখন তারা মনে করে ঝুঁকিটা সামলে নিতে পারবে, তখন তারা আমার অনেক নিবন্ধ ছেপে থাকে। সমস্যা হলো, এটা খুব সুস্পষ্ট কোনো সংগ্রাম নয়। এটা নেতা ও দলের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রাম নয়, আনুষ্ঠানিক বিরোধী গোষ্ঠীর বাইরে থেকে আমাকে কাজ করতে হয়েছে, যারা দামেস্কে বসেছে, আটটা কি দশটা, কী বলে যেন ডাকা হয়, পপুলার ফ্রন্ট, পুপলার ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এবং অন্যান্যরা। তাদের সাথে মিলে আমার করার কিছু নেই। চাঁদের বুকে মানুষের মতো আমি তাদের অপ্রাসঙ্গিক মনে করি। কিন্তু গত ২-৩ বছর ধরে গাজা, পশ্চিমতীর, লেবানন, জর্ডান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে যার সাথে আমি জড়িত ছিলাম এবং একটি জনপ্রিয় দল গড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ইয়াদ সারাজ জানতে চাইলেন আমি যোগ দেব কিনা, আমি হ্যাঁ বললাম। আজমি বাশারা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তার প্রচারণায় অংশ নেব কিনা। আমি অংশ নিলাম। সেই অর্থে আমি জড়িত, আমি জনসমক্ষে চিহ্নিত হতে ভয় পাই না। আমার ধারণা ছিল অবস্থা পালটায়নি, একই আছে, যদিও ভিতরে ভিতরে পালটেছে। কিন্তু আমি মনে করি না আমি পালটেছি।

আরাফাতের ঘনিষ্ঠজনেরা, যার মধ্যে আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও রয়েছেন, প্রায়ই আমাকে আরাফাতের সাথে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ঐক্যের স্বার্থে তার সাথে মিত্রতা স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ও তার লোকেরা কয়েকবার চেষ্টা করেছেন আমাদের একত্রিত করতে। কিন্তু আমি তাদের বলেছি যে, আমার সেরকম কোনো আগ্রহ নেই। আমি মনে করি তিনি অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এইজন্য নয় যে, আর একটা বিরাট এলাকা রয়েছে যেটাকে তিনি কৌশলে পরিচালনা করতে পারেন, এই প্রক্রিয়ায় তিনি একজন বন্দী মাত্র। তিনি ইসরায়েলিদের বন্দী, তিনি বন্দী আমেরিকানদের। আমি তাকে বলেছি যে, কোনোপ্রকার সমঝোতা হতে হলে তা জনসমক্ষে হলে আমি খুশি হবো, একটি মঞ্চে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের মাধ্যমে। অবশ্য এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কোনো কারণ ছিল না। যখন অনুগত্যের প্রশ্ন

উত্থাপিত হলো, আমি বললাম, আমার ধারণা আমি তার চেয়ে এ ব্যাপারে অনেক বেশি অনুগত। এখন অহুদ বারাকের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সাথে সাথে যে যুক্তি দেখানো শুরু হয়েছে তা হলো, ১৯৯৩ সালের পরে এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় যখন সম্ভবত কিছু একটা ঘটতে চলেছে। তারা আমার সমালোচনামূলক নিবন্ধগুলোর পরিবর্তন চাইল। আমি সাড়া দিইনি। আমি যা অনুভব করি তাই লিখি। এই সম্পর্কিত কোনো সীমাবদ্ধতার মাঝে বাঁধা পড়তে আমি রাজি নই। যখন সবকিছু পরিষ্কার হবে আমি ওই বিষয়ে মন্তব্য করব।

◆ *সমালোচনার আগে সংহতি নয়।*

অবশ্যই নয়। বলতে পারেন, এতে তাদের জন্য কী ফল বয়ে আনবে?

◆ *যাইহোক আমাদের এই ইউনিপোলার পৃথিবীতে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং বিশ্ববাজারে একচেটিয়া অধিকারের প্রশ্নটির কারণে। কীভাবে আজকের দিনে একজন ক্ষমতার তাত্ত্বিকীকরণ ও প্রতিরোধক্ষমতার বিষয়টি সূত্রবদ্ধ করবেন?*

আমার ধারণা, ক্ষমতার প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে যতবেশি সম্ভব ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মন্ত্র, যেমনটি গ্রামসি বলেছেন। আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা চিরস্থায়ী। বেশি বেশি ভূখণ্ড দখল করাটা মর্যাদার লড়াই এবং যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তার কিছু কিছু অংশ সর্বত্র প্রতর্কের ওপর একটি তাত্ত্বিক উত্তরীয় চাপিয়ে দিয়েছে। 'পশ্চিম', 'বাজার অর্থনীতি' বা বিশ্বায়নের পক্ষে এ কথা বলাটা একধরনের চর্বিতচর্বন এবং এর প্রতি একটা তাৎক্ষণিক আবেদন রয়েছে। দ্বিতীয়ত আন্তর্জাতিক আইনে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ যাবৎ বিভিন্ন দেশের সই করা প্রোটোকলে এরকম ভুরি ভুরি নজির রয়েছে। জেনেভা কনভেনশন, অনাক্রমণ বিষয়ক ভিয়েনা চুক্তি, মানবাধিকার ঘোষণা ইত্যাদি এটা এমন নয় যে, দিকনির্ণয় যন্ত্র ছাড়া আমরা একটি সমুদ্র ভ্রমণ করছি। এরকম আরো দৃষ্টান্ত অনেকে মনে করতে পারবেন। তবে তারজন্য চেষ্টা করতে হবে, কারণ স্মৃতি থেকে আধিপত্যের অনেক নজিরই কার্যকরিভাবে মুছে যেতে পারে এবং সহজেই বলতে পারে এসব আবোলতাবোল, বাজে কথা। আমরা যা বলি তা-ই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সবকিছু আবার মনে করার মধ্য দিয়ে একটা প্রতিরোধকর্ম শুরু হতে পারে।

তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহকে অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহের সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে আপনি সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। যেমন-যুগোশ্লাভিয়ায় NATO–এর হস্তক্ষেপ ঐতিহাসিকভাবে NATO যা করেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। জাতিসত্তা নির্মূলের ঘটনা ঘটেছে NATO–এর নিজস্ব এলাকার ভিতরই, বাইরে নয়। যদি আমরা তুরস্ক ও অন্যান্য এলাকার কথা বিবেচনা করি যেখান থেকে মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে বলতে হয়, এইসব ঘটেছে ইউরোপ ও NATO এলাকার মধ্যেই এবং যুক্তরাষ্ট্রেও বটে। আপনি অ-ইউরোপীয় ও অ-আমেরিকানদের দোষারোপ করতে পারেন না। NATO-এর নিজের কাঁধে রয়েছে অপরাধের বিরাট

বোঝা এবং বহন করার মতো দায়দায়িত্ব। NATO–এর বর্তমান কর্মকাণ্ডের সাথে তার নিজস্ব ইতিহাসকে মেলাতে হবে, যা অস্পষ্ট এবং অবশ্যই 'অন্যান্য অধমদের' প্রতি আমেরিকানদের আচরণের সমগ্র ইতিহাসসহ, তা হোক সে গুয়েতেমালা, কলম্বিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া।

পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে সমমনা লোকদের দলে টেনে, যারা ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন এবং ভিন্ন পরিবেশে কাজ করছেন। খুঁজে বের করতে হবে কোথায় বিরুদ্ধবাদীরা আছেন এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কসোভো সংকটের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো - যা আধিপত্যের কারণে চাপা পড়েছিল - ১৯৯৯ সালের ২৪ মার্চ থেকে ন্যাটোর বোমাবর্ষণের শুরু হওয়ার আগে থেকেই দেশটিতে মিলোসেভিচের শক্ত বিরোধিত বলবৎ ছিল, কিন্তু NATO'র বোমাবর্ষণের কারণে হয় সেই বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নয়তো উলটে মিলোসোভিচকেই সমর্থন দিতে শুরু করেছিল, কারণ এটা ছিল সমগ্র যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ, শুধু মিলোসোভিচ-শাসনের বিরুদ্ধে নয়। কেউ হয়তো গণতান্ত্রিক বিকল্প কিংবা বেসামরিক বিকল্পের কথা বলতে পারেন এবং আমিও মনে করি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হলো না। আর এটা সমগ্র বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ব্যর্থতা যারা গণমাধ্যমে অংশ নিয়েছিল। বিশ্লেষক ও ভূতপূর্ব সামরিক কর্মকর্তারা ঘটনাপ্রবাহের ওপর যথেষ্ট আলো ফেলতে পারেন নি, কিন্তু গণমাধ্যমে সমর্থন পোক্ত করতে পেরেছিলেন।

◆ *আমার কাছে মনে হয় যে, আধিপত্যের একটা বড় প্রতিক্রিয়া হলো, অনেক বামপন্থী যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন–*

এটা ছিল নব্যউদারবাদী যুদ্ধ। এটা ছিল বামদের জন্য, তথাকথিত বাম।

◆ *ঠিক। আমেরিকান বামপন্থীদের স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন-*

শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপেও। একজন জার্মান বুদ্ধিজীবী অবশ্য বলেছিলেন সামরিক মানবতাবাদের আদলে সেখানে আসলে কী ঘটছে। কী ভয়ানক নিষ্ঠুরতা ! ভাবুনতো একবার। শুধু আমেরিকানরাই নয়, ইউরোপীয়রাও। ১৯৯৯ সালের আগস্ট *The New Yorker*–এ মাইকেল ইগনাতিয়েফের একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল, তাতে তিনি বলছেন যে, এটা একটা 'ঝুঁকিমুক্ত যুদ্ধ'। কিন্তু তার বিশ্লেষণে এমন কোনো কথা বলা নেই যে, এটা অনৈতিক এবং ধ্বংসাত্মক এবং এ কাজে তারা লিপ্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবনের বিনিময়ে, যাদের অনেকে মিলোসেভিচের বিরোধিতা করেছে।

◆ *আমেরিকাতে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল যখন বামপন্থীরা নিজেদের ডানপন্থীদের সাহচর্যে আবিষ্কার করল। জ্যাক কেম্প যুগোশ্লোভিয়ায় বোমাবর্ষণকে একটি 'আন্তর্জাতিক উন্মাদনা ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।*

আপনি কি *The New Yorker*–এ বিজ্ঞপ্তিটা দেখেছেন যেখানে প্রেসিডেন্ট স্থলসৈন্যর সংখ্যাবাড়িয়ে কসোভোতে আক্রমণের তীব্রতা বাড়াতে বলেছেন? বিজ্ঞাপনটা বলছে

যে, 'আমরা' তাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। বিগনিব ব্রেজেঝিনস্কি, সুসান সনটাগ, জেনি কার্ফপ্যাট্রিক-এরা সবাই এটাতে সই করেছে। কে ভাবতে পেরেছিল যে, বিগনিব ব্রেজেঝিনস্কি, সুসান সনটাগ, জেনি কার্ফপ্যাট্রিক এবং ডেভিড রেইফের মতো লোক যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেবেন?

◆ *নব্যউদারবাদ ও রক্ষণশীলতার সমকেন্দ্রিকতা কী গুরুত্ব বহন করে?*

এটাই যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ঘটছে সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার তথাকথিত উদারবাদী অংশ কার্যত রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী অংশের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে। শীতলযুদ্ধ পরবর্তী নব্যউদারবাদী পশ্চিমের তথাকথিত বামদলের নীতি হলো, নিজেদেরকে এমন কিছুতে পালটে ফেলা যেখানে আদর্শ আর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে না, যেখানে বামমূল্যবোধ, যা সবসময়ই সংগঠন, সুস্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত করপদ্ধতির বিপরীতে সবার জন্য সমান সামাজিকনীতির ওপর গুরুত্ব দেয়, তা পালটে এক ধরনের ভোগবাদী আদর্শ ধারণ করা, যাকে বলা হচ্ছে উদারবাদী, কিন্তু আসলে তা গভীরভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে কল্যাণকামী রাষ্ট্র দ্বারা যে সমস্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল এর মাধ্যমে তার লাগাম আবার টেনে ধরা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খাতগুলো ব্যক্তিউদ্যোগ দ্বারা স্থালাভিষিক্ত হচ্ছে, যা আমার মতে ভীষণ অগণতান্ত্রিক এবং ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত, কারণ সবকিছু যদি বাজার ও বাজারশক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তখন বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষদের আর কোনো সুযোগ থাকে না। এটা ছিল তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ। বামদের নীরবতা, অন্ত তঃ সনাতন বাম, একধরনের ভয়াবহ অশনি সংকেত। এটা পরিষ্কার যে, বিকল্প খুঁজতে হবে, তবে তা সনাতন গণতান্ত্রিক দলের মাঝে নয়, অন্যত্র, আর সম্ভবত তা অভিবাসী জনগণ ও নারীবাদী আন্দোলনের মাঝে। কাউকে না কাউকে সৃষ্টিশীল হতে হবে এবং অন্যত্র পুষ্টি ও সমর্থন খুঁজতে হবে, বামদের মাঝে যা ভুলে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

◆ *শেষ প্রশ্ন। একধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আপনি স্মৃতির গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন এবং একইসাথে আপনার সাম্প্রতিক কাজ স্মৃতি ও তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত এক ধরনের গবেষণা বলা যেতে পারে। স্মৃতির এই দ্বৈতধারণাকে সম্পৃক্ত করার কি বিশেষ কোনো পথ আছে? অর্থাৎ স্মৃতির একটা ধারণা, যা মূলত রাজনৈতিক, যা ক্ষমতা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, তা আমরা স্মরণ করে থাকি, যাকে আপনি অনুস্মরণ কর্তৃক প্রতিরোধ (Resistance by Recollection) বলেছেন। স্মৃতির আরেকটি ধারণা হলো ব্যক্তিগত, একান্ত স্মৃতি যা স্মৃতিকথায় দেখা যায়।*

খুবই ভালো প্রশ্ন। গণমাধ্যম, মান প্রমিতকরণ এবং নৃতাত্ত্বিক আনুগত্যের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠা আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা এবং চাপিয়ে দেওয়া আনুষ্ঠানিক জ্ঞানপদ্ধতি দ্বারা শুধুমাত্র জনস্তরেই নয়, বরং ব্যক্তিগত স্তরেও স্মৃতিবিলোপ প্রতিহত করার একটা প্রচেষ্টার সাথে আমি সম্পৃক্তি রয়েছে। বয়স এবং আমার ক্ষেত্রে আমার অসুস্থতা যে বন্দিদশা আরোপ করেছে আমি তা প্রতিহত করার

চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি যৌথ অভিজ্ঞতার মাঝে অবস্থান করতে চেয়েছি এই আশায় যে, আমার ব্যক্তিগত সমস্যা সম্ভবত জনগণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

যে সময়টাতে আমি আমার স্মৃতিকথা লিখছিলাম, সেই সময়ও জনগণের ব্যাপারে আমার আগ্রহ এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। দেখেছি বেশকিছু স্থান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমার মনের মধ্যে জড়ো হয়ে আছে এবং অবশ্যই তার একটি মধ্যপ্রাচ্য। এছাড়াও রয়েছে আয়ারল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, কোরিয়া, জাপান ও লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত এলাকাসমূহ। পৃথিবীর এই অংশের বন্ধুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে তাদের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমার ক্ষেত্রে এই বিশাল সম্মিলিত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি যা একধরনের আঞ্চলিকতা বিরোধী, বিচ্ছিন্নতা বিরোধী এবং বর্জনবাদ বিরোধী, যা প্রায় স্বয়ংক্রীয়ভাবে আপনার ওপর চেপে বসবে যদি আপনি কোনো স্থানীয় সংগ্রামে জড়িত থাকেন-এটা ছিল খুবই মূল্যবান। আমি সবসময় চেষ্টা করেছি আলজেরিয়া, লাতিন আমেরিকা বা আয়ারল্যান্ডে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে একটি কসমোপলিটান সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য ও ফিলিস্তিন সম্পর্কে যা বলেছি তার সাথে তাকে মেলাতে। সেটাই মূল কাজ। জনগণকে সচেতন করে তোলাই একটি বড় কাজ যা একজন মানুষ তার নিজ এলাকার মানুষের জন্য করতে পারে। সেখানে একটি মাত্র সংগ্রাম আছে তা নয়, সেখানে আরো সংগ্রাম রয়েছে যা থেকে আপনি শিখতে পারেন অনেক কিছু। আর সেই অর্থে, এটা আমার জন্য একটা শিক্ষা।

এডওয়ার্ড সাঈদ রিডার, নিউইয়র্ক জুলাই-আগস্ট-১৯৯৯
ভাষান্তর : শরীফ আতিক-উজ-জামান

ফিলিস্তিনিদের পরিচয় সন্ধানে
এডওয়ার্ড সাঈদের সঙ্গে সালমান রুশদীর বাক-বিনিময়

সালমান রুশদী : পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে প্রাচ্যের সদর-অন্দরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যারা দেখেছিলেন তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড সাঈদ একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। সাহিত্যভিত্তিক বহু বইয়ের জনক এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদের এত জগতখ্যাতি যে তিনি বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবে পড়তে (বিশ্লেষণ করতে) পারেন, যেন তা বই পড়ার মতো।

তার নতুন বই *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*-এর আগে লেখা প্রধান ট্রিলজি আমাদের মূল ভাবনার খোরাক। ট্রিলজির প্রথম ভলিউম *'অরিয়েন্টালিজম'*-এ তিনি ক্ষমতাধর জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন। *অরিয়েন্টালিজম*-এ তিনি দেখিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে ক্ষমতাঅলা পণ্ডিতরা কিভাবে প্রাচ্যের ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছেন যার শেষ বিচারে সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক। অরিয়েন্টালিজম'র পরের বই *'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'*, *'দ্য কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'র* মধ্যে সাঈদ পশ্চিমা মতাদর্শ তথা ইসরাইলের ইহুদিবাদী বিশ্বের সঙ্গে আরব ফিলিস্তিনিদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বয়ান করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় লিখিত হয় *'কভারিং ইসলাম'*, সাঈদের মতে, তার উপ-শিরোনাম এই রকম– *'হাউ দ্য মিডিয়া এন্ড এক্সপার্টস ডিটারমাইন হাউ সি দি রেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড।'* যাতে পশ্চিমা দেশের প্রাচ্য আবিষ্কারের সময় এবং ইসলামী জাগরণের বিষয়ে বিস্তারিত বয়ান করা হয়।

'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই' লেখা হয় জ্যঁ মোর নামের এক ফটোগ্রাফারকে কেন্দ্র করে। ইউরোপের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত, জন বার্জারস্ এর বই- *'এ সেভেনেথ্ ম্যান'*-এ জ্যঁ মোরের উল্লেখ আছে। *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* শিরোনাম নেয়া হয়েছিল ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশের বিখ্যাত কবিতা *'দি আর্থ ইজ ক্লোজিং অন আস'* অবলম্বনে– এ কবিতার ভাবার্থ এমন–

'আমাদের দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে–
দুনিয়া ছুঁড়ে ফেলছে আমাদের তার শেষ সীমানায়
আর আমরা কান্দি অবিরাম
পলায়নপর দুনিয়া আমাদের ক্রমাগত চেপে ধরছে
আমার মনে হচ্ছে আমরা এ দুনিয়ায় শস্যদানা
তাই যদি মরতে পারি তবে হয়তো আবার
বেঁচে উঠতে পারবো।

আমার মনে হচ্ছে দুনিয়া আমাদের দাই মা
দুনিয়া আমাদের প্রতি দয়াময় হবে–
পাহাড়ের ভাঁজের আয়নায় আমরা আমাদের স্বপ্ন খুঁজি–
আমাদের মধ্যকার শেষ বিপ্লবীর হাতে যেই সব
শ্রেণী শত্রু খতম হবে তাদের মুখগুলো দেখলাম–
আমরা তাদের হতভাগা পোলাপানদের জন্যে কাঁদলাম
যারা আমাদের পোলাপানদের জানালা দিয়ে
রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছিল আমরা তাদের মুখের
দিকে চাইলাম। আমাদের সৌভাগ্য নক্ষত্র
আয়নায় রবে বন্দী হয়ে–
ছুটতে ছুটতে দুনিয়ার শেষ মাথায় যাবার পর আমরা কোথায় যাব?
আসমানের সীমানা শেষ হলে পাখিরা উড়বে কোথায়?
যেখানে হাওয়ার শেষ আয়ু শেষ হয়ে গেছে–
সেখানে শিশু চারাগাছ বেড়ে উঠবে কী করে?
লালচে ধোঁয়ার আসমানে আমরা লিখবো আমাদের নাম
আমরা আমাদের হাড় মাংসের আঘাতে কেটে ফেলবো যত সঙ্গীতের ডানা
আমরা এখানে মরবো। দুনিয়ার শেষ মাথায়
এসে আমরা মরবো।
এদিক-ওদিক ছড়ানো আমাদের তাজা
রক্ত জন্মদেবে এক অমর অলিভ বৃক্ষ।'

'দি আর্থ ইজ ক্লোজিং টু আস'– মাহমুদ দারবিশ

শেষ আসমানের পরে আর কোন আসমান নাই। শেষ সীমানার পরে আর কোন জমি নাই। সাঈদের লেখা *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*র প্রথম পর্বের নাম তিনি দিয়েছেন 'স্টেটস্'। ভূমিহীন, দুর্গত, নির্বাসিত ও পরিচয়হীন মানুষের আর্তহাহাকার এ পারার মূল আমল। এ পারায় সাঈদের জিজ্ঞাসা, 'ফিলিস্তিনিরা কোন অর্থে বেঁচে আছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা কী বেঁচে আছি? এর পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ আছে? এখন আমরা যে ফিলিস্তিনে আছি তা আগের চেয়ে ভয়াবহ। আমাদের মান-ইজ্জত এখন অনিশ্চিত, আমাদের শৌর্য-বীর্য ধ্বংসোন্মুখ, আমাদের অস্তিত্ব এখন জ্বরাক্রান্ত। আমরা কবে 'নাগরিক' বলে পরিচিত ছিলাম? আমরা কি প্রকৃত নাগরিক হবার উপায় কখনো অনুসরণ করেছি? একে অপরকে, এ প্রশ্নের জবাব আমরা কতটুকু দিয়েছি? আমরা অবিরাম একজন আরেকজনকে পত্র লিখে, শেষ করবার আগে গতানুগতিকভাবে 'ফিলিস্তিনি ভালোবাসা', 'ফিলিস্তিনি চুমু' উপহার দিয়ে যাচ্ছি। তাতে কি সত্যিকার ফিলিস্তিনি ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়ছে? ইহা কেবলই সৌজন্যমূলক আন্তরিকতার প্রকাশ, ইহা কি লোক দেখানো কোলাকুলি? এই ফিলিস্তিনি শুভেচ্ছা বিনিময়ের আগা-পাশতলায় কি কোন রাজনৈতিক মোটিভেশন নাই, যা বিশেষ একটি জাতি অথবা ব্যক্তির জন্য তাৎপর্যময়?" সাঈদের বইয়ের পরের অধ্যায়, *'মাইনরিটি ইনসাইড এ মাইনরিটি'*

অর্থাৎ 'সংখ্যালঘুর সংখ্যালঘু' পড়ে আমি তার প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভূব করেছি। সত্যিই তিনি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক সংখ্যালঘু প্রতিনিধি। তার এ অনুভূতি এক ধরনের 'চাইনিজ বাক্স'র সঙ্গে তুলনীয়। সাঈদের ভাষায়, 'সুন্নী মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় গ্রীক বংশোদ্ভুত একটি ছোট খ্রিস্টান প্রোটেস্ট্যান্ট গ্রুপে আমার জন্ম।' এরপর তিনি তার হালের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে ফিলিস্তিনের সার্বিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল 'ত্রিস্ত্রাম ম্যানডি' যা একজনের গোপন জীবন অবলম্বনে রচিত একটি কমেডি উপন্যাস। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে সাঈদ বলেছেন, 'ইল-ফেটেড পেসোপটিমিস্ট'। 'পেসোপটিমিস্ট' বলতে এমন কাউকে বোঝায় যে পৃথিবীর সবকিছু দেখে হতবাক হয়ে বিপদে পড়ে যায়। এর প্রথম অধ্যায়ের এক জায়গায় সাঈদ আগে বলেছেন, 'ইসলাম আবির্ভাবের তথাকথিত অজ্ঞতার যুগে আমাদের আগের জনেরা খেজুর দিয়ে তাদের দেবমূর্তি বানাত এবং যখন প্রয়োজন হতো তখন তারা তা খেয়ে ফেলতো। এখন বলুন দেখি মশাই, অই পরিস্থিতিতে কে বেশি অজ্ঞ? আমি না যারা তাদের দেবতাকে খেয়ে ফেলতো তারা? আপনি হয়তো বলবেন, দেবতা মানুষকে খেয়ে ফেলার আগে মানুষেরই আগে দেবতাদের খেয়ে ফেলা উচিৎ। আমিও জবাবে আপনাকেই সমর্থন করবো এবং বলবো– হ, যেহেতু তাদের দেবতা ভক্ষণযোগ্য খেজুর নির্মিত।'

*'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*তে সাঈদ প্যালেস্টাইনের মানুষের শৈল্পিক অভিজ্ঞতার তাফসীর করেছেন।

এডওয়ার্ডের দৃষ্টিতে, ফিলিস্তিনিদের ভগ্ন অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐতিহ্য সামাজিক রীতিনীতির ওপর এমনভাবে চেপে বসেছে যা কোনভাবেই সত্যসম্মত সমাজব্যবস্থা হতে পারে না। সুতরাং এখন ফিলিস্তিনিদের এই অস্থির ও শৃঙ্খলাহীন ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই কাজ করে যাওয়া উচিৎ যা তাদের অজ্ঞতাকে শনাক্ত করে। এডওয়ার্ড এ ভাবকেই বইয়ের পরের অংশে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, ফিলিস্তিনি আরবদের ইতিহাস ফিলিস্তিনের বাইরের ইতিহাসে পরিণত হচ্ছে। এইভাব চিত্রায়িত হয়েছে একটি ফটোগ্রাফে। অই ফটোগ্রাফে নাজারাতের একটি জায়গার ছবি চিত্রায়িত হয়েছে। অই জায়গা 'আপার নাজারাত' বলে পরিচিত এবং জায়গাখানি আরব ফিলিস্তিনভূক্ত ছিল না। আরব ফিলিস্তিনকে একটি নব্য আবিস্কৃত ভূমি হিসেবে দেখা হয়। এবং প্রাচীন ফিলিস্তিনের আভ্যন্তরীণ ঐতিহ্য এখন ছবির মত অকার্যকর হয়ে গেছে। তবু ফিলিস্তিনিরা এখনও আওড়ায়–

'বরং সহজ দূর ছায়াপথ থেকে ভাজা মাছ তুলে খাওয়া–
বরং সহজ সাগর চষে ফেলা অথবা
কুমিরকে শেখানো কোন সদাচারী নীতিবাক্য
তবু একটি ছেড়ে কোথাও যাওয়া অতো সহজ নয়'

টুয়েনটি ইম্পসিবলস্– তৌফিক জায়াদ

*'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*র দ্বিতীয় অধ্যায় 'ইনটেরিওরস্'-এ ফিলিস্তিনে বসবাসরত আরবদের সদর-অন্দরের জীবনযাপনের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত

ফিলিস্তিনিদের মধ্যে হাতে গোনা কিছু লোক ছাড়া বেশির ভাগ ফিলিস্তিনিরা এমনভাবে তাদের ঐতিহ্য ভুলে বসেছে যেন মনে হচ্ছে ইহুদি সংশ্রবে তারা অনেকখানি দূষিত হয়ে গেছে। এখন ফিলিস্তিনের হাল-হকিকত এমন যে সেখানকার কেউ ফিলিস্তিনি সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকলে তাকে এক বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।

ফিলিস্তিনিদের এই অভিজ্ঞতাগুলোই সাঈদ দেখাতে চেয়েছেন। একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এডওয়ার্ডের কাছে এক মুসাফির একটা পত্র নিয়ে আসেন। পত্রদাতার দাবি– তিনি কারাত বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিলিস্তিনি পরিচয়কে মহিমান্বিত করেছেন। 'অই পত্রে কী ছিল?'–এর জবাবে এডওয়ার্ড বলেছেন, 'প্রথমত লোকটি জানিয়েছেন, তিনি ফিলিস্তিনের জন্মগত নাগরিক– এখন থাকেন আমাদের আদি নিবাস জেরুজালেমে। তিনি আমার নাম লিখেছেন ইংরাজিতে। পুরাপত্রে কারাতে তার দক্ষতার কথা এমনভাবে বারবার বলেছেন যেন 'কারাতে দক্ষতাই ফিলিস্তিনিদের সর্বোচ্চ সাফল্য। কারাত মূলত আত্মোন্নয়ন নয় বরং তা কোন বিষয়ের রিপিটেশনের প্রতীক।' এরপর সাঈদ ফিলিস্তিনিদের চরিত্র বোঝাতে কয়েকটি পুনরাবৃত্তি ধর্মী চরিত্রকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। বইয়ে তৃতীয় অধ্যায় 'ইমার্জেন্সি' ও চতুর্থ অধ্যায় 'পাস্ট এ্যান্ড ফিউচার'-এ সাঈদের মূল কথা ফিলিস্তিনি কারা এবং ফিলিস্তিনিদের কেমন হওয়া উচিৎ। এখানে আরেক শক্তিকে দেখানো হয়েছে যার দিকে ফিলিস্তিনিরা আলবৎ ঝুকে পড়েছে। তা হল অন্য ভাষার ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়া। এমনকি তাদের নামও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় বদলানো হচ্ছে। পরিচয়ের মূলে যাবার জন্যে তারা প্রাচীন আরব ইতিহাসে ফিরে যাচ্ছে; তাদের পরিচয়ের আদর্শমডেল হিসেবে তারা ইয়াসির আরাফাত নয়, আবু ওমরকে বেছে নিচ্ছে। বিভিন্ন কারণে নামের অর্থও পাল্টে যাচ্ছে। লেবাননের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরের নাম 'ঈন এল হিলবি'। এই 'হিলবি' বানান লেখা হয় আরবী 'হা' অর্থাৎ 'এইচ' দিয়ে কিন্তু বর্তমানে প্রাচীন হিব্রু বানানরীতি অনুসরণে তার নাম হয়েছে 'ঈন এল খিলবি'। 'ঈন এল খিলবি' মানে 'মধুর বসন্ত' আর বদলানো নামের অর্থ দাঁড়ায় 'ফাঁকা জায়গার বসন্ত'। সাঈদ এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমিও ভেবে দেখেছি ইসরাইলিরা শূন্য বসন্ত দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ক্যাম্প শূন্য করে ফেলেছে।' এ বইয়ে তিনি ইহুদিবাদীতার বিষয়েও কথা বলেছেন। তার আগের বই *'দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'* সে বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। 'সেমিটিজম' বা ফিনিশীয় আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন ইহুদিবাদীতার যে কোন ধরনের সমালোচনা করার পেছনে যে জটিলতা তা আগে আমাদের 'নোট' করা দরকার। ঐতিহাসিক ধারায় জিওনিজম বা ইহুদিবাদীতাকে আমাদের বুঝতে হবে। জিওনিজমেরও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস যা আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বইয়ের একটি জায়গায় তিনি বলেছেন, পশ্চিমা দেশের মানুষ অবরুদ্ধ ভূমি বলতে প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের আবাসস্থলকেই বোঝে। কিন্তু সাঈদ অবরুদ্ধভূমিকে এমন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসস্থল বলে অভিহিত করেছেন যেখানে সম্ভাবনাময় উচ্চমার্গের দর্শন চিন্তা করা যায়। ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে, তার বক্তব্য হল এটা অবরুদ্ধ ভূমি কিন্তু মধ্যবিত্ত চেতনার ভূমি নয়– বরং এখানে বহু

উচ্চ ভাবনার বিষয় রয়েছে। সবশেষে সাঈদ ক'গোছা প্রশ্ন করেছেন যা ফিলিস্তিনের মূল অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

'ভূমিহীনদের কী হবে? এ দুনিয়ায় তুমি কোথায় দাঁড়াবে? তুমি কী ত্যাগ করবে?' তার একটা অনুচ্ছেদ আমার খুব দামী মনে হয়েছে– আমি নিজেও বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের ক্ষেত্রে সত্য হল– আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির দিকে দৌড়াতে চাই। আমরা যাযাবরের মত, এবং সম্ভবত আমরা শংকর জাতিভূক্ত মানুষ ছাড়া নিজেদের ভাবতে পারি নাই। অবরুদ্ধতাকে আমাদের এই প্রবণতাই আরো বেশি দীর্ঘায়িত করে রেখেছে।' এছাড়া নিজেদের সংস্কৃতিকে ছুঁড়ে ফেলে মুক্তির লড়াইয়ে শুধু সহিংসতাকেই বিদ্রোহের ভাষা মনে করার কারণেও সাঈদ ফিলিস্তিনিদের সমালোচনা করেছেন।

নিউইয়র্কে থাকাকালীন প্রফেসর সাঈদকে বহুবার 'জিউস ডিফেন্স লীগ'র কর্মীরা নানা ধরনের হুমকি দিয়েছে। নিউইয়র্কের মত জায়গায় নিজেকে ফিলিস্তিনি বলে পরিচয় দেবার জন্যই তাকে আমাদের শুভেচ্ছা জানানো দরকার, কারণ নিউইয়র্কে ফিলিস্তিনি পরিচয়ে বাস করা কপালের জন্য সুখবর নয়।

একবার আমার এক বোনকে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকাকালীন তার দোস্তরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?' যখন সে বললো, পাকিস্তান; তখন তাদের বেশিরভাগই এমন ভাব করলো যেন 'পাকিস্তান' সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নাই। একজন আমেরিকান তো বলেই ফেললো 'ও, প্যাকেস্টাইন!'– [যেন সে চিনে ফেলেছে] এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে তার কয়েকজন ইহুদি দোস্তর গল্প শুরু করে দিল।

নিজেদের দুনিয়ার বাইরে আমেরিকানদের এহেন মূর্খতার কথা তো আমরা ভাবতেই পারি না। আমি যখন ১৯৮৬ সালে নিউইয়র্কের পেন কংগ্রেসে ছিলাম, তখন সিনথিয়া ওজিক নামের এক লেখিকা অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ক্রিসকিকে এন্টি-সিমেটি বলে তার বিরুদ্ধে নিন্দা চালিয়েছিল। ক্রিসকি নিজে ছিলেন একজন ইহুদি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হাজার হাজার ইহুদি শরণার্থীদের অস্ট্রিয়ায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপরও তাকে এন্টি-সিমেটি বলা হয়েছিল। তার কারণ ছিল একটাই, তিনি একবার ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে বৈঠক এবং আলাপ আলোচনা করেছিলেন। আশংকার ব্যাপার হল– সিনথিয়ার এই অভিযোগে পেন কংগ্রেসে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। কংগ্রেসে সবাই একের পর এক ফিলিস্তিনিদের দোষারোপ করে ভাষণদান করলেন। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কেউ কোন কথা বলছেন না এবং আমি বলবো বলে মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় পিয়েরে ট্রুডিউ সবার মধ্য থেকে উঠে আসলেন এবং চমৎকার ভাষায় ফিলিস্তিনের পক্ষে তার ভাষণদান শুরু করলেন। কিন্তু পিয়েরের মত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার ঘটনা নিউইয়র্কে কদাচিৎ ঘটে। এটা একেবারেই ব্যতিক্রম ঘটনা। এডওয়ার্ড, অই সম্মেলনে আপনি উপস্থিত ছিলেন। যে পরিস্থিতি তা কি ভালো না খারাপের দিকে গড়াচ্ছে? এ জাতীয় পরিস্থিতিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

এডওয়ার্ড সাঈদ : ভালো কথা। আমার মনে হয় পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকেই গড়াচ্ছে। প্রথমত, নিউইয়র্কে বেড়ে ওঠা আমেরিকানদের ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে

কোন চাক্ষুস ধারণা নাই। তারা টেলিভিশনে ফিলিস্তিনিদের যেভাবে দেখে সেভাবেই তাদের সম্পর্কে ধারণা নেয়। মার্কিন টেলিভিশনে তাদের 'বোমাবাজ' 'খুনি' বলে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'সন্ত্রাসী' বলে আর তারাও ফিলিস্তিনিদের তাইভাবে। এ কারণেই ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে তাদের কিছু ভিত্তিহীন কু-ধারণা তৈরি হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার কারণে আমার সম্পর্কেও তাদের ধারণা ভালো। তবে তারা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে তখন তারা বলে ফেলে, 'তোমাকে দেখে যত খারাপ মনে হয় হয়তো তুমি তত খারাপ নও।' আমি ইংরাজিতে কথা বলি এবং স্বাভাবিক কারণেই ভালভাবেই তা বলতে পারি। ফলে একটা বড় ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। আমার কথা বলার বাইরে যে বইপত্র লিখেছি, তা যখন পাঠক পড়ে তখন তারা একজন 'ইংরাজি' সাহিত্যের অধ্যাপকের লেখা হিসেবেই পড়ে। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন ১৯৮২ সালের পরে আমরা নতুন কিছু সমস্যা, নতুন কিছু সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লাম। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তখন আমাদের ভাঙন ধরলো যখন বৈরুত, আমাদের বৈরুত ভেঙে গেল। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ইহুদি ও ইসরাইল সমর্থক এবং আমার মত লোক উভয়ের কাছেই বৈরুত ভেঙে যাওয়া একটি যুগের অবসান বলে চিহ্নিত। আপনি ভাবছেন যে এখানে নিরাপদে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন এখানেও কিছু নানা ধাচের হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আপনাকেও। আপনি যে এখানে বহিরাগত তা কোন না কোনভাবে ঠিকই এখানকার আশপাশ আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সালমান রুশদী : ফিলিস্তিনি ইস্যুতে ভাষণ রাখতে বা কিছু লিখতে এখানে কোন প্রতিবন্ধকতা টের পাচ্ছেন? মানে আপনার কোন লেখা বা ভাষণে অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন আনতে হচ্ছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : একটু দীর্ঘ জবাব দিতে হবে। আপনি জানেন ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের গ্রুপ তৈরি হয়েছে। একদল বামপন্থী আরেকদল ডানপন্থী। নোয়াম চমস্কি, আলেকজান্দার কোকবার্নের মত কিছু লেখক এখানে উঠে দাঁড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ লোকই ভাবে বিরুদ্ধ স্রোতের কিছু না করাই ভাল। তারপরও এখানে কিছু জায়গা আছে যেখানে খুব কম সংখ্যক শ্রোতা-পাঠক আপনি পাবেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ফিলিস্তিনিদের পক্ষে যাবে এমন কিছু বললে বা লিখলে আপনাকে 'টোকেনাইজ' করা হবে। আপনাকে চিহ্নিত করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও অপহরণ, বোমবাজি ইত্যাদি ঘটনা ঘটলে আমাকে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে ফোন করা হয় এবং একা এসে সে বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য বলা হয়। মিডিয়াগুলোও আমাকে সন্ত্রাসীদের প্রতিনিধি মনে করে– এটা ভাবতেই আমার মধ্যে এক আশ্চর্য অনুভূতি কাজ করে। দুর্ঘটনা ঘটলে তারা ধরেই নেয় যে এটা ফিলিস্তিন সমর্থিত 'সন্ত্রাসী'দের কাজ। আপনি কোন অনুষ্ঠানে, কোন বৈঠকে যাবেন সেখানেও আপনাকে 'সন্ত্রাসী'দের কূটনৈতিক হিসেবে দেখা হবে। আমার মনে পড়ছে, একবার ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটি টেলিভিশন বিতর্কে যোগ দেবার জন্য আমাকে ডাকা হল। যদিও বিতর্কের বিষয় ছিল আমার যদ্দুর মনে পড়ছে 'এ্যাচিল লাউরোর' ঘটনা সংক্রান্ত। কিন্তু ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিতে রাজি

হলেন এক শর্তে– তা হল তিনি একই রুমে আমার সঙ্গে কথা তো বলবেনই না। আলোচনা ও বিতর্ক যদি এক বিল্ডিংয়ের মধ্যে হয় তাহলেও তিনি রাজি নন। সরাসরি প্রচারিত অই অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তখন দর্শকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেন, 'অধ্যাপক সাঈদ এবং রাষ্ট্রদূত নেতানিয়াহু দু'জনই কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে কথা বলবেন না এবং মিস্টার সাঈদ...' কিন্তু আমি তার কথার মধ্যেই বলে উঠলাম 'না–না, আমি কথা বলতে চাই কিন্তু তিনি চান নাই।' মর্ডারেটর তখন বললেন, 'ঠিক আছে আমিই সমাধান করছি; মিস্টার এ্যাম্বাসেডর, আপনি কেন প্রফেসর সাঈদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'কারণ উনি আমাকে হত্যা করতে চান।' মর্ডারেটর তখন একটুও অবাক না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও, তাই? তাহলে এ বিষয়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।' তখন এ্যাম্বাসেডর মিস্টার নেতানিয়াহু বেশ রসিয়ে রসিয়ে কইতে লাগলেন, কীভাবে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলিদের হত্যা করার প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মূল প্রসঙ্গ ফেলে তখন যে আক্রমণাত্মক ভাষণ তিনি দিলেন তাতে 'টোটালি একটি এ্যাবসার্ড সিচুয়েশন' তৈরি হল।

সালমান রুশদী : আপনি মাঝে মাঝে বলেন যে ইহাকে আপনি ফিলিস্তিনি বিদ্বেষ বলতে পছন্দ করেন না। কিন্তু কেন?

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমার মনে হয় ইহা অন্য এক ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে। যেমন, জেরুজালেম থেকে একবার এক লোক আমার কাছে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা আরব দুনিয়ার ইহুদি।' আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা কাজ করে। আমরা ভাবতে পারি না, আমরা আরব দুনিয়ার মুসলমান বা আমরা আরব দুনিয়ার খ্রিস্টান।

হয়তো ইসরাইলিদের অই চিন্তা-ভাবনা আরও বেশি ভালো। ফিলিস্তিনিদের প্রতি তা হয়তো তাদের বিদ্বেষ নয়; হয়তো ইসরাইল কেন্দ্রীক জাতীয়তাবোধ তাদের ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে অন্ধভীতি তৈরি করেছে।

সালমান রুশদী : তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার দর্শন কী? কোন অর্থে ফিলিস্তিনি জাতি টিকে আছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : প্রথমত স্মৃতিচারণ অর্থে। আপনি ফিলিস্তিনের অসংখ্য লোক পাবেন যারা তাদের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাতে ভালোবাসে এবং ঐতিহাসিক আভিজাত্যের বড়াই করে। অনেক আধুনিক প্রজন্মের নবীন ফিলিস্তিনি পণ্ডিতরা ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় আবিষ্কার করছে যেসব বিষয় ফিলিস্তিনকে আরব বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়ত, ফিলিস্তিনিরা রাজনৈতিক খবরা-খবরের দিক থেকে বহুত দূরে অবস্থান করছে। একটা খেয়াল করার মত ব্যাপার হল কিছু কিছু ফিলিস্তিনি ইয়ংস্টাউন অথবা ওহিওতে এসে বসবাস করতে চায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইহা কেমন জায়গা, বা সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থান কোথায় তাহলে তারা বলতে পারবে না। হয়তো তারা বলবে, ইয়ংস্টাউন অথবা ওহিও কোথায় তা জানা নাই। কিন্তু বৈরুতের সর্বশেষ ঘটনার খোঁজ ঠিকই রাখে। পপুলার ফ্রন্ট অথবা আল ফাতাহ্ মুভমেন্টের কোন

চুক্তিভঙ্গ হল তার খবর তারা রাখছে– কিন্তু ইয়ংস্টাউনে বসবাসরত এমন ফিলিস্তি নিও পাবেন যে সেখানকার মেয়রের নাম পর্যন্ত জানে না অথবা বলতে পারে না সে কিভাবে নির্বাচিত হল। বোধ হয় তারা ধরে নেয় কোন একজনকে মেয়রের পদে ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেষ কথা, জ্যঁ মোরের ছবিতে দেখা যায় ফিলিস্তিনিরা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে অনবরত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করছে। এখানে ফিলিস্তিনিদের যাযাবরের মত চিত্রায়িত করা হয়েছে। এসব আমাদের নাগরিক বোধকে স্পর্শ করে। আমাদের পরিচয় বোধকে জাগ্রত করে এবং আমরা চেঁচিয়ে বলতে পারি সে অনুভূতি এখনও মুছে যায় নাই। যেন ফিলিস্তিনিরা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। আশা-নিরাশার এক মধ্যবর্তী জায়গায় বাস করছে তারা।

সালমান রুশদী : বিষয়টি আরও করুণভাবে উপস্থাপনের জন্য আপনি সদ্য মরা ছেলের মায়ের গল্প বলেছেন। বিয়ের পর পরই এক ছেলে মারা গেল। তার বিধবা নববধূ যখন কাঁদছে তখন তার শাশুড়ি বলছেন, 'আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সে এখন মরলো, নয়তো পরিস্থিতি ঢের খারাপ হতো।' সদ্য বিধবা মেয়ে তখন তার শাশুড়িকে ধমক দিয়ে বললো, 'এ আপনি কি বলছেন, আমার স্বামী এখন না মরলে পরিস্থিতি কীভাবে ঢের খারাপ হতো?'

উত্তরে শাশুড়ি বললেন, 'আমার ছেলে যখন বড় হয়ে যেত তখন তুমি পরপুরুষের হাত ধরে চলে যেতে, সেই শোকেই সে মারা যেত। তার চে' এখন মরাই তার জন্য ভালো হয়েছে।'

এডওয়ার্ড সাঈদ : আপনি নেগেটিভ দিকগুলো তালাশ করতে বরাবরই ওস্তাদ!

সালমান রুশদী : ফিলিস্তিনিদের পরিচয়ের ব্যাপারে তারা আশাবাদী না নৈরাশ্যবাদী তা ঠাহর করা ভারি মুশকিল। সে জন্য একে আমরা 'নৈরাশ্যপূর্ণ আশাবাদ' বলি। আপনি কি বলবেন ফিলিস্তিন পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার মত তাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : একটা ঘটনা বলি; তাহলে আপনার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার খুব ঘনিষ্ট এক দোস্ত একদিন আমার বাসায় এলো এবং সেদিন রাতে আমার বাসায় থাকলো। সকাল বেলায় আমরা নাস্তা খেতে বসলাম। নাস্তার মেন্যুতে ছিল দুধের সর দিয়ে বানানো বিশেষএকটা খাবার। আরব অঞ্চলে এই খাবারকে বলে 'জা'আতার'। ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়াসহ আরব দুনিয়ার সবখানে অই খাবার একটি পরিচিত মেন্যু। কিন্তু আমার দোস্ত বললো, 'তোমার বাসায় যে ফিলিস্তিন সংস্কৃতি চর্চা হয় তা বোঝা যাচ্ছে। নাস্তার টেবিলে 'জা'আতার' দেখে।' তারপর কবির মত সে বোঝাচ্ছিল লেবানন বা সিরিয়ার সঙ্গে ফিলিস্তিনের রন্ধন প্রক্রিয়ার কী কী সূক্ষ্ম ফারাক আছে। এবং অন্যান্য অঞ্চলের 'জা'আতার'র সঙ্গে ফিলিস্তিনি 'জা'আতার'র কী কী তফাৎ রয়েছে। এবং অই দিন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে ফিলিস্তিনের রন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্যেও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

সালমান রুশদী : তাহলে একজন ফিলিস্তিনি যে কাজ করে সেটাই 'ফিলিস্তিনি' কাজ হয়ে ওঠে। এটা বোঝাতে চাচ্ছেন কী?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হাঁ ঠিক তাই। এমনকি তাদের ভাষার মধ্যেও বিশেষ বিশেষ কোড রয়েছে যা আপনাকে বুঝতে সহায়তা করবে যে অমুক লোক কোন ক্যাম্প অথবা গ্রুপ থেকে এসেছে। কথার উচ্চারণ, শব্দের প্রয়োগ শুনেই বুঝতে পারবেন সেকি পপুলার ফ্রন্ট না ফাতাহ্ গ্রুপের সমর্থক। এছাড়াও তাদের ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক টান রয়েছে। সবচে' তাজ্জব ব্যাপার, যে শিশুর জন্ম লেবাননের শরণার্থী শিবিরে এবং যে জীবনে কোনদিন ফিলিস্তিনে যায় নাই তার সেই লেবাননীয় আরবী উচ্চারণের মধ্যেও হাইফা, জাফা, গাজার আঞ্চলিক টান রয়েছে।

সালমান রুশদী : প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে একটু অন্যদিকে যাই। প্রসঙ্গটি হল ফিলিস্তিনিদের চরিত্রের মাত্রাতিরিক্ত তার ব্যাপারে। আপনি নিজেও বলে থাকেন যে কোথাও যেতে আপনার মাত্রাতিরিক্ত বড় লাগেজ সঙ্গে নিতে হয়। কিন্তু তার চেয়ে মাত্রাতিরিক্ততার উদাহরণ হিসেবে আমার মনে পড়ছে; ইসরাইল রেডিওতে প্রচারিত এক ফিলিস্তিনি গেরিলার বক্তব্যের কথা। ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার পর রেডিওতে এক গেরিলার সঙ্গে ইসরাইলি অফিসারের যে কথোপকথন হয় তা প্রচার করা হয়। আসলে ইহা ছিল একটা অভিনীত সাক্ষাৎকার। ওই সাক্ষাৎকারে দেখা গেল গেরিলা নিজেকে ভয়ঙ্কর ও জঘন্য মানুষ হিসেবে অভিহিত করলো। একই সঙ্গে সে তার সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য সাংঘাতিক অনুশোচনা বোধ করছে বলেও জানালো।

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে। সেই ১৯৮২ সালের ঘটনা। ইসরাইল কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফিলিস্তিনিদের বিভ্রান্ত করার জন্য সাজানো কিছু সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করত। কিন্তু মজার কথা হল ফিলিস্তিনিরা তাতে বিভ্রান্ত তো হয়ই নাই বরং সন্ধ্যায় বিনোদনের জন্য তারা নিজেরা অই ভিডিও টেপ চালিয়ে মজা করতো। সেরকম একটা সাক্ষাৎকারের নমুনা দেই :

ইসরাইলি উপস্থাপক : আপনার নাম?

আটককৃত ফিলিস্তিনি : আহমেদ আব্দুল হামিদ আবু সাঈদ।

ইসরাইলি : আপনার মুভমেন্টের নাম?

ফিলিস্তিনি : আমার মুভমেন্টের নাম আবু লেল। [আবু লেল মানে 'অন্ধকারে পিতা' যা এক আতংক সৃষ্টিকারী নাম।]

ইসরাইলি : এখন বলুন আপনার সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম কী?

ফিলিস্তিনি : আমার সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন'।

ইসরাইলি : কখন আপনি এই সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে জড়ালেন?

ফিলিস্তিনি : যখনই প্রথম আমি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সচেতন হলাম।

ইসরাইলি : দক্ষিণ লেবাননে আপনার মিশন কী ছিল?

ফিলিস্তিনি : আমার মিশন ছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। আমরা স্রেফ গ্রামে ঢুকতাম এবং এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতাম। শিশু ও নারীসহ সবাইকেই আমরা চরম ভীতির মধ্যে রাখার চেষ্টা করতাম; সোজা কথায় সেখানে আমরা যা করতাম তা সন্ত্রাসী তৎপরতা।

ইসরাইলি : আপনি কি কোন আদর্শগত কারণে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়েছিলেন না স্রেফ টাকার জন্য?

ফিলিস্তিনি : না, স্রেফ টাকার জন্য। টাকা ছাড়া এ ব্যাপারে কি আদর্শ থাকতে পারে?

আসলেই কী কোন আদর্শ আছে? আমরা বহু আগেই আমাদের আদর্শ বেঁচে দিয়েছি।
ইসরাইলি : এই সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো কোথায় টাকা পায়?
ফিলিস্তিনি : সন্ত্রাস ছড়ালে যাদের স্বার্থ উদ্ধার হয় তারা দেয়।
ইসরাইলি : সন্ত্রাসী ইয়াসির আরাফাত সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?
ফিলিস্তিনি : আমি শপথ করে বলতে পারি আরাফাত হচ্ছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী। সে আদর্শ বিকিয়ে আমাদের বেঁচে দিয়েছে। আসলে তার পুরো জীবনটাই সন্ত্রাসে ভরা। [একজন ফিলিস্তিনের কাছে মনে হতে পারে সে যা করছে তা আদর্শের জন্য করছে। কিন্তু আসলে তা নয়। সে আসলে টাকার জন্যই তার আদর্শের বুলি আওড়ায়।]
ইসরাইলি : ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সঙ্গে কী রকম আচরণ করে বলে আপনি মনে করেন?
ফিলিস্তিনি : সততার সাথেই বলছি। ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো দরকার কারণ তারা আমাদের সঙ্গে যথার্থ সদয় আচরণ করে।
ইসরাইলি : যারা আইডিএফ [ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্স] এর ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে সেই সন্ত্রাসীদের প্রতি আপনার কোন উপদেশ বা পরামর্শ আছে?
ফিলিস্তিনি : তাদের প্রতি আমার উপদেশ হল আইডিএফ এর কাছে এখনই তাদের অস্ত্র সমর্পণ করা দরকার। যা তাদের জন্য সব দিক থেকে মঙ্গলজনক হবে।
ইসরাইলি : অবশেষে, আপনি কি আপনার পরিবারের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?
ফিলিস্তিনি : আমি আমার পরিবারকে আশ্বস্ত করতে চাই আমি ভাল আছি এবং সুস্থ আছি। আমি ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা আমার শত্রুপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে এ কথাগুলো বলার সুযোগ দিয়েছেন।
ইসরাইল : মানে আপনি এই টেলিভিশন চ্যানেল অর্থাৎ 'ভয়েস অব ইসরাইল'র কথা বলছেন?
ফিলিস্তিনি : হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ধন্যবাদ স্যার! অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার!
সালমান রুশদী : এভাবে প্রচার করত?
এডওয়ার্ড সাঈদ : একদম এভাবে। বৈরুত থেকে অইরকম বানানো ভিডিও চিত্র তারা গেরিলাদের মানসিক শক্তি ভেঙে দেওবার জন্য প্রচার করত। ভেবে দেখুন কী হাস্যকর, মজার কাহানী বটে?
সালমান রুশদী : এছাড়া আপনি একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের ফটো আর্টিকেল সম্পর্কে বলেছিলেন। অই আর্টিকেলের শিরোনাম ছিল 'টেরোরিস্ট কালচার'। সে আর্টিকেলে দাবি করা হয় যে ফিলিস্তিনিরা প্রকৃতপক্ষে ফিলিস্তিনি নয়; তারা আদতে আরব সংস্কৃতি ও লেবাস ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরা ফিলিস্তিনি বলে দাবি করছে।
এডওয়ার্ড সাঈদ : আমরা তো সব সময়ই তাই করি! [ব্যাঙ্গাত্মক হাসি]
সালমান রুশদী : অই আর্টিকেলে আরো বলা হয়েছিল, ফিলিস্তিনিরা আরবের সাধারণ মানুষ নয় বরং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পোষাকের অনুকরণ করে। অই আর্টিকেলের মার্কিন লেখিকা শ্যারন চার্চারের প্রতি নির্দেশ করে আপনি লিখেছিলেন, 'গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে অই মহিলা একটি ভাড়াটে ফ্যাশন

ম্যাগাজিনের একজন ভাড়াটে লেখিকা।' এরপর আপনি বলেছেন শ্যারন চার্চারের মিথ্যা মন্তব্য ভুল প্রতিপন্ন করতে ফিলিস্তিনের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। তাহলেই বোঝানো যাবে ফিলিস্তিনিরা যে পোশাক পরে তা কতখানি মৌলিক। কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মৌলিকত্ব নিয়ে বার বার অভিযোগ তোলার পর যদি বার বার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করতে যান তাহলে ব্যাপারটাকে ক্লান্তিকর মনে হবে না?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ তা হবে। কিন্তু তারপরও আমি তা করবো। *'মিডনাইট'স চিলড্রেন'* উপন্যাসের আদলে ইহা সবকিছু সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত অনুসন্ধানের মতো। আপনি 'মিডনাইট' সম্পর্কে পরিচিত সে কারণে আপনি অতীতে ফিরে যাবার কথা বুঝতে পারবেন। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করা খুব কঠিন। কারণ দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলো তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে এত ভুল তথ্য দিয়ে রেখেছে যে অতীতের সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

সালমান রুশদী : কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তো দীর্ঘদিন থেকেই বলা হচ্ছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু ইসরাইলিরা শক্ত মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে কব্জা করে রাখায় তা হচ্ছে না।

সালমান রুশদী : আপনি ফিলিস্তিনিদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। ফিলিস্তিনিদের মিডিয়া অপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আপনি ফিলিস্তিনিদের সমালোচনা করেছেন।

এডওয়ার্ড সাঈদ : ঠিক তাই। একটা আজব ব্যাপার হল ১৯৪৮ সালের পর থেকে যত ফিলিস্তিনি লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার বেশির ভাগের মধ্যেই দেখা যায় তারা যেন আশঙ্কা করছেন যে তারা তাদের দেশ হারিয়ে ফেলছেন। তাদের লেখার মধ্যে ফিলিস্তিনের শহরগুলোর এমনভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেন ফিলিস্তিনি এক জেলখানা যেখানে এখনই কোন কয়েদিকে জেরা করতে হবে। ফিলিস্তিনিরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর লক্ষ্যণীয়ভাবে ফিলিস্তিনি সাহিত্যে আকাল পড়ে। অবশ্য পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকে আবার তা জেগে উঠতে শুরু করে। কিন্তু তাদের এই সাফল্যের মধ্যে এমন একটি বই আপনি পাবেন না যাতে ফিলিস্তিনির সঠিক ইতিহাস বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। অথচ তারা অনেক সময় পেয়েছেন– কিন্তু তারা শুধু তাদের লেখায় প্রতিপক্ষের সমালোচনাই করেছেন। কাজের কাজ কিছুই করেন নাই। এ সুযোগে ইসরাইলিরা তাদের সব তল্পীতল্পা সরিয়ে ফেলেছে। ১৯৮২ সালে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইন রিসার্চ সেন্টারের সব তল্পীতল্পা তেল আবিবে নিয়ে যায়, যে ঘটনা আমাকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছিল।

সালমান রুশদী : সাহিত্যের প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন ফিলিস্তিনিরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ফিলিস্তিনি লেখকদের লেখায় তাদের জন্মভূমির বিস্তারিত বিবরণ ও ইতিহাস অনুপস্থিত। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে তা কি খুব বড় বাধা?

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ। ফিলিস্তিনের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলোকে ইতিহাসের একটি কোষে সংকলিত করা সম্ভব নয়। ফিলিস্তিনের ইতিহাস লিখতে হলে অবশ্যই লেবাননে অবস্থানরত শরণার্থী ফিলিস্তিনি অথবা সীমানাবর্তী উদ্বাস্তুদের ইতিহাসও লিখতে হবে। এইখানে মূল সমস্যা। কেবল এককভাবে ফিলিস্তিনের বর্ণনা দিলে তা

অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ফিলিস্তিনের ইতিহাস লিখতে হলে তার অস্থির সময়কে নির্দেশ করতে হবে, ফিলিস্তিনিদের দেশ ছাড়া বা দেশে ফেরা সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। *'মিডনাইটস চিলড্রেন'* উপন্যাসে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা চেষ্টা করা হয়েছে।

সালমান রুশদী : আপনি কিছুক্ষণ আগে 'পেসোপটিমিস্ট' বা 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক আশাবাদী' লেখককে এমন এক ফর্মের লেখক বলেছেন যার কোন ফর্ম নাই। এবং যাকে আপনি অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতির আয়না বলে চিহ্নিত করেছেন। তাদের বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত কিছু বলবেন কী?

এডওয়ার্ড সাঈদ : এটা উৎকেন্দ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছি। আমি নিজে ফিলিস্তিনি পণ্ডিত নই এবং আরবী সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞও নই।

কিন্তু কানাফানি'র লেখা উপন্যাস *'মেন ইন দ্য সান'* সবাইকে মুগ্ধ করেছে দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তার উপন্যাসের রচনাশৈলী এবং কাহিনীর মধ্যে সময়ের অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তার উপন্যাসের একটি অংশ 'হাইফায় প্রত্যাবর্তন'-এ একটা পারিবারিক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কাহানীতে দেখানো হয়েছে ১৯৪৮ সালে দেশছাড়া একটি পরিবার রামাল্লায় ফিরে আসে। এর বহুদিন পরে অই পরিবার আবার হাইফায় তাদের পুরানা বাসস্থান দেখার জন্য ফিরে যায় এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া পোলাপানদের খোঁজ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অই পরিবার হাইফায় তাদের ছোট ছেলেকে ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় যে পরকালে হাইফায় একটি ইহুদি পরিবারের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে। এ গল্পে কানাফানি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ছাড়াই গুলিয়ে ফেলেছেন।

সালমান রুশদী : যাক, এবার আমরা আপনার লেখা *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনা করব। ফিলিস্তিনি মহিলাদের অপ্রকাশিত কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আপনার এ বইটিতে। আপনি লিখেছেন 'এবং আমি লক্ষ্য করলাম ফিলিস্তিনের অসংখ্য মৌলবাদী সমস্যার মধ্যে একটি হল সার্বিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অনুপস্থিতি। অল্প কিছু মহিলা ছাড়া ফিলিস্তিনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান দাড়ি, কমা, হাইফেনের মত। যতক্ষণ না আমরা আমাদের সমাজে নারীদের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, সচেতন ও মূল পথে না আনতে পারব ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতাহীনতার বিষয় উপলব্ধি করতে পারব না।' বক্তব্যের তাফসীর হিসেবে আপনি ফিলিস্তিনের তরুণ চিত্র পরিচালক মাইকেল ক্লিফির ছবি *'দি ফার্টাইল মেমোরি'র* কথা উল্লেখ করেছেন। অই ছবিতে দু'জন ফিলিস্তিনি নারীর অভিজ্ঞতাকে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : হ্যাঁ, অই ছবি আমাকে খুবই আন্দোলিত করেছে। অই ছবির আকর্ষণীয় দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্যে একজন বৃদ্ধার অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে। অই মহিলা আদতে পরিচালক ক্লিফির চাচী হন। নাজারাতে অই মহিলার একখণ্ড জায়গা আছে। সেখানে একটি ইহুদি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া থাকেন। কিন্তু একদিন সেই মহিলার মেয়ে ও জামাই এসে তাকে খবর দিল যে অই ইহুদি পরিবার এখন জায়গাখানি কিনে নিতে চায়। মহিলা সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন অই প্রস্তাবে তিনি রাজি

নন। কিন্তু তার মেয়ে-জামাই বললো 'আম্মাজান, আপনি কী বলছেন? তারা সেখানে দীর্ঘদিন ধরে আছে অতএব এ জায়গা তাদেরই। বরং তারা দয়া করে আপনাকে জমির দাম দিয়ে ব্যাপারটাকে সহজ করতে চাচ্ছে।' কিন্তু বৃদ্ধা বললেন, 'না আমি কোনভাবেই তাদের প্রস্তাবে রাজি নই।' ছবিতে ক্লিফি তখন অই মহিলার আইনি অজ্ঞতা প্রসূত অসহায়তা দেখিয়েছেন। ছবিতে মহিলা বলেছেন, 'জমিখান এখন আর আমার নাই। কিন্তু কে জানতো এমন হবে? আমরা এক সময় এখানে (নাজারাতে) ছিলাম, তারপর ইহুদিরা এখানে এলো, তাদের পর আরও ইহুদি এলো। আমি এ জমির মালিক ছিলাম, এখন নাই কিন্তু জমি ঠিকই আছে। মানুষ আসে, যায়– কিন্তু জমি আগের জায়গাতেই থেকে যায়।' অই বৃদ্ধা তার পুরানা জমি দেখতে যায়। লেবাননে গিয়ে মরে যাবার আগে ১৯৪৮ সালে বৃদ্ধার স্বামী তাকে এই জমি দিয়ে গিয়েছিল। ক্লিফি চমৎকার ভাবে অই জমির ওপরে বৃদ্ধার অসহায় পায়চারি করার দৃশ্য দেখিয়েছেন। এ সেই জমি যার ওপর অই বৃদ্ধার মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখিয়েছেন ক্লিফি। তিনি দেখিয়েছেন, বৃদ্ধা অবশেষে বুঝতে পারলেন তার অজ্ঞতার কারণেই আজ তিনি মালিক হয়েও জমির মালিকানা দাবি করতে পারছেন না। ছবির এ দৃশ্যকে ফিলিস্তিনি নারীদের বাস্তব অবস্থার সচিত্র প্রতিচ্ছবি মনে হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা তাদের অজ্ঞতার কথাও স্বীকার করে না। আরব সমাজে নারী বিদ্বেষী মনোভাব তীব্রভাবেই রয়েছে। তারা মহিলাদের সমাজে সম্মানজনক উত্থানকে ভয় পায়। আমার মনে পড়ছে একবার আমি আর আমার এক দোস্ত একটা চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম। প্রদর্শনীর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছিল হাস্যোজ্জ্বল এক নারী বুকে হাত বেধে দাঁড়িয়ে আছে। আমার দোস্ত স্বভাবসুলভ ভাষায় তার পরস্পর মতাদর্শ বিরোধী মন্তব্য করে বললো, 'তিনি একজন ফিলিস্তিনি মহিলা, কুৎসিত প্রগতিবাদী মহিলা।' আমার মনে হল জ্যঁ মোরের আঁকা অই ছবি যেন এমন কিছু বলতে চাচ্ছে যা আমরা বুঝতে পারছি না।

সালমান রুশদী : *আফটার দ্য লাস্ট স্কাই*'র ভেতরে আপনি বলেছেন, দীর্ঘদিন পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে বাস করার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন একজন অ-ইহুদি ভাবতেই পারে না ইহুদিদের ইহুদিবাদী ক্ষমতা কত। আপনি এই জিওনিজমের ক্ষমতাকে একটি 'স্লো এ্যান্ড স্টেডি প্রসেস' বলে অভিহিত করেছেন যা ইহুদি বিরোধী যে কোন কার্যক্রমের চেয়ে অনেক কার্যকর ও শক্তিশালী।

আপনার ভাষায় প্রধান সমস্যা হল, ইহুদিদের বিরোধিতা করা হলে তার বিরুদ্ধে ফিনিশীয় আরব বিরোধিতার অভিযোগ আনা হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ যদি 'এন্টি-জিওনিস্ট' হয় তাকে বলা হচ্ছে 'এন্টি-সেমিটিক'। আপনি আপনার এই বই এবং *'দি কোয়েশ্চেন অব প্যালেস্টাইন'* বইয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ইহুদিবাদীতার খোলা সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন–

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমার দিক থেকে কথা হচ্ছে 'জিওনিজম' হল এ অঞ্চলের হালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। আপনি অনেক লোক পাবেন যারা জাতি বিদ্বেষসহ মধ্য আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারির বিরোধিতা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে আপনি এমন কাউকে পাবেন না যে ইহুদিবাদীতার সমালোচনা করে না বলে ইহুদিবাদীতা ফিলিস্তিনিদের জন্য কতটা ক্ষতিকর। আপনি যদি নির্যাতনের

শিকার কোন ফিলিস্তিনির পক্ষ নেন তাহলে দেখবেন কোন না কোন ইহুদি অথবা তার সংগঠন আপনাকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে যাতে আপনি নিজেই তাদের শিকার হয়ে যাবেন। আপনার কোন উপন্যাসের কমেডি চরিত্রের মত আপনাকে 'ভিকটিম অব দ্য ভিকটিম' বানানো হবে। আর এখন একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ইসরাইল বিরোধী যে কোন বই অথবা কলামকে তারা 'এন্টি-সেমিটিজম' বলে নিন্দা করা শুরু করেছে। 'এন্টি-সেমিটিজম' শব্দটাকে তারা এখন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে আপনি আরব অথবা মুসলিম সমাজের কেউ হয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রে বসে ইসরাইলের কোন কুকীর্তির নিন্দা করেন তাহলে তারা আপনাকে ইউরোপীয় অথবা পশ্চিমা এন্টি-সেমিটিজমের চর বলতে দ্বিধা করবে না। এখন সময় এসেছে সত্যিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করবার। সময় এসেছে ইহুদিবাদীতার গোড়াপত্তন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের মনোভাব নজরে আনবার।

সালমান রুশদী : কিন্তু সমস্যা হল 'ইহুদিবাদ' বিষয়টি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে এখন তার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা মুশকিল। আপনি কী ভেবে দেখেছেন গেলো বছরগুলোতে 'জিওনিজম' শব্দটি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেন তা যে কোন সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : গত ১০ বছরে আমি অনেক ইহুদি'র সঙ্গে কথা বলেছি যারা তাদের সম্পর্কিত অন্যদের ধারণা বদলাতে আগ্রহী এবং ষাটের দশকে ইহুদিদের চরম উত্থান ও ইহুদিবাদ বিষয়ে অস্বস্তিবোধ করে।

সালমান রুশদী : আপনাকে কয়েকটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি বলেছেন, মুসলিম কালচার থেকেই ফিলিস্তিনি হবার বাসনা জাগ্রত হয়েছে এবং ঘটনাক্রমে আপনি একজন অমুসলিম। এটাকে কি আপনি কোন সমস্যা হিসেবে দেখছেন? এ ক্ষেত্রে কী কোন ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে?

এডওয়ার্ড সাঈদ : আমি আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি আমার কোন অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা নাই। আমার ধারণা লেবাননের শরণার্থী ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক তফাৎ রয়েছে সেখানে সুন্নী-শিয়া উদারপন্থী-মৌলবাদীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। আমাদের এখানেও হয় সেটা অন্য রাজনৈতিক কারণে ধর্মীয় কারণে নয়। ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবোধ আপনাকে এমন একটি স্বতন্ত্র চেতনায় জাগ্রত করবে যা আসলে কোন মুসিবত নয়, বরং উপহার। বিশ শতকে আরব দুনিয়াসহ অনেক জায়গার অনেক জাতি তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে নিজেরাই ধ্বংস করে ফেলেছে।

সালমান রুশদী : আপনি লিখেছেন, 'আমাদের ওপর পতিত দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে আমাদের এক বিশাল অংশের ফিলিস্তিনি জনগণ অতীষ্ট হয়ে পড়েছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য কিছুটা দায়ী আমাদের নিজস্ব ভুল, কিছু অংশ সৃষ্টি করেছে আগ্রাসী শক্তি এবং কিছু অংশ তৈরি হয়েছে আমাদের কৌশলগত ত্রুটির জন্য অর্থাৎ হয় আমরা আমাদের মিত্রদের একত্রিত করতে ব্যর্থ হয়েছি নয়তো আমরা শত্রু দমন করতে ব্যর্থ হয়েছি। এসব কারণেই আমাদের ওপর এত মুসিবত পতিত হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ লোকই এখন উদ্ভ্রান্ত, কিন্তু আশার কথা– আমি একজন ফিলিস্তিনিও পাই নাই যে হতাশায় ভেঙে মুষড়ে পড়েছে।'

এডওয়ার্ড সাঈদ : একদম সত্যি কথা!

সালমান রুশদী : আপনার আগের তিনখানি বইয়ে পশ্চিমা ও প্রাচ্যের সংস্কৃতিগত বাহ্যিক ব্যবধান দেখিয়েছেন কিন্তু *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*তে ফিলিস্তিনিদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে বলে মনে হয়। আপনি বলেছেন, ফিলিস্তিনিরা বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে কৌতুহল গুটিয়ে নিয়ে এখন তাদের আত্মপরিচয়ের দিকে ঝুঁকছে। কেন? এ সম্পর্কে আপনার নিজের কী ধারণা?

এডওয়ার্ড সাঈদ : ভালো কথা। এখন ফিলিস্তিনিদের মোহমুক্তির পর্যায়। আমার প্রজন্মের অনেক লোকই প্রবল দুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু ষাটের দশকের শেষে এবং সত্তরের প্রথম দিকে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে নবজাগরণ খেয়াল করা যায়। বাইরের দিকে এই জাগরণ তেমন কোন সুফল বয়ে আনে নাই; এ জাগরণে কোন অধিকৃত জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তবে, ফিলিস্তিনি জাগরণকে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান বলে অনেকে অপব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু এখন তাদের সেই মোহমুক্তি ফিলিস্তিনিদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্রেক করছে, 'আমি কে? আমরা ফিলিস্তিন ছেড়ে কোথায় যাব?' আমি এই বিষয় নিয়েই *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'* লিখেছি।

সালমান রুশদী : আপনার বইয়ের কভারে ছাপা জ্যঁ মোরের তোলা ছবিটি সত্যিই ব্যতিক্রম। ভাঙা চশমা চোখে একজন ফিলিস্তিনি– আপনি বলেছেন লোকটির ডান চোখ গুলিতে নষ্ট হয়ে যায়– কিন্তু সে জেনেছে কিভাবে এক চোখে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। গুলিতে আহত ছবির লোকটি এখনও হাসছে।

এডওয়ার্ড সাঈদ : জ্যঁ মোর আমাকে বলেছেন, লোকটি তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ছেলেকে দেখতে যাবার পথে ছবিটি তোলা হয়েছিল।

লেখাটি সালমান রুশদী'র ই হোমল্যান্ড গ্রন্থ থেকে
ভাষান্তর : সাখাওয়াত টিপু ও সারফুদ্দিন আহমেদ

এখন আমেরিকা-বিরোধিতা ও সন্ত্রাসবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে

◆ *১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় অধিকাংশ আমেরিকাবাসীই হতবাক হয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?*

একজন নিউইয়র্কবাসী হিসাবে এই ঘটনা আমার কাছে খুবই বেদনার ও আতঙ্কের, বিশেষ করে এর ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপকতা ছিল বিস্ময়কর। বস্তুতঃ এই আক্রমণ নিরাপরাধ মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্য এক অপ্রশম্য অভিপ্রায়, যা করা হয়েছে আমেরিকান পুঁজিতন্ত্রের হৃদপিণ্ড বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ও সামরিক স্থাপনার প্রাণকেন্দ্র পেন্টাগনের মত নির্দিষ্ট কিছু প্রতীককে লক্ষ্য করে। এই আক্রমণ যেমন বিবাদ বাধানোর জন্য করা হয়নি তেমনি এটা কোনো সমঝোতার অংশও ছিলনা। কোনো 'মেসেজ' নেই এই হামলার সাথে। শুধু হামলার জন্যই হামলা যা খুবই অস্বাভাবিক। রাজনীতির হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়ে তা অধিবিদ্যার বিমূর্ত জগতে পৌঁছে গেছে, যেখানে একধরনের মহাজাগতিক, মনের এক দানবীয় বৈশিষ্ট্য কাজ করে চলেছে যার রাজনৈতিক সংগঠন, আলোচনা বা বোঝানোর প্রতি কোনো আগ্রহই নেই। শুধু ক্ষতি করা ছাড়া এই আক্রমণের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলনা। খেয়াল করুন, কেউ এই আক্রমণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেনি, কেউ কোনো দাবী-দাওয়া জানায় নি এমনকি কোনো বিবৃতিও দেয়নি। এ এক নীরব সন্ত্রাস। এটা কোনো কিছুরই অংশ নয়। এ যেন অন্য এক জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত যা উন্মত্ত বিমূর্ততা ও পৌরাণিক অস্পষ্টতার জগতের মত, যেখানে জড়িত রয়েছে সেইসব মানুষরা যারা ইসলামকে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে হাইজ্যাক করেছে। এদের ফাঁদে পা না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, বরং এই অন্যায়ের প্রতিশোধকল্পে ওদের মতোই এক দূরকল্পী দার্শনিক পথ ধরা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

◆ *তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কী করা উচিৎ?*

এই ভয়াবহ ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিৎ ছিল বিশ্বসম্প্রদায় অর্থাৎ জাতিসংঘের কাছে যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কিন্তু আমার মনে হয় এখন যথেষ্টই দেরি হয়ে গেছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র তা করেনি। সবসময়ই সে 'একলা চলো' নীতি পছন্দ করে। যেহেতু আমরা সন্ত্রাস নির্মূল করতে যাচ্ছি, যেহেতু এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ এবং এর সাথে নানাধরনের সমরাস্ত্র ব্যবহারের প্রশ্ন জড়িত, তাই এতে করে অন্যদের সাথে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী বৈরিতা সৃষ্টি ও সম্পর্ক জটিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা মেনে নেওয়ার জন্য বেশিরভাগ আমেরিকা বাসীই প্রস্তুত নন। তাছাড়া এর

লক্ষ্যটাও খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ ওসামা-বিন-লাদেনের সংগঠন এখন আর তার নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। এখানে আরো অনেকে আছে যারা আগামীতে বারংবার দৃশ্যপটে হাজির হবে। আর সেইজন্য আমাদের উচিৎ আর একটু ধৈর্য ধরে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে সংগঠিত অভিযান চালানো যাতে করে শুধুমাত্র সন্ত্রাসী নয় একেবারে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন সম্ভব হয়।

◆ *সন্ত্রাসবাদের মূল কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন?*

মুসলিম বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে আমেরিকার বিতর্কিত সংশ্রবই এর উৎপত্তির কারণ। মধ্যপ্রাচ্যের ওইসব তেল-সমৃদ্ধ দেশসমূহ নিজের নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমেরিকার প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আলোচনায় আমেরিকা যে ভিন্ন ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কে বেশিরভাগ আমেরিকাবাসী হয় বেখেয়ালি না হয় ভীষণভাবে অজ্ঞ।

মুসলিম বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রকে দুইভাবে দেখা হয়। একদল মনে করে আমেরিকা অসাধারণ এক দেশ। আমার পরিচিত অনেক মুসলমান আমেরিকা সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী। অনেকে তাদের সন্তানদের এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, অনেকে আসেন ছুটি কাটাতে। কারো কারো এখানে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে, কেউ কেউ প্রশিক্ষণের জন্যও এসে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আর যে ধারণাটি প্রচলিত আছে তা অফিসিয়াল যুক্তরাষ্ট্রের। এই ধারণায় বিশ্বাসীরা মনে করেন আমেরিকা সেনাবাহিনীর দেশ যারা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে অবৈধ সামরিক হস্তক্ষেপ করে থাকে। এরাই ১৯৫৩ সালে ইরানে জাতীয় মোসাদেগ-সরকারকে হটিয়ে দিয়ে শাহকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিল, এরাই উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রথম জড়িয়ে পড়ে ইরাকের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল এবং এই আমেরিকাই ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।

যদি আপনি এইসব অঞ্চলে থেকে থাকেন তাহলে দেখবেন যে, এখানে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে আমেরিকার কেমন সার্বক্ষণিক দৌড়ঝাপ চলছেই, আর তার সাথে আছে এখানকার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অনুতাপহীন-জেদি-একগুঁয়ে এক অবস্থান। বেশির ভাগ আরবীয় মুসলিম মনে করেন আমেরিকা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সঠিক মনোযোগী নয়। তারা মনে করে আমেরিকা সর্বত্র নিজের স্বার্থে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যার অনেকগুলোই আবার তাদের নীতি-আদর্শের সাথে খাপ খায়না যেগুলোকে তারা একান্তই তাদের নিজস্ব বলে দাবী করে, যেমন-গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি। কিন্তু কিভাবে ৩৪ বছর ধরে গাজা উপত্যাকা ও পশ্চিম তীর ইসরায়েলী বাহিনী কর্তৃক দখল হয়ে থাকে, কিভাবে ১৪০ টি ইসরায়েলী অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠে এবং ৪,০০০০০ (চার লক্ষ) ইহুদি সেখানে বসতি স্থাপন করে—তার যৌক্তিকতা নির্ণয় করা সত্যিই খুব দুরূহ। আর এর সবকিছুই ঘটেছে আমেরিকার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও অর্থানুকূল্যে। এই কী আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি আমেরিকার বিশ্বস্ততা? সর্বত্র আজ এক বিকারগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের চিত্র।

তবে সবথেকে দুঃখজনক বিষয় হলো, আরব দেশসমূহের শাসকদের কোনো জনপ্রিয়তা নেই। দেশের জনগণের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তারা ক্ষমতায় টিকে আছে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে । সন্ত্রাস ও কুনীতির হঠকারী সংমিশ্রণে এরা আগাগোড়া অজনপ্রিয়। তবে যেহেতু এসব দেশের জনগণ ধর্মভীরু তাই ধর্মের জিগির তুলে আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ সংগঠিত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তারা সহজেই মানুষকে বুঝাতে পারে, যেভাবেই হোক আমরা আমেরিকাকে টেনে নামাবোই। সশেষে বলতে হয়, এদের অনেকেই, যেমন–ওসামা-বিন-লাদেন ও তার মুজাহেদীনরাও আমেরিকার সৃষ্টি এবং তাদের দ্বারা লালিত-পালিত। আশির দশকের শুরুতে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য এইসব মুজাহিদ তৈরি করা হয়েছিল। সবাই মনে ভাবে আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী শক্তিকে একত্রিত করার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি ভালো শিক্ষা হয়েছিল, তারা পিটটান দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে একদল মুজাহেদিন ওয়াশিংটন এলে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান তাদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে অভিহিত করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরা প্রকৃত অর্থে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেনা। এরা ইমাম বা শেখ (আরব সর্দার) নয়, এরা ইসলামের জন্য স্ব-নিয়োজিত যোদ্ধা। সৌদি ওসামা-বিন-লাদেন নিজেকে একজন দেশপ্রেমিক মনে করেন, কারণ আমেরিকান সৈন্য ঘাঁটি গেড়েছে সৌদিআরবে, যা মুসলমানদের পূণ্যভূমি, কেননা এখানে নবী মোহাম্মদ (সঃ) জন্মেছিলেন এবং এর পবিত্রতা আমেরিকার সৈন্যদের পদাপর্ণে নষ্ট হয়েছে। আর এদের মাঝে বড় ধরনের বিজয়গর্বও রয়েছে। তা হলো, যদি আমরা সোভিয়েত বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারি তাহলে আমেরিকার সাথে পারব না কেন। এই বেপরোয়া ভাব ও ধর্মীয় আবেগ-আতিশয্য থেকেই তাদের মাঝে সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার এক সর্বগ্রাসী ধ্বংসাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, সেখানে কে নিরাপরাধ, কে জড়িত, কে জড়িত নয় তা আমল দেওয়ার কোনো ফুসরত নাই। নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছে। তবে এসব বিবেচনার অর্থ এই নয় যে, এই অপরাধকে ক্ষমা করে দিতে হবে। তবে যেটা ভেবে আমি আতঙ্কিত তা হলো, আমরা এমন এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছি যেখানে কোনোরকম সহানুভূতি ছাড়া এই ঘটনার ঐতিহাসিক পরম্পরা নিয়ে কথা বললে আপনি দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হতে পারেন, এমনকি নিষিদ্ধও হতে পারেন। এ খুব বিপদের কথা। আমি মনে করি এখন প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য, যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করছি তাকে সঠিকভাবে বুঝা, তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যে ইতিহাসের আমরা অংশ এবং কীভাবে আমরা 'সুপারপাওয়ার' হিসাবে গড়ে উঠেছি, জানার চেষ্টা করা।

◆ *কিছু পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ হার্ট অভ ডার্কনেস - এর কুর্টজ'র 'জানোয়ারগুলোকে শেষ করে দাও'-এই সংলাপের প্রতিধ্বনি করছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?*

সেপ্টেম্বরের ঘটনা-পরবর্তী কিছুদিন আমি খেদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সবাই একই সুরে কথা বলছে। বার বার একই বিশেষণ। ভিন্নমত, ভিন্নব্যাখা বা ভিন্নভাবনার প্রতিফলন খুব একটা দেখিনি। সবথেকে ক্লান্তিকর লেগেছে সঠিক বিশেষণের

অভাব। 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটার কথা ভাবুন। এই কথাটি এখন আমেরিকা-বিরোধিতা, আমেরিকার সমালোচনা ও দেশদ্রোহের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি একটি অগ্রহণযোগ্য ধারাবাহিক সমীকরণ। সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যাতে করে আমরা ইসরায়েলি সামরিক-বাহিনীর জবর-দখলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম ও বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হঠকারী হামলার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হই।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ডেভিড বারসামিয়ান সাঈদের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন যা *The Progressive* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাষান্তর : শরীফ আতিক-উজ-জামান

পরিশিষ্ট

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ : জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি

এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ (Edward Wadie Said)। বিশ্বের অন্যতম ধ্রুপদী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিবেত্তা। পাণ্ডিত্য ও মৌলিক চিন্তার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি যাঁর। ইংরেজি সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। লেবানিজ বংশোদ্ভুত এই আমেরিকান বুদ্ধিজীবী নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন; আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিদের মাটির অধিকার তথা মুক্তির সংগ্রামে তিনি ছিলেন অকুতোভয় লেখিয়ে বোদ্ধা ও যোদ্ধা।

সাঈদের বাবার নাম ছিল ওয়াদি ইব্রাহীম, জন্ম জেরুজালেমে ১৮৯৫ সালে। মা হিল্ডা মুসা, তাঁর দেশ ছিল লেবানন এবং জন্ম হয়েছিল নাজারেথ-এ ১৯১৪ সালে। সাঈদের দাদার নাম আবু আসাদ। দাদির নাম হাননে। সাঈদের বাবা ব্রিটিশ শাসিত জেরুজালেম ত্যাগ করে ১৯১১ সালে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। ব্রিটিশদের তিনি দেখতেন ঘৃণার চোখে। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি নাগরিকত্বও নিয়ে ছিলেন; ইচ্ছে ছিল যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে গিয়ে আইন পেশায় যোগ দেবেন। কিন্তু মায়ের অনুরোধে ১৯২০ সালে তিনি প্যালেস্টাইনে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত যৌথভাবে ব্যবসা চালান। কিন্তু এখানে তাঁর জীবন ছিল অনিশ্চিত, রাজনৈতিক পরিস্থিতি অথবা ইতিহাস ছিল প্রতিকূলে। ভাগ্য উন্নয়নে ইব্রাহীম চলে আসেন মিশর। তিলে তিলে কায়রোতে গড়ে তোলেন গগনচুম্বী ব্যবসায়িক সাফল্য। ১৯৩২ সালে সাঈদের মা হিল্ডাকে যখন তিনি বিয়ে করেন তখন ওয়াদি ইব্রাহীম একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু এখানেও পরিবর্তন হতে থাকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির। মিশরে যেসব আরব অন্য জায়গা থেকে এসে থাকতেন, বিশেষ করে সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও প্যালেস্টাইন থেকে, তাদের বলা হতো শামি। তাদের ভাষাকেও বলা হতো শামি।

ওয়াদির পরিবার ছিল শামি অর্থাৎ বহিরাগত। ১৯৬০ সালে জেনারেল মোহাম্মদ নাগিবের কাছ থেকে যখন গামাল নাসের মিসরের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজস্ব ধরনের আরব সমাজতন্ত্রের প্রচলন করেন, কায়রো তখন হঠাৎ খুব বেশি রক্ষণশীল হয়ে পড়ে বিদেশীদের ব্যাপারে। ইউরোপ-আমেরিকা তো ভিন্ন কথা, এই শামিদের ক্ষেত্রেও মনোভাব দ্রুত পাল্টে যায়। ধ্বস নামে ওয়াদি ইব্রাহীমের রমরমা ব্যবসায়, ছাড়তে হয় কায়রো। এ দিকে যে জেরুজালেমে জন্ম হয়েছে তাঁর, সেই জেরুজালেমে থাকেনি আর ফিরে যাবার মতো একটি স্থায়ী ঠিকানা। ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝিতে ওই শহরের পুরনো অধিবাসীদের সরিয়ে ইহুদি অভিবাসীদের দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে শহরটা।

ওয়াদি ইব্রাহীমের জন্মভূমি দখল করে নিয়েছে পোলিশ, জার্মান এবং আমেরিকান অভিবাসীরা, যারা শহরটা জয় করে ফেলে এবং তাদেরকে পরিণত করে দৃষ্টান্তহীন সার্বভৌমত্বে, যাতে প্যালেস্টাইনি জীবনের কোন জায়গা ছিল না। বালক সাঈদ বাবার সাথে ছিলেন এসব ঘটনার সাক্ষি। এমনি হাজারও মর্মস্পর্শি অভিজ্ঞতায় ভরপুর এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদের জীবন। বাবা প্যালেস্টানিয়ান, মা লেবানিজ, মাতুলালয়ে জন্ম নেয়ার কারণে সাঈদ জন্মসূত্রে লেবানিজ। শৈশব কেটেছে তার মিশরের কায়রোতে। লেখাপড়া শেষে জীবন কাটিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে। কোথাও তিনি স্থির হতে পারেননি। শিকড় গাঁথেনি তার গভীর মাটিতে। তিনি আত্ম জীবনীতে লিখছেন– 'আমি কেবলমাত্র অনেক পরিচিতির একটি অস্থিতিশীল অনুভূতি ধরে রেখেছি মনে।'

১৯৩৫ ১ নভেম্বর ব্রিটিশ-শাসিত ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত এক সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ।

১৯৪৮ ১৩ বছর বয়সে সাঈদ তার মোহন মায়াময় জন্মস্থান জেরুজালেম নগরী ত্যাগ করে বাবা-মা'র হাত ধরে চলে আসেন কায়রো। এত অল্প বয়সে তাঁর কোন কিছুই ঠিক বুঝে ওঠার কথা না, তবুও ১৯৪৮ সাল একটা তীব্র বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হিসেবে তাঁর আত্মজীবনীর অনেকগুলো পৃষ্ঠা অধিকার করে আছে। কেননা, তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন প্যালেস্টাইনের পতন তাঁর পরিবারের জন্য এক নির্মম শোকাবহ ঘটনা। যদিও বাবা-মা পুরো ব্যাপারটাই সাঈদের সামনে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়া বাক্য– **'আমাদের আর কিছুই থাকলো না'** জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে ভাবিয়েছে। এই '৪৮ সালে কায়রোরই এক নামকরা ব্রিটিশ স্কুল গেজিরা প্রিপেয়োটারতে ভর্তি হন এডওয়ার্ড সাঈদ। এই স্কুলে পড়ার সময় সাঈদ দুষ্টু প্রকৃতির ছিলেন, ইংরেজ শিক্ষকদের আচার-আচরণ নিয়ে সাঈদ ও তার বন্ধুরা মিলে নানা হাসি-তামাশা করতেন; স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করার কারণে স্কুল থেকে পরবর্তীতে সাঈদ বহিষ্কৃতও হন।

১৯৪৯ কায়রোর ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন সাঈদ।

১৯৫১ সাঈদকে পাঠানো হয় আমেরিকাতে, মাউন্ট হার্মন স্কুলে। এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে ওঠে তাঁর ঠিকানা।

১৯৫৩ মাউন্ট হার্মন থেকে সাঈদ গেলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মানস গঠনের একটা পর্যায় পরিপূর্ণতা পায়।

১৯৫৭ আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ করেন স্নাতক; এখানে তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল– 'আন্দ্রে জিদ ও গ্রাহাম গ্রিন'।

১৯৫৮-৬৩ পাঁচ বছর সাঈদ কাটিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে।

১৯৬৩ এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্যে অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। পড়াতেন– মাতৃভাষা আরবির পাশাপাশি

ইংরেজি ও ফার্সি; এছাড়াও সাঈদ ভাষা জানতেন– ইতালি, জার্মান, ল্যাতিন ও স্প্যানিস।

১৯৬৪ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পিএইচডি অর্জন করেন।

১৯৬৬ সাঈদ লেখেন, *'জোসেফ কনরাড এণ্ড দ্য ফিকশান অফ অটোবায়োগ্রাফি'*।

১৯৭২ সাঈদের বাবা ওয়াদি ইব্রাহীম মারা যান।

১৯৭৪ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন।

১৯৭৫ সাঈদের *'বিগিনিংস; ইনটেনশন এন্ড মেথড'* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫-৭৬ স্ট্যানফোর্ডের সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডি ইন বিহেভিওরাল সায়েন্স-এ গবেষক হিসেবে কাটিয়েছেন।

১৯৭৭ প্রবাসি প্যালেস্টাইন পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৮ পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে ইসলাম বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'অরিয়েন্টালিজম'* প্রকাশিত হয়। যা পরে পৃথিবীর ২৬টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

১৯৭৯ জনইশফিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৯ প্রকাশিত হয় সাঈদের অপর বিখ্যাত গ্রন্থ *'দ্য কোয়েশ্চেন অফ প্যালেস্টাইন'*।

১৯৮০ প্রকাশিত হয় *'লিটারেচার এণ্ড সোসাইটি'* (সম্পাদক)।

১৯৮১ প্রকাশিত হয় *'কভারিং ইসলাম'*।

১৯৮৩ প্রকাশিত হয় তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ *'দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য টেক্সট এন্ড দ্য ক্রিটিক'*।

১৯৮৬ প্রকাশিত হয় *'আফটার দ্য লাস্ট স্কাই'*।

১৯৮৮ প্রকাশিত হয় *'ব্লেমিং দ্য ভিকটিমস'* (সম্পাদক)।

১৯৯০ সাঈদের মা হিল্ডা মুসা মারা যান।

১৯৯১ প্রকাশিত হয়, *'মিউজিক্যাল ইলাবোরেশন্স'*।

১৯৯১ সাঈদের শরীরে ধরা পড়ে ক্যান্সার। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি ভারতীয় ডাক্তার 'কান্তি রায়ের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

১৯৯১-৯২ পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের সাথে তাঁর মতান্তর ঘটে 'অসলো' চুক্তি নিয়ে। পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিকে সাঈদ মূল্যায়ন করেন–"প্যালেস্টাইনি আত্মসমর্পণের দলিল" হিসেবে। তাঁর মতে এই চুক্তির মাধ্যমে আরবরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চুক্তিতে 'অসৎ মধ্যস্থতার' জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রেরও সমালোচনা করেন।

১৯৯৩ প্রকাশিত হয় সাঈদের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ *'কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম'*।

১৯৯৪ প্রকাশিত হয় *'দ্য পলিট্রিক্স অব ডিসপজেশান'*
'রিপ্রেজেন্টেশন্স অফ দি ইন্টেলেকচুয়াল'।
'পিস এন্ড ইরস ডিসকন্টেন্স'।

১৯৯৪ প্রকাশিত হয় *'দ্য পেন এন্ড দ্য সোর্ড'*
আনট্রে গ্যারে এ্যাট পেইক্স
হেনরি জেমস্ : কমপ্লিট স্টোরিজ, ১৮৮৪-১৮৯১ (সম্পাদক)

১৯৯৪ আত্মজীবনী *'আউট অফ প্লেস'* লেখা শুরু করেন।
'দা এন্ড অফ পিস প্রসেস'।
দ্যা এডওয়ার্ড সাঈদ রিডার

১৯৯৯ প্রকাশিত হয় এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদের আত্মজীবনী গ্রন্থ *'আউট অফ প্লেস'*। গ্রন্থটি নন-ফিকশনের জন্য নিউইয়র্কের বুক অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

২০০০ প্রকাশিত হয় তাঁর আরো একটি বিখ্যাত গ্রন্থ *'দ্য রিফ্লেকশন অন এক্সাইল'*। এছাড়াও এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে–
'অসলো এন্ড আফটার'।
'নট হোয়াইট রাইট'।
'ক্রিটিসিজম ইন সোসাইটি'।
পাওয়ার, পলিটিক্স, এ্যান্ড কালচার : ইন্টারভিউ উইথ এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ।
সাঈদ কলাম, প্রবন্ধ লিখেছেন কয়েক হাজার।

২০০২ হল্যাণ্ডের হেগ নগরীতে অবস্থিত Institute of social studies (ISS) সাঈদকে তাঁর স্ব-কৃতি স্বরূপ অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়।

২০০৩ ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার রাতে নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে এই আবিশ্ব মানবীয় বিবেকের কণ্ঠস্বর এডওয়ার্ড ওয়াদি সাঈদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

[illegible] তিনি চিহ্নিত করেন প্রাচ্য [illegible] গূঢ়-[illegible] সংগঠন যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্ম-[illegible] মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক [illegible] কিংবা জেনে অভিযোগের উপন্যাস। এর লক্ষ্য হল প্রাচ্যের মানুষদের মনোজগতকে বশে রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করা। এ ধরনের আত্মমুখী অন্বেষা আধুনিকতা-উত্তর চিন্তাধারায় সাঈদকে প্রতিষ্ঠিত করে অনন্য অলঙ্কারে। উপনিবেশিক শক্তিসংঘের জটিল কাঠামো ও তার কর্ম-প্রক্রিয়া উন্মোচন এবং উত্তর-উপনিবেশ কালে উপনিবেশিক যুগের সাংস্কৃতিক প্রভাবন ঝেড়ে ফেলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাঈদের এই বিশ্লেষণই ক্রমে উত্তর-উপনিবেশবাদ রূপে সুসংগঠিত ও পরিচিত হয়।

সাঈদের রচনার ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্য– সংখ্যা ও বিষয় দুইদিক থেকেই। তাঁর সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা সময়সাপেক্ষ কাজ। এছাড়া সব বই কিনে পড়া অনেক পাঠকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য। এসব দিক চিন্তা করেই এই বইয়ের পরিকল্পনা। সাঈদের সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত রচনাংশ নিয়ে সংকলিত এই বই পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অর্জন সম্ভব হবে। তেমনি তাঁর বিচিত্রমুখি মণীষারও স্পর্শ পাওয়া যাবে। অরিয়েন্টালিজম, কালচার এন্ড ইম্পেরিয়ালিজম, কাভারিং ইসলাম, রিপ্রেজেন্টেশনস অব দি ইন্টেলেকচুয়াল, দি ওয়ার্ল্ড দি টেক্সট এন্ড দি ক্রিটিক প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বই থেকে গৃহীত রচনাংশ কলেবরে বেশি হলেও অন্যান্য জরুরি বইও বাদ পড়েনি। মৃত্যুর আগে লেখা কিছু রাজনৈতিক নিবন্ধ এবং সাক্ষাৎকারও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বইটি সাঈদ-পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।